

সুভাষ ভট্টাচার্য

ভাষার তত্ত্ব ও বাংলা ভাষা

ভাষার তত্ত্ব ও বাংলা ভাষা

সুভাষ ভট্টাচার্য

বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ
৬/২ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট
কলকাতা : ৭০০০০৯

BHASAR TATTWA O BANGLA BHASA, Linguistics and the Bengali Language, by Subhas Bhattacharya, Published by Debasis Bhattacharjee, Bangiya Sahitya Samsad, 6/2 Ramanath Majumder Street, Kolkata : 700009, May : 2012. ₹ 160.00

প্রথম প্রকাশ
রবীন্দ্র জয়ন্তী, ২০১২

প্রকাশক
দেবাশিস ভট্টাচার্য
বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ
৬/২ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট
কলকাতা : ৭০০০০৯

প্রচ্ছদ
অতনু গাঙ্গুলী

বর্ণ সংস্থাপন
ছায়া গ্রাফিক্স
কলকাতা : ৭০০০৫৪

মুদ্রক
অজন্তা প্রিন্টার্স
কলকাতা : ৭০০০০৯

ISBN : 978-93-82012-12-2

মূল্য : একশো ষাট টাকা

অধ্যাপক পঞ্চানন মালাকর
অধ্যাপক অচিন্ত্য বিশ্বাস
স্নেহাস্পদযুগলেষু—

প্রাক্কথন

ভাষাতত্ত্ব যে একটি দুরূহ বিষয় তা সর্বস্বীকৃত। ছাত্রছাত্রী ও সাধারণ পাঠকেরা বিষয়টিকে যে নীরস মনে করবেন তা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু শিক্ষার্থীদের তো বিষয়টা পড়তেই হবে। আবার ভাষা বিষয়ে আগ্রহী সাধারণ পাঠকদেরও বিষয়টা পড়ার ইচ্ছা জাগতে পারে। এই দুই শ্রেণির পাঠকের কথা ভেবে এই বইটি লিখতে প্রবৃত্ত হয়েছি। এই বইয়ের দুটি অংশ—এক. *ভাষার তত্ত্ব*, যাতে আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানের তত্ত্ব ও তথ্য সহজ ভাষায় বলার চেষ্টা করেছি। দুই. *বাংলা ভাষা*, যাতে বাংলার ভাষার উদ্ভবের ইতিহাস, বাংলা ভাষার বিকাশ এবং বাংলা ভাষার সামগ্রিক ভাষাতাত্ত্বিক পরিচয় দেবার চেষ্টা করেছি।

বিষয়টা সহজ নয় আদৌ। কিন্তু আমার ভাষাবিষয়ক বইগুলি যাঁরা পড়েছেন তাঁরা নিশ্চয় বুঝবেন যে, আমি চেষ্টা করি ভাষাতত্ত্বকে সর্বস্তরের শিক্ষিত পাঠকের এবং কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের ছাত্রছাত্রীদের কাছে সম্পূর্ণ বোধগম্য করে এবং স্বাদু ভাষায় ও ভঙ্গিতে উপস্থিত করতে।

জটিল বিষয়কে সরলভাবে বিবৃত করতে গেলে অনেকসময় অতিসরলীকরণের আশঙ্কা থাকে। চেষ্টা করেছি, অতিসরলীকরণ এড়িয়ে যথাযথভাবে ভাষাতত্ত্বের বিভিন্ন দিক বর্ণনা ও ব্যাখ্যা করতে। এই বইয়ে আলোচিত হয়েছে আধুনিক ভাষাবিজ্ঞান তথা ভাষাতত্ত্বের নানা দিক।

তবে সাধারণ পাঠক ও ছাত্রছাত্রীদের কথা মনে রেখে এবং তাঁদের প্রয়োজনের কথা মনে রেখে বিষয়ের সমাবেশ ও বিন্যাস করা হয়েছে। সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান (General Liguistics) এবং ঐতিহাসিক বা তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বকে (Historical or Comparative Linguistics) একই কাঠামোয় ফেলে আলোচনা করা হয়েছে। আবার চমস্কি-প্রবর্তিত সঞ্জননী-সংবর্তনী ব্যাকরণের (Transformational and Generative Grammar) প্রসঙ্গও বাদ যায়নি। তাই এই বই পড়লে সামগ্রিকভাবে আধুনিক ভাষাবিজ্ঞান সম্বন্ধে পরিষ্কার একটা ধারণা হবে এমন আশা করাই যায়।

এই বইয়ের কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে—

প্রথমত, আগাগোড়া সহজ ও সাবলীল ভাষায় ভাষাতত্ত্বের ব্যাখ্যা করা হয়েছে;

দ্বিতীয়ত, প্রতিটি অধ্যায়ের শেষে গ্রন্থপঞ্জি সন্নিবিষ্ট হয়েছে। পাঠক বুঝতে পারবেন কোন অধ্যায়ের জন্য আরও কী কী বই পড়া যেতে পারে;

তৃতীয়ত, বইয়ের শেষে বিস্তৃত ও সম্পূর্ণ গ্রন্থপঞ্জি দেওয়া হয়েছে;

চতুর্থত, একেবারে শেষে নির্ঘন্ট বা index দেওয়া হয়েছে। প্রয়োজনীয় বিষয়টি যাতে সহজে ও দ্রুত খুঁজে পাওয়া যায় সেদিকে দৃষ্টি দিয়েই রচিত হয়েছে নির্ঘন্টটি।

প্রকাশক শ্রী দেবাশিস ভট্টাচার্যের আগ্রহ আর নিরন্তর তাড়না না থাকলে এ-বইয়ের প্রকাশ ত্বরান্বিত হত না। বন্ধু পিনাকী মিত্র অনেক দিন ধরে এই বইয়ের জন্য অপেক্ষা ক'রে রয়েছে। অধ্যাপক অচিন্ত্য বিশ্বাস আর অধ্যাপক পঞ্চানন মালাকরের আগ্রহ আমাকে প্রভূত উৎসাহ দিয়েছে। এঁরা আমার অতি স্নেহভাজন। শুকনো কৃতজ্ঞতা না জানিয়ে বরং বলি, এ-বইয়ে ভালো যদি কিছু থাকে তবে তার কৃতিত্ব অনেকটাই এঁদের। ত্রুটিবিচ্যুতির দায় একান্তই আমার।

বল্মীক আবাসন
কলকাতা, ৭০০০০৫৯
জানুয়ারি, ২০১২

সূচিপত্র

প্রথম পর্ব : ভাষার তত্ত্ব

তৃতীয় পর্ব

প্রথম পর্ব

১. উপক্রমণিকা : ভাষার কী ও কেন?

১.১ ভাষা কী?

ভাষা কী, কী-ই বা তার প্রকৃতি, কেমনই বা তার উৎসের কাহিনি, এসব নিয়ে মানুষ ভেবে আসছে বহুকাল ধরে। এসব নিয়ে কোনো অবিতর্কিত সিদ্ধান্ত অসম্ভব আজও। তবে যে কথাটা সংশয়াতীত তা এই যে, ভাষা হল মানুষে মানুষে যোগাযোগের মৌখিক মাধ্যম। এখানে মৌখিক কথাটা vocal-এর বাংলা প্রতিশব্দ হিসেবে ব্যবহার করেছি। এই মৌখিক যোগাযোগ বা vocal communication কথাটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আরও একটা কথা সংশয়াতীতভাবে প্রমাণিত। ভাষা মানব সমাজের সৃষ্টি, মানব সমাজের বাইরে তার অস্তিত্ব সম্ভব নয়। এই কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গে নিশ্চয় অনেকেরই মনে হবে মনুষ্যেতর প্রাণীকুলের কথা। কোনো-কোনো প্রাণী, যেমন শিম্পাঞ্জি মৌমাছি ইত্যাদি, নিজেদের মধ্যে ভাবের আদানপ্রদান যে করে সে-তথ্য আজ প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। তাহলে আমরা ওকথা কেন বললাম? যাকে প্রকৃতপক্ষে ভাষা বলা হয়, তা কেবল মানুষই ব্যবহার করে। ভাষার ব্যবহারকারীদের চরিত্র মানসতা আর সামাজিক ভূমিকা তার ব্যবহৃত ভাষায় প্রতিফলিত হয়। আর এই ভাষাই মানুষকে অন্যান্য প্রাণীদের থেকে আলাদা করে দেয়। শিম্পাঞ্জি বা মৌমাছির ভাষা আদৌ 'ভাষা' কি না সে-প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা আমরা পরে করব।

তার আগে মানুষের ভাষার প্রকৃতিটা কেমন সেটা জানা খুব জরুরি। মানুষ নিশ্চয় কতকগুলি সংকেতের সাহায্যে ভাবের আদানপ্রদান করে। এই আদানপ্রদান সঞ্চারণযোগ্য, বহু মানুষের কাছে তা পৌঁছে দেওয়া যায়, পৌঁছে দেওয়া যায় সময় থেকে সময়ান্তরে। তাহলে বলাই যায়, ভাষা হল মানুষের ব্যবহৃত সুসম্বদ্ধ ধ্বনিপ্রক্রিয়া যার সাহায্যে মানুষে মানুষে সামাজিক আদানপ্রদান চলে। এই প্রক্রিয়ায় আবেগ সঞ্চারিত হয়, অভিজ্ঞতা সঞ্চারিত হয়। ভাষা মানবসমাজের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সৃজন। ভাষাই তার সংস্কৃতি-সৃষ্টির মূলে।

সংকেতই বলি আর পশুপাখির 'ভাষা'ই বলি, মানুষের ভাষার মতো সম্পূর্ণ মাধ্যম কোনোটিই নয়। কোনোটিই সমস্ত ভাবনা জানাতে পারে না, সমস্তরকম কার্যকলাপের উপযুক্ত মাধ্যম হয়ে উঠতে পারে না। ভাষা ছাড়া অন্য কোনো মাধ্যমই চিন্তার বাহন হতে পারে না, চিন্তাকে ছড়িয়ে দিতে পারে না। মানুষ ভাষা ব্যবহারের পাশাপাশি সংকেত ইশারা এসব যে ব্যবহার করে না তা নয়, তবে সেসব হল ভাষার সহায়কমাত্র এবং সেগুলির প্রয়োগ নিতান্তই গৌণ। ভাষার পরিবর্তে সেগুলির ব্যবহার সম্ভব নয়। মানুষের ভাষার একটা দ্বৈতভূমিকা আছে। মানুষের ভাষার সঙ্গে চিন্তনের গভীর সম্পর্ক আছে। আবার ভাষার রয়েছে একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ভূমিকা। এখানেই মানুষের ভাষা

অন্য প্রাণীদের তথাকথিত ভাষার চেয়ে আলাদা, মৌলিকভাবেই আলাদা। সংকেতভাষা ও মনুষ্যেতর প্রাণীর ভাষা সম্বন্ধে পরবর্তী এক অধ্যায়ে আরও বিশদভাবে বলা যাবে। আপাতত কেবল এটুকু বলাই যথেষ্ট হবে এখানে, যে, মানুষের ভাষায় যে জটিল সংগঠন আছে তা অন্যত্র নেই, মানুষের ভাষাকে, ভাষায় ব্যবহৃত বাক্যকে যেভাবে বদলে নেওয়া যায়, নেওয়া হয়, যেভাবে শব্দকে ছোটো করি, বড়ো করি, বদলে নিই, তাও সম্ভব নয় সংকেতভাষায় বা জীবজন্তুর ভাষায়।

একটু আগে বলেছি যে, মানুষের সংস্কৃতিরও ভিত্তি ভাষা। কথাটা ভেবে দেখার মতো। প্রাচীন কাল থেকে আজ পর্যন্ত মানুষের সভ্যতার যে অগ্রগতি হয়েছে, যে পরিবর্তন হয়েছে তার পিছনে ভাষার অবদান সর্বাধিক। একথা প্রাচীন মিশরীয়রা বুঝেছিল। তাই তারা বলত ভাষাই চিন্তাপ্রক্রিয়ার জনক। এবং ইতিহাস সৃষ্টিতেও ভাষার ভূমিকা উপেক্ষণীয় নয়। ফিশার লিখেছেন, 'The linguistic verdict has been final and has fashioned all of human history.' (দ্র., S.R. Fischer, A History of Language (2001), P. 172)।

আগেই বলেছি, ভাষা সমাজকেন্দ্রিক, বা আরও নির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে, মানবসমাজকেন্দ্রিক। মানুষের সমাজেই ভাষার উদ্ভব ও বিকাশ। মানব সমাজের বাইরে ভাষার অস্তিত্ব অসম্ভব। মানুষের ভাষার সঙ্গে চিন্তাপ্রক্রিয়ার ও চিন্তনক্ষমতার একটা নিবিড় যোগ হয়েছে। মানবভাষা প্রবৃত্তিগত নয়, স্বতঃস্ফূর্ত নয়, মানবভাষা যে বিশেষভাবে non-instinctive একথা ভাষাবিজ্ঞানে স্বীকৃত। মানবভাষা কতকগুলো উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে সঞ্জাত সংকেতের সমষ্টি। অন্য দিকে, মনুষ্যেতর প্রাণীর ভাষা স্বতঃস্ফূর্ত, আবেগতাড়িত ও প্রবৃত্তিগত। মানুষ কতগুলো মৌখ-শ্রব্য (oral-auditory) সংকেতের সাহায্যে মনোভাব প্রকাশ করে। এই মৌখ-শ্রব্য কথাটিতে বুঝতে হবে যে, মানুষের ভাষা আদতে মুখেরই ভাষা। দুটো প্রক্রিয়া তাতে কাজ করে, ধ্বনি উচ্চারণের প্রক্রিয়া এবং ধ্বনি শোনার প্রক্রিয়া।

মুখের ভাষা কতকগুলো অপেক্ষাকৃত ছোটো উপাদানে তৈরি। এইরকমই দুটো উপাদানের নাম স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জনধ্বনি। আর একটা কথাও বলে নেওয়া প্রয়োজন এখানে। আমরা বলেছি বটে যে, ভাষার একটা প্রধান কাজ জ্ঞাপন বা কমিউনিকেশন, তবে ওই জ্ঞাপন ছাড়া অন্য কাজও হয় ভাষা দিয়ে। অন্যভাবে বলা যায়, জ্ঞাপনই ভাষার একমাত্র কাজ নয়। আমরা চিন্তা করি বা ভাবি ভাষার সাহায্যে। আমরা যখন ভাবি, তখনও নীরবে অর্থাৎ মনে-মনে কথা বলি। আমরা হিসেবেও করি ভাষার সাহায্যে। এসব ক্ষেত্রে কিন্তু জ্ঞাপন হচ্ছে না। অথচ এই যে দুটো কাজ, চিন্তন আর কলন (calculation) তা তো ভাষা দিয়েই সম্পন্ন করি।

এডওয়ার্ড সাপির বলেছেন যে, মনে হতে পারে মানুষের হাঁটতে শেখা আর কথা বলতে শেখা প্রায় একই রকমের স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। মানবশিশু যেমন এক সময় হাঁটতে শেখে, তেমনি কথা বলতেও শেখে একসময়। আসলে কিন্তু দুটো প্রক্রিয়ার মধ্যে বিস্তর প্রভেদ আছে। মানবশিশু হাঁটতে শেখে জৈবিক কারণে, কিন্তু কথা বলা সম্পূর্ণ ভিন্ন

প্রক্রিয়া, যদিও হাঁটতে শেখাবার মতো তাকে কথা বলতেও শেখানো হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সমাজজীবনের উত্তরাধিকার ও ঐতিহ্য রয়েছে ভাষা অর্জনের পিছনে। সাপির বলছেন, যদি সমাজ জিনিসটাকে একেবারে উৎখাত বা উচ্ছেদ করা যেত তাহলে দেখা যেত যে, মানবশিশু একটা সময়ের পর হাঁটছে ঠিকই, কিন্তু কথা বলছে না। তাই ভাষাবিজ্ঞানীদের সিদ্ধান্ত এই যে, মানবভাষা আদৌ কোনো স্বতঃস্ফূর্ত বা প্রবৃত্তিগত ব্যাপার নয়, তাকে আয়ত্ত করতে হয়, অর্জন করতে হয়, তা এক সামাজিক সংস্কারের ফল। (Sapir, E, Language, 1949, p.4)।

ভাষা যেমন ব্যক্তির অর্জন, ভাষা তেমনি সমগ্র ভাষিক সম্প্রদায়েরও অর্জন। আগেই বলেছি, মানব সমাজের বাইরে ভাষার অস্তিত্ব নেই। এই-যে মানুষে-মানুষে পারস্পরিক আদানপ্রদান, তাতে এই কথাটা ভালোই বোঝা যায় যে, ভাষার একটা সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি বা প্রণালী (system) আছে। এই পদ্ধতিটিকে বুঝতে হলে ভাষার তত্ত্বের আলোচনা ছাড়াও ভাষার ব্যাবহারিক বা প্রায়োগিক দিককেও আলোচনার বৃত্তে নিয়ে আসতে হবে। ভাষায় যে প্রণালী বা পদ্ধতি আছে তা নানাভাবে বোঝা যায়। প্রথমত, আমরা সকলেই জানি যে, ভাষা মূলত কতকগুলো প্রতীকের সমাহার। যাকে আমরা শব্দ বলি তাও প্রকৃতপক্ষে প্রতীক, অন্য কোনো বস্তুর প্রতীক, কোনো ভাবের প্রতীক, কোনো প্রাণী বা মানুষের প্রতীক বা কোনো ক্রিয়াকর্মের প্রতীক। 'বিড়াল' শব্দটার সঙ্গে ওই প্রাণীটির নিশ্চিত ও অপরিবর্তনীয় কোনো যোগ নেই, 'বিড়াল' ওই প্রাণীটির নাম নয়, বরং তার প্রতীক। আর এই কারণেই ভাষাভেদে শব্দপ্রতীক বদলে বদলে যায়। আরও একটা কথা বলা দরকার। এই প্রতীকগুলো কতকগুলো শাব্দিক উপাদানে তৈরি। (Trager, G.L., Language and Languages, 1972, p.7)।

দ্বিতীয়ত, ভাষা যে কতকগুলো পদ্ধতি মেনে চলে তার প্রমাণ এই যে, ভাষার অপপ্রয়োগ আমরা সহজেই ধরতে পারি, চিহ্নিত করতে পারি। কোনো শব্দের ভ্রান্তিই হোক বা কোনো বর্ণনার ত্রুটিই হোক, আমাদের দৃষ্টি এড়িয়ে যায় না তা। অর্থাৎ ভাষার 'বিচ্যুতি' বা ভাষা ব্যবহারের 'বিচ্যুতি' আমরা ধরতে পারি। এতেই বোঝা যায় যে, ভাষায় রয়েছে সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি বা প্রণালী।

১.২ ভাষা কেন?

ভাষা কেন? এই প্রশ্নের উত্তর আমরা একটু ভিন্নভাবে খুঁজব। ভাষা মানুষে মানুষে কথার আদানপ্রদানের মাধ্যম—কেবল এটুকু বললেই ভাষার কাজটা কী তার সবটা বোঝা যায় না। ভাষা সমাজজীবনে বন্ধনের কাজ করে। ভাষাই সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যায়। যারা একই ভাষায় কথা বলে তারা ভাষার মাধ্যমেই তাদের অভিজ্ঞতা ভাগাভাগি করে নিতে পারে। ভাষাবিজ্ঞানীরা বলেন, শুধু তথ্যের আদানপ্রদানটাই সব নয়, ভাষা আছে বলে আমরা ভাব বিনিময় করতে পারি। ভাষা দিয়ে phatic communion সম্পন্ন হয় (Wardhaugh, Ronald, Investigating Language, Oxford, 1993, p.170)।

তার মানে আমাদের সুখ-দুঃখ-আনন্দ-বেদনা, উচ্ছ্বাস-আবেগ এসবই আমরা ভাষা দিয়ে প্রকাশ করি। এই প্রসঙ্গে উঠে পড়ে ভাষা ব্যবহারের ভঙ্গির কথাও। কোনো-কোনো সময় বিশেষ কোনো ভাব প্রকাশ করার সময়ে আমরা গলার স্বরের তারতম্য ঘটাই, জোরে বা আস্তে বলি, নানাভাবে ভাষাকে ভাবপ্রকাশক্ষম করে তুলি। ফ্যাটিক জ্ঞাপনের এই হল মানে।

আরও আছে বলবার কথা। মানব সমাজে ভাষার মতো গুরুত্বপূর্ণ জিনিস আর কিছু আছে বলে মনে হয় না। সংস্কৃতি বলি, ইতিহাস বলি, ভাষাই এদের ভিত্তি। ভাষা আছে বলেই মানুষের সংস্কৃতি আছে, সংস্কৃতির চলমানতা আছে, ভাষা আছে বলেই ইতিহাসের 'সৃষ্টি' হয়, ইতিহাস লিপিবদ্ধ হয়, যুগ থেকে যুগান্তারে তা পরিবাহিত হয়। এখানে অবশ্য আমরা লিখিত ভাষাকে হিসেবের মধ্যে নিয়ে এসেছি বলেই কথাগুলো বলা যাচ্ছে।

একালের ভাষাবিজ্ঞানীরা ভাষার ক্রিয়াত্মক ভূমিকার প্রসঙ্গে কয়েকটা কথা আমাদের মনে করিয়ে দেন। রোমান ইয়াকবসন যেমন বলেছেন, ভাষা জ্ঞানার্জনে সহায়ক, জ্ঞান-প্রসারণে সহায়ক, ভাষা দিয়ে আবেগাদি প্রকাশিত হয় ইত্যাদি। কাজেই জ্ঞানার্জনে বা জ্ঞানসঞ্চারে বা আবেগ প্রকাশে ভাষা যে জরুরি একটা ব্যাপার তাতে ভুল নেই। আবার সমাজজীবনের বন্ধন হিসাবেও কাজ করে ভাষা। সংস্কৃতির বাহনও সেই ভাষা। অতীতের সঙ্গে বর্তমানের, বর্তমানের সঙ্গে ভবিষ্যতের যোগসূত্র তো ভাষাই ঘটায়, ভাষাই রক্ষা করে।

১.৩ ভাষাবিজ্ঞান ও ভাষাতত্ত্ব

খুব সহজ ভাষায় বলতে পারা যায়, ভাষা নিয়ে ভাষার পণ্ডিতদের চিন্তাভাবনা ও গবেষণাই ভাষাবিজ্ঞান। কিন্তু এটুকু বললে ভাষাবিজ্ঞান বা linguistics কথাটার অর্থ স্পষ্ট হবে না, তার ব্যাপ্তি ও পরিধি সম্বন্ধেও স্বচ্ছ ধারণা হবে না। সাধারণভাবে যখন বলা হয়, ভাষাবিজ্ঞান হল ভাষার বিজ্ঞান (the science of language), তখনও কি স্পষ্ট হল বিষয়টা? হয়তো আর একটু স্পষ্ট হয় যদি বলি ভাষাবিজ্ঞান হল ভাষা নিয়ে বিজ্ঞানসম্মত চর্চা (the scientific study of language)। বিষয়টিকে স্পষ্ট করতে হলে সংজ্ঞা বা সংজ্ঞার্থকে এড়িয়ে ভাষাবিজ্ঞানের অন্তর্গত আলোচ্য বিষয়গুলিকে দেখতে হবে। এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে, ব্যাকরণ ভাষাবিজ্ঞানের একটি অংশ। শব্দের গঠন যেমন ব্যাকরণের উপজীব্য, তেমনি ধ্বনির সংগঠনও ব্যাকরণের উপজীব্য। সেই সঙ্গে বাক্যরীতি ও আন্বয়িক সংগঠনও বৃহৎ অর্থে ব্যাকরণের আলোচ্য বিষয়। ভাষাবিজ্ঞান এই বিষয়গুলিকে নিয়ে নিবিড় চর্চা করে এবং বিজ্ঞানসম্মত চর্চা করে। কিন্তু এখানে একটা কথা মনে রাখতেই হবে। তা এই যে, ভাষাবিজ্ঞান মানুষের মুখের ভাষার চর্চা করে। লিখিত ভাষা ভাষাবিজ্ঞানের আলোচনায় আসে না। যেকোনো সাধারণ পাঠক এই কথাটাতে বিস্মিত হতে পারেন, কেননা সাধারণ শিক্ষিত মানুষ, এবং বিশেষভাবে ভাষাবিজ্ঞানে অদীক্ষিত মানুষ, লিখিত ভাষাকে এবং মুখের ভাষাকে মিলিয়েই ভাষার কথা ভাবেন। তাঁদের ধারণায় লিখিত ভাষা ও মুখের ভাষা একই

বস্তুর দুটি ভাগ। এমনকী, অনেকেরই ধারণা, লিখিত ভাষাই বেশি গুরুত্বপূর্ণ। আসলে ব্যাপারটা তার বিপরীত। কেন বিপরীত? লক্ষ লক্ষ বছর ধরে মানুষ কথা বলছে। মানুষের ভাষার উদ্ভব কীভাবে হয়েছে তা নিয়ে সকলে এখনও একমত হতে না পারলেও এ বিষয়ে অন্তত সন্দেহ বা বিতর্ক নেই যে, ভাষার সৃষ্টি হয়েছে কয়েক লক্ষ বছর আগে। লক্ষাধিক বছর ধরে পৃথিবীর নানা প্রান্তে মানুষ নানান রকম ভাষা বলছে। কিন্তু লেখা শুরু কবে হল? খুব বেশি হলে পাঁচ-ছয় কি সাত হাজার বছর আগে। মুখের ভাষাকে কখনো লিখন পদ্ধতি সম্পূর্ণ প্রকাশ করতে পারে না। লিখিত ভাষার বহু সীমাবদ্ধতা আছে। দ্বিতীয় যে কারণে ভাষাবিজ্ঞান কেবল মৌখিক ভাষাকে গুরুত্ব দেয় তা এই যে, যেখানে বহু সহস্র কোটি মানুষ কথা বলে বা মৌখিকভাবে ভাষা ব্যবহার করে, সেখানে তার মাত্র কয়েক শতাংশ মানুষ লিখতে জানে। কাজেই মুখের ভাষাকেই ভাষাবিজ্ঞানীরা আসল ভাষা বলে মানেন। আর এর মধ্যে ভুল কিছু নেই। তাহলে এবার আমরা নিশ্চয় এমন কথা বলতে পারি যে, ভাষাবিজ্ঞান হল সামগ্রিকভাবে ভাষার (অর্থাৎ মানুষের মুখের ভাষার) গঠন, প্রকৃতি, পদ্ধতি সম্বন্ধে বিজ্ঞানসম্মত চর্চার নাম। আমরা লক্ষ করব যে, ভাষাবিজ্ঞান কোনো বিশেষ একটা-দুটো ভাষার কথা বলে না, ভাষাবিজ্ঞান সাধারণভাবে ভাষার কথা বলে।

ভাষাবিজ্ঞান আর ভাষাতত্ত্ব কি অভিন্ন? এই বিষয়টা নিয়েও মতভেদ বা অস্পষ্টতা থাকা সম্ভব। অনেকেই অন্তত বাংলা বিদ্যাচর্চার ক্ষেত্রে 'ভাষাবিজ্ঞান' আর 'ভাষাতত্ত্ব' এই দুইয়ের মধ্যে তফাত করেন না। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, ইংরেজিতে linguistics আর philology এই দুটি শব্দের অর্থ তাৎপর্য আর পরিধির মধ্যে বেশ বড়োসড়ো তফাত আছে। একটা বড়ো তফাত এই যে, philology হল সাবেক পদ্ধতির ভাষাচর্চার নাম। মূলত লিখিত টেক্সট বা সাহিত্যই এই পদ্ধতির প্রধান নির্ভর। অক্সফোর্ডের ভাষাবিজ্ঞানের অধ্যাপক এবং সোস্যুরের 'কুর দ্য ল্যাঁগিস্তিক জেনেরাল্' বইয়ের বিখ্যাত অনুবাদক রয় হ্যারিস খুব সংক্ষেপে এই philology আর linguistics-এর পার্থক্য বুঝিয়েছেন এইভাবে—'As distinguished from **linguistics**, the term philology is usually applied to a more traditional form of language study, based on texts (particularly of bygone periods). Comparative philology in the nineteenth century established the relationships between languages of the Indo-European family before the emergence of modern linguistics'. তাহলে philologyকে comparative philology বা তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব বলা ভুল হবে না। এবং philology-র আর একটি দিক হল ঐতিহাসিক ভাষাতত্ত্ব। তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য বা লক্ষণ এবারে দেখা যেতে পারে। প্রথমত, তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব ইন্দো-ইয়োরোপীয় ভাষাপরিবারের সদস্য-ভাষাগুলোর মধ্যে তুলনায় আগ্রহী। দ্বিতীয়ত, মূলত লিখিত ভাষাই এর আলোচ্য। তৃতীয়ত, ভাষার diachronic বা

বিবর্তনমূলক বিশ্লেষণই করা হয় ঐতিহাসিক ভাষাতত্ত্বে। অন্য দিকে, আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানের কারবার মানুষের মুখের ভাষা নিয়ে (verbal communication)। আর এর দৃষ্টিভঙ্গি diachronic বা বিবর্তনমূলক বা কালানুক্রমী নয়, বরং synchronic বা এককালিক। এটা একটা বড়ো তফাত। বিশেষ কালসীমায় ভাষার প্রকৃতি, সংগঠন প্রভৃতির বিশ্লেষণই ভাষাবিজ্ঞানের উপজীব্য। ভাষার ইতিহাস নয়, ভাষার বর্তমান অবস্থাই আলোচ্য। এইজন্য একে বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানও বলা হয়।

১.৪ ভাষাবিজ্ঞানের পরিধি বা আলোচ্য বিষয়

আমাদের আগের আলোচনা থেকে একথা স্পষ্ট হওয়া উচিত যে, ভাষাবিজ্ঞানের প্রধান বিষয় ধ্বনি অর্থাৎ বাগ্‌ধ্বনি। ধ্বনির চরিত্র, ধ্বনির উচ্চারণস্থান ও উচ্চারণের প্রক্রিয়া, ধ্বনির সংগঠন, ধ্বনির সমবায় ইত্যাদি সবকিছু নিয়েই ধ্বনিবিদ্যা বা ধ্বনিবিজ্ঞান (phonology)। এই ফোনোলজি বা ধ্বনিবিজ্ঞানের মধ্যে আসছে ধ্বনির প্রকারভেদ—(স্বর ও ব্যঞ্জন, অধিধ্বনি বা অবিভাজ্য ধ্বনি (suprasegments), দল বা অক্ষর (syllable) এবং সিলেবল তত্ত্ব। দ্বিতীয় বিষয় হল শব্দবিজ্ঞান, আধুনিক পরিভাষায় যাকে morphology বা রূপতত্ত্ব বলা হয়। শব্দের গঠন, গঠন প্রক্রিয়া, শব্দার্থতত্ত্ব ইত্যাদি এই অংশের আলোচ্য বিষয়। আরও আছে বাক্য—বাক্যতত্ত্ব, যার মধ্যে শুধু বাক্যের গঠনই নয়, আলোচিত হয় বাক্যের প্রকারভেদ, অন্বয় ইত্যাদি।

কিন্তু বিভিন্ন সময়ে ভাষাবিজ্ঞানী ও দার্শনিকদের তাত্ত্বিক আলোচনায় ভাষাবিজ্ঞানের আরও নানান দিক উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। আর ভাষাবিজ্ঞানের, বা আরও ব্যাপক অর্থে, ভাষার আলোচনা ও চর্চাও চালিত হয়েছে নানা দিকে। এককালিক ভাষারীতির পাশাপাশি চলে এল গঠনমূলক ভাষাবিজ্ঞান বা structural linguistics এর তত্ত্ব। আরও একটু পরে মার্কিন ভাষাবিজ্ঞানী ব্লুমফিল্ডের হাত ধরে এবং তাঁর শিষ্যদের আলোচনায় রূপ পেল বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞান। মার্কিন ভাষাবিজ্ঞানী ও প্রাগ্ স্কুলের ভাষাবিজ্ঞানীদের চর্চা পাশাপাশি চলছিল ভালোই। ঠিক সেই সময় ১৯৫৭ সালে নোয়াম চমস্কির Syntactic Structure বইটি প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভাষাচর্চায় একটা নতুন দিক উন্মোচিত হল। ১৯৬৫ সালে চমস্কির অন্য একটি বই Aspects of the Theory of Syntax প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে একটা নতুন তত্ত্ব উঠে এল। নতুন এই তত্ত্বের নাম Transformational-Generative Grammar (TG)। অদ্যাবধি সারা পৃথিবীর ভাষাভাবুকরা চমস্কির তত্ত্বে মজে রয়েছেন। কিন্তু কেন? আমরা সে আলোচনা করব এই বইয়ের নবম অধ্যায়ে। আপাতত পাঠকদের একটা ছোটো রূপরেখা দিলাম মাত্র।

১.৫ ভাষাতত্ত্ব ও তার বিষয়ভেদ

আগেই বলেছি ভাষাতত্ত্ব বলতে দুটি বিষয়কে বোঝায়—ঐতিহাসিক ও তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব। ঐতিহাসিক ভাষাতত্ত্ব হল ভাষার বিবর্তনমূলক তত্ত্ব। এতে সাধারণভাবে ভাষার উদ্ভব ও বিকাশ যেমন আলোচিত হয়, তেমনি আলোচিত হয় কোনো একটি : ভাষার

উদ্ভব ও বিকাশের ধারা। আমরা যখন বাংলা ভাষার উদ্ভব ও বিকাশের ধারা বা রূপান্তর আলোচনা করব, তখন আমরা তা করব ঐতিহাসিক ভাষাতত্ত্বের সূত্র অনুযায়ী। অন্য দিকে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের আলোচ্য বিষয় কিছুটা অন্যরকম, তার পরিধি বিস্তৃততর। বাংলা ভাষার আলোচনার প্রসঙ্গে অন্যান্য ভাষার, বিশেষত, একই বর্গভুক্ত অর্থাৎ নিকটসম্বন্ধযুক্ত (cognate) ভাষাসমূহের আলোচনাও যদি করা হয়, তবে তা করা হবে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের এলাকাভুক্ত হয়ে।

ভাষাতত্ত্বের অন্তর্গত বিষয়গুলির দিকে এবার দৃষ্টিপাত করা যাক। সেই বিষয়গুলি হল ক. ধ্বনিতত্ত্ব, খ. রূপতত্ত্ব, গ. অন্বয় বা ব্যক্যতত্ত্ব, ঘ. শব্দার্থতত্ত্ব।

ধ্বনিতত্ত্বের আলোচ্য বিষয় হল ভাষার বাগ্‌ধ্বনিগুলির শনাক্তকরণ, বাগ্‌ধ্বনির উচ্চারণস্থান ও উচ্চারণপ্রক্রিয়া, ধ্বনির সংগঠন, ধ্বনির সমবায়, ধ্বনির পরিবর্তন, ধ্বনিমূল ও ধ্বনিমূল বিশ্লেষণ ; সিলেবলতত্ত্ব ইত্যাদি।

রূপতত্ত্ব হল শব্দগঠনতত্ত্ব। তার ভিতরে আছে রূপমূল ও তার শ্রেণিবিভাগ ; রূপমূল গঠন এবং রূপধ্বনিতত্ত্ব (morphophonology)।

অন্বয় বলতে প্রথাগত ভাষাতত্ত্বে বা ব্যাকরণে বোঝানো হত বাক্যের পদক্রমকে। কিন্তু আধুনিক ভাষাতত্ত্বে অন্বয় বলতে বুঝি অন্য কিছু। বাক্যে শব্দ বা পদগুলি কীভাবে একের সঙ্গে অন্যে অন্বিত হয়, তাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক কী এইগুলিই অন্বয়ের বিষয়। এবং প্রথাগত ব্যাকরণের পদক্রমও এর মধ্যে আসবে। এক হিসাবে অন্বয়কে বাক্যরীতিও বলা যায়।

শব্দার্থতত্ত্ব বা semantics একটি বড়ো বিষয়। তার মধ্যে শুধু যে শব্দের অর্থই আলোচ্য তা নয়। অর্থ তো আছেই। তাছাড়া আছে অর্থের বৈচিত্র্য বা বৈভিন্ন্য, শব্দার্থের সঙ্গে অন্বয়ের সম্পর্ক, শব্দার্থের পরিবর্তন ইত্যাদি।

ভাষাতত্ত্বের প্রধান আলোচ্য বিষয় যদিও এগুলিই, তবে ব্যাপক অর্থে আরও বহু কিছু আলোচনায় এসে পড়ে। যেমন লিপির কথা, ভাষার বিলোপের কথা, শৈলীবিজ্ঞানের কথা, ভাষাপরিকল্পনার ইত্যাদি। সামগ্রিকভাবে ভাষার আলোচনায় আমরা বর্ণনামূলক (description) এবং ঐতিহাসিক (historical) এই দুই পদ্ধতিকে মিলিয়ে ভাষাকে এবং বাংলাকে দেখার চেষ্টা করব এই গ্রন্থে।

১.৬ ভাষার শ্রেণিবিভাগ

পৃথিবীর সমস্ত ভাষাকে কতকগুলি শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়ে থাকে। যদিও একথা মনে রাখা দরকার যে, সেই শ্রেণিগুলোর মধ্যে মোটেই জল-অচল ভেদ নেই। প্রায়ই আমরা দেখতে পাই যে, এক শ্রেণির ভাষা যেন অলক্ষিতভাবে অন্য শ্রেণির প্রান্তে এসে মিশছে। তবু ভাষাচর্চায় ভাষার শ্রেণিবিভাগ একরকম অপরিহার্য। নানারকম বিচার-বিবেচনার পর ভাষাতাত্ত্বিকগণ ভাষার শ্রেণিবিভাগ করেছেন দুইভাবে। ক. রূপতাত্ত্বিক শ্রেণিবিভাগ (Morphological Classification) এবং খ. ভাষাবংশগত শ্রেণিবিভাগ (Genealogical

Classification)। বাক্যের গঠন এবং রূপতত্ত্বের বিশ্লেষণের সাহায্যে যে শ্রেণিবিভাগ তাকেই বলা হয়েছে রূপতাত্ত্বিক বা ভাষার গঠনগত শ্রেণিবিভাগ। এই রূপতাত্ত্বিক বা গঠনগত শ্রেণিবিভাগ অনুযায়ী ভাষাকে বিশ্লেষণাত্মক ভাষা বা isolating language (বা analytic) এবং সংশ্লেষাত্মক ভাষা বা synthetic (বা non-isolating) language এই দুই ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে। সংশ্লেষাত্মক ভাষাকে আবার সংবদ্ধ ভাষাও বলা যেতে পারে। সংশ্লেষাত্মক ভাষায় প্রভূত বদ্ধরূপ বা bound form থাকে, অন্য দিকে বিশ্লেষাত্মক ভাষায় বদ্ধরূপ কমই ব্যবহৃত হয়। সংশ্লেষাত্মক ভাষার বিশেষত্ব হল বিভক্তিযোগে শব্দ গঠন। সংস্কৃত একটা সংশ্লেষাত্মক ভাষা। এই ভাষায় পদক্রমের কোনো নির্দিষ্ট নিয়ম নেই। যে-কোনো শব্দ বাক্যের যে-কোনো স্থানে বসতে পারে। আবার বাংলায় পদক্রম খুবই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। কারণ বাংলা ভাষায় কোনো শব্দে বিভক্তি যোগ হয়, কোনো শব্দে হয় না। তাই বাংলা ভাষায় পদগুলিকে নির্দিষ্ট ক্রম অনুসারে বাক্যে সাজাতে হয়। বাংলা সাধারণভাবে একটি বিশ্লেষাত্মক ভাষা। অবশ্য একথাও ঠিক যে, বাংলায় কিছু সংশ্লেষাত্মক বৈশিষ্ট্য বা লক্ষণও আছে। অন্যান্য বিশ্লেষাত্মক ভাষার উদাহরণ হল চৈনিক ভাষা, তিব্বতি ভাষা ইত্যাদি।

ভাষার দ্বিতীয় ধরনের শ্রেণিবিভাগ হল ভাষাবংশগত (বা genealogical) শ্রেণিবিভাগ। ১৭৮৪ সালে স্যার উইলিয়াম জোনস্-এর তত্ত্ব প্রচারিত হওয়ার পর থেকে ভাষাতাত্ত্বিকগণ পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষার মধ্যে আত্মীয়তার সন্ধান পেয়েছেন। এই আত্মীয়তা দ্বিবিধ—ভাষার উপকরণ বা প্রকরণের দিক থেকে আত্মীয়তা, এবং ভাষাপদ্ধতির দিক থেকে আত্মীয়তা। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় যে, আর্য ভাষাগুলির মধ্যে যেমন মিল বা আত্মীয়তার সুস্পষ্ট লক্ষণ আছে, তেমনি ফরাসি, ইতালীয়, স্পেনীয় ও পোর্তুগিজ ভাষার মধ্যেও আছে লক্ষণীয় মিল। ইংরেজি, জার্মান, ডাচ ও ডেনীয় ভাষার মধ্যেও আছে সুস্পষ্ট মিল। ফরাসি, ইতালীয়, স্পেনীয় ও পোর্তুগিজ ভাষা যেমন আত্মীয়তার সূত্রে বদ্ধ (এগুলি লাতিন থেকে উদ্ভূত), তেমনি ইংরেজি, জার্মান, ডাচ ও ডেনীয় ভাষাও আত্মীয়তার সূত্রে বদ্ধ (এগুলো জার্মানিক গোষ্ঠীর ভাষা)। এই শ্রেণিবিভাগকেই ভাষার বংশগত শ্রেণিবিভাগ বলা হয়েছে।

গ্রন্থপঞ্জি

১. বসু, দ্বিজেন্দ্রনাথ—বাংলা ভাষার আধুনিক তত্ত্ব ও ইতিকথা, ১৯৮০
২. সেন, সুকুমার—ভাষার ইতিবৃত্ত, ১৯৯৪
৩. Crystal, David—Cambridge Encyclopaedia of Language, 1997
৪. Hockett, Charles F—A Course in Modern Linguistics, 1958
৫. Robins, R.H.—A Short History of Linguistics, 1997
৬. Sapir, Edward—Language, 1949
৭. Trager, George L—Language and Linguistics, 1972

২. ভাষার উদ্ভব ও বিলোপ

২.১ ভাষার উৎপত্তি সম্বন্ধে পুরোনো ধারণা

ভাষার উদ্ভব সম্বন্ধে আমরা প্রায় কিছুই নিশ্চিতভাবে জানি না। ভাষাচর্চার সূচনাকাল থেকে ভাষা কীভাবে এল তা নিয়ে নানা কল্পনা নানা অনুমান হয়েছে। কিন্তু সুনির্দিষ্টভাবে কোনো সিদ্ধান্তেই পৌঁছোনো সম্ভব হয়নি। তাছাড়া, এক পণ্ডিতের অনুমান অপর এক পণ্ডিত মুহূর্তে খারিজ করে দিয়েছেন। ফলে অনুমান ও পালটা অনুমান হয়েই চলেছে, বিশ্বাসযোগ্য কোনো সিদ্ধান্ত করা যায়নি। ফলে ভাষার উৎপত্তির বিষয়টা অদ্যাবধি একটা কঠিন সমস্যা হয়ে রয়েছে। তর্ক-বিতর্ক এতটাই বিরক্তিকর হয়ে ওঠে যে, ভাষাতাত্ত্বিকরা পর্যন্ত মাঝে মাঝে এ নিয়ে হতাশা প্রকাশ করে ফেলেন। ১৮৬৬ সালে প্যারিসের ভাষাসমিতি (Linguistic Society of Paris) তার অধিবেশনের আগে একটি বিজ্ঞপ্তি প্রচার ক'রে বলে দিয়েছিল যে, ভাষার উৎপত্তি নিয়ে একটি কথাও বলা চলবে না। এই ঘোষণা অবশ্য আলোচনা-অনুমান-বিতর্ক থামাতে পারেনি। আর এ-নিয়ে গড়েও উঠেছে নানা তত্ত্ব।

১. একটি তত্ত্ব অনুসারে মানুষের আদিম ভাষার উৎপত্তি হয়েছিল স্বাভাবিক ধ্বনির অনুকরণ থেকে। কুকুরের মতো পশুর ডাকের অনুকরণ থেকেই মানুষের ভাষার সৃষ্টি হয়েছে—এই হল এই তত্ত্বের মূল কথা। এই তত্ত্বকে তাই **বৌ-ঔ তত্ত্ব** (bow-wow theory) বলা হয়। এই তত্ত্বের সমর্থকরা বলেন যে, প্রতিটি ভাষাতেই আছে বহু স্বাভাবিক ধ্বনি যা থেকে ধ্বন্যাত্মক নাম ও শব্দ তৈরি হয়েছে। তাঁরা অনুমান করেন যে, আদিম মানুষ একে অপরকে ডাকত মুখে নানারকম আওয়াজ ক'রে, হিংস্র পশুকে তাড়াত আওয়াজ ক'রে। ক্রমে ক্রমে প্রতিটি আওয়াজের একটা করে মানে দাঁড়িয়ে গেল। এই তত্ত্ব যে নিতান্তই একটা অসম্পূর্ণ মডেল তাতে সন্দেহ নেই। ভাষার শব্দ এত বিচিত্র ও বিপুল-সংখ্যক যে, কেবল কতকগুলি ধ্বন্যাত্মক শব্দ থেকে ভাষা এসেছে এইরকম একটা অনুমান মেনে নেওয়া যায় না।

২. দ্বিতীয় তত্ত্বটি হল **পুঃ-পুঃ তত্ত্ব** (pooh-pooh theory)। মানুষ আবেগের বশে বা যন্ত্রণা প্রভৃতির জন্য কতকগুলি স্বাভাবিক আওয়াজ করে—আঃ, উঃ ইত্যাদি। সম্ভবত তা থেকেই সৃষ্টি হয়েছে ভাষার। প্রাথমিকভাবে, ভাষার সব শব্দই এই তত্ত্ব অনুসারে উচ্ছ্বাসবাচক শব্দ থেকে আসে। এই তত্ত্বটি পূর্ববর্তী বৌ-ঔ তত্ত্বেরই অনুরূপ এবং একইরকম ত্রুটিপূর্ণ। ভাষার ভাষণ প্রক্রিয়া তথা উচ্চারণ-প্রক্রিয়ার (articulation) বিকাশ এই তত্ত্ব থেকে কিছুই বোঝা যায় না।

৩. এমনি আর একটি তত্ত্ব হল **ডিং ডং তত্ত্ব**। ধ্বনি ও অর্থের সম্পর্ক আছে। একথাই এই তত্ত্বের ভিত্তি। আদিম মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে কতকগুলি ঘটনায় সাড়া দিত। এই সাড়া

দেবার সহজাত ক্ষমতা থেকে সৃষ্টি হয়েছে বহু শব্দের। ৪. চতুর্থ একটি তত্ত্বের নাম **ইয়ো-হে-হো** (yo-he-ho theory) তত্ত্ব। শ্রমিকেরা দলবদ্ধভাবে যখন কোনো শ্রমসাধ্য কাজ করে তখন তারা সেই কষ্টসাধ্য কাজ ভোলার জন্য কতকগুলি ছন্দবদ্ধ আওয়াজ করে। ৫. পঞ্চম তত্ত্বটিকে বলতে পারি **দেহভঙ্গির তত্ত্ব** (gesture theory)। এই তত্ত্ব অনুসারে দেহভঙ্গি থেকেই ভাষায় শব্দের উৎপত্তি হয়েছে। এই তত্ত্বের সমর্থকরা তাঁদের সমর্থনে উত্তর আমেরিকার (রেড) ইন্ডিয়ানদের ব্যবহৃত সাংকেতিক ভাষার (sign language) কথা বলেন। বিভিন্ন উপজাতির ভাষা বিভিন্ন। তা সত্ত্বেও সাংকেতিক ভাষা ব্যবহার করে এক উপজাতির মানুষ অন্য এক উপজাতির মানুষের সঙ্গে 'কথা' চালাতে পারত। একথা বলতেই হবে যে, এই তত্ত্বও ভাষার উৎপত্তির বিশ্বাসযোগ্য ব্যাখ্যা নয়।

৬. সবশেষে উল্লেখ করব আর একটি তত্ত্বের—**লা-লা তত্ত্ব** (la-la theory)। ভাষাতত্ত্ববিদ অটো য়েসপের্সেন বলেছেন যে, যদি কোনো একটি তত্ত্ব দিয়ে ভাষার উৎপত্তি ব্যাখ্যা করতেই হয়, তাহলে সেই তত্ত্বটি হবে 'লা-লা তত্ত্ব'। মানুষের প্রেম, বা আনন্দানুভূতিসূচক অভিব্যক্তি থেকে ভাষার উৎপত্তি হয়ে থাকতে পারে। য়েসপের্সেন নিজেই অবশ্য এই তত্ত্বের অসারতা সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন। আবেগ ও বুদ্ধিবৃত্তির মধ্যে যে ফারাক আছে, ভাষার উৎপত্তিকে তা ব্যাখ্যা করতে পারে না। আদিম মানুষের ভাষা কেবল চিৎকার, গান আর ভাবোচ্ছ্বাস থেকে সৃষ্টি হতে পারে না।

বলা বাহুল্য, এইসব তত্ত্বের কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। বিংশ শতকে, ভাষার উৎপত্তির বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা খোঁজার চেষ্টা হয়েছে। আধুনিক কালে glossogenetics নামে একটি বিদ্যার উদ্ভব হয়েছে যার অর্থ **মানবভাষার গঠন ও বিকাশ সম্বন্ধীয় বিদ্যা**। এতে বিজ্ঞানের যে শাখাগুলির প্রয়োগ হয় তা হল জীববিদ্যা, নৃতত্ত্ব, মনোবিজ্ঞান, চিহ্নবিজ্ঞান, স্নায়ুতন্ত্র, ভাষাবিজ্ঞান, প্রত্নজীববিদ্যা ও পুরাতত্ত্ব।

২.২ ভাষার উৎপত্তি সম্বন্ধে আধুনিক ধারণা

এ বিষয়ে এখন কোনো সন্দেহ নেই যে, ভাষার উৎপত্তি ওইভাবে খোঁজা নিরর্থক। শুধু ভাষার বিবর্তন আমাদের সাহায্য করবে না। মানবজাতির জৈব ইতিহাস ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের মধ্যে খুঁজতে হবে ভাষার উৎপত্তিকে। প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান থেকে জানা যায় যে, মানুষ ও বনমানুষ একই বংশানুক্রম থেকে আগত। অর্থাৎ লক্ষ লক্ষ বছর আগে মানুষ ও বনমানুষের আদিতম ঊর্ধ্বতনপুরুষ ছিল অভিন্ন। পূর্ব আফ্রিকায় লিকি (L.S.B. Leaky) নামে জনৈক পুরাতত্ত্ববিদ অতি আদি মানবাকৃতি হোমিনিডের হাড় পেয়েছেন। এই হাড়গুলিকে হোমো হাবিলিস (homo habilis) নামে মানুষের সুদূর পূর্বপুরুষ বলে শনাক্ত করা হয়েছে। এই হাড়গুলির সঙ্গেই এমন কিছু জিনিসপত্রও পাওয়া গেছে যা থেকে অনুমান করা যায় যে, প্রায় কুড়ি লক্ষ বা দুই মিলিয়ন বছর আগে এই হোমো হাবিলিসেরা যন্ত্রপাতি বানাতে শুরু করেছিল, যদিও সেসব যন্ত্রপাতি সূক্ষ্ম নয়, বরং বোঝাই যায় সেই আদিম বানরমানুষেরা সবে সেসব তৈরি করতে শুরু করেছে। কিন্তু যন্ত্রপাতি

তৈরি যে করতে শুরু করেছে তা থেকে একথা নিশ্চয় বোঝা যায় যে, তাদের জীবনযাপন পশুজীবনের স্তর থেকে এক ধাপ এগিয়েছে। তাদের সাংস্কৃতিক জীবন শুরু হয়েছে বলেই অনুমান করা হয়। কিন্তু যাকে true culture বলা হয়, সে আরও অন্তত দশ লক্ষ বছর পরের ব্যাপার। আর এই true culture বা 'উন্নত সংস্কৃতি' ভাষার সাহায্য ছাড়া যে সম্ভব ছিল না তাও অনুমান করা যায়, যদিও সেই আদিম ভাষাকে বলা উচিত prelanguage বা **'ভাষাপূর্ব ভাষা'** বা **প্রাক্‌ভাষা**। যাকে বলা যেতে পারে 'প্রত্নভাষা' তা নিশ্চয় বিবর্তিত হয়েছে আরও বহু বহু বছর পরে।

আর একটা কথা এখানে বলে রাখা দরকার। যাকে আমরা বনমানুষ বলি তার ভাষা ছিল কতকগুলি ডাকের সমাহার (calls) এবং সেই ডাক ছিল 'বদ্ধ'। অন্য দিকে মানুষের ভাষা হল 'মুক্ত'। অর্থাৎ মানুষ কথা তৈরি করতে পারে, বনমানুষের সে ক্ষমতা ছিল না, আজও নেই। মানুষের ভাষা কীভাবে বনমানুষের 'বদ্ধ' ডাকের ভাষা থেকে লক্ষ লক্ষ বছর ধরে আলাদা হয়ে প্রকৃত 'ভাষায়' রূপান্তরিত হল, এবারে আমরা সেটাই দেখব।

মানুষের ভাষার এমন কয়েকটি ধর্ম বা বৈশিষ্ট্য আছে যেগুলো শুধু যে মানুষের ভাষার অনন্যতার পরিচায়ক তা নয়, সেগুলো দিয়ে ভাষার উৎপত্তির রহস্য অনেকটাই সমাধান করা যায়। মানবভাষা বনমানুষের ভাষা থেকে আলাদা হয়ে গিয়েছিল একটা ধর্ম বা বৈশিষ্ট্যের ফলে যার নাম productivity বা **উৎপাদন শক্তি** বা **সৃজনীশক্তি**। এই শক্তির জন্যই মানুষ অসংখ্য কথা তৈরি করতে পারে, যে শক্তি বনমানুষের ছিল না।

দ্বিতীয়ত, চোখের সামনে যেসব জিনিস নেই কথা দিয়ে তাদের চিহ্নিত করার ক্ষমতা বা বোঝাবার ক্ষমতা মানুষের ভাষার আর এক বৈশিষ্ট্য। চোখের সামনে যা আছে তার দিকে ইঙ্গিত করে তাকে চেনানো যায়, হাত আঙুল ইত্যাদি ব্যবহার করে সেসব বস্তু দেখানো যায়। কিন্তু যা চোখের সামনে নেই, যা রয়েছে দূরে, অন্যত্র, তাকে বোঝাতে হলে সেই বস্তুর একটা নাম দরকার। সেই বস্তু হল একটা প্রতীক বা symbol. ভাষা দিয়েই কেবল তাকে চেনানো যায় বা বোঝানো যায়। এই প্রয়োজনটি ভাষার সৃষ্টিতে সহায়ক হয়েছিল। মানবভাষার এই বৈশিষ্ট্যের নাম displacement বা **প্রতিসরণ**। এই displacement-এর জন্যই মানুষ প্রতীক সৃষ্টি করতে পেরেছে। যে বস্তুকে বোঝাতে চাই তার কাছে না গিয়ে অর্থাৎ তার থেকে বিচ্ছিন্ন থেকেও তাকে বোঝাতে পারার ক্ষমতারই নাম displacement.

মানুষের ভাষার যে বিশেষ বৈশিষ্ট্য বা ধর্ম ভাষার উৎপত্তি বুঝতে সাহায্য করে, তা হল **গঠনগত দ্বৈততা**, ইংরেজিতে যাকে duality of patterning বলা হয়ে থাকে। আমরা জানি যে, ফোনিম বা স্বনিম বা ধ্বনিমূল যোগ ক'রে ক'রে ভাষার রূপ গড়ে ওঠে, অর্থপূর্ণ ভাষারূপ তৈরি হয়। এই প্রসঙ্গে minimal pair বা ন্যূনতম জোড়ের কথা উঠে পড়ে। 'আমি খাই', 'আমি খাব', 'আমি পাই' এই তিনটি বাক্যে একটি করে স্বনিম বদলে গেছে, আর তার ফলে তৈরি হয়েছে তিনটি পৃথক বাক্য। ইংরেজিতে I hit him আর I bit him এই দুটি বাক্যও ওই একইভাবে একটি স্বনিমের পরিবর্তনের ফলে আলাদা হয়ে

গেল, বা দুটি আলাদা বাক্য তৈরি হল। একেই duality of patterning বলা হয়। এই দ্বৈততা সৃষ্টির ফলেই ভাষার অসংখ্য নতুন নতুন শব্দ সৃষ্টি হয়।

ভাষার চতুর্থ ধর্ম হল traditional transmission বা **ঐতিহ্যের সঞ্চালন** বা **সম্প্রসারণ**। মানুষের ভাষা জন্মগতভাবে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে চালিত হয় না, সে-ভাষা শিখতে হয়, শেখাতে হয়। মানবশিশু যখন জন্মায়, তখন তার ভাষা থাকে না। সে যত বড়ো হতে থাকে ততই সে শুনে, অনুকরণ করে ভাষা আয়ত্ত করে। ক্রমশ সেও স্বনিম ও রূপিম বা phoneme ও morpheme জুড়ে জুড়ে শব্দ তৈরি করা শিখে নেয়।

প্রত্নজীববিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, স্নায়ুবিজ্ঞান, ভাষাবিজ্ঞান প্রভৃতি বিদ্যা অনুমান করে যে, আদিম বনমানুষেরা (hominids) যে 'ডাক' (call system) ব্যবহার করত, তা-ই লক্ষ লক্ষ বছর ধরে মানুষের **ভাষাসৃজনশক্তি** (productivity), **বিচ্ছিন্নতা** (displacement), **হস্তান্তর** (transmission) এবং **গঠনগত দ্বৈততার** সাহায্যে '**প্রত্নভাষায়**' পরিণত হল। এবং এই চমকপ্রদ রূপান্তর সম্ভব হয়েছিল মানুষের উন্নততর মস্তিষ্ক ও করোটিকাস্থি-র (cranial bone) জন্য।

২.৩ ভাষার বিলোপ

ভাষার অবলুপ্তি নিয়ে সাধারণ মানুষের ততটা উদ্‌বেগ না থাকারই কথা। কেননা, কোনো ভাষা বিলুপ্ত হচ্ছে কি না বা ভাষার অবলুপ্তি কেন বিশেষ দুশ্চিন্তার কারণ, তা সাধারণ মানুষের জানা থাকে না। কিন্তু ভাষার ইতিহাস যাঁদের চর্চার বিষয়, তাঁরা সত্যিই উদ্‌বিগ্ন। এতটাই উদ্‌বিগ্ন যে, ২০০০ থেকে ২০০২ সালের মধ্যে ইংরেজ ভাষাবিজ্ঞানী ডেভিড ক্রিস্টাল দুটি মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেছেন, যার একটির শিরোনাম Language Death. কেবল ডেভিড ক্রিস্টালই নন, 'ভাষার মৃত্যু' নিয়ে গ্রন্থ রচনা করেছেন অন্য কোনো-কোনো লেখকও।

কিন্তু কাকে বলে language death বা ভাষার অবলুপ্তি? কোনো ভাষা যখন এতটাই অচল ও দুর্বল হয়ে পড়ে যে, সেই ভাষায় কথা বলে এমন লোকের সংখ্যা হ্রাস পেতে পেতে একেবারে শূন্যে এসে ঠেকে, তখনই সেই ভাষাটিকে 'মৃত' বলে ধরে নেওয়া হয়। যে-অর্থে আজ লাতিন বা সংস্কৃত 'মৃত' সেই অর্থে ভাষার মৃত্যুর কথা বলছি না আমরা। লাতিন এখনও ভাতিকানে (Vatican) পোপের রাজ্যে চালু ভাষা, আর সংস্কৃত লোকে না বললেও তার চর্চা আজও হয়ে চলেছে। তাহলে কোন ভাষা 'মৃত'?

খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দে ইন্দো-ইয়োরোপীয় ভাষায় কথা বলে এমন একটি জাতির আবির্ভাব হয় দক্ষিণ-মধ্য ইয়োরোপে। তাদের ভাষাকে বলা হত Common Celtic বা Proto-Celtic অর্থাৎ প্রত্ন-কেলতীয় ভাষা। ইয়োরোপের নানা দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল তারা, ছড়িয়ে পড়েছিল ব্রিটেনেও। যে শাখাটি ফ্রান্স, ইতালি প্রভৃতি দেশে যায় তারা পরিচিত হয় গল নামে। ইংল্যান্ডে তারাই কেল্ট বা কেলতীয় জাতি। প্রাচীন প্রস্তর লিপিতে এই ভাষার নমুনা পাওয়া যায়। কিন্তু এক হাজার বছর পর থেকে খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতক

থেকে মূলত অ্যাংলো-স্যাক্সন অভিযান শুরু হবার পর থেকে কেলতীয় ভাষা পিছু হটতে থাকে। এক-এক অঞ্চলে এক-একটি নতুন ভাষার উদ্ভব হতে থাকে—কর্নিশ, ওয়েলশ, আইরিশ বা গেইলিক ইত্যাদি। কেলতীয় ভাষার 'মৃত্যু' ঘটে এর ফলে। কখনো-কখনো আদিম জনজাতির ভাষা নতুন আগন্তুক প্রবল জাতির ভাষার চাপে দুর্বল হতে হতে শেষে লোপ পেয়ে যায়। এইরকম ঘটনা ঘটেছে আফ্রিকায়, দক্ষিণ আমেরিকায়। এসব ক্ষেত্রে স্থানীয় ভাষার মৃত্যুর জন্য দায়ী মূলত উন্নত ও প্রতাপশালী পাশ্চাত্য ভাষা ও সংস্কৃতি। কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রবার্ট ফিলিপসন (Robert Phillipson) তাঁর Linguistic Imperialism গ্রন্থে ইংরেজি ভাষার আধিপত্যের ফলেও যে দুর্বল স্থানীয় ভাষার অবলুপ্তি ঘটছে তার নানা দৃষ্টান্ত আলোচনা করেছেন।

একথা সকলেই স্বীকার করেন যে, একটি ভাষার মৃত্যু ঘটে গেলে তা মানবজাতির ও মানব সভ্যতার এক বিরাট ক্ষতি। ১৯৯২ সালে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের এক ভাষাবিজ্ঞানী সারা পৃথিবীকে চমকে দিয়ে আশঙ্কা প্রকাশ করেন যে, বর্তমানে পৃথিবীতে যে সাত হাজারের মতো ভাষা আছে, একশো বছর পরে তার ৯০ শতাংশেরই বিলোপ ঘটবে। তিনি আরও বলেন যে, যে গতিতে কতকগুলো ভাষা দুর্বল হয়ে পড়ছে তাতে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে, যদি সেইসব ভাষার সংরক্ষণের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা না নেওয়া হয় তাহলে ওই ভাষাগুলোকে বাঁচানো সম্ভব হবে না। তাঁর এই আশঙ্কার সবটা অন্যেরা স্বীকার না করলেও একথা মানতেই হবে যে, আগামী শতকে অর্ধেকের মতো ভাষার বিলোপ ঘটবার সম্ভাবনা আছে।

১৯৯২ সালে কুইবেক শহরে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক ভাষা সম্মেলনে (International Linguistic Congress) ভাষার অবলুপ্তির বিষয়টিতে বিশেষ উদ্‌বেগ প্রকাশ করা হয়। একথাও বলা হয় যে, ইউনেস্কোর একটা দায়িত্ব আছে এই ব্যাপারে। ১৯৯৩ সালের নভেম্বর মাসে রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ সভা Endangered Languages Project নামে একটি প্রকল্প ঘোষণা করে।

গ্রন্থপঞ্জি

১. দাশ, শিশিরকুমার—ভাষাজিজ্ঞাসা (১৯৯২)
২. Barbar, C.L.—The Story of Language (1975)
৩. Crystal, David—Cambridge Encyclopaedia of Language (1997)
৪. Crystal, David—Language Death (2000)
৫. Hoijer, Harry—'The Origin of Language' in Archibald A. Hill (ed). Linguistics Today (1969)
৬. Phillipson, Robert—Linguistic Imperialism Continued (2009)
৭. Taraporewala, I.G.S.—Elements of the Science of Language (1978)
৮. Trask, R.L.—Linguistics : The Basics (1995)

৩. নানারকম ভাষা

৩.১ না-মানুষি ভাষা

মানুষের ভাষার কথা বলার আগে এই কথাটা বুঝে নেওয়া দরকার যে, ভাষা হতে পারে নানান রকমের। অর্থাৎ পশুপাখির মধ্যেও ভাবের আদান-প্রদান চলে একরকম 'ভাষার' মাধ্যমে।

বিজ্ঞানীরা বুঝতে পেরেছেন যে, আদিম কাল থেকেই সমস্ত প্রাণী নিজেদের মধ্যে ভাব আদানপ্রদান করে আসছে। আর সেটাই তাদের 'ভাষা'। পিঁপড়ে, পাখি, শিম্পাঞ্জি, ঘোড়া, হাতি, মৌমাছি—বলতে গেলে সমস্ত প্রাণীরই 'ভাষা' আছে। আর প্রত্যেকেরই ভাষার ধরনধারণ আলাদা। পৃথিবীতে কোটি-কোটি পিঁপড়ে আছে। দলবদ্ধভাবে বাস করে তারা। জানা গেছে যে, প্রতিটি পিঁপড়ে তার দেহভঙ্গি দিয়ে, শুঁড় বা হাত-পা নাড়িয়ে অন্ততপক্ষে ৫০ রকমের উপায়ে খবর বা ভাব জানায়। তার শরীরের পিছনের অংশ থেকে একটা রস নিঃসরণ করে যার গন্ধ অনুসরণ করে অন্যেরা তাকে খুঁজে পেতে পারে। এই রাসায়নিক পদার্থটিকেও বলা যেতে পারে পিঁপড়ের ভাষার একটা উপাদান। ওই উপাদান এবং তার দেহভঙ্গির ভাষা মিলে তৈরি হয় একটা সংকেতভাষা। সেটাই পিঁপড়ের 'ভাষা'।

বিংশ শতকের গোড়ার দিকে কার্ল ফন ফ্রিশ নামে এক অস্ট্রিয়ান বিজ্ঞানী আবিষ্কার করেন যে, মৌমাছিদেরও ভাষা আছে। আর সেই ভাষা হল এক বিচিত্র ধরনের 'নাচ'। এছাড়া তাদের ডানার দ্রুত সঞ্চালনের ফলে যে গুন্‌গুন্‌ আওয়াজ ওঠে তাও তাদের ভাষার মতো।

কোনো-কোনো পাখি যে 'কথা' বলে তা নিয়ে আজ আর কোনো সংশয় নেই। ময়না, টিয়া, কাকাতুয়ারা যে কথা বলে তা মানুষেরই শেখানো বুলি। সেই শেখানো বুলির বাইরেও তারা কিছু বলতে বা জানাতে পারে। নিজেদের মধ্যে নানাভাবে ভাবের আদানপ্রদান করে তারা। পাখিদের গান নিয়ে, নানারকম ডাক ও তার অর্থ নিয়ে গবেষণা হয়ে আসছে অনেক দিন ধরেই। মার্চ রেন (march wren) নামে একরকম পাখির গানে স্বরের বহুরকম ওঠানামা বা ভঙ্গি আছে। বিজ্ঞানীরা সেই গান রেকর্ড করে তার নানান অর্থ খুঁজে বার করেছেন। ওই পাখি নানারকম বার্তা পাঠাবার জন্য নানারকম সংকেত ব্যবহার করে। আর এটা কেবল মার্চ রেনেরই ব্যাপার নয়। অন্য সব পাখিই অল্পবিস্তর খবর জানাতে পারে। আর সেটাই তাদের ভাষা। শুধু কি তাই? পাখিরা মানুষের ভাষা বুঝে নেয় আর মানুষের শেখানো কাজও চটপট বুঝে ফেলে। আফ্রিকার ধূসর টিয়া, আমাজনের টিয়া আর কাকাতুয়ারা নিজেদের মধ্যে 'কথাবার্তা' ভালোই চালায়। আরও

আশ্চর্যের খবর, ১৯৭৭ সালে ইরিন পেপারবার্গ নামে এক মহিলা অ্যালেক্স নামে একটা আফ্রিকান টিয়াকে ইংরেজি শেখানো শুরু করেন। কিছুদিন পরে দেখা গেল যে, পাখিটা তার মনিবের কথা বুঝতে পারছে, তাঁর কথা অনুযায়ী কাজও করছে।

ঘোড়া আর হাতিরাও যে বার্তা পাঠাবার জন্য বা নিজেদের মধ্যে ভাবের আদানপ্রদানের জন্য দেহের নানারকম ভঙ্গি করে তা আজ আর অজানা নয়। গবেষকরা তাদের সেইসব ভঙ্গি বুঝে নিয়ে তাদের সঙ্গে 'কথাবার্তা' চালান। হাতিরা অবশ্য শুধুই দেহভঙ্গি করে না। তারা গলা দিয়ে বহুরকম আওয়াজ বার করে—কখনো গর্জন, কখনো গরগর আওয়াজ, কখনো শিঙার মতো আওয়াজ—যার প্রত্যেকটারই আলাদা আলাদা মানে আছে। অফ্রিকার জাম্বিয়া, নামিবিয়া ও কিনিয়ায় হাতিদের নিয়ে গবেষণার ফলে জানা গেছে যে, হাতিরা এমনকিছু আওয়াজও করে যা অত্যন্ত নীচু পর্দার এবং যা মানুষের শ্রবণশক্তিতে ধরা পড়ে না, যাকে বলা হয় অবশ্রব্য বা infrasonic ধ্বনি। সেই ধ্বনি ধরা পড়ে যন্ত্রে। দেখা গেছে যে, তাও হয় নানা রকমের। তার অর্থও নানা রকমের।

ঠিক এইভাবেই ডলফিন, গরিলা আর শিম্পাঞ্জিদের নিয়ে দীর্ঘকালের গবেষণায় জানা গেছে যে, তাদেরও ভাষা আছে। ডলফিনরা তো শুধু খবর জানানোই করে না। তারা আবেগ-অনুভূতিও প্রকাশ করতে পারে। আর তা তারা করে তাদের গলা দিয়ে। তার মানে ডলফিনদের গলায় নানারকম আওয়াজ বার করার উপযোগী ব্যবস্থা আছে। সমস্ত জলচর প্রাণীর মধ্যে ডলফিনদের ভাষাব্যবহারের ক্ষমতা এবং মানুষের সঙ্গে ভাবের আদানপ্রদানের ক্ষমতা সবচেয়ে বেশি।

এবারে আসছি শিম্পাঞ্জির কথায়। বহুদিনের গবেষণায় জানা গেছে যে, শিম্পাঞ্জিরা মানুষের ভঙ্গি ও ধ্বনি অনুকরণ করতে খুবই পটু। শুধু তাই নয়, তারা মানুষের কথা বুঝে নিয়ে কাজও করতে পারে। ১৯৬৭ সালে ওয়াশোই নামে একটা শিম্পাঞ্জি মার্কিন সংকেত ভাষায় (American Sign Language) দুটো শব্দ লিখেও ফেলেছিল।

৩.২ সাংকেতিক ভাষা

এই পর্যন্ত বলেছি অন্য প্রাণীর ভাষার কথা। এ ছাড়াও আছে অন্য ভাষা, যাকে সংকেত-ভাষা বলতে পারি। এগুলো মানুষেরই তৈরি ভাষা, কিন্তু মানুষের মুখের ভাষা নয়. এর প্রথমটি হল টেলিগ্রাফের সংকেত বা টরেটক্কা। টেলিগ্রাফের সংকেত-ভাষা আমাদের মুখের ভাষার বার্তাকে ঠিক ঠিক পৌঁছে দেয়।

মূক-বধিরদের আমরা দেখেছি মুখভঙ্গি আর হাতের আঙুলের নানা ভঙ্গি দিয়ে পরস্পরের সঙ্গে ভাববিনিময় করতে। মূক-বধিরদের এই ইশারাও একরকম সংকেতভাষা। গণিতে নানারকম চিহ্ন ব্যবহার করা হয়। প্রত্যেকটার এক-এক অর্থ আছে। তাই বিজ্ঞানীরা বলেন ওটাও একরকম সংকেতভাষা। পথের মোড়ে-মোড়ে আছে পথ চলার নানা সংকেত লাল-সবুজ আলো, কোন রাস্তায় ডাইনে মোড় নেওয়া যাবে না,

কোথায় বাঁয়ে মোড় নেওয়া যাবে না, কোথায় গাড়ির গতিবেগ কত হবে, আর কোথায় পথচারীরা রাস্তা পারাপার করতে পারবে ইত্যাদি। এও তো একরকম ভাষা, সংকেতভাষা।

কম্পিউটারে নানারকম সংকেত ব্যবহৃত হয়। ব্যবহৃত হয় নানান প্রোগ্রাম। এইসব প্রোগ্রামকেও বলা যায় একরকম যান্ত্রিক ভাষা। এগুলিকে বলা হয় non-verbal language.

৩.৩ মানবভাষা ও তার অনন্যতা

এ বিষয়ে কোনোই সন্দেহ নেই যে, ভাষাই পশুজগৎ থেকে মানুষকে আলাদা করে দিয়েছে। ভাষাবিজ্ঞানী ট্রাস্ক (R.L. Trask) খুবই প্রত্যয়ের সঙ্গে ঠিক এই কথাই বলেছেন—If you were asked to name the trait which most decisively distinguishes human beings from all other creatures on the planet, what would you choose? Love? Warfare? Art and music? Technology? ......But most people who have considered this question at length have come up with a single answer : **language**.

কাজেই মানুষের ভাষার অনন্যতা নিয়ে কোনোই সন্দেহ নেই। কিন্তু প্রশ্ন উঠতেই পারে—কীসে সেই অনন্যতা? কী কী বৈশিষ্ট্য আছে মানুষের ভাষার? একে একে এবার মানুষের ভাষার সেই বৈশিষ্ট্য ও অনন্যতার সন্ধান করব।

প্রথমত, এডওয়ার্ড সাপিরকে অনুসরণ করে আমরাও বলতে পারি যে, মানুষের ভাষায় আছে একটা universality বা সর্বজনীনতা। সাপির বলেছেন যে, সার্বজনিকতা হল মানুষের ভাষার সবচেয়ে বড়ো পরিচয়। এই সার্বজনিকতার ব্যাপারটা একটু বুঝে নেওয়া দরকার। পৃথিবীতে হাজার-হাজার জাতি-উপজাতি আছে। সামাজিক-আর্থনীতিক দিক থেকে তাদের কোনোটি একটু এগিয়ে, কোনোটি পিছিয়ে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, প্রত্যেক জাতি বা উপজাতির ভাষা তাদের প্রয়োজন সম্পূর্ণ মেটাতে সমর্থ। ভাষাবিজ্ঞানীরা বলেন যে, প্রতিটি জাতিরই আছে পূর্ণবিকশিত ভাষা (fully developed language)। অর্থাৎ একটি উপজাতির যা কিছু প্রয়োজন তার সবই তাদের ভাষা মেটাতে পারে। একেই সাপির বলেছেন মানবভাষার universality.

মানুষের ভাষার দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য এই যে, এই ভাষা বংশপরম্পরাগত ভাবে জৈবক্রিয়ার মাধ্যমে অর্জিত নয় (not biologically inherited)। যেভাবে শিশু হাঁটতে শেখে, সেভাবে সে কথা বলতে শেখে না। মানুষের ভাষা একটি সাংস্কৃতিক সঞ্চালন-প্রক্রিয়া (culturally transmitted)। এর থেকেই আসে মানবভাষার আর একটি বৈশিষ্ট্যের কথা। তা হল transferability বা সঞ্চালন। ভাষা শুধু যে একজন থেকে আর এক জনের মধ্যে সঞ্চালিত হয় তা নয়, যুগ থেকে যুগে সঞ্চালিত হয়। আর তা হয় বলেই আমরা বলতে পারি যে, ভাষারই মাধ্যমে মানুষের সংস্কৃতিও যুগ থেকে যুগে বাহিত হয়। ভাষার উৎপত্তির প্রসঙ্গে মানুষের ভাষার যেসব ধর্ম বা বৈশিষ্ট্যের কথা বলেছি, সেগুলোই

আর একবার স্মরণ করব। তার মধ্যে একটা হল ভাষার গঠনগত দ্বৈততা বা duality of pattern. মানুষের ভাষায় আছে কতকগুলি ধ্বনি-একক, যাকে ফোনিম বা স্বনিম বা ধ্বনিমূল বলা হয়। এই স্বনিম বা ফোনিমগুলি অর্থহীন। তবে সেগুলি অর্থপূর্ণ হয় যখন একটি ফোনিম অপর একটি ফোনিমের সঙ্গে নির্দিষ্ট ক্রম বা নিয়ম অনুযায়ী যুক্ত হয়। যেমন ক্, আ, ন্ এই তিনটি ফোনিমের পৃথক অর্থ নেই। কিন্তু আমরা যদি ক্ + আ + ন্ এইভাবে সাজাই তবে একটা অর্থপূর্ণ শব্দ পাই—কান। একেই বলা হয় দ্বিস্তর সংগঠন—পৃথক ধ্বনিমূলের স্তর আর পরপর সংযুক্ত হয়ে শব্দগঠনের স্তর। এই duality of patternকে মানবভাষার একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য বলব।

আমরা প্রয়োজনমতো ধ্বনিগুলিকে অদলবদল করে নিয়ে শব্দ তৈরি করতে পারি। বাক্যের অন্তর্গত পদগুলিকেও আমরা অদলবদল করতে পারি। একে বলা হয় reordering বা পরাবর্তন। এই বৈশিষ্ট্য কেবল মানুষের ভাষারই আছে।

একমাত্র মানুষই পারে দূরের বিষয় ভাষা দিয়ে প্রকাশ করতে। আমাদের চোখের সামনে যাকিছু আছে, তাকে আমরা ভাষায় যেমন প্রকাশ করি, তেমনি যা দূরে আছে তাকেও প্রকাশ করতে পারি। উপস্থিত প্রসঙ্গ থেকে বিচ্ছিন্নতা মানুষের ভাষার একটা গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। একে বলা হয় displacement বা প্রতিসরণ বা সঞ্চারণ।

এইভাবে বিচার করে দেখলে বলতে পারা যায় যে, মানবভাষা প্রকৃতই পূর্ণাঙ্গ। মানুষের ভাষায় কোনো সীমাবদ্ধতা নেই। সৃজনশীলতা, সঞ্চারণ, দ্বৈতগঠন প্রভৃতি নিয়ে মানুষের ভাষা পূর্ণাঙ্গ।

গ্রন্থপঞ্জি

১. মহম্মদ দানীউল হক—ভাষাবিজ্ঞানের সূক্ষ্মতর প্রসঙ্গ (১৯৯৪)
২. দাশ, শিশিরকুমার—ভাষাজিজ্ঞাসা (১৯৯২)
৩. Crystal, David—Cambridge Encyclopaedia of Language (1997)
৪. Fischer, S.R.—A History of Language (2001)
৫. Hockett, Charles F.—A Course in Modern Linguistics (1958)

৪. মুখের ভাষা ও লিখিত ভাষা

৪.১ মুখের ভাষা ও লিখিত ভাষার পার্থক্য

১৯৫৯ সালে 'ডাইগ্লোসিয়া' (Diglossia) নামে একটি প্রবন্ধে ভাষাবিজ্ঞানী চার্লস ফার্গুসন ভাষার দ্বিভাষারীতির কথা বলেছেন। বিশেষ প্রয়োজনে একটি ভাষাগোষ্ঠীর ভাষিক জীবনে এমন একটা পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে যাতে ধীরে ধীরে দুটি ভাষারীতির উদ্ভব হবে। একটি রীতি মূলত ইনফরমাল বা অনাচারিক, যা সাধারণ ও স্বাভাবিক কথোপকথনে ও আলাপে সীমাবদ্ধ। অন্য রীতিটি ফরমাল বা আচারিক, যা ভাষণে ও লিখিত ভাষায় ব্যবহৃত। ইংরেজ ভাষাবিজ্ঞানী ডেভিড ক্রিস্টাল এই ডাইগ্লোসিয়ার একটা সহজ ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তিনি বলেন যে, দ্বিভাষারীতি অনেক ভাষাতেই আছে—গ্রিকে, আরবিতে। সাধারণভাবে, যাকে high আর low বলা হয়, এ হল সেইরকম। বাংলায় মান্য চলিত আর সাধুভাষা হল এই ডাইগ্লোসিয়ার দৃষ্টান্ত। এ থেকেই আমরা লেখার ভাষা আর মুখের ভাষার প্রসঙ্গে এসে পড়লাম।

মুখের ভাষার সঙ্গে লেখার ভাষার কি কোনো তফাত আছে? লেখার আর মুখের ভাষায় অবশ্যই একটা তফাত থাকে। এর একটা বড়ো কারণ এই যে, আমরা কথা বলি শুধু সামনে যারা রয়েছে তাদের সঙ্গে। আর সাহিত্য রচিত হয় বর্তমান ও ভবিষ্যতের বহু পাঠকের জন্যে। তাই লিখিত ভাষার নিয়মকানুনে একটু কড়াকড়ি থাকেই। তাছাড়া মুখের ভাষায় ভুল হলেই আমরা সেই ভুল তখনই সংশোধন করে নিতে পারি। কিন্তু লেখার ভাষায় এভাবে ভুল সংশোধন করা যায় না। তাই লেখার ভাষাকে মুখের ভাষার চেয়ে অনেক বেশি মার্জিত হতে হয়।

ভাষা সম্পর্কে কথা উঠলে কিংবা ভাষার চালচলন সম্পর্কে কথা উঠলে অধিকাংশ লোকই সেই ভাষার সাহিত্য থেকে উদাহরণ দেয়। তার মানে ভাষার আলোচনায় লিখিত ভাষার উদাহরণ বেশি এসে পড়ে। ভাষাবিজ্ঞানীরা বলেন যে, ভাষা মানেই মুখের ভাষা, যে-ভাষায় আমরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে একে অপরের সঙ্গে কথা বলি, সেই ভাষা। তাঁদের আবার লিখিত ভাষার আলোচনায় তেমন উৎসাহ নেই। তাঁরা ভাষার লিখিত রূপকে কিছুটা কম গুরুত্বপূর্ণ বলেই মনে করেন।

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, একদলের মতে ভাষার আলোচনায় লিখিত উপাদানই আসল। অন্য দলের মতে মুখের ভাষাই খাঁটি ভাষা। আসলে মুখের ভাষাই ভাষার অকৃত্রিম ও স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশের নিদর্শন। মানুষে মানুষে ভাবের আদান-প্রদান তো প্রধানত

কথাতেই হয়। সুশিক্ষিত অশিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত সকলেই কথা বলে। কোটি কোটি লোক বাংলায় কথা বলে। কিন্তু কোটি কোটি লোক লেখে কি? পড়ে কি? এ তো গেল একটা ব্যাপার। এ ছাড়া আর একটা কথাও মনে রাখা দরকার। লেখার সৃষ্টি হয়েছে মানুষ কথা বলতে আরম্ভ করার অনেক অনেক পরে। প্রাচীনকালের মানুষের শুধু কথা বলেই শান্তি হয়নি। যারা কথা শুনতে পাচ্ছে না, যারা উপস্থিত নেই তাদের কাছেও মনের কথা পৌঁছে দেওয়ার তাগিদেই লেখার সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু মুখের ভাষা তো কতকগুলো ধ্বনির সমষ্টি। মোদ্দা ধ্বনিগুলোর জন্যে চিহ্ন তৈরি তো করা গেল। কিন্তু মুখের ভাষায় ধ্বনি যেমন আছে তেমনই আছে সুর, সুরের ওঠা-নামা ইত্যাদি। সেগুলো কীভাবে লেখার মধ্যে আসবে? আসতে পারে না তা। সেই জন্যেই প্রথম থেকে আজ পর্যন্ত লেখার ভাষা আর মুখের ভাষা আলাদা হয়ে আছে। লেখার ভাষা আর মুখের ভাষা কখনো পুরোপুরি এক জিনিস হতে পারে না। এ সম্পর্কে পরে আরও বলছি।

আগেই বলেছি ভাষা নিয়ে যাঁরা চর্চা করেন তাঁদের অনেকেই মনে করেন যে, মুখের ভাষাই আসল ভাষা। কিন্তু একথাও ঠিক যে, আমাদের ভাষার (শুধু আমাদের ভাষারই নয়, সব ভাষারই) সমস্ত কীর্তি লেখার মধ্যেই রয়েছে। ভাষার আলোচনায় তাই সাহিত্যকে বাদ দেওয়া কখনো সম্ভব নয়। ভাষা একটা স্রোতের মতো। ভাষায় ক্রমাগত পরিবর্তন হচ্ছে। তবে সেই পরিবর্তন এতই ধীরে হয় যে, আমরা তা সব সময় বুঝতে পারি না। পরিবর্তন নানা রকমে হয়। উচ্চারণ বদলে যায়, শব্দের অর্থও বদলে যায়। কিন্তু এই যে বলছি ভাষায় পরিবর্তন হয়, আমরা তা জানছি কী করে? জানছি ভাষার লিখিত নমুনা থেকে, পুরোনো সাহিত্য থেকে। আমাদের দেশে বই ছাপার ব্যাপারটা চালু হয়েছে মোটের উপর দুশো বছর আগে। তার আগেকার সব কিছু আমরা হাতে লেখা পুথিতে পাই। ছাপার ব্যাপারটা চালু হওয়ার পরে অবশ্য পুরোনো পুথি থেকে অনেক কিছু ছাপা হয়েছে। পুরোনো লেখার নমুনা দেখে এবং তা ভালো করে বিচার করে পণ্ডিতরা বুঝতে পারেন যে, অনেক শব্দের বানান আগে অন্যরকম ছিল, অনেক শব্দের মানেও অন্যরকম ছিল। শব্দের বানান আর মানে যে বদলে যায় তা না হয় আগেকার লেখার সঙ্গে এখনকার লেখার তুলনা করলেই বোঝা যায়। কিন্তু আগেকার উচ্চারণও যে কোথাও কোথাও অন্যরকম ছিল তা কী করে বোঝা যায়? তখনকার লোকের উচ্চারণ কেমন ছিল তা তো শোনার কোনো সুযোগ আমরা পাইনি। তবে? এখানেই মজা। আসলে কবিতায় ছড়ায় মিল কীভাবে দেওয়া হত তা দেখলেই সেকালের উচ্চারণ সম্পর্কে একটা ধারণা হয়। গানে, ছড়ায়, কবিতায় ছন্দও একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। এই ছন্দ আর মিল দেখে আগেকার দিনের মানুষের উচ্চারণ খানিকটা অনুমান করা যায়। এ থেকেই লিখিত ভাষার গুরুত্ব উপলব্ধি করা যায়।

লিখিত ভাষাকে উপেক্ষা নিশ্চয়ই করব না আমরা। কিন্তু তাই বলে লিখিত ভাষা আর মুখের ভাষা একই জিনিস সেটাও ভাবা চলবে না। এই দুটো জিনিস যে কেন আলাদা

এবারে সেই কথাটাই বলব। মুখের ভাষায় ঝোঁক একটা আসল ব্যাপার। লেখায় সেই ঝোঁক প্রায়ই আনা যায় না। নীচের বাক্যটা দেখব—

ক. সে কেবল আমাকে এই কথা বলেছে।

এটা লেখার ভাষা থেকে নেওয়া হয়েছে। মুখে বললে অনেকটা এইরকম শোনাবে—

খ. শে কেবোল্ আমাকে এই কথা বোলেছে।

এতেও কিন্তু মুখের ভাষার সঙ্গে লেখার ভাষা মিলে যায়নি। কারণ এই কথাগুলো খ-য়ের মতো করে লিখলেও এর মানে স্পষ্ট হল না। এই বাক্যটার অন্তত তিন রকম মানে হতে পারে—

গ. সে কেবল আমাকেই এই কথা বলেছে, আর কাউকে নয়।

ঘ. সে সবেমাত্র আমাকে এই কথা বলেছে।

ঙ. কেবল সে-ই আমাকে এই কথা বলেছে, আর কেউ বলেনি।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, এই বাক্য এইভাবে লিখলে মানে বুঝতে একটু অসুবিধে হয়। কিন্তু মুখে বললে ঠিকই বুঝে নেব আমরা। আসলে কথা বলার সময় আমরা স্বরের যে ভঙ্গি করি বা দরকারমতো কোনো কোনো শব্দের উপর যে ঝোঁক দিই, লেখায় তা বোঝানো যায় না। মুখে উপরের বাক্যটাকে যখন বলব তখন তার অর্থ অনুযায়ী এক একটা বিশেষ শব্দের উপর ঝোঁক দেব। তাতেই মানে স্পষ্ট বোঝা যাবে।

লিখিত ভাষায় কমা দাঁড়ি সেমিকোলন প্রভৃতি নানান চিহ্ন ব্যবহার করা হয়। এই চিহ্নগুলোকে বলে বিরামচিহ্ন। বাক্যে নানারকম বিরতির জন্যে এই বিরামচিহ্ন ব্যবহার করা হয়। মুখের ভাষারও বিরাম থাকে, কিন্তু সে বিরাম লিখিত ভাষার বিরামের সঙ্গে মেলে না। কথা বলার সময় আমরা থামি, আবার বলি, আবার থামি। একই কথা দুবার বলি। থমকে যাই, অস্পষ্ট উচ্চারণে কথা বলি। বলতে বলতে কথা খুঁজে না পেয়ে 'মানে', 'কী বলে', 'হচ্ছে গিয়ে' এই সব নানান কথা দিয়ে ফাঁক ভরাট করি। মুখের ভাষা স্বতঃস্ফূর্ত। তাই তাতে অস্পষ্টতা, অস্বচ্ছতা ও ভুল থাকে। আমরা ক্রমাগত ভুল সংশোধন করি। কিন্তু লেখায় ক্রমাগত ভুল সংশোধন করা সম্ভব নয়। কাজে কাজেই লেখার ভাষাকে অনেক বেশি মার্জিত হতে হয়। এইসব কারণেই লেখার ভাষা আর মুখের ভাষা আলাদা। যদিও ভাষার প্রকৃত স্বরূপ মুখের ভাষা দিয়েই বোঝা যায়, তবু লিখিত ভাষাকেও উপেক্ষা করা যায় না। কেননা ভাষার আলোচনায় লিখিত নমুনা বা সাহিত্যেরও একটা স্থান আছে।

মুখের ভাষা নিয়ে আরও কয়েকটা কথা বলা দরকার এখানে। আজকাল ছোটো-বড়ো অনেকের মুখেই কয়েকটা কথা শুনতে পাই যেগুলো মান্য চলিত বা মান্য কথ্য ভাষায় ব্যবহার করা ভুল এবং অনুচিত। এইরকম একটা শব্দ হল—'সাথে'। 'সঙ্গে'-র বদলে সাথে মান্য ভাষায় অচল। কবিতায় চলতে পারে, যেমন রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন তাঁর গানে—

'ওদের সাথে মেলাও যারা চরায় তোমার ধেনু।'

কিন্তু কথাবার্তায় বা গদ্য লেখায় 'সাথে' ব্যবহার করা ঠিক নয়।

মুখের ভাষার সঙ্গে লেখার ভাষার যে তফাত আছে একথা তো আগেই বলেছি। তবে একথাও ঠিক যে, কখনো-কখনো একই শব্দ লেখায় ও মুখের কথায় ব্যবহার করা যায়। তাতে দোষের কিছু নেই। যেমন 'কৌতূহলী' ও 'আকর্ণ' শব্দদুটো। এইরকম ভারী শব্দ কথ্য ভাষায় ব্যবহার করায় কোনো বাধা নেই। যেমন নীচের দুটি বাক্যে—

শ্বশুরবাড়িতে তোমার প্রথম দিনটা কেমন কাটল জানার জন্যে কৌতূহলী হয়ে আছি।

তোমার ওই আকর্ণ হাসি দেখলে আমার গা জ্বলে যায়।

৪.২ মুখের ভাষার বৈচিত্র্য

মুখের ভাষা আর লেখার ভাষা যে অনেকটাই আলাদা তা দেখালাম আমরা। কিন্তু আরও একটা কথা আমাদের মনে রাখতে হবে। মুখের ভাষায় আছে নানান বৈচিত্র্য। আমরা জানি, যেকোনো ভাষার মৌখিক রীতির প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায় তার আঞ্চলিক রূপভেদগুলির মধ্যে, অর্থাৎ উপভাষার মধ্যে। যেমন, বাংলা উপভাষা হল সমস্ত অঞ্চলের বাঙালির অপরিশীলিত মুখের ভাষা। এক-একটা ভাষা-অঞ্চল যত ছোটো হবে, উপভাষার সংখ্যাও তত কম হবে। বাঙালির মুখের ভাষার বা মৌখিক ভাষার পরিচয় পেতে হলে বাংলা উপভাষাগুলির পরিচয় পাওয়া দরকার। প্রত্যেক ভাষারই আঞ্চলিক বিভিন্নতা আছে। ইংরেজি ভাষায়ও আছে। ইংল্যান্ডের উত্তরে ইয়র্কশায়ারের ভাষা দক্ষিণাঞ্চলের ভাষার চেয়ে অনেকটাই পৃথক এবং সে পার্থক্য উচ্চারণেই বেশি। একথা ঠিক যে, ইংরেজি উপভাষাগুলি বাংলা উপভাষার মতো এত বিচিত্র বা বিভিন্ন নয়। তবে ঔপভাষিক বিভিন্নতা নেই এমনও নয়। আর তা আছে বলেই বহুকাল যাবৎ ইংরেজি উপভাষার চর্চা হয়ে আসছে। বহু বছর আগে আলেকজান্ডার জন এলিস (Alexander John Ellis) লিখেছেন তাঁর The Present English Dialects, জোসেফ রাইট (Joseph Wright) লিখেছেন The English Dialect Dictionary. ঠিক তেমনি মার্কিনি ইংরেজিরও আছে আঞ্চলিক বিভিন্নতা। আর তারও চর্চা হয়ে চলেছে বহুকাল যাবৎ। ১৯৬৩ সালে একটি বিপুল কর্মযজ্ঞ শুরু হয় ফ্রেডারিক ক্যাসিডি-র (Frederic Cassidy) তত্ত্বাবধানে। প্রকল্পটির নাম Dictionary of American Regional English.

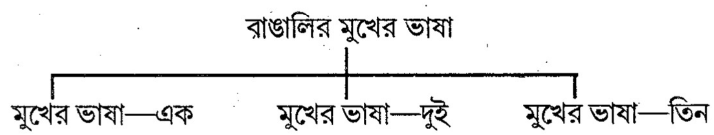
আঞ্চলিক ভাষা বা উপভাষার মধ্যে যদিও রয়েছে মুখের ভাষার পরিচয়, কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, শিক্ষার প্রসার, বেতার, টেলিভিশন ও সিনেমার দৌলতে আঞ্চলিক ভাষা প্রায় সব দেশেই তার আদি অপরিশীলিত রূপ হারাতে বসেছে। তার মানে শহুরে সংস্কৃতি এমনভাবে গ্রামাঞ্চলে অনুপ্রবেশ করছে যে, গ্রামের বহু মানুষই এখন একটু পরিশীলিত ভাষায় কথা বলা শুরু করেছে। বিখ্যাত ইংরেজ ভাষাবিদ সিমিয়ন পটার (Simeon Potter) তাঁর Our Language (1976) বইয়ে বলেছেন—'The genuine regional

dialects of Britain have tended to decline in recent years. School, radio and television do not favour the preservation of local speech. Other factors conducive to the decline of regional dialect are snobbishness, the rush to the towns and the subsequent urbanization of life'. (p. 139)।

কথ্য বা মৌখিক ভাষা সম্বন্ধে আরও একটা কথা বলা দরকার। বাঙালিকে দিয়েই কথাটা বোঝানো সহজ হবে। প্রায় প্রত্যেক বাঙালিরই একটা মূল ভাষা বা 'দেশের ভাষা' আছে। অল্পবয়সিরা সচরাচর সেই ভাষার সঙ্গে পরিচিত না হতেই পারে। কিন্তু বয়স্কদের অনেকেই সেই 'দেশের ভাষা'-য় কথা বলেন। কেউ হুগলির ভাষায়, কেউ ঢাকার ভাষায়, কেউ বর্ধমানের ভাষায়, কেউবা যশোরের ভাষায়। আর এই 'দেশের ভাষায়' কথোপকথন চলে কেবল ঘরের মধ্যে নিজের লোকজনের সঙ্গে। এ হল মুখের ভাষার এক নম্বর রূপ। একে বলতে পারি **'মুখের ভাষা—এক'**।

আবার বাড়ির বাইরে, অনেকেই নিজের দেশের ভাষাটিকে একটুখানি 'সংস্কার' করে বা পরিশীলিত করে বলার চেষ্টা করেন। যেমন বর্ধমানের লোক বাড়ির বাইরে যথেষ্ট সাবধানে কথা বলেন, যদিও মাঝেমাঝেই তাঁদের কিছু 'দেশীয় কথা' বাইরে বেরিয়ে আসে। একে আমরা বলব **'মুখের ভাষা—দুই'**।

সব শেষে বলব, শিষ্ট কথ্য ভাষার কথা বা standard colloquial ভাষার কথা। এ হল সর্বাঞ্চলবাসী বাঙালির মান্য মুখের ভাষা। এই ভাষা যদিও কথ্য ভাষার উপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে, তবে এর মধ্যে আছে যথেষ্ট পরিমার্জনা বা পরিশীলনের চিহ্ন। আর দেখা যায় যে, সমস্ত অঞ্চলের বাঙালিই ফরমাল পরিবেশে এই পরিশীলিত কথ্য ভাষাই ব্যবহার করে। কেউ-কেউ একে মান্য চলিত ভাষা বা **মা-চ-বা** বলেন। এ হল আমাদের **'মুখের ভাষা—তিন'**। একটা ছক এঁকে মুখের ভাষার সম্পূর্ণ রূপ দেখানো যায়।



এই তিনটি মিলে বাঙালির মুখের ভাষার একটা সামগ্রিক ও সত্যিকার পরিচয় দেয়। মনে রাখতে হবে যে, এগুলি কথ্য ভাষা। তবে যাকে standard colloquial ভাষা বা মা-চ-বা বলছি তা লেখাতেও ব্যবহৃত হয়। আধুনিক কালে সাহিত্যে মৌখিক রীতি ক্রমশ বেশি ব্যবহৃত হচ্ছে। গল্পে-উপন্যাসে-নাটকে অবশ্য বিশেষত সংলাপাংশে মুখের ভাষার এক ও দুই, এই দুটি রূপই ব্যবহৃত হতে দেখা যায়।

৪.৩ লিখিত ভাষার বৈচিত্র্য

মুখের ভাষার বিভিন্নতা ও বৈচিত্র্য দেখার পর এবার দেখব লিখিত ভাষার বৈচিত্র্য। আমরা দেখেছি যে, লিখিত ভাষায় থাকে পরিমার্জনা ও পরিশীলন। কিন্তু সেই লিখিত ভাষার মধ্যেও থাকে বিভিন্নতা। এখানে আমরা চার্লস ফার্গুসনের diglossia-র প্রসঙ্গ এড়িয়েই

লিখিত ভাষার কথা বলব, কেননা ফার্গুসন যখন দ্বিভাষারীতির কথা বলেছেন তখন মূলত মুখের ভাষার কথাই তাঁর মাথায় ছিল।

বাংলা ভাষায় দুটি লিখনরীতি আছে—সাধু ভাষা ও চলিত ভাষা। বলাবাহুল্য, সাধুভাষা একটা পুরোনো স্টাইল বা রীতি, যার উদ্ভব অষ্টাদশ শতকে, বিকাশ উনিশ শতকে এবং বিংশ শতকের প্রথম দুই দশকে। বহুদিন পর্যন্ত সাধু ভাষায় তৎসম শব্দের প্রাধান্য ছিল। ক্রমে ক্রমে অতৎসম শব্দও সাধুভাষায় যথেষ্টই ব্যবহৃত হতে থাকে। আর দ্বিতীয় রীতিটি হল চলিত ভাষা যা সর্বাঞ্চলবাসী বাঙালির শিষ্ট কথ্য ভাষারই মার্জিত রূপ। এই সাধু ও চলিত রীতির মধ্যে পার্থক্য আছে যথেষ্টই।

প্রথমত, **শব্দগত পার্থক্য**। আগেই বলেছি যে, বহুদিন পর্যন্ত সাধু ভাষায় ছিল তৎসম শব্দের প্রাধান্য। বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা সাধু ভাষায় এর দৃষ্টান্ত আছে। তবে অনেকে এ বিষয়ে ভুল করেন। ১৯৬০ সালে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে মার্কিন লেখক এডওয়ার্ড ডিমক (Edward Dimmock) বলেছেন যে, সাধু ভাষায় আর চলিত ভাষায় ব্যবহৃত শব্দে পার্থক্য আছে। তিনি বলতে চেয়েছেন যে, সাধু ভাষায় তৎসম শব্দ ব্যবহৃত হয়, আর চলিত ভাষায় অতৎসম শব্দ ব্যবহৃত হয়। কিন্তু একথা আদৌ ঠিক নয়। চলিত ভাষাতেও তৎসম শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে এবং হচ্ছে, অন্য দিকে সাধু ভাষাতেও অতৎসম শব্দ যথেষ্টই ব্যবহৃত হয়, বিশেষত উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে। বাস্তবিকপক্ষে, সাধুতে বা চলিতে কী ধরনের শব্দ বেশি ব্যবহৃত হবে তা নির্ভর করে পরিস্থিতির উপর, রচনার মেজাজ ও ভঙ্গির উপর। চাঁদ, হাঁস, বই এগুলি অতৎসম শব্দ। সাধু ভাষায় বহুবার ব্যবহৃত হয়েছে এগুলি। অন্য দিকে, চঞ্চল, বিভিন্নতা, পার্থক্য এগুলি তৎসম শব্দ হলেও চলিত ভাষায় বহুলব্যবহৃত।

সাধু ভাষা ও চলিত ভাষায় আসল পার্থক্য **সর্বনাম ও ক্রিয়াপদের ব্যবহারে, অনুসর্গ ও অব্যয়ের ব্যবহারে**। উহা, তাহা, তাহাদের, তাহাদিগের, তাহাকে, তাহার, ইহা, ইহাকে, ইহাদের ইহাতে—এসব সর্বনাম কেবল সাধু ভাষাতেই দেখতে পাওয়া যায়। চলিতে ব্যবহৃত হয় তা, তাদের, তাকে, তার, এ, এর, একে, এদের ইত্যাদি। অবশ্য কয়েকটি সর্বনাম দুই রীতিতেই ব্যবহৃত হয়। যেমন আমি, তুমি, আপনি, সে, তিনি ইত্যাদি।

সাধু ভাষায় ক্রিয়াপদের পূর্ণ রূপ ব্যবহৃত হয়—খাইব, খাইবে, খাইতেছে, খাইয়াছে, খাইতেছিল ইত্যাদি। চলিতে খাব, খাবে, খাচ্ছে, খেয়েছে, খাচ্ছিল ইত্যাদি। ক্রিয়াপদের বর্তমান, অতীত, ভবিষ্যৎ প্রতিটি রূপেই সাধু-চলিতে বিভিন্নতা দেখা যায়। আমরা বলেছি, সাধু ভাষায় ক্রিয়াপদের পূর্ণ রূপ ব্যবহৃত হয়। চলিতে সংক্ষিপ্ত রূপ। সংক্ষেপণ হয় মূলত ধ্বনিলোপের ফলে। সাধুর *করিব* চলিতে *করব, বলিতেছে* চলিতে *বলছে*। সাধুতে যা *খাইয়াছিল,* চলিতে তা হল *খেয়েছিল*। তবে সাধারণ বর্তমান ও বর্তমান অনুজ্ঞায় সাধু-

চলিতে তেমন তফাত নেই। *দাও, যাও, ঘুমাও* এসব সাধু ও চলিত উভয় রীতিতেই ব্যবহৃত হয়।

অব্যয়ের ব্যবহারে পার্থক্য আছে দুই রীতিতে। *নচেৎ, কদাপি, অদ্যাপি* এসব অব্যয় সচরাচর সাধু ভাষাতেই দেখা যায়। অনুসর্গও সাধু-চলিতে কিছুটা আলাদা। *অপেক্ষা, দ্বারা, দিয়া, কর্তৃক* এসব অনুসর্গ একসময় চলিতেও ব্যবহৃত হত, এখন এগুলো অবশ্য চলিতে কমই ব্যবহৃত হয়। ক্রিয়াজাত অনুসর্গের ব্যবহারে সাধু-চলিত আলাদা হয়ে যায়। *আমার কাছ হইতে / আমার কাছ থেকে, হাত হইতে / হাত থেকে* ইত্যাদি উদাহরণ থেকে এই পার্থক্য ভালোই বোঝা যায়।

চলিত ভাষা যেহেতু শিষ্ট কথ্য ভাষার উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে, তাই চলিত ভাষায় কথ্যরীতির শব্দ বেশি ব্যবহৃত হয়। বিশেষত বিশেষ্যবাচক শব্দের পুরোনো রূপের বদলে আধুনিকতর রূপ ব্যবহৃত হয়। *বেনিয়া* বা *বানিয়া*-র বদলে *বেনে, পটুয়া-র* বদলে *পোটো, জুতা*-র বদলে *জুতো, পূজার* বদলে *পুজো, টুকরা*-র বদলে *টুকরো, ভিক্ষা*-র বদলে *ভিক্ষে, সলিতা*-র বদলে *সলতে*। বিশেষণের স্ত্রীলিঙ্গরূপ সাধুভাষাতে বেশি ব্যবহৃত হত—*ভীষণা, রুষ্টা, চঞ্চলা, অধীরা, প্রবলা* এসবের ব্যবহার নেই চলিতে। এমনকী, এখনকার সাধুভাষাতেও বিশেষণের স্ত্রীলিঙ্গরূপ এভাবে ব্যবহৃত তেমন হয় না।

৪.৪ সাধু-চলিতের পারস্পরিক সংলগ্নতা

আমরা দেখলাম যে, ক্রিয়াপদের পূর্ণরূপ, সর্বনামের পূর্ণ রূপ ও ক্রিয়াজাত অনুসর্গের সাধুরূপ সাধুভাষারই বৈশিষ্ট্য ছিল। চলিত ভাষায় ওগুলো কখনোই ব্যবহৃত হয়নি। কিন্তু কতকগুলো ব্যাপারে সাধু-চলিতে বড়ো তফাত ছিল না। উনিশ শতকে দেখা যাচ্ছে যে, কখনো সাধু ভাষা তার সাধুত্ব কিছুটা পরিহার করে যেন চলিতের কাছাকাছি আসছে, আবার কখনো দেখতে পাচ্ছি যে, চলিত ভাষা একটু বড়ো সমাসবদ্ধ ও সন্ধিবদ্ধ পদ ব্যবহার করে, তৎসম শব্দ একটু বেশি ব্যবহার করে সাধুর কাছে যেতে চাইছে। তবে চলিত যতটা সাধু হয়ে উঠতে চেয়েছে, তার চাইতে সাধুভাষাই চলিতের দিকে এগিয়েছে বেশি। একেই আমরা বলেছি সাধু-চলিতের পারস্পরিক সংলগ্নতা। বাংলা গদ্যের প্রথম যুগের লেখকরা দীর্ঘ সময়ের চেষ্টায় ও অনুশীলনে একটা সুস্থির, সুনিরূপিত গদ্যরীতি—অবশ্য তা সাধুর গদ্যরীতি—উদ্‌ভাবন করেছিলেন। সেকালের শ্রেষ্ঠ এবং অবশ্যই সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গদ্যশিল্পী বঙ্কিমচন্দ্র। সে যুগের আর এক গদ্যশিল্পী বিদ্যাসাগর। তাঁর বড়ো কৃতিত্ব এই যে, তিনি বাঙালির মুখের ভাষার ছন্দটিকে আবিষ্কার করে তার উপর ভিত্তি করেই লিখলেন তাঁর গদ্য। তাই তাঁর সাধুগদ্য যেমন স্বচ্ছন্দ ও বেগবান, তেমনি আন্তরিক ও নমনীয়। সাধুভাষার কৃত্রিমতার অনেকটাই বিদ্যাসাগরের গদ্যের সুবাদে চলে গেল। চলিতের ক্রিয়াপদ ও সর্বনাম সাধুতে গৃহীত হল না বটে, তবে প্রাঞ্জলতা, স্পষ্টতা ও নমনীয়তা

এসে গেল সাধু ভাষাতেও। এভাবেই সাধু ও চলিতের মধ্যে তৈরি হল একটা রফা, একটা সংলগ্নতা। এই সংলগ্নতার ফলে চলিত ভাষা সমস্তরকম ভাবপ্রকাশের উপযোগী হয়ে উঠল, আলালি গদ্যে বা হুতোমি গদ্যে যে চটুলতা ছিল—যা মহৎ ভাষাপ্রকাশের পক্ষে উপযোগী ছিল না—তা অপগত হল। রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী ও রাজশেখর বসুর হাতে চলিত ভাষা হয়ে উঠল সর্বগুণান্বিত। আর তার পিছনে কিছুটা হলেও সাধু ভাষার অবদান ছিল।

গ্রন্থপঞ্জি

১. আজাদ, হুমায়ুন—বাঙলা ভাষা (প্রথম খণ্ড ১৯৮৪)
২. দাশ, শিশিরকুমার—'মুখের বাংলা, লেখার বাংলা' দ্র. মৃণাল নাথ সম্পাদিত, ভাষা ১৯৮৫-৮৬ যুগ্ম সংখ্যা
৩. ভট্টাচার্য, সুভাষ—বাঙালির ভাষা ২০০০
—'বাঙালির মুখের ভাষা' দ্র. ভাষার অভিমুখ (২০০৯)
—'সাধু ভাষার সেকাল ও একাল : সাধু-চলিতের পারস্পরিক সংলগ্নতা' দ্র. ভাষা সাহিত্য রবীন্দ্রনাথ (২০০৪)
৪. সরকার, পবিত্র—ভাষাজিজ্ঞাসা (১৯৮৮)
৫. Barber, C.L.—The Story of Language (1975)
৬. Bryson, Bill—The Mother Tongue (1990)
৭. Potter, Simeon—Our Language (1976)

৫. লিপির ইতিহাস

৫.১ লিপির উদ্ভব

লিপির উদ্ভব হয়েছিল মুখের ভাষার চিত্ররূপ হিসাবে। ভাষাতাত্ত্বিক স্টিভেন ফিশার বলেছেন—'It (i.e. writing) began immediately as the graphic expression of actual human speech and has remained so.' কাজেই এই বিষয়ে সন্দেহ নেই যে, লিপি হল মুখের ভাষার অপূর্ণাঙ্গ দৃশ্যরূপ। আদিম মানুষ ছবি এঁকে মনের ভাব প্রকাশ করত। কোনো তথ্য বা সংবাদ জানাবার জন্য বা সতর্ক করার জন্য তারা ছবি আঁকত। তবে শুধু ছবি আঁকাই নয়, তারা দড়িতে গিঁট দিয়ে বা কাঠের দণ্ডে খাঁজ কেটে দরকারি কথা মনে রাখত। সেগুলো অবশ্যই চিত্র নয়। এইভাবে দড়িতে গিঁট দেওয়াকে স্মরণসহায়ক হিসাবে ব্যবহার করার নাম কিপু (Quipu)। সেসব প্রতীক বা সংকেত কোনো কথার প্রতিনিধিত্ব করেনি। আদিম মানুষের আঁকা ছবি লিপির ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কেননা এই ছবি থেকে এসেছে লিপি। আদিম মানুষ ছবি আঁকত মাটিতে, পাথরের দেওয়ালে, গুহার গায়ে, চামড়ায়। পুরোনো প্রস্তরযুগের মানুষ ছবি আঁকত নানা উদ্দেশ্যে। গোড়ার দিকে শিকারের আহ্বান, দৈহিক শক্তির প্রদর্শন ইত্যাদি উদ্দেশ্য থাকত সেসব ছবির পিছনে। পরে বার্তা প্রেরণ করা বা তথ্য সংরক্ষণ প্রভৃতি কাজেও চিত্রলিপি ব্যবহৃত হত।

কোনো তথ্য বা বার্তা পৌঁছে দেবার জন্য ছবি বা সংকেতের ব্যবহার অবশ্য এই আধুনিক কালেও করা হয়। রাস্তার যানচলাচল বা লোকচলাচলের জন্য ব্যবহৃত সংকেতের কথা সকলেরই জানা আছে। শৌচাগারে পুরুষ ও মহিলাদের ছবি এঁকে আলাদা কক্ষ দেখিয়ে দেওয়া হয়। এও তো সেই চিত্রই। এসব ক্ষেত্রে এধরনের ছবির উপযোগিতা অনস্বীকার্য, কেননা এগুলো বোঝার জন্য বিশেষ কোনো ভাষা বোঝার দরকার হয় না।

প্রকৃতপক্ষে যাকে লিপি বলা হয় তার সূত্রপাত বলতে গেলে চিত্রলিপি বা pictograph দিয়ে হয়। পাহাড়ে বা গুহার গায়ে বা চামড়ায় যে ছবি আঁকা হত তা কিন্তু চিত্রলিপি নয়। সেগুলো চিত্রই। চিত্রলিপিতে কোনো বস্তু বা প্রাণীর সম্পূর্ণ চিত্র আঁকা হত না। নানারকম রেখা এঁকে বিষয়টির প্রতি ইঙ্গিত করা হত। চিত্রলিপি আজও বহু ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয়ে চলেছে। চিত্রলিপিরই অনুরূপ আর একরকম চিত্র এঁকেও বিষয় বা ভাব বোঝানো হত প্রাচীন কালে। তাকে বলা হয় ভাবলিপি (ideograph)। চিত্রলিপি ও ভাবলিপির মধ্যে তফাত এই যে, প্রথমটি দিয়ে বস্তুর প্রতি ইঙ্গিত করা হত, দ্বিতীয়টি ছিল

ভাবের প্রতি বা বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হত। আদিম চিত্রলিপির নানান নিদর্শন দেখা গেছে আমেরিকার আদিম উপজাতি সমূহের ব্যবহৃত চিত্রলিপিতে, মেক্সিকোর আদিম মানুষের চিত্রলিপিতে। তবে একথাও বলা দরকার যে, চিত্রলিপি আর ভাবলিপি ঘনিষ্ঠভাবে পরস্পরসম্বদ্ধ। চিত্রলিপি ও ভাবলিপির আধুনিক নাম logograph বা শব্দলিপি। কিন্তু শব্দলিপি বা চিত্রলিপি ভাষার ধ্বনিকে কোনো ভাবেই প্রকাশ করে না।

চিত্রলিপি বা ভাবলিপি বা শব্দলিপি থেকে প্রকৃত লিপিতে পৌঁছোনোর জন্য দরকার ছিল চিত্র বা প্রতীকের সরলতা। শুধু সরল হলেই তা থেকে লিপিতে উত্তরণ সম্ভব হয়নি। চিত্রগুলি যতদিন পর্যন্ত ভাষার শব্দ ও ধ্বনির প্রতিনিধিত্ব করতে না পেরেছে, ততদিন প্রকৃত লিপি আসেনি।

৫.২ কিউনিফর্ম ও হায়েরোগ্লিফিক্স

যাকে প্রাচীন মানুষের প্রথম লিপি বলা যেতে পারে তা উদ্ভাবন করেছিল সুমেরীয়রা। তাদের লিপিকে cuneiform বলা হয়। তারা পেরেকের মতো মাথাওয়ালা কাঁটা দিয়ে পোড়া মাটির ফলকে বা অন্য মাধ্যমে লেখা শুরু করে। এই কাঁটাকে wedge বা stylus বলা হয়। বাংলায় তাই কিউনিফর্ম লিপিকে বাণমুখ লিপি বলা হয়েছে। কিউনিফর্ম লিপি যুগে যুগে বদলে গেছে। গোড়ার দিকে কাঁটা দিয়ে মাটি ইত্যাদিতে রেখা টানা হত। যখন দেখা গেল তাতে কাঁটার সামনে মাটির ছোটো ছোটো স্তূপ তৈরি হচ্ছে তখন সুমেরীয় লিপিকররা রেখা টানার বদলে মাটির উপর কাঁটার চাপ দিয়ে লিখত। সুমেরীয়দের এই লিপি প্রাচীন সেমিটিকরা ব্যবহার করেছে, তাকে উন্নতও করেছে এবং বহুকাল পর্যন্ত এই কিউনিফর্মই ছিল প্রাচীন মধ্যপ্রাচ্যের একমাত্র লিপি। এই লিপি হিত্তীয় জাতি ও প্রাচীন পারসিকরাও যে ব্যবহার করত তা ভাষাতাত্ত্বিকদের অনুসন্ধানের ফলে জানা গেছে।

কিন্তু যখন স্টাইলাস বা কাঁটার বদলে কলম বা তুলি দিয়ে চামড়া বা প্যাপিরাসের উপর লেখা শুরু হল তখন লিপির ধরনটাই বদলে গেল। প্রতীকই বলি, আর অক্ষরই বলি, সেগুলো সরলতর হল এবং একটু-একটু করে জড়ানো (cursive) লেখাও শুরু হল। ঠিক এই ব্যাপারটাই ঘটেছিল মিশরের হায়েরোগ্লিফিক্স-এ। মিশরের ওই লিপির নামটা গ্রিকদের দেওয়া। তার অর্থ 'পবিত্র লিপি'। গ্রিকদের ধারণায় মিশরীয়রা কেবল ধর্মীয় অনুশাসনই লিখত ওই লিপিতে। হায়েরোগ্লিফিক্স লেখা হত প্যাপিরাস গাছের পাতায় ও চামড়ায়। প্রাচীন মিশরে অবশ্য হায়েরোগ্লিফিক্সই একমাত্র লিপি নয়। তার দুটি পরিবর্তিত রূপও দেখা গিয়েছিল। একটি hieratic অর্থাৎ পুরোহিত বা যাজকদের লিপি এবং অন্যটি demotic অর্থাৎ জনগণের লিপি। তবে এই তিনটি বস্তুতপক্ষে একটি লিপিরই ঈষৎ রূপভেদমাত্র। আজ থেকে ৫০০০-৫৫০০ বছর আগে এই লিপি

মোটামুটিভাবে বিধিবদ্ধ রূপ পেয়ে গিয়েছিল অর্থাৎ তার একটা নিরূপিত চেহারা তৈরি হয়ে গিয়েছিল। কেউ-কেউ হায়েরোগ্লিফিক্স-কে চিত্রপ্রতীক বলেছেন।

৫.৩ অক্ষরলিপি ও ধ্বনিলিপি

চিত্রলিপি একসময় আর ভাবলিপিমাত্র থাকল না। লিপি ক্রমশ ভাষিক রূপকে দ্যোতিত করতে শুরু করল। চিত্রগুলি ভাষার শব্দকে বোঝাল। সেই শব্দ নিছক বস্তুকে না বুঝিয়ে বোঝাল বিমূর্ত বস্তু বা ভাবকেও। সূর্যের ছবিতে কেবল যে 'সূর্য' বোঝাল তা নয়, সূর্যের ছবি দিয়ে বোঝানো হল উজ্জ্বলতাকে, দিনের আলোকে। 'চাবুক' দিয়ে বোঝানো হল ক্ষমতাকে বা কর্তৃত্বকে। এর পর শব্দচিত্র ক্রমশ সাংকেতিক অর্থ বহন করল। একটি শব্দকে সম্পূর্ণভাবে না বুঝিয়ে কেবল তার আদ্যধ্বনিকে বোঝাল। একে acrology বলা হয়, বাংলায় বলব শীর্ষনির্দেশ। এইভাবে তৈরি হল syllabic script বা অক্ষরলিপি। একে syllabary-ও বলা হয়।

অক্ষরলিপির একটা উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত হল সাইপ্রাসের লিপি। খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ থেকে তৃতীয় শতকে এই লিপি সেখানে ব্যবহৃত হত। সাইপ্রাসের এই অক্ষরলিপির প্রথম পাঠোদ্ধার হয় উনিশ শতকে। সাইপ্রাসবাসীদের এই লিপির ভাষা মূলত গ্রিক। এবং উল্লেখযোগ্য যে, এই লিপি লেখা হত ডান দিকে থেকে বাঁদিকে।

এরপরে এল alphabetic script বা ধ্বনিলিপি। ধ্বনিলিপির বৈশিষ্ট্য এই যে, এতে স্বনিম বা ধ্বনিমূলের সঙ্গে বর্ণরূপমূলের (grapheme) প্রত্যক্ষ সম্পর্ক তৈরি হল। এর ফলে এই লিপি শুধু যে অল্প জায়গা নেয় তাই নয়, এই লিপি নানা ধরনের ভাষা লেখার উপযোগীও হয়ে উঠল। ধ্বনিলিপিতে হাজার হাজার শব্দলিপি বা logograph-এর দরকার হয় না। এতে মাত্র কয়েকটি বর্ণ-এককের (units) দরকার হয়। আর সেই কারণে বহু ভাষাই এ-ধরনের লিপিতে লেখা যায়। ধ্বনিলিপির দৃষ্টান্ত হল আর্মেনিয়ান, বর্মি, দেবনাগরী, ইথিয়োপীয়, কন্নড়, খ্‌মের, সিংহলি, তামিল, তেলুগু, তাই, তিব্বতি ইত্যাদি।

৫.৪ বর্ণমালা (alphabets)

যতদূর জানা যায়, সেমীয় ভাষা সমূহেই প্রথম বর্ণমালার উদ্ভব হয়েছিল। ১৭০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ নাগাদ এই বর্ণমালা ব্যবহৃত হয় পালেস্তাইন ও সিরিয়ায়। এতে ছিল বাইশটি বর্ণ। এই সেমীয় বর্ণমালার উপর ভিত্তি করেই বিকাশলাভ করেছিল হিব্রু, আরবি ও ফিনিশীয় বর্ণমালা। তারপর ১০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ নাগাদ গ্রিকরা ফিনিশীয় বর্ণমালার আদলে নিজেদের ভাষায় বর্ণমালা তৈরি করল। এত্রুস্কান (Etruscan) বর্ণমালা আবার গ্রিক বর্ণমালারই রূপভেদমাত্র। এ থেকেই এল রোমক বর্ণমালা এবং অন্যান্য ইয়োরোপীয় ভাষার বর্ণমালা।

লক্ষণীয় যে, গোড়ার দিকের বর্ণমালায় ছিল শুধুই ব্যাঞ্জনবর্ণ। স্বরবর্ণ এসেছে পরে। সেমীয় বর্ণমালায় ABC ছিল না, ছিল BCD অর্থাৎ তাতে শুধুই ব্যঞ্জনবর্ণ ছিল। গোড়ার দিকে তাই শব্দের মধ্যে স্বরধ্বনি থাকলেও ছিল না স্বরবর্ণ। এতে কী ধরনের অসুবিধে হত তা অনুমান করা শক্ত নয়। ধরা যাক plt শব্দটি। এর ভিতরের স্বরবর্ণগুলো অনুমান করে নিতে হত বলে শব্দটিতে plot, plate, pleat ইত্যাদি অনেককিছুই বোঝানো হতে পারত। কাজেই এক-একটি শব্দে নানান শব্দের ইঙ্গিত থাকা সম্ভব ছিল ওই ব্যঞ্জনবর্ণ-প্রধান বর্ণমালায়।

গ্রিকরা অবশ্য এই সমস্যার সমাধান করে নিয়েছিল। তারা যখন ফিনিশীয় বর্ণমালা নেয় তখন তারা তাতে স্বরবর্ণ যোগ করে নেয়। ভাষার ইতিহাসে, কিংবা বলা যায়, বর্ণমালার ইতিহাসে এই ঘটনাটির গুরুত্ব অপরিসীম। প্রাচীন সেমীয় বর্ণমালায় স্বরবর্ণ না থাকায় তাতে সহজ-সরল অনুশাসন লেখা বা পড়ায় অসুবিধে হত না, হয়তো ধর্মীয় আদেশ-নির্দেশ মোটামুটি লেখা বা পড়া হত, কিন্তু ওই বর্ণমালা ভাষার বা ব্যাকরণের নানান সূক্ষ্ম ব্যাপারের পক্ষে আদৌ উপযোগী ছিল না। স্বরবর্ণ ছাড়া তা সম্ভব নয়। গ্রিকদের বৈষয়িক ও লোকায়ত সাহিত্যের জন্য স্বরবর্ণ একান্তই প্রয়োজন ছিল। গ্রিকদের ছিল সাতটি স্বরবর্ণ। ইতালীয়রা গ্রিকদের কাছ থেকেই যদিও তাদের বর্ণমালা ধার করেছিল, তবে তারা গ্রিকদের বর্ণমালা থেকে দুটি স্বরবর্ণ ছাঁটাই করে। সেদুটি হল ইতা বা ইটা অর্থাৎ i এবং ওমেগা (o)।

৫.৫ রোমান বর্ণমালা

আধুনিক পৃথিবীতে সর্বাধিক প্রচলিত বর্ণমালাটি হল রোমান বা রোমক বর্ণমালা। আমরা আজ যে ইংরেজি বর্ণমালা বা তার graphemic form বা বর্ণরূপ দেখি তা-ই আসলে রোমান বর্ণমালা বা রোমান হরফ। রোমক বর্ণমালার উদ্ভব হয় খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম শতকে, এক্রস্কান বর্ণমালার আদলে। খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতকে রোমক বর্ণমালা পশ্চিম রোম সাম্রাজ্যের সর্বত্র ব্যবহৃত হতে থাকে। গোড়ায় রোমক বর্ণমালায় ছিল একুশটি বর্ণ, পরে দুটি নতুন বর্ণ (y ও z) যুক্ত হয়ে সংখ্যা দাঁড়ায় তেইশ।

বর্তমানে বহু ইয়োরোপীয় ভাষাতেই রোমান রীতির বর্ণমালা অল্পবিস্তর পরিবর্তনসহ প্রচলিত রয়েছে। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ইংরেজি, ফরাসি, জার্মান, ইতালীয়, স্পেনীয়, পোর্তুগিজ, চেখ ইত্যাদি। এমনকী, কিছু ভিন্নতা সত্ত্বেও ডেনীয়, সুইডিশ আর নরওয়েজীয় বর্ণমালাও মূলত রোমক বর্ণমালারই ঈষৎ রূপভেদ। রোমক বর্ণমালার জনপ্রিয়তা ও সুবিধা এতই বেশি যে, আরও বেশি ভাষা রোমক রীতিতে লেখার একটা ঝোঁক দেখা যাচ্ছে। চীনের বর্ণমালায় পিন-য়িন (pin-yin) পদ্ধতি প্রচলিত হওয়ায় চৈনিক বর্ণমালাও বড়োসড়ো প্রশ্নের সম্মুখীন হয়ে পড়েছে। এমনকী, আমাদের দেশ ভারতেও রয়েছে রোমক লিপি পরিষদ নামে একটি সংস্থা যা

দাবি করে আসছে যে, ভারতের প্রধান ভাষাগুলি রোমক বর্ণমালায় ও রোমকলিপিতে লেখা হোক। তাতে ভারতীয় ভাষার grapheme বা বর্ণরূপে একটা ঐক্য আসবে। অবশ্য এই দাবির বিরুদ্ধে জোরালো মত প্রকাশও করেন অন্যেরা, বিশেষত সাহিত্য অকাদেমি। সাহিত্য অকাদেমি ভারতের ২২টি ভাষার কোনোটির জন্যই রোমান লিপি বা রোমান বর্ণমালাকে স্বীকৃতি দেয় না। রোমক লিপি পরিষদের দাবি মেনে নিলে ভারতের ঐতিহ্যশালী দেশীয় লিপির উৎসাদন ঘটবে বলেই মনে করা হয়।

গ্রন্থপঞ্জি

১. ভট্টাচার্য, পার্বতীচরণ—বাংলা ভাষা, ১৯৮২
২. সেন, সুকুমার—ভাষার ইতিবৃত্ত, ১৯৯৪
৩. Bodmer, Frederick—The Loom of Language, 1944
৪. Crystal, David—The Cambridge Encyclopaedia of Language, 1997
৫. Fischer, S.R.—A History of Language, 2001
৬. Hockett, C.F.—A Course in Linguistics, 1958
৭. Taraporewala, I.J.S.—Elements of the Science of Language, 1978

৬. ভাষা পরিবার (Language Family)

৬.১ ভাষাপরিবারের কথা

ভাষার ইতিহাস সম্বন্ধে বিজ্ঞানসম্মত চর্চা শুরু হয়েছিল অষ্টাদশ শতকের শেষ দিকে। ১৭৮৬ সালে ব্রিটিশ প্রাচ্যবাদী পণ্ডিত উইলিয়াম জোনস কলকাতায় রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটির অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে যে-কথাগুলো বলেছিলেন তাকেই মনে করা হয় ভাষাপরিবার সম্বন্ধে যাবতীয় আধুনিক আলোচনার সূত্রপাতস্বরূপ। স্যার উইলিয়াম তাঁর বক্তৃতায় বলেন যে, সংস্কৃত, গ্রিক, লাতিন ও জার্মানিক গোষ্ঠীর ভাষাগুলির মধ্যে সন্দেহাতীত সাদৃশ্য রয়েছে। তাঁর এই কথাগুলি বহুশ্রুত বহুপঠিত এবং আধুনিক ভাষাতত্ত্বের ইতিহাসে এর প্রভাব গভীর ও সুদূরপ্রসারী। তাঁর কথাগুলি এইরকম— সংস্কৃত ভাষার প্রাচীনতা যা-ই হোক না কেন, এই ভাষাটির গঠন আশ্চর্যরকম সুন্দর। সংস্কৃতের রূপ গ্রিক ভাষার চেয়ে পূর্ণাঙ্গতর এবং লাতিনের তুলনায় সম্পন্নতর, তবু উভয়ের সঙ্গেই সংস্কৃতের রয়েছে 'a stronger affinity' এবং সেই কারণে একথা মনে করা যেতেই পারে যে, এই তিনটি ভাষাই এক অভিন্ন প্রত্নভাষা থেকে উদ্ভূত হয়েছে। আর সেইসঙ্গে একথাও মনে করা অসংগত নয় যে, গথিক ও কেলটিক বা কেলতীয় ভাষাসমূহও সংস্কৃতের মতো একই পরিবারভুক্ত এবং একই উৎস থেকে উদ্ভূত। একালে ভাষাবিজ্ঞানীদের মতে এভাবেই সূত্রপাত হয়েছিল ঐতিহাসিক ভাষাতত্ত্বের।

কিন্তু আজ একথা আর অজানা নয় যে, উইলিয়াম জোনসের অনেক আগে, সেই ষোড়শ শতকেই রোমান ক্যাথলিক মিশনারিরা সংস্কৃত এবং পশ্চিমি কোনো-কোনো ভাষার সাদৃশ্যের কথা বলেছিলেন। ষোড়শ শতকের শেষ দিকে ফিলিপ্পো সাস্‌সেত্তি (Filippo Sassetti) নামে জনৈক ইতালীয় ভারত থেকে স্বদেশে পাঠানো চিঠিতে সংস্কৃত (lingua Sanscruta) ভাষার সঙ্গে বহু ইতালীয় শব্দের বিস্ময়কর মিলের কথা লিখেছিলেন। পরে জার্মান পণ্ডিত শুলৎসে (B. Schulze) এবং ফরাসি লেখক পিয়ের ক্যরদু-ও (P.Coerdoux) একই মিল লক্ষ করেছেন। কিন্তু এঁদের এইসব মন্তব্য ততটা প্রচার পায়নি তখন। একথা আমরা জানতে পারছি রবিনস-এর (R.H. Robins) বিখ্যাত A Short History of Linguistics (1997) থেকে।

ঐতিহাসিক ভাষাতত্ত্বে তুলনাত্মক পদ্ধতিতে বিভিন্ন ভাষার মধ্যে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য খুঁটিয়ে দেখে ভাষাগুলির মধ্যে সম্পর্ক আবিষ্কারের চেষ্টা করা হয়। এই পদ্ধতিকে external reconstruction বা 'আন্তর পুনর্গঠন' বলা হয়। যেসমস্ত ভাষা এক অভিন্ন

প্রত্নভাষা থেকে উদ্ভূত, সেগুলিকে cognate language বা সমগোত্রজ ভাষা বলা হয়ে থাকে। ঐতিহাসিক-তুলনাত্মক পদ্ধতির গবেষণা ও অনুমানের ভিত্তিতে কল্পনা করা হয় যে, পৃথিবীর সমস্ত ভাষাই কয়েকটি আদি উৎস-ভাষা থেকে বিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান ভাষাগুলির ধ্বনি, রূপ ইত্যাদির পূর্বতন রূপ অনুমান করতে করতে অর্থাৎ পিছিয়ে যেতে যেতে সেইসব আদি উৎস-ভাষার কাছে পৌঁছোতে চেষ্টা করা হয়। এই পদ্ধতিতে উৎস-ভাষাগুলিকে কতকগুলি ভাষাবংশে বিন্যস্ত বা বিভক্ত করা হয়। তেমনই একটি আদি উৎস-ভাষা হল প্রত্ন-ইন্দোইয়োরোপীয় যার পরবর্তী রূপ ইন্দো-ইয়োরোপীয়। এই ভাষাবংশটি শুধু প্রাচীনতমই নয়, বৃহত্তমও। ইন্দো-ইয়োরোপীয় ভাষাবংশের অন্তর্গত প্রাচীন ভাষাগোষ্ঠীগুলির মধ্যে আছে গ্রিক, হিত্তীয় বা হিটাইট, ইন্দো-ইরানীয়, আলবেনীয়, ইটালিক, জার্মানিক, তোখারীয় প্রভৃতি। আজকের দিনে পৃথিবীর সুপরিচিত ভাষাগুলির মধ্যে অনেকগুলিই ইন্দো-ইয়োরোপীয় ভাষাবংশ থেকে এসেছে, যেমন—সংস্কৃত, গ্রিক, ইতালীয়, ফরাসি, ইংরেজি, জার্মান, বাংলা, হিন্দি ইত্যাদি, যদিও এইসব ভাষার অব্যবহিত ঊর্ধ্বতন উৎস হিসাবে নাম করতে হয় অন্য ভাষাগোষ্ঠীর। যেমন ফরাসি ইতালীয় ও স্পেনীয় ভাষা হল লাতিন থেকে উদ্ভূত রোমান্স গোষ্ঠীর ভাষা। ইংরেজি জার্মান ডেনীয় প্রভৃতি কয়েকটি ভাষা হল জার্মানিক বা টিউটনিক গোষ্ঠী থেকে উদ্ভূত। বাংলা আর হিন্দি এসেছে ইন্দো-এরিয়ান বা ভারতীয়-আর্য থেকে। লক্ষ করবার বিষয় এই যে, এই-যে রোমান্স ভাষাগোষ্ঠী বা জার্মানিক ভাষাগোষ্ঠী বা ভারতীয়-আর্য, এর প্রতিটিই ইন্দো-ইয়োরোপীয় ভাষাবংশের অন্তর্গত।

কিছুকাল আগে একদল পণ্ডিত ইন্দো-হিত্তীয় (Indo-Hittite) নামে একটি প্রত্ন-ভাষাগোষ্ঠীর কথা বলেছেন। তাঁদের মতে ইন্দো-ইয়োরোপীয় ভাষা পরিবার ওই ইন্দো-হিত্তীয় প্রত্ন-ভাষা থেকেই উদ্ভূত। এই বিষয়টি এখনও আনুমানিক, তবে সম্পূর্ণ বর্জিতও হয়নি। আমরা দু-তিনটি ছকের সাহায্যে আধুনিক ভাষাগুলির বংশাবলি দেখব। সেই ছক দেখলে ভাষাপরিবার এবং আধুনিক ভাষাগুলির বিবর্তন সম্বন্ধে পাঠক সহজেই একটা ধারণা তৈরি করে নিতে পারবেন।

এখানে আরও একটা কথা বলবার আছে। ইন্দো-ইয়োরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীকে ভাষাতাত্ত্বিকরা দুটি বড়ো ভাগে ভাগ করে দেখেন। সে-দুটি ভাগ হল কেন্তুম্ ও সতম্ অর্থাৎ Centum ও Satem ভাষাগুচ্ছ। যেসব ভাষার ক্-ধ্বনি কণ্ঠ্যধ্বনিই থেকে গেছে সেগুলিকে কেন্তুম্ গুচ্ছে রাখা হয়েছে, আর যেসব ভাষায় মূলের ক্-ধ্বনি শ্-বা স্ ধ্বনিতে পরিণত হয়েছে সেগুলিকে সতম্ গুচ্ছে রাখা হয়েছে। এই হিসেবে গ্রিক, জার্মানিক লাতিন প্রভৃতিকে বলা হবে কেন্তুম্ গুচ্ছের ভাষা, অন্য দিকে আলবেনীয়, বাল্‌তোস্লাভীয়, আর্মেনীয় প্রভৃতি ভাষাকে সতম্ গুচ্ছের অন্তর্গত বলা হবে। প্রধান ভাষাপরিবারগুলিকে এই অধ্যায়ের শেষে কয়েকটি ছক এঁকে দেখানো হয়েছে।

৬.২ ইন্দো-ইয়োরোপীয় ভাষাপরিবার

আগের পরিচ্ছেদে বলেছি যে, সমস্ত ভাষাপরিবারের মধ্যে Indo-European বা ইন্দো-ইয়োরোপীয়-ই বৃহত্তম। স্টিভেন ফিশার তাই বলেছেন 'Indo-European is Earth's superfamily—history's most successful—and includes all but a handful'. অর্থাৎ যতগুলি ভাষা এই পরিবারের মধ্যে রয়েছে তত আর কোনো ভাষাপরিবারের মধ্যে নেই। বস্তুতপক্ষে ইয়োরোপের পশ্চিম প্রান্ত থেকে পুবে ভারতভূখণ্ড পর্যন্ত কয়েক হাজার মাইল জুড়ে যেসব দেশ, তাদের প্রায় সবারই ভাষা ইন্দো-ইয়োরোপীয় পরিবারভুক্ত। এই ভাষা পরিবারের প্রাচীনতম নমুনা আজ থেকে অন্তত ৩৫০০ বছর আগেকার। গ্রিক, সংস্কৃত, হিত্তীয় প্রভৃতি প্রাচীন ভাষা এই ইন্দো-ইয়োরোপীয় পরিবারভুক্ত। ইন্দো-ইয়োরোপীয় পরিবারে আছে প্রধানত নয়টি ভাষাগোষ্ঠী—ক. গ্রিক, খ. ইতালীয় (Italic), গ. টিউটনিক, ঘ. কেলতীয় (Celtic), ঙ. তুখারীয়, চ. আলবেনীয়, ছ. বাল্‌তো-স্লাভীয়, জ. আরমেনীয়, ঝ. ইন্দো-ইরানীয় বা আর্য। এগুলির মধ্যে আবার আছে কয়েকটি উপগোষ্ঠী। লক্ষণীয় যে, তুখারীয় ভাষার কোনো শাখাভাষা বা বংশধর নেই। বলা যেতে পারে ওটি একটি লুপ্ত ভাষা।

গ্রিককে হেলেনিক বা হেলেনীয়-ও বলা হয়। গ্রিক-এর শাখা হিসেবে জানা যায় ডোরিক বা দোরিক (Doric), আইয়োনিক (Ionian) এবং অ্যাটিক বা আত্তিক (Attic)। ভাষাতাত্ত্বিকদের বিবেচনায় গ্রিক ভাষাই ইন্দো-ইয়োরোপীয় পরিবারের প্রাচীনতম ভাষা। ক্রিট (Crete) দ্বীপে যেসব প্রাচীন লিপি পাওয়া গেছে সেগুলি আজ থেকে অন্তত ৩৫০০ বছর আগে লিখিত হয়েছিল। মূল গ্রিক ভাষার দুটি রূপ—ধ্রুপদি বা ক্ল্যাসিকল ও আধুনিক গ্রিক। গ্রিসের প্রাচীন নাটক, কাব্য ও অন্যান্য যাবতীয় রচনা ক্ল্যাসিকল গ্রিকের দৃষ্টান্ত। ওই ভাষা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হয়ে রূপ লাভ করেছে আধুনিক গ্রিক (Modern Greek) ভাষায়।

জার্মানিক বা টিউটনিক (Teutonic) একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা। এই টিউটনিক শাখার প্রাচীনতম নিদর্শন পাওয়া যায় গথিক ভাষার মধ্যে। টিউটনিকের একটি উপশাখা হল উত্তর জার্মানিক বা উত্তর টিউটনিক। এই উপশাখা থেকেই কয়েকটি আধুনিক ভাষার সৃষ্টি হয়েছে, যেমন ডেনীয় (Danish), নরওয়েজীয়, আইসল্যান্ডীয় (Icelandic) ও সুইডিশ। অন্য দিকে পশ্চিম জার্মানিক শাখা থেকে সৃষ্টি হয়েছে ইংরেজি, জার্মান ও ডাচ ভাষার।

আনুমানিক ৫৫০০ বছর আগে কেলতীয় জাতি ইয়োরোপের পশ্চিম ও দক্ষিণ অংশে অভিবাসী হয়। তাদেরই ভাষা কেলতীয় (Celtic)। এই ভাষার তিনটি শাখার কথা জানা যায়—গলীয় (Gaulish), কেলতিবেরীয় (Celtiberian) ও গ্যালেশীয় (Galatian)। গলীয় ভাষা বলা হত পূর্ব গলে (বর্তমান ফ্রান্স), কেলতিবেরীয় প্রচলিত হয় স্পেনে, গ্যালেশীয় প্রচলিত হয় এশিয়া মাইনরে। কিন্তু অন্য দুটি ক্রমশ অচলিত হয়ে গেলেও গলীয় ভাষা ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জে প্রচলিত হয়। কেল্‌তীয় ভাষা আয়ারল্যান্ডে প্রচলিত হয়। পরে এই ভাষার রূপভেদ প্রচলিত হয় স্কটল্যান্ডে।

ইতালিক শাখার প্রধান ভাষা লাতিন। রোমান সাম্রাজ্যের প্রসারের ফলে লাতিনের গুরুত্ব বেড়ে যায়। ইতালিকে ছাড়িয়ে লাতিন ইয়োরোপের নানা দেশে ব্যাপ্ত হয়। লাতিন থেকেই এসেছে, ফরাসি, ইতালীয়, স্পেনীয়, পোর্তুগিজ, রুমানীয় ও কাতালান (Catalan)।

বালতো-স্লাভীয় (Balto-Slavic) শাখার অন্তর্গত প্রধান ভাষাগুলি হল লিথুয়ানীয়, বুলগারীয়, পোলিশ, চেক, স্লোভাক, রুশ, সার্বোক্রোট প্রভৃতি। এই শাখার অন্তর্গত প্রাচীন লেটিশ (Lettish) ভাষা এখন লুপ্ত। আলবেনীয় শাখার একটি বিকল্প নাম কোনো-কোনো ভাষাতাত্ত্বিক দিয়েছেন—ইলিরীয় (Illyrian)। এর অন্তর্গত ভাষাগুলির মধ্যে একমাত্র আলবেনীয় ভাষাই গুরুত্বপূর্ণ।

আর্মেনীয় (Armenian) ভাষা প্রচলিত কেবল আর্মেনীয় প্রজাতন্ত্রে। এই ভাষার প্রথম নিদর্শন পাওয়া গেছে খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতকে।

ইন্দো-ইয়োরোপীয় পরিবারের আর একটি শাখা ইন্দো-ইরানীয় বা আর্য। এই আর্য থেকে এল ভারতীয়-আর্য ভাষা, যার প্রাচীনতম নিদর্শন ঋগ্‌বেদ। সাধারণভাবে বেদের যুগের ভাষাকে বৈদিক ভাষা বলা হয়। বৈদিক সংস্কৃত তারই একটি রূপ। সংস্কৃত থেকে পালি ও প্রাকৃত হয়ে আধুনিক ভারতীয় ভাষাসমূহের উদ্ভব। এই বিষয়টি আমরা বিশদভাবে দেখব আমাদের বাংলাভাষার উৎসসন্ধানের প্রসঙ্গে (দ্র. ষোড়শ অধ্যায়)।

৬.৩ সেমীয় (Semitic) ভাষাপরিবার

ইন্দো-ইয়োরোপীয় ভাষাপরিবারের পর যে ভাষাপরিবারকে নিয়ে সবচেয়ে বেশি চর্চা করা হয়েছে, সেটি সেমীয় বা সেমিটিক ভাষাপরিবার। চর্চার কারণ এরই অন্তর্গত দুটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রাচীন ভাষা—আরবি ও হিব্রু। ইয়োরোপীয় পণ্ডিতদের সেমীয় ভাষা সম্পর্কে আগ্রহের আরও কারণ বাইবেল চর্চা। সেমীয় ভাষাপরিবারের তিনটি শাখা—ক. উত্তরপশ্চিম, খ. উত্তরপূর্ব, গ. দক্ষিণ-পশ্চিম। উত্তরপশ্চিম শাখার প্রধান ভাষা আক্কাদীয় (Akkadian), যার মধ্যে আছে ব্যাবিলনীয় ও আসিরীয় উপভাষা। খ্রিস্টজন্মের বহু বছর আগে থেকেই এই ভাষা মেসোপটেমিয়ায় প্রচলিত ছিল। উত্তরপূর্ব শাখায় অনেকগুলি ভাষা ছিল, যার মধ্যে কয়েকটি প্রচলিত ছিল ভূমধ্যসাগরের পূর্বাঞ্চলে। এই শাখার প্রধান ভাষা হিব্রু। খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতক নাগাদ মৌখিক ভাষা হিসাবে হিব্রু অচলিত হয়ে যায়, এবং পালেস্তাইনে হিব্রুর স্থান নেয় আরামাইক ভাষা। হিব্রু অবশ্য একটি ধ্রুপদি ভাষা হিসাবে আজও গুরুত্বপূর্ণ। সেমীয় ভাষার দক্ষিণপশ্চিম শাখার প্রধান ভাষা আরবি। এই ভাষার লিখিত নিদর্শন পাওয়া যায় খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতক থেকে।

৬.৪ হামীয়-সেমীয় (Hamito-Semitic)

আজকাল ভাষাবিদদের অনেকেই মনে করেন যে, সেমিটিক বা সেমীয় ভাষাগুলি একটা বৃহত্তর ভাষাগোষ্ঠীর শাখা। সেই গোষ্ঠীটি হল Hamito-Semitic বা যাকে বাংলায় আমরা

হামীয়-সেমীয় বলতে পারি। এই গোষ্ঠীর মধ্যে আছে চ্যাড (Chadic), কুশিতিক (Cushitic), মিশরীয়, বারবার (Berber) প্রভৃতি। উত্তর আফ্রিকার কোনো-কোনো অঞ্চলের আর সাহারার মরুপ্রদেশের ভাষা বারবার। কুশিতিকের মধ্যে আছে সোমালি ভাষা, বোগো (Bogo) ভাষা। চ্যাড হ্রদের দক্ষিণে ও পশ্চিমের প্রচলিত ভাষা চ্যাড। চ্যাডের শাখাভাষার মধ্যে সবচেয়ে পরিচিত হল হাউসা (Hausa) যা পশ্চিম আফ্রিকার বহু মানুষ শেখে দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে। এই ভাষাগোষ্ঠীর মিশরীয় শাখায় আছে প্রাচীন মিশরীয় আর কপ্‌টিক। কপ্‌টিক ভাষা আজও কপ্‌টিক চার্চের প্রার্থনাগীতিতে ব্যবহৃত হয়।

৬.৫ সুমেরীয় (Sumerian)

সেমিটিক ভাষা-অঞ্চলের একটি প্রাচীন ভাষা সুমেরীয়। আক্কাদীয় সভ্যতার বিকাশের অনেক আগে বিকাশলাভ করেছিল সুমেরীয় সভ্যতা। সুমেরীয় ভাষা আজও সমান আগ্রহ জাগায় ওই ভাষায় লেখা লিপি ও নথিপত্রের জন্য। সুমেরীয় ভাষা একাক্ষরী (monosyllabic)। এই ভাষার একটি বৈশিষ্ট্য হল সমোচ্চারিত ভিন্নার্থক শব্দের (homonyms) প্রচুরতা।

৬.৬ ফিনো-উগ্রিক (Finno-Ugric)

ইন্দো-ইয়োরোপীয় ভাষাপরিবারের বাইরে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ইয়োরোপীয় ভাষা আছে, যেমন হাঙ্গেরীয়, ফিনীয় বা ফিনিশ, এস্টোনীয় (Estonian) ইত্যাদি। এই ভাষাগুলি একত্রে ফিনো-উগ্রিক বা ফিনো-উগ্রীয় গোষ্ঠী নামে পরিচিত। এই গোষ্ঠীকে উরাল (Uralic) ভাষাগোষ্ঠীও বলা হয়। হাঙ্গেরির ভাষাকে একসময় মজর ভাষা বলা হত। হাঙ্গেরির বৃহত্তম জনগোষ্ঠীই ছিল মজর এবং তাদের ভাষার নামও মজর ভাষা (Magyar)। আধুনিক কালে অবশ্য হাঙ্গেরীয় ভাষাই বলা হয়। উরাল বা ফিনো-উগ্রিক গোষ্ঠীর মধ্যে এমন দু-চারটি ভাষাও আছে যেগুলি রাশিয়ার কোনো-কোনো অঞ্চলে প্রচলিত, যেমন—স্যামোয়েড (Samoyed), অব উগ্রিক (Ob Ugric) ইত্যাদি।

৬.৭ আলতাই (Altaic)

ইয়োরোপের দক্ষিণপূর্বাঞ্চলের এবং এশিয়া মাইনরের একটি বড়ো ভাষাগোষ্ঠী হল আলতাই (Altaic)। এই গোষ্ঠীর মধ্যে আছে তুর্ক, মোঙ্গল (Mongol), মাঞ্চু (Manchu) প্রভৃতি। এই গোষ্ঠীর মধ্যে একটি অতিপ্রচলিত ও অতিপরিচিত ভাষা হল তুর্কি ভাষা। তুর্কি ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্গত একটি অতিপ্রচলিত ভাষা হল ওসমানলি। এই পরিবারে কয়েকটি মধ্যএশীয় ভাষা আছে, যেমন উজবেক, কাজাখ ও কিরঘিজ। তুর্ক গুচ্ছের ভাষার প্রথম লিখিত নিদর্শন খ্রিস্টীয় সপ্তম শতকের। এ ছাড়া আছে মাঞ্চু ভাষা, যদিও এই ভাষার প্রচলন কম।

৬.৮ ককেশীয় (Caucasian)

রাশিয়ার অন্তর্গত পর্বতময় ককেশাস অঞ্চলে রয়েছে অনেকগুলি ভাষা। এর কোনোটি ইন্দো-ইয়োরোপীয় পরিবারের সদস্য (যেমন অসেটিক এবং আরমিনীয়) ; কোনোটি

আবার তুর্ক গোষ্ঠীর সদস্য। এই অঞ্চলের অন্য ভাষাগুলি হল সারক্যাসীয় (Circassian), জর্জিয়ান, মিনগ্রেলীয় (Mingralian) ইত্যাদি।

এশিয়ার অন্যান্য ভাষাপরিবার সমূহ

৬.৯ ভোট-চীনীয় (Sino-Tibetan)

পূর্ব এশিয়ার প্রধান ভাষা পরিবার হল ভোটচীনীয় (Sino-Tibetan)। এই পরিবারের দুটি শাখা আছে—ভোটবর্মি (Tibeto-Burman) ও চৈনিক (Sinitic)। ভোটবর্মি গোষ্ঠীতে আছে তিব্বতি ভোট ভাষা আর বর্মি ভাষা। তিব্বতি ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন পাওয়া গেছে সপ্তম শতকে। বর্মি ভাষার প্রথম লিখিত নিদর্শন একাদশ শতকের। এই গোষ্ঠীর মধ্যে কয়েকটি গৌণ ভাষাও আছে, যেমন লোলো (Lolo), কাচিন (Kachin)। Sinitic বা চৈনিক গোষ্ঠীর মধ্যে রয়েছে চীনের ভাষাসমূহ। যতদূর জানা যায় চীনা ভাষা লেখা হয়ে আসছে খ্রিস্টপূর্ব ত্রয়োদশ শতক থেকে। সেই প্রথম যুগে অবশ্য চিত্রলিপি দিয়ে লেখার কাজ শুরু হয়েছিল। প্রাচীন চীনা ভাষার তিনটি স্তরের কথা বলা হয়—প্রত্নচীনা (Old/Ancient Chinese), মধ্যযুগীয় চীনা (Middle Chinese) এবং প্রাচীন মান্দারিন।

আধুনিক চীনা ভাষাকে বরং মান্দারিন বলাই সংগত। বেজিং-কে কেন্দ্র করে যে মান্য ভাষারূপটি গড়ে উঠেছে সেটিই চীনের সরকারি ভাষা, আর তারই সাধারণ নাম চীনা ভাষা। সেই মান্য ভাষাই চীন ছাড়াও সিঙ্গাপুর ও তাইওয়ানেরও সরকারি ভাষা। চৈনিক ভাষাগোষ্ঠীর কতকগুলি শাখা বা উপভাষা আছে। সেগুলি হল কান্তনি বা ক্যান্টনি (Cantonese), হক্কিয়েন (Hokkien), কান-হাক্কা (Kan-Hakka), উ (Wu), ফুচৌ (Foochow), মিন (Min) এবং মান্দারিনের তিনটি উপভাষা। কান্তনি উপভাষা প্রচলিত কান্তন ও হংকংয়ে; মিন প্রচলিত ফুকিয়েন (Fukien) প্রদেশে ; উ উপভাষা প্রচলিত সাংহাইয়ে ; মান্দারিনের তিনটি উপভাষা প্রচলিত—উত্তরাঞ্চলীয়, দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় এবং দক্ষিণপূর্বাঞ্চলীয়। শেষেরটি প্রচলিত নানকিংয়ে।

ভোটবর্মি ও চৈনিক (Sinitic) ভাষাসমূহের বাইরে আরও একটি ভাষা আছে যাকে ভাষাতাত্ত্বিকরা ভোটচীনীয় ভাষাপরিবারের মধ্যে গণ্য করেন। সেটি হল ইয়েনিসেই অস্‌তিয়াক (Yenissei Ostyak)। এই ভাষাটি বলে মধ্য সাইবেরিয়ার ইয়েনিসেই নদীতীরবর্তী লোকেরা।

এই প্রসঙ্গে দুটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এশীয় ভাষার কথা বলা দরকার—জাপানি ও কোরীয়। জাপানি ভাষার কথা বলার আগে বলা দরকার আইনু বা Ainu-র কথা। জাপানের আদিম জনজাতির ভাষা আইনু। এটিকে জাপানের প্রাচীন দেশীয় ভাষাই বলা চলে। কিন্তু এর সঙ্গে জাপানি ভাষার তেমন সম্পর্ক নেই। তবে বিগত দু-তিন হাজার বছরে আইনু-তে জাপানির অনুপ্রবেশের ফলে আইনু কোণঠাসা হয়ে পড়েছে। আরও একটি ভাষা হল কোরীয়। জাপানি ও কোরীয় ভাষাকে কেউ-কেউ আলতাই পরিবারের সদস্য বলে মনে করলেও, সে সিদ্ধান্ত তর্কাতীত নয়।

৬.১০ তাই (Thai)

দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার একটি বড়ো ভাষা পরিবার হল তাই ভাষাপরিবার। তাইয়ের মধ্যে আছে তাই যার পুরোনো নাম সাইয়ামিজ় ভাষা, লাওসীয় ও দক্ষিণ চীনে প্রচলিত কতকগুলি ভাষা। একসময় তাই ভাষাকে ভোট-চীনীয় পরিবারের সদস্য বলে ভাবা হত। যে সাদৃশ্য দেখে এই সিদ্ধান্ত করা হয়েছিল, পরে দেখা গেছে সেসব সাদৃশ্যের কারণ আত্মীয়তা নয়, ভাষাঋণ। বর্তমানে তাইকে একটি পৃথক পরিবার বলে গণ্য করা হয়।

৬.১১ মোন-খ্‌মের (Mon-Khmer)

মোন-খ্‌মের দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ ভাষা পরিবার। এই পরিবারে আছে মোন, খ্‌মের, ভিয়েতনামীয়। এই ভাষাগুলির প্রচলন দুই ভিয়েতনামে, লাওসে, কম্বোডিয়ায়, মায়ানমারে (পূর্বতন ব্রহ্মদেশ) ও মালয়েশিয়ায়। মোন ভাষা বলে মায়ানমার ও তাইল্যান্ডের প্রায় সাত লক্ষ লোক, খ্‌মের বা কম্বোডীয় ভাষা বলে অন্তত সত্তর লক্ষ। এই ভাষাই কম্বোডিয়ার সরকারি ভাষা। ভিয়েতনামি প্রায় ছয় কোটি লোকের ভাষা। দুই ভিয়েতনাম এবং লাওস ও কম্বোডিয়ার প্রচলিত এই ভাষা।

৬.১২ দ্রাবিড়ীয় (Dravidian)

দ্রাবিড়ীয় দক্ষিণ ভারতের একটি স্বতন্ত্র পরিবার। একে প্রাক্-ইন্দোইয়োরোপীয় বলে মনে করা হয়। দ্রাবিড়ীয় পরিবারে আছে চারটি মূল ভাষা, অন্ধ্রপ্রদেশে তেলুগু ভাষা, তামিলনাড়ুতে তামিল ভাষা, কর্ণাটকে কন্নড় বা কানাড়ি ভাষা এবং কেরলে মালয়ালম ভাষা। এই চারটি প্রধান ভাষা যথেষ্ট সমৃদ্ধ ও উন্নত, প্রতিটিতেই উৎকৃষ্ট সাহিত্যসৃষ্টি হয়েছে। এগুলি ছাড়াও আছে কয়েকটি অপ্রধান ও অনতিউন্নত ভাষা। তারই একটি ব্রাহুই, যার প্রচলন বেলুচিস্তানের পার্বত্য অঞ্চলে। পূর্বভারতের রাজমহল পার্বত্য অঞ্চলের মাল্‌তো বা মালপাহাড়ি ভাষাও দ্রাবিড় পরিবারের ভাষা। গৌণ ভাষার মধ্যে আরও আছে কুর্গ অঞ্চলের কুড়গু ভাষা, কুর্গের কাছাকাছি অঞ্চলের আর একটি ভাষা টুলু। এছাড়া আছে খোঁড়, গোঁড়, ওরাওঁ, নীলগিরি অঞ্চলের টোডা।

৬.১৩ মালয়ি-পলিনেশীয় (Malayo-Polynesian)

দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার একটি বড়ো ভাষা-পরিবার মালয়ি-পলিনেশীয়। আফ্রিকার পূর্ব উপকূলে মালাগাসি প্রজাতন্ত্রের মালাগাসি ভাষা এই ভাষাপরিবারের সদস্য। মালাগাসি হল মালয়ি শাখার অন্তর্ভুক্ত ভাষা। এই শাখারই আর একটি সদস্য বাহাসা ইন্দোনেশিয়া। এছাড়া ইন্দোনেশিয়া দ্বীপপুঞ্জের কয়েকটি ভাষাও এই শাখার অন্তর্ভুক্ত, যেমন জাভানি (Javanese) ও সুদানি (Sudanese)। এ ছাড়া আছে মালয়েশিয়ার সরকারি ও প্রধান ভাষা মালয়ি। ফিলিপিন দ্বীপপুঞ্জের তাগালোগ (Tagalog) ভাষাও এই শাখার অন্তর্ভুক্ত।

গ্রিক poly (বহু) এবং nēsos (দ্বীপ)—এ থেকেই Polynesian নাম হয়েছে। পলিনেশীয় শাখাটি বহু প্রাচীন। এই শাখার ভাষাগুলি আশ্চর্যরকমের রক্ষণশীল অর্থাৎ

পরিবর্তন-বিমুখ। এই শাখার ভাষার স্বরধ্বনি, শব্দভাণ্ডার ও ব্যাকরণ প্রায় ৩৫০০ বছর ধরে অপরিবর্তিত রয়েছে। এবং একমাত্র ব্যঞ্জনবিকার (consonant shift) ছাড়া বলতে গেলে এই ভাষায় কোনো পরিবর্তনই হয়নি। পলিনেশীয় শাখায় রয়েছে ৩৬টি ভাষা। এই ভাষাগুলি ব্যবহৃত হয় পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরের সলোমন দ্বীপপুঞ্জ থেকে দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরের ইস্টার দ্বীপ পর্যন্ত অঞ্চলে।

৬.১৪ অস্ট্রেলীয়-পাপুয়ান (Australian-Papuan)

অস্ট্রেলিয়ার সব ভাষাই অস্ট্রেলীয় পরিবারের অন্তর্ভুক্ত। ১৭৮৮ সালে অস্ট্রেলিয়ায় ব্রিটিশ অভিযানের সময় অস্ট্রেলিয়ায় ২৬০টি ভাষা ছিল। তারপর থেকে ১০০টি ভাষা লুপ্ত হয়েছে, আরও ১০০টি বিলুপ্তির পথে। অস্ট্রেলিয়ার দক্ষিণে টাজ়মেনিয়া (Tasmania) দ্বীপবাসী জাতি নিজেদের অস্ট্রেলীয়দের থেকে পৃথক জাতি বলে মনে করত এবং তাদের ভাষার স্বাতন্ত্র্যও বজায় রাখতে সচেষ্ট ছিল। টাজ়মেনিয়ায় দুটি স্বতন্ত্র ভাষা ছিল উত্তরের ও দক্ষিণের। দুটিই অস্ট্রেলিয়ার ভূখণ্ডের ভাষাসমূহ থেকে পৃথক ছিল। এই পরিবারের একটি শাখা হল পাপুয়া নিউগিনির ভাষা, পাপুয়ার ভাষাগুলিকে সাধারণভাবে পাপুয়ান বলা হলেও সেই ভাষাগুলির মধ্যে কিছু পার্থক্য লক্ষ করা যায়।

আফ্রিকার ভাষাসমূহ

৬.১৫ নাইজার-কঙ্গো ও খইসান (Niger-Congo and Khoisan)

আগে ৬.৪ পরিচ্ছেদে যে হামীয়-সেমীয় পরিবারের কথা বলা হয়েছে, তার বাইরেও আছে আফ্রিকার কিছু ভাষা যেগুলিকে ভাষতাত্ত্বিকরা নাইজার-কঙ্গো ও খইসান পরিবারভুক্ত বলে চিহ্নিত করেছেন। আফ্রিকার এই ভাষাগুলি সম্বন্ধে অনুসন্ধান করে তাদের শ্রেণিবিভাগ করার কাজটি সম্পন্ন হয়েছে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে। কেউ-কেউ নাইজার-কঙ্গোর পরিবর্তে নাইলো-সাহারান (Nilo-Saharan) পরিবার নামটি সংগততর বলে মনে করেন। এর অর্থ খুবই স্পষ্ট। নীল নদ এবং সাহারা মরুভূমি জুড়ে আফ্রিকার যে অঞ্চল, সেই অঞ্চলের ভাষাগুলিকে নিয়েই এই ভাষাপরিবার। এই পরিবারে আছে ১১টি উপশাখা। এর মধ্যে আছে পশ্চিম আটলান্টিক, কোয়া (Kwa), বেনু-কঙ্গো (Benue-Congo) প্রভৃতি। পশ্চিম আটলান্টিক গোষ্ঠীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ভাষা হল সেনেগালের উওলোফ (Wolof) ভাষা এবং নাইজেরিয়ার ফুলানি (Fulani) ভাষা। কোয়া গোষ্ঠীর মধ্যে আছে ঘানার প্রধান ভাষা গা (Ga), ইয়োরুবা (Yoruba), ইগ্‌বো (Igbo) এবং ইউয়ে (Ewe) প্রভৃতি। এছাড়া আলাদা গোষ্ঠী হিসেবে আছে বান্টু ভাষাসমূহ যার মধ্যে আছে জুলু ভাষাও। মূলত আফ্রিকার দক্ষিণাঞ্চলেরই ভাষা খইসান। খইসান গোষ্ঠীর অন্তর্গত ভাষা হল হটেনটট, বুশম্যান। আফ্রিকার ভাষাগুলির মধ্যে শ্রেণি নির্ণয় করা যায়নি এমন কয়েকটি ভাষাও আছে যেমন, টোগোর আন্‌লো (Anlo), নাইজেরিয়ার বেতে (Bete), মরিটানিয়ার ইমেরাগুয়েন (Imeraguen) ইত্যাদি।

উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার ভাষাসমূহ

৬.১৬ উত্তর আমেরিকার ইন্ডিয়ান (North Amerindian)

ইংরেজি, স্পেনীয়, পর্তুগিজ ও ফরাসি ভাষা আমেরিকায় প্রচলিত হবার আগে পশ্চিম গোলার্ধের প্রাচীন অধিবাসীরা যেসব দেশীয় ভাষায় কথা বলত সেগুলির নামকরণ হয়েছে ভৌগোলিক নাম অনুসারে। সাধারণভাবে এগুলিকে আমেরিকান ইন্ডিয়ান ভাষা বা আমেরিন্ডিয়ান ভাষা বলা হয়। তার মধ্যে কতকগুলি বিলুপ্ত হয়ে গেছে। অন্য কতকগুলির কথা জানা গেছে পর্যটক ও মিশনারিদের বিবরণ থেকে। কিন্তু আধুনিক ইয়োরোপীয় ভাষাগুলির চাপে সেসব ভাষা ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ছে। নব্য প্রজন্ম দেশীয় ভাষার বদলে ইয়োরোপীয় ভাষা শিখে নেয়। ফলে পিতামাতা বা বয়স্কদের মতো দেশীয় ভাষায় দক্ষতা তারা অর্জন করে না।

এইসব ভাষার মধ্যে আছে এস্কিমো-অ্যালিউট (Eskimo-Aleut) ও আথাবাস্কান পরিবার। আলাস্কা, ক্যানাডা ও গ্রিনল্যান্ডে এবং তৎসহ সাইবেরিয়ার প্রান্তে প্রচলিত ভাষাগুলি এস্কিমো-অ্যালিউন্ট পরিবারভুক্ত। তারই দক্ষিণাঞ্চলে প্রচলিত আছে আথাবাস্কান (Athabascan) পরিবারের ভাষা। আথাবাস্কানের একটি শাখার নাম আপাচিয়ান (Apachean)। ক্যানাডার মধ্যভাগ এবং উত্তর আমেরিকার পূর্বাঞ্চলের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভাষাপরিবার হল আলগনকিয়ান (Algonquian)। এরই শাখাগুলি হল মিকম্যাক (Micmac), আবনাকি (Abnaki) ইত্যাদি। সাম্প্রতিক গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে, আলগনকিয়ানের চেয়েও বড়ো একটি ভাষাপরিবার আছে। বস্তুতপক্ষে, আলগনকিয়ান তারই শাখাপরিবার। সেটি হল আলজিক (Algic)।

উত্তর আমেরিকার আরও দুটি পরিবার হল ইরোকুইয়ান (Iroquoian) এবং মাস্কোজিয়ান (Muskogean)। আরও আছে সাইউয়ান (Siouan) এবং উতো-আজ়তেকীয় (Uto-Aztecan) পরিবার। এই পরিবারগুলির অন্তর্ভুক্ত গুরুত্বপূর্ণ ভাষা হল ডাকোটা, ক্রো (Crow), হোপি (Hopi)। মেক্সিকোর দুটি বিশিষ্ট ভাষাপরিবার হল নাউয়াত্‌ল্ (Nahuatl) ও মায়া।

৬.১৭ দক্ষিণ আমেরিকার ভাষাসমূহ (South Amerindian)

দক্ষিণ আমেরিকার ভাষা নিয়ে তুলনামূলকভাবে গবেষণা ও আলোচনা কম হয়েছে। দক্ষিণ আমেরিকায় পাঁচাত্তরটি ভাষাপরিবার আছে বলে মনে করা হয়। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি হল আরাওয়াক (Arawak), ক্যারিব (Carib), কোয়েচুয়া (Quechua), তুপি-গুয়ারানি (Tupi-Guarani)। কোয়েচুয়া পেরুর ভাষাপরিবার। ইনকা ভাষা এরই অন্তর্ভুক্ত। তুপি-গুয়ারানি ভাষার প্রচলন ব্রাজিলে এবং পারাগুয়েতে। এ ছাড়া আছে চিব্‌চান (Chibchan), মাইপুরীয় (Maipurean), তাকানান (Tacanan) ইত্যাদি।

ভাষা পরিবার

ছক : ১

ইন্দো-হিত্তীয় (Indo-Hittite)
- ইন্দো ইয়োরোপীয়
- আনাতোলীয় বা হিত্তীয়

ছক : ২

ইন্দো-ইয়োরোপীয় (Indo-European)
- কেন্তুম্ ভাষাগুচ্ছ
  - গ্রিক
  - লাতিন/ইতালিক
  - কেল্তীয়/(Celtic)
  - টিউটনিক/জার্মানিক
- শতম্ ভাষাগুচ্ছ
  - বাল্তো-স্লাভ
  - আলবেনীয়
  - আরমেনীয়
  - ইন্দো ইরানীয় (আর্য)
    - দরদীয় (Dardic)
    - ইরানীয়
    - ভারতীয় আর্য

ছক : ৩

টিউটনিক/জার্মানিক
- ইংরেজি
- জার্মান
- ডেনীয়
- নর্স (নরওয়েজীয়)
- আইসল্যান্ডীয়
- সুইডিশ
- ডাচ (হল্যান্ডীয়)

ছক : ৪

লাতিন /ইতালিক
- ফরাসি
- ইতালীয়
- স্পেনীয়
- পোর্তুগিজ
- রোমানীয়

গ্রন্থপঞ্জি

১. সেন, সুকুমার—ভাষার ইতিবৃত্ত (১৯৯৪)
২. Arlotto, Anthony—Introduction to Historical Linguistics (1972)
৩. Barber, C.L.—The Story of Language (1975)
৪. Fischer, S.R.—A History of Language (2001)
৫. Matthews, P.H.—Linguistics : A Very Short Introduction (2003)
৬. Robins, R.H.—A Short History of Linguistics (1997)
৭. Taraporewala, IJS—Elements of the Science of Language (1978)

৭. ধ্বনিতত্ত্ব (Phonetics)

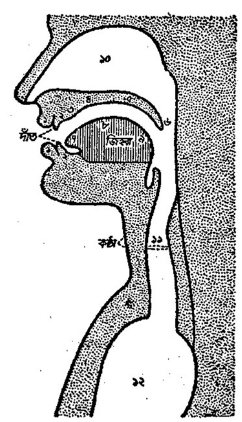
৭.১ ধ্বনি ও বাগ্‌ধ্বনি (sound and speech sound)

ধ্বনি (sound) বলতে সাধারণত বায়ুবাহিত যেকোনো আওয়াজকেই বোঝাতে পারে। ধ্বনির প্রধান বৈশিষ্ট্য হল শ্রুতিগোচরতা। ধ্বনি উৎপন্ন হলে তা কেউ শুনতে পাবে। কিন্তু আমরা ভাষায় যে-ধ্বনির কথা বলি তা যেকোনো আওয়াজ নয়, তা হল বাগ্‌ধ্বনি যার ইংরেজি নাম speech sound. তাহলে জেনে নিতে হবে কাকে বলে বাগ্‌ধ্বনি। আমরা কণ্ঠের অন্তর্গত বাগ্‌যন্ত্র বা স্বরযন্ত্র অর্থাৎ ওষ্ঠ, জিহ্বা, তালু, মূর্ধা ইত্যাদি দিয়ে যে সমস্ত ধ্বনি উচ্চারণ করি সেগুলিই বাগ্‌ধ্বনি। অর্থাৎ সংক্ষেপে বলা যায়, ভাষায় ব্যবহৃত ধ্বনিই বাগ্‌ধ্বনি। বাগ্‌ধ্বনির সমবায়েই তৈরি হয় শব্দ। সহজ উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি বোঝানো যায়। প্রথমে ইংরেজি speech sound দেখব। ইংরেজিতে k, ei, m এই তিনটি ধ্বনি বা বাগ্‌ধ্বনি জুড়ে তৈরি হয়েছে came (এসেছিল) শব্দটি। বানানে c থাকলেও ধ্বনিটি হল /k/, বানানে যা a, উচ্চারণে তা হল ei, এবং m, came এর উচ্চারণ হল *'keim'* এবার দেখব বাংলার দৃষ্টান্ত। 'শ্রেষ্ঠ' শব্দে কী কী বাগ্‌ধ্বনি আছে? শব্দটির ধ্বনি বিশ্লেষণ করলে এই কটি ধ্বনি বা বাগ্‌ধ্বনি পাওয়া যাবে—স + র্ + এ + শ্ + ঠ্ + ও। লক্ষ করতে হবে যে, 'শ্রেষ্ঠ' শব্দের শেষ যুক্তবর্ণে যে নিহিত ধ্বনি আছে সেটি আমাদের উচ্চারণে অ নয়, ও।

৭.২ বাগ্‌যন্ত্র (speech organ)

উপরে বলেছি যে, বাগ্‌ধ্বনি উৎপন্ন হয় আমাদের বাগ্‌যন্ত্র থেকে। তাহলে দেখে নেওয়া দরকার আমাদের বাগ্‌যন্ত্রটি কেমন, কী কী তার যন্ত্রাংশ এবং সেগুলি কী কাজ করে।

১ — ঠোঁট
২ — দাঁতের পাটি
৩ — দন্তমূল
৪ — অগ্রতালু, কঠিনতালু
৫ — পশ্চাত্তালু, কোমলতালু
৬ — আলজিভ
৭ — জিহ্বাগ্র
৮ — সম্মুখ জিহ্বা
৯ — পশ্চাদ্‌জিহ্বা
১০ — নাসা-গহ্বর
১১ — স্বরপল্লব/স্বরতন্ত্রী
১২ — ফুসফুস



এই চিত্রটি দেখলেই আমাদের বাগ্‌যন্ত্র সম্বন্ধে একটা ধারণা হবে পাঠকের।

৭.২.১ স্বরতন্ত্রী বা স্বরপল্লব (vocal cords)

ফুসফুস থেকে নির্গত শ্বাসবায়ু windpipe বা বায়ুনালি দিয়ে প্রথমেই ল্যারিংস বা স্বরযন্ত্রে আসে। ল্যারিংসে আছে দুটি পাতলা ঝিল্লি। সমান্তরালভাবে থাকা সে দুটি ঝিল্লি দরকার মতো খুলে যায় আর বন্ধ হয়। একেই বলে স্বরতন্ত্রী বা স্বরপল্লব। এই স্বরতন্ত্রী দুটি যখন জোরে বন্ধ করে দেওয়া হয়, তখন তাদের ভিতর দিয়ে বায়ু চলাচল করতে পারে না। বন্ধ অবস্থা থেকে হঠাৎ স্বরতন্ত্রী খুলে ফেললে আটকে থাকা বায়ু জোরে বেরিয়ে আসে এবং একটা কাশির মতো আওয়াজ ওঠে। এভাবে বায়ু আটকে রেখে হঠাৎ খুলে দিলে যে-ধ্বনি উৎপন্ন হয় তাকে glottal stop বা কণ্ঠনালীয় স্পৃষ্টধ্বনি বলে। আবার কখনো-কখনো স্বরতন্ত্রীদুটি খুলে রাখা হয় যাতে বায়ু সহজেই তার ভিতর দিয়ে যেতে পারে এবং কোনো কম্পন ছাড়াই। এভাবে যে ধ্বনি উৎপন্ন হয় তাকে বলা হয় voiceless বা অঘোষ ধ্বনি। আবার স্বরতন্ত্রী বা স্বরপল্লবে বায়ু ঈষৎ বাধা পাবার ফলে কম্পন সৃষ্টি হলে যে-ধ্বনি উৎপন্ন হয় তাকে বলে ঘোষ বা সঘোষ (voiced) ধ্বনি। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, আমাদের স্বরযন্ত্রে এই উপাঙ্গটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

৭.২.২ তালু (the palate)

তালুর দুটি অংশ। সামনের অংশ কঠিন তালু, পিছনের অংশ কোমল তালু। কঠিন তালুকে অগ্রতালু এবং কোমল তালুকে পশ্চাত্তালুও বলা হয়। তালুর কোমল অংশ বা পশ্চাত্তালুকে উপরে তোলা এবং নীচে নামানো যায়। পশ্চাত্তালুকে নীচে নামিয়ে নাসিক্য ধ্বনি উচ্চারণ করা হয়। আর পাশ্চাত্তালুকে উপরে তুললে বায়ু কেবল মুখ দিয়ে নির্গত হবে, নাক দিয়ে নয়। তালুর আরও একটা কাজ আছে। জিহ্বাকে তালুতে—তালুর সামনের অংশে বা পিছনের অংশে—ঠেকিয়ে নানান ধ্বনি উচ্চারণ করা হয়।

৭.২.৩ দন্ত, দাঁত (the teeth)

দুই পাটির দাঁতের মধ্যে ধ্বনি উচ্চারণের ক্ষেত্রে উপরের পাটির সামনের অংশ বেশি গুরুত্বপূর্ণ। জিহ্বার ডগা উপরের পাটির দাঁতে ঠেকিয়ে ধ্বনি উচ্চারণ করা হয়, আবার দাঁতের গোড়ায়ও জিহ্বাগ্র ঠেকিয়ে ধ্বনি উচ্চারণ করা হয়। প্রথম শ্রেণির ধ্বনিকে দন্ত্য ধ্বনি (dental) এবং দ্বিতীয় শ্রেণির ধ্বনিকে দন্তমূলীয় (alveolar) ধ্বনি বলা হয়।

৭.২.৪ জিহ্বা (the tongue)

বাগ্‌যন্ত্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল জিহ্বা। তালুর যেমন দুটি ভাগ আছে, কঠিন ও কোমল বা অগ্রতালু ও পশ্চাত্তালু, তেমনি জিভের চারটি ভাগ ভেবে নেওয়া হয়। সেগুলি হল tip বা জিহ্বাগ্র, blade বা জিহ্বাফলক, front বা সম্মুখ এবং back বা পশ্চাৎ। বিভিন্ন ব্যঞ্জনধ্বনি ও স্বরধ্বনি উচ্চারণে জিভের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

জিভের ডগা বা জিহ্বাগ্র দাঁতে বা দন্তমূলে ঠেকালে যেমন দন্ত্য (dental) বা দন্তমূলীয় (alveolar) ধ্বনি উৎপন্ন হয়, তেমনি ওই জিহ্বাগ্র (tip বা apex of the tongue) কঠিন তালুতে (hard palate) ঠেকালে মূর্ধন্য বা প্রতিবেষ্টিত (retroflex বা cerebral) ধ্বনি উৎপন্ন হয়।

আবার স্বরধ্বনির উচ্চারণেও জিভের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। জিভ যখন উপরে ওঠে তখন যে-স্বরধ্বনি উৎপন্ন হয় তাকে high vowel বা ঊর্ধ্ব স্বরধ্বনি বলে। তেমনি জিভ নীচে থাকলে যে-স্বরধ্বনি উৎপন্ন হয় তাকে low vowel বা নিম্ন স্বরধ্বনি বলে। আরও আছে নিম্নমধ্য (lowmid vowel) ও উচ্চমধ্য (highmid vowel) স্বরধ্বনি। এ ছাড়া জিভ কখনো সামনে এগিয়ে আসে কখনো আবার পিছিয়ে যায়। তখন উৎপন্ন হয় যথাক্রমে front vowel বা সম্মুখ স্বরধ্বনি এবং back vowel বা পশ্চাৎ স্বরধ্বনি।

৭.২.৫ ওষ্ঠদ্বয় (the lips)

বাগ্‌যন্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ অংশ আমাদের ঠোঁট দুটিও। সংস্কৃতে উপরের ঠোঁটকে ওষ্ঠ এবং নীচের ঠোঁটকে অধর বলা হলেও আমরা দুটিকেই ঠোঁট বা ওষ্ঠ বলব—নীচের ঠোঁট, উপরের ঠোঁট। ঠোঁটদুটি কথা বলার সময় বিভিন্ন অবস্থানে থাকে। যেমন p, m, b, বা প্, ম্, ব্ উচ্চারণের সময় দুটি ঠোঁট বন্ধ করতে হয়। আবার স্বরধ্বনি উচ্চারণের সময় এবং বাকি সব ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণের সময় ঠোঁটদুটি ফাঁক হয়ে থাকে। ইংরেজি f ও v উচ্চারণের সময় নীচের ঠোঁট একটু ভিতরে চলে আসে এবং কিছুটা উপরে উঠে উপরপাটি দাঁতের সম্মুখভাগ স্পর্শ করে। কিন্তু বাংলায় তা হয় না। এইজন্য ইংরেজি f ও v কে denti-labial বা দন্তৌষ্ঠ্য ধ্বনি বলা হয়, অন্য দিকে বাংলায় ফ ও ভ-কে শুধুই ঠোঁট বন্ধ রেখে উচ্চারণ করা হয় বলে এদের বলা হয় labial sound বা ওষ্ঠ্য ধ্বনি।

৭.৩ ব্যঞ্জনধ্বনি (consonants)

ফুসফুস থেকে শ্বাসবায়ু বেরিয়ে আসার সময় গলনালি, মুখগহ্বর, ঠোঁট ইত্যাদিতে বাধা পেলে যে-ধ্বনি উৎপন্ন হয় তাকেই বলা হয় ব্যঞ্জনধ্বনি। ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণে উচ্চারণস্থানে বাধা পাওয়াটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সাধারণভাবে, এমন একটা ধারণা প্রচলিত আছে যে, যে-ধ্বনি স্বরধ্বনির সাহায্য ব্যতিরেকে উচ্চারিত হতে পারে না, তা-ই ব্যঞ্জনধ্বনি। এ-ধারণা সঠিক নয়। একথা ঠিক যে, অধিকাংশ ব্যঞ্জনধ্বনিকে আমরা যখন শ্রুতিগ্রাহ্যভাবে উচ্চারণ করি, তখন তার সঙ্গে থাকে একটা নিহিত স্বর। যখন বলি 'ক' তখন আসলে তা ক্ + অ। কিন্তু সব ব্যঞ্জনধ্বনিই যে স্বরধ্বনির সাহায্যে উচ্চারিত হয়, তা নয়। শ্লেষ শব্দের উচ্চারণ স্ + ল্ + এ্ + শ্। এখানে স্ ল্ শ্ এই তিনটি ব্যঞ্জনের উচ্চারণে স্বরধ্বনির সাহায্য লাগছে না।

যখন আমরা বলি ব্যঞ্জন তখন ব্যঞ্জনধ্বনি আর ব্যঞ্জনবর্ণের মধ্যে পার্থক্য মনে রাখতে হবে। ইংরেজিতে consonant letter ছাব্বিশটি। কিন্তু consonant sound চব্বিশটি।

C ও Q এ-দুটি বর্ণের পৃথক ধ্বনি নেই। বাংলায় ব্যঞ্জনবর্ণ আছে ৩৫টি, কিন্তু ব্যঞ্জনধ্বনির সংখ্যা ৩০। কারণ ঞ, ণ, য, ষ, ৎ এগুলির পৃথক উচ্চারণ নেই, এগুলি যথাক্রমে ন্, ন্, জ্, শ্, ত্-এর মতো।

৭.৪ উচ্চারণস্থান অনুযায়ী ব্যঞ্জনধ্বনির শ্রেণিবিভাগ

উপরে আমরা বাগ্‌যন্ত্র সম্বন্ধে আলোচনা করেছি। এই বাগ্‌যন্ত্রের বিভিন্ন অংশ থেকে বিভিন্ন ধ্বনি উৎপন্ন বা উচ্চারিত হয়। উচ্চারণের উৎসস্থানকেই উচ্চারণস্থান (place of articulation) বলা হয়। আমরা দেখব উচ্চারণস্থান অনুযায়ী ব্যঞ্জনধ্বনির ভাগ।

১. **কণ্ঠ্যব্যঞ্জন (velar consonants বা velars)**

   ক্ খ্ গ্ ঘ্ ঙ্ এই পাঁচটি বাংলা ব্যঞ্জনধ্বনি velum বা soft palate অর্থাৎ 'কণ্ঠ' বা কোমল তালু থেকে উৎপন্ন হয়। কোমল তালুতে জিহ্বার পশ্চাদ্ভাগ ঠেকিয়ে এই ধ্বনিগুলি উচ্চারিত হয়। ইংরেজি ভাষার /k/, /g/, /ŋ/ ধ্বনিও কণ্ঠ্যধ্বনি। কেউ-কেউ কণ্ঠ্যব্যঞ্জন (velars) এবং কণ্ঠনালীয় ব্যঞ্জনকে (gutterals) অভিন্ন বলে মনে করেন। কিন্তু velar আর gutteral এক নয়। সেকথা পরে বলা হবে।

২. **তালব্য ব্যঞ্জন (palatals)**

   জিহ্বার প্রসারিত সম্মুখভাগ কঠিন তালুতে অর্থাৎ অগ্রতালুতে স্পর্শ করিয়ে যেসব ধ্বনি উচ্চারিত হয় তাদের বলা হয় palatal sound বা তালব্য ধ্বনি। বাংলাভাষার চ্ ছ্ জ্ ঝ্ শ্ এই পাঁচটি হল তালব্য ব্যঞ্জনধ্বনি। ইংরেজি ভাষায় / j / বা ইয়্ একটি palatal sound; yes শব্দের y-তে এই ব্যঞ্জনটি পাওয়া যায়।

৩. **মূর্ধন্য ব্যঞ্জন (cerebral বা retroflex)**

   জিহ্বার ডগা বা অগ্রভাগ (tip) কিছুটা প্রতিবর্তিত হয়ে বা উলটে একটু পিছন দিকে ঘুরে গিয়ে তালুর উপরদিক (roof of the palate) স্পর্শ করলে যে-ধ্বনি উৎপন্ন হয় তাকে মূর্ধন্য ধ্বনি বলে। বাংলায় ট্ ঠ্ ড্ ঢ্ ড়্ ঢ়্ এই ছয়টি মূর্ধন্য ব্যঞ্জন। ণ-এর নাম মূর্ধন্য-ণ হলেও এর উচ্চারণ দন্ত্য ন-এরই মতো। কাজেই ণ-কে মূর্ধন্য ধ্বনি বলা হবে না।

৪. **দন্ত্য ব্যঞ্জন (dentals)**

   জিহ্বার আগা বা অগ্রভাগ উপরপাটির দাঁতের পিছনে ঠেকিয়ে দন্ত্য ধ্বনি উচ্চারিত হয়। বাংলায় ত্ থ্ দ্ ধ্ এই চারটিই প্রকৃত দন্ত্য ব্যঞ্জন। দন্ত্য ন নামে দন্ত্য ধ্বনি হলেও প্রকৃতপক্ষে ওটি একটি দন্তমূলীয় ধ্বনি।

৫. **দন্তমূলীয় ব্যঞ্জন (alveolars)**

   জিহ্বার অগ্রভাগ উপরপাটি দাঁতের পিছনে মূলদেশে ঠেকিয়ে যে-ধ্বনি উচ্চারিত হয় তাকেই বলা হয় দন্তমূলীয় ব্যঞ্জন। মস্ত, বিস্তর, ইসলাম প্রভৃতি শব্দের স্ একটি

দন্তমূলীয় ব্যঞ্জন। ইংরেজি ভাষায় /s/, /t/, /θ/ অর্থাৎ thunder-এর th, /δ/ অর্থাৎ this-এর th এগুলি দন্তমূলীয় বা alveolar ধ্বনি। এদের প্রত্যেকটিই উপরপাটির পিছনে দাঁতের গোড়ায় জিভ ঠেকিয়ে উচ্চারিত।

৬. **ওষ্ঠ্য ব্যঞ্জন (labials)**
দুটি ঠোঁট পরস্পর বন্ধ করে ভিতরের শ্বাসবায়ুকে অবরুদ্ধ করে পরে ঠোঁটদুটি মুক্ত করে যে-ধ্বনি উচ্চারিত হয়, তা-ই ওষ্ঠ্য ধ্বনি বা ওষ্ঠ্য ব্যঞ্জন। বাংলায় প্ ফ্ ব্ ভ্ ম্ এই পাঁচটি ওষ্ঠ্য ধ্বনি। ইংরেজি ভাষায় /p/, /b/, /m/ এই তিনটি labial বা ওষ্ঠ্য ব্যঞ্জন। ইংরেজিতে এদের bilabial-ও বলা হয়। ইংরেজিতে ফ্ বা ph এবং ভ্ বা bh ওষ্ঠ্য ধ্বনি নয়। ও-দুটি দন্তৌষ্ঠ্য ধ্বনি (denti-labial)। সেকথা পরে বলা হবে।

৭. **কণ্ঠনালীয় ব্যঞ্জন (gutterals, velars)**
জিভের পশ্চাদ্ভাগ কণ্ঠনালিতে বায়ুনির্গমনে ব্যাঘাত সৃষ্টি করলে যে-ধ্বনি উৎপন্ন হয়, তাকেই কণ্ঠনালীয় ব্যঞ্জন বলে। ধ্বনিবিজ্ঞানে আগে একে gutteral বলা হত। বর্তমানে gutteral নামটির পরিবর্তে velars ব্যবহৃত হয়। বাংলায় অনেকে কণ্ঠ্য ব্যঞ্জন আর কণ্ঠমূলীয় ব্যঞ্জনের মধ্যে পার্থক্য করেন না। প্রকৃতপক্ষে, বাংলায় একটিমাত্র velar বা কণ্ঠনালীয় ব্যঞ্জন আছে—হ্। ইংরেজিতে cat-এ /k/ একটা velar ধ্বনি। প্রকৃতপক্ষে ইংরেজদের মুখে cat-এর উচ্চারণ ক্যাট্ নয়, খ্যাট্।

৭.৪.১ উচ্চারণস্থান অনুযায়ী সূক্ষ্মতর শ্রেণিবিভাগ

আধুনিক ধ্বনিবিজ্ঞানে উপরের সাতটি শ্রেণি ছাড়া আরও কয়েকটি শ্রেণির কথা বলা হয়। একে-একে তেমনই কয়েকটি ব্যঞ্জনধ্বনির কথা বলা হবে এবার।

১. **দন্তৌষ্ঠ্য ব্যঞ্জন (denti-labials)**
দন্তৌষ্ঠ্য ধ্বনির উচ্চারণে দাঁত ও নীচের ঠোঁটের সংযোগ ঘটে। নীচের ঠোঁট উপরপাটির দাঁতে ছুঁইয়ে শ্বাসবায়ুকে ঈষৎ বাধা দিয়ে যে-ধ্বনি উচ্চারণ করা হয়, তাকেই বলে দন্তৌষ্ঠ্য ব্যঞ্জন (denti-labials বা labio-dentals)। মান্য চলিত বাংলায় এই ধ্বনি নেই। ইংরেজি /f/ আর /v/ দন্তৌষ্ঠ্য ধ্বনি। আঞ্চলিক বাংলায় অবশ্য এই ধ্বনি শোনা যায়।

২. **তালুদন্তমূলীয় ব্যঞ্জন (palato-alveolars)**
জিহ্বার ফলক (blade of the tongue) যখন কঠিন তালু (hard palate) অর্থাৎ অগ্রতালু এবং দন্তমূল দুই-ই স্পর্শ করে, তখন যে-ধ্বনি উৎপন্ন হয় তাকেই তালুদন্তমূলীয় ব্যঞ্জন বা palato-alveolar ধ্বনি বলে। ইংরেজি /ʃ/ বা শ্ এবং /ʒ/ জ়্ এই দুটি তালুদন্তমূলীয় ব্যঞ্জন। Shine-এর sh এবং measure-এর s-এ এই দুটি ধ্বনির দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

৩. পশ্চাৎ-দন্তমূলীয় ব্যঞ্জন (post-alveolars)

তালু ও তালুদন্তমূলীয় অঞ্চলের মধ্যবর্তী অংশই হল পশ্চাৎ-দন্তমূলীয় অঞ্চল। এখানে উচ্চারিত ধ্বনিকেই পশ্চাৎ-দন্তমূলীয় বা post-alveolar ধ্বনি বলে। ইংরেজি ভাষায় drive এবং try এইদুটি শব্দের /r/ একটি পশ্চাৎ-দন্তমূলীয় ব্যঞ্জন। ব্যংলায় এই ধ্বনি নেই।

৭.৪.২ উচ্চারণের প্রকৃতি অনুযায়ী ব্যঞ্জনের শ্রেণিবিভাগ (classification of consonants according to the manner of articulation)

উপরে আমরা দেখেছি উচ্চারণস্থান অনুযায়ী ব্যঞ্জনধ্বনির শ্রেণিবিভাগ। এবারে দেখব উচ্চারণের প্রকৃতি বা প্রকার (manner of articulation) অনুযায়ী ব্যঞ্জনধ্বনি কত রকমের হতে পারে।

১. সঘোষ ও অঘোষ ধ্বনি (voiced ও unvoiced বা voiceless)

কোনো-কোনো ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণে স্বরতন্ত্রী কিছুটা অবরুদ্ধ হয়। আর সেই অবরোধ বা বাধার কমবেশির দরুন যে-ধ্বনি উৎপন্ন হয় তাকে অঘোষ বা সঘোষ ধ্বনি বলা হয়। আরও একটু স্পষ্ট করে বলা যায়, যে-ধ্বনির উচ্চারণে কণ্ঠমধ্যস্থ স্বরতন্ত্রীতে বাধার ফলে কম্পনের সৃষ্টি হয় তাকে সঘোষ (voiced) ব্যঞ্জনধ্বনি বলা হয়। অন্য দিকে, যে ধ্বনির উচ্চারণে সেই কম্পনের সৃষ্টি হয় না, তাকে বলা হয় অঘোষ (voiceless বা unvoiced) ধ্বনি। বাংলা ভাষায় এই দুইয়ের মধ্যবর্তী আর একরকম ব্যঞ্জনধ্বনির কথা বলেন ধ্বনিতাত্ত্বিকরা। তার নাম ঘোষবৎ বা আংশিক ঘোষযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনি (half voiced বা partially voiced)। ইংরেজি ধ্বনিতত্ত্বে অবশ্য শুধুই voiced ও voiceless এই দুটি ভাগের কথা বলা হয়। বাংলায় গ্ ঘ্ ঙ্ জ্ ঝ্ ড্ ঢ্ দ্ ধ্ ন্ ব্ ভ্ ম্ র্ ল্ ড়্ ঢ়্ হ্ এই আঠারোটি ব্যঞ্জনধ্বনিকে ঘোষ বা ঘোষবৎ বলা যায়। তবে যদি পূর্ণ ঘোষ বা সঘোষ ব্যঞ্জনকে আলাদা করে চিহ্নিত করতে হয়, তাহলে বলতে হবে কেবল ঙ্ ন্ ম্ ল্ এই চারটিই পূর্ণ ঘোষ বা সঘোষ (voiced) ব্যঞ্জন। চলতি বাংলা ব্যাকরণে অনেকসময় বর্গের তৃতীয় ও চতুর্থ বর্ণকে সঘোষ ও ঘোষবৎ বলা হয়। এই বর্ণনা ঠিক নয়। এই বর্ণনাকে মানতে হলে গ্ ঘ্ জ্ ঝ্, ড্ ঢ্ দ্ ধ্ ব্ ভ্—পাঁচটি বর্গের এই দশটিকেই শুধু সঘোষ ও ঘোষবৎ বলতে হয়। কিন্তু তা ঠিক নয় একথা উপরের তালিকা দেখলেই বোঝা যাবে। পবিত্র সরকার এই কথাটি খুব স্পষ্ট করেই বুঝিয়েছেন। উপরের সঘোষ ও ঘোষবৎ ধ্বনির যে তালিকা দেওয়া হল, তার বাইরের সমস্ত ব্যঞ্জনধ্বনিই অঘোষ বা voiceless বা unvoiced ধ্বনি। এখানে লক্ষ করতে হবে যে, ইংরেজি ভাষার সঘোষ ব্যঞ্জন বা voiced consonants হল /b/, /d/, /g/, /dʒ/ অর্থাৎ জ্, /m/, /ŋ/ অর্থাৎ ঙ্, /V/ অর্থাৎ ভ্, /ð/ অর্থাৎ দ্, /z/ অর্থাৎ জ়্, /ʃ/ অর্থাৎ শ্, /ʒ/ অর্থাৎ জ়্, /ℓ/

, /r/, / j / অর্থাৎ য়্, এবং /w/ অন্য দিকে, unvoiced বা voiceless consonants হল /t/ অর্থাৎ ট্, /k/,অর্থাৎ ক্, /tʃ / অর্থাৎ চ্, /f/ অর্থাৎ ফ্, /θ / অর্থাৎ থ্, এবং /s/।

২. **নাসিক্য ব্যঞ্জন ও মৌখিক ব্যঞ্জন (nasal consonants ও oral consonants)** শ্বাসবায়ু মুখবিবরের কোনো স্থানে বাধা পেয়ে নাসাপথে নির্গত হবার সময় ঘর্ষণজনিত অনুনাসিকতা সৃষ্টি করলে যে-ধ্বনির সৃষ্টি হয় তাকেই নাসিক্য ধ্বনি বলে। বাংলা ভাষায় ঙ্ ন্ ম্ এই তিনটি নাসিক্য ব্যঞ্জন। বাকি সব ব্যঞ্জনধ্বনিই মৌখিক ব্যঞ্জন। সেগুলির উৎপাদনে নাসিকার কোনো ভূমিকা নেই। সেগুলি সৃষ্টি হয় মুখবিবরের মধ্যে ঘর্ষণ, অবরোধ, স্পর্শ ইত্যাদির ফলে। সেগুলিকে oral sound বা মৌখিক ধ্বনি বলে। ইংরেজিতে /m/, /n/, /ŋ/ এই তিনটি nasal consonants বা নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনি।

৩. **স্পৃষ্ট ধ্বনি বা স্পর্শ ধ্বনি (stops)** যে-ধ্বনির উচ্চারণে শ্বাসবায়ু সাময়িকভাবে অবরুদ্ধ হয়ে যায় তাকেই স্পর্শধ্বনি বা স্পৃষ্টধ্বনি বলে। ইংরেজিতে /p/, /t/ stop বা স্পৃষ্টধ্বনি। আবার /m/ ও /n/ nasal consonant বা নাসিক্য ধ্বনি হলেও এদুটিও stop বা স্পৃষ্ট ধ্বনি। এদের বলতে পারি nasal stops বা নাসিক্য স্পৃষ্ট ধ্বনি। বাংলায় ক্ খ্ গ্ ঘ্ ঙ্ ট্ ঠ্ ড্ ঢ্ ত্ থ্ দ্ ধ্ ন্, প্ ফ্ ব্ ভ্ ম্—এইগুলিই প্রকৃতপক্ষে স্পৃষ্ট ব্যঞ্জন। মুহম্মদ আবদুল হাই স্পৃষ্ট ধ্বনির প্রধান লক্ষণ বা গুণ হিসেবে ‘স্পর্শতা গুণ’-এর কথা বলেছেন। (মুহম্মদ আবদুল হাই রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, ১৯৯৪, পৃ ৬০)। কিন্তু এই ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ নির্ভুল নয়। কেননা, এই শ্রেণির ব্যঞ্জনকে স্পৃষ্ট বা স্পর্শ ব্যঞ্জন বলা হলেও প্রকৃতপক্ষে ‘স্পর্শতা’ এই শ্রেণির ধ্বনির প্রধান লক্ষণ নয়, প্রধান লক্ষণ হল কণ্ঠে বায়ুপ্রবাহে সম্পূর্ণ অবরোধ।

৪. **মহাপ্রাণ ও অল্পপ্রাণ ব্যঞ্জনধ্বনি (aspirated, unaspirated)** কোনো-কোনো ধ্বনির উচ্চারণের সময় মুখের ভিতরের বায়ুনির্গমন পথ বা স্বরপথ প্রথমে অবরুদ্ধ হয়ে পরে কিছুটা জোরে অবরুদ্ধ বায়ুকে মুক্ত করলে সেই ধ্বনিকে মহাপ্রাণ ধ্বনি বা aspirated sound বলে। এইভাবে আংশিক বাধার পর জোরে ধাক্কা দিয়ে বায়ু বার করলে উৎপন্ন ধ্বনিটিতে একটা বাড়তি হ্ (h) শোনা যায়। একেই মহাপ্রাণতা বা aspiration বলে। যেমন ক্ + হ্ = খ্, গ্ + হ্ = ঘ্। এইভাবে দেখতে পাব যে, মান্য চলিত বাংলায় (standard colloquial Bengali) খ্, ঘ্, ছ্, ঝ্, ঠ্, ঢ্, থ্, ধ্, ভ্, ঢ়্—এই দশটি মহাপ্রাণ ধ্বনি আছে। ইংরেজি ভাষায় কতকগুলি বর্ণের উচ্চারণ aspirated বা মহাপ্রাণিত। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল t, p, k aspirated ধ্বনি। ইংরেজিতে t শব্দের শুরুতে থাকলে সর্বদাই th বা t^h উচ্চারিত

হয়। যেমন task উচ্চারণ t^ha : sk বা ঠা-স্‌ক্‌। তেমনি শব্দের শুরুতে p ও k যথাক্রমে p^h ও k^h উচ্চারিত হয়। দুটি শব্দ নিয়ে এদের উচ্চারণ দেখব—policy ও cat। এই দুটি শব্দের উচ্চারণ যথাক্রমে p^holisi বা ফলিসি এবং k^hæt বা খ্যাট্‌। যেসব ধ্বনির উচ্চারণে স্বরপথে বায়ুর অবরোধ বা বাধা থাকে না এবং জোরে ধাক্কা দিয়ে অবরুদ্ধ বায়ুকে মুক্তি দেওয়া হয় না, সেইসব ধ্বনিকে বলা হয় অল্পপ্রাণ ধ্বনি (unaspirated sound)। বাংলায় ক্‌ গ্‌ চ্‌ ড্‌ ত্‌ প্‌ ইত্যাদি অল্পপ্রাণ ধ্বনি। 'প্রাণ' কথাটির অর্থ বায়ু। যে-ধ্বনির উচ্চারণে বায়ুর প্রবলতা থাকে, তাই মহাপ্রাণ, এবং যে-ধ্বনির উচ্চারণে বায়ুর প্রবলতা থাকে না, তাই অল্পপ্রাণ।

৫. **ঘৃষ্ট ধ্বনি (affricates)**

কোনো-কোনো ধ্বনির উচ্চারণে মুখের ভিতরের বায়ুনির্গমন-পথ প্রথমে সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গিয়ে তারপর তা ঈষৎ উন্মুক্ত হয়ে একটা ঘর্ষণের সৃষ্টি হয়। তার ফলে যে-ধ্বনির সৃষ্টি হয়, তাকে বলা হয় ঘৃষ্ট ধ্বনি। মান্য চলিত বাংলায় চ্‌ ছ্‌ জ্‌ ঝ্‌ এই চারটি ঘৃষ্ট ব্যঞ্জনধ্বনি। ঘৃষ্ট ধ্বনি বা affricate sound এর উচ্চারণের দুটি পর্যায়। প্রথমে stop বা স্পৃষ্টতা বা শ্বাসবায়ুর পূর্ণ অবরোধ এবং পরে আংশিক উন্মুক্ত হওয়া। এইজন্য কোনো-কোনো ধ্বনিবিজ্ঞানী ঘৃষ্টধ্বনিকে affricated stops বলেছেন। (John Laver—Principles of Phonetics, Cambridge University Press, 2000, p.364)।

৬. **উষ্ম ব্যঞ্জন (fricatives)**

উষ্ম ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণের সময় স্বরপথ বা বায়ুনির্গমন-পথ রুদ্ধ হয় না, তবে খুবই সংকুচিত হয় এবং ফলে চাপের সৃষ্টি হয় এবং সেই চাপের মধ্য দিয়ে ধ্বনি উচ্চারণে একটা ঘর্ষণের সৃষ্টি হয় এবং শিস্‌জাতীয় ধ্বনি নির্গত হয়। বাংলায় শ্‌ স্‌ হ্‌ এগুলি উষ্মব্যঞ্জন। অনেকদিন পর্যন্ত fricative কে spirant বলা হত। বর্তমানে spirant কথাটি আর ব্যবহৃত হয় না। ধ্বনিবিজ্ঞানীরা বলেন যে, উষ্ম ব্যঞ্জন উচ্চারণের একটা আবশ্যিক লক্ষণ হল stricture বা স্বরপথের সংকীর্ণতা বা সংকোচন। ইংরেজিতে /s/ বা স্‌, /ʃ/ বা শ্‌, /z/ বা জ্‌, /ʒ/ বা জ়্‌, /f / বা ফ়্‌, /v/ বা ভ়্‌, /h/. বা হ্‌ fricative বা উষ্ম ব্যঞ্জনের দৃষ্টান্ত। লক্ষণীয় যে, কতকগুলি উষ্ম ধ্বনি আবার sibilant বা শিস্‌ ধ্বনিও বটে। যেমন ইংরেজির /s/ ও /ʃ/ এবং বাংলার স্‌ ও শ্‌।

৭. **রণিত বা কম্পিত ব্যঞ্জনধ্বনি (trills)**

বাংলায় র্‌ একটি রণিত বা কম্পনজাত ধ্বনি। র্‌ উচ্চারণ করার সময় জিভের ডগা কম্পিত হয়ে দন্তমূল বা দাঁতের গোড়া স্পর্শ করে। এই ধ্বনির উচ্চারণে জিহ্বাগ্র ও দন্তমূলের সংযোগের সময় একটা খুব হালকা কম্পন অনুভূত হয়। মুহম্মদ আবদুল হাই বলেছেন যে, র্‌-ধ্বনির উচ্চারণে ওই কম্পন না থাকলে তাকে বরং tap sound

বলা যায়, trill বলা যায় না। কম্পনের জন্যই trill বলা হয়। এই ধ্বনির উচ্চারণের বৈশিষ্ট্যই কম্পন। ইংরেজিতে এর আর এক নাম rolled sound ইংরেজিতে দুটি r ধ্বনি আছে। একটিকে voiced alveolar trill বলা হয়, যার ধ্বনিচিহ্ন হল /r/। এটি বাংলা র্ ধ্বনির সঙ্গে তুলনীয়। ইংরেজিতে আর একটি r ধ্বনি আছে। সেটি উৎপন্ন হয় আলজিভ ও জিভের সংস্পর্শ থেকে। তার ধ্বনিচিহ্ন হল /R/।

৮. **পার্শ্বিক ব্যঞ্জন (lateral)**

বাংলা ল্ একটি পার্শ্বিক ধ্বনি। এর উচ্চারণে জিভের ডগা দন্তমূলকে দৃঢ়ভাবে স্পর্শ করে এবং শ্বাসবায়ু জিভের দুই পাশ দিয়ে বেরিয়ে আসে। ইংরেজিতেও /ℓ/ একটি lateral consonant বা পার্শ্বিক ব্যঞ্জন। এই ধ্বনি উচ্চারণের বৈশিষ্ট্যগুলো একটু দেখে নিতে পারি আমরা। (১) কোমল তালু বা পশ্চাত্তালু একটু উপরে উঠে আসে ; (২) জিভের ডগা উপরপাটির দাঁতের গোড়ায় দৃঢ়ভাবে সংলগ্ন থাকে ; (৩) জিভের বাকি অংশ তালু স্পর্শ করে না এবং জিভের দুই পাশ দিয়ে বায়ু বেরিয়ে আসে ; (৪) এই ধ্বনির উচ্চারণে কোথাও কোনো ঘর্ষণ সৃষ্টি হয় না।

৯. **শ্রুতিব্যঞ্জন (gliding consonant)**

ইংরেজিতে দুটি gliding consonant বা শ্রুতিব্যঞ্জন আছে। সেগুলি হল / j / বা য় এবং /w/ বা ওয়্। / j / ধ্বনিকে পাওয়া যায় yes শব্দে—/jes/, বাংলায় বলা যায় ইয়েস্ বা য়েস্। /w/ কে পাওয়া যায় win, wait, sweet প্রভৃতি শব্দে—/win/, /weit/, /swi : t/ বাংলায় উইন্ লিখলে glideটা ঠিক বোঝানো যায় না। লেখা উচিত উ্ইন্। অনুরূপভাবে ও্য়েইট্ এবং স্উঈট্।

১০. **তাড়িত ব্যঞ্জন (flapped consonant)**

মুহম্মদ আবদুল হাই বলেন যে, তাড়িত বা 'তাড়নজাত' ধ্বনির উচ্চারণে জিভের ডগা একটু 'মুচড়ে গিয়ে' উপরপাটি দাঁতের গোড়া স্পর্শ ক'রে 'কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে' এবং এর ফলে শ্বাসবায়ুর নির্গমপথ রুদ্ধ হয় কিছু সময়ের জন্য। বাংলায় ড় ও ঢ় এই দুটি তাড়িত বা তাড়নজাত ব্যঞ্জন। লক্ষণীয় যে, তাড়িত ব্যঞ্জনে একটা sliding motion বা গড়ানে গতি আছে। রামেশ্বর শ' একে বিকল্পে tapped consonant বলেছেন। কিন্তু tapped sound আর flapped sound সমার্থক নয়। Tapped sound-এ কোনো sliding motion বা গড়ানে ভাব নেই।

৭.৫ স্বরধ্বনি (vowels)

ইংরেজ ধ্বনিবিজ্ঞানী ড্যানিয়েল জোনসকে (Daniel Jones) অনুসরণ করে মুহম্মদ আবদুল হাই বলেছেন—'স্বাভাবিক কথাবার্তায় গলনালী ও মুখবিবর দিয়ে বাতাস বেরিয়ে যাবার সময় কোন জায়গায় বাধাপ্রাপ্ত না হ'য়ে কিংবা শ্রুতিগ্রাহ্য চাপা না খেয়ে ঘোষবৎ

যে-ধ্বনি উদগত হয় তা-ই স্বরধ্বনি'। স্বরধ্বনির কয়েকটি বৈশিষ্ট্য এই সংজ্ঞা থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। প্রথমত, স্বরধ্বনির উচ্চারণে মুখের মধ্যে বাতাস কোথাও বাধা পায় না। দ্বিতীয়ত, স্বরধ্বনি হল voiced sound বা সঘোষ ধ্বনি। তৃতীয়ত, মুখবিবরে কোথাও শ্রুতিগোচর কোনো ঘর্ষণ ঘটে না। ড্যানিয়েল জোনসের ভাষায় 'no narrowing as would cause audible friction'. এবার ওই সংজ্ঞাটিকে আমরা একটু বুঝে নিতে পারি। স্বরধ্বনি উচ্চারণের সময় জিভ, দাঁত, ঠোঁট, তালু ইত্যাদি কোনো অঙ্গই মুখনির্গত বাতাসকে বাধা দেয় না। স্বরধ্বনি উচ্চারণের সময় কণ্ঠের ভিতরে ল্যারিংক্সের অন্তর্গত স্বরতন্ত্রীতে একটা মৃদু কম্পনের সৃষ্টি হয়, আর সেই কম্পনের জন্যই স্বরধ্বনিকে সঘোষ ধ্বনি বা voiced sound বলা হয়।

এবারে আমরা ইংরেজি ও বাংলা ভাষার স্বরধ্বনিগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করব।

ইংরেজিতে তেরোটি vowel sound বা স্বরধ্বনির কথা বলা হয়। তার মধ্যে সাতটি হ্রস্ব স্বরধ্বনি বা short vowels এবং পাঁচটি দীর্ঘ স্বরধ্বনি (long vowels)। ইংরেজি ভাষার হ্রস্ব স্বরধ্বনি—

/I/	ই	pit /pit/পিট্
/e/	এ	pet /pet/পেট্
/æ/	অ্যা	cat /kat/ক্যাট্
/ʌ/	আ	but / b ʌ t /বাট্
/ɔ/	অ	dog /dɔg/ডগ্
/ʊ/	উ	put /pʊt/পুট
/ə/	অ	about/əbout/অবাউট্

ইংরেজি ভাষার long vowels বা দীর্ঘ স্বরধ্বনির সংখ্যা পাঁচটি—

/i :/	ঈ	bean /bi:n/বীন্
/a :/	আ—	barley /ba:li/বা—লি
/ɔ:/	অ—	born /bɔ:n/ব—ন্
/u :/	ঊ	spool /spu:l/স্পূল্
/ɜ:/	অ—	burn /bɜ:n/বঅ—ন্

এবারে দেখা যাক, আমাদের বাংলা ভাষার স্বরধ্বনিগুলিকে। মান্য চলিত (colloquial) বাংলায় স্বরধ্বনি সাতটি—অ, আ, ই, উ, এ, ও, অ্যা। লক্ষ করবার বিষয় এই যে, এই তালিকায় ঐ এবং ঔ নেই। স্বাভাবিক, কেননা ও-দুটি একক স্বরধ্বনি নয়, ও-দুটি যৌগিক স্বরধ্বনি, অর্থাৎ দুটি স্বরধ্বনি মিলে ঐ (ও + ই) এবং ঔ (ও + উ)। আরও লক্ষ করব, এখানে ঋ নেই। নেই, কেননা, সংস্কৃতে ঋ স্বরধ্বনি হলেও বাংলা ঋ ব্যঞ্জনের মতো উচ্চারিত হয় (র্ + ই)। আরও লক্ষ করব, একটি এমন স্বরধ্বনি এখানে রয়েছে সেটির অস্তিত্ব আমাদের বর্ণমালায় নেই—অ্যা।

৭.৫.১ স্বরধ্বনির উচ্চারণ প্রকৃতি

ব্যঞ্জনধ্বনির যেমন উচ্চারণের বিভিন্ন ধরন আছে, তেমনি স্বরধ্বনি উচ্চারণেরও নানান ধরন আছে। স্বরধ্বনি উচ্চারণে জিভের অবস্থান, ঠোঁটের আকৃতি, জিভের সামনে-পিছনে গতি প্রভৃতির গুরুত্ব খুবই বেশি। বস্তুতপক্ষে এইগুলির জন্যই স্বরধ্বনির প্রকারভেদ হয়।

ক. প্রথমে বলব **ঠোঁটের আকৃতির** কথা। ঠোঁট কতটা উন্মুক্ত বা বন্ধ তার উপর স্বরধ্বনির শ্রেণিবিভাগ নির্ভর করে। ঠোঁটের উন্মুক্ততা বা openness অনুযায়ী স্বরধ্বনির চারটি শ্রেণি—বিবৃত (open), অর্ধ-বিবৃত (half-open), সংবৃত (close বা closed) এবং অর্ধ-সংবৃত (half-close)। ইংরেজিতে but এর u /ʌ/ এবং father এর a /a:/ open vowel. বাংলায় আ একটি বিবৃত স্বরধ্বনি। যে-স্বরধ্বনির উচ্চারণে ঠোঁট সম্পূর্ণ বা সবচেয়ে বেশি খোলা থাকে তাকেই বিবৃত বা open স্বরধ্বনি বলে। দ্বিতীয়ত, যে-স্বরধ্বনির উচ্চারণে মুখদ্বার বা ঠোঁটদুটি বিবৃত (open) স্বরধ্বনির চেয়ে কিছুটা কম উন্মুক্ত থাকে, তাকে অর্ধ-বিবৃত (half-open) স্বরধ্বনি বলে। বাংলার অ এবং অ্যা এবং ইংরেজির /æ/ এই শ্রেণির স্বরধ্বনি। তৃতীয়ত যে-স্বরধ্বনির উচ্চারণে দুই ঠোঁট সবচেয়ে কম খোলা থাকে তাকে সংবৃত (close) স্বরধ্বনি বলে। উদাহরণ, বাংলার ই, উ এবং ইংরেজির /i/, অর্থাৎ pit এর i সংবৃত স্বরধ্বনি বা close vowel. চতুর্থত, যে স্বরধ্বনির উচ্চারণে দুটি ঠোঁট অর্ধ-বিবৃত-র চেয়ে আরও কম খোলা থাকে তাকে অর্ধ-সংবৃত স্বরধ্বনি বা half-close vowel বলে। এর উদাহরণ বাংলার এ, ও।

খ. ঠোঁটের আকৃতি অনুযায়ী স্বরধ্বনির শ্রেণিবিভাগ

স্বরধ্বনি উচ্চারণের সময় আমাদের দুটি ঠোঁট দু-রকম আকার ধারণ করে—গোলাকার বা বর্তুল বা কুঞ্চিত (rounded) এবং প্রসৃত বা প্রসারিত অর্থাৎ ছড়ানো (spread)। বাংলায় উ, ও, অ এই তিনটি স্বরধ্বনি উচ্চারণে ঠোঁটদুটি গোল বা বর্তুল আকার ধারণ করে বলে এদের rounded বা বর্তুলাকার বা কুঞ্চিত স্বরধ্বনি বলে। ইংরেজিতে দীর্ঘ ঊ বা /u:/ (school/sku:l) একটি rounded vowel. আবার যে-স্বরধ্বনির উচ্চারণে ঠোঁটদুটি দুই পাশে ছড়িয়ে যায় তাকে প্রসৃত বা প্রসারিত স্বরধ্বনি বলে (spread vowel)। বাংলায় এ, ই, অ্যা এই তিনটি প্রসৃত স্বরধ্বনি।

গ. জিহ্বার সম্মুখ-পশ্চাৎ গতি অনুযায়ী স্বরধ্বনির শ্রেণিবিভাগ

কোনো-কোনো স্বরধ্বনি উচ্চারণের সময় জিহ্বা সামনের দিকে এগিয়ে আসে। সেই স্বরধ্বনিগুলিকে front vowel বা সম্মুখ স্বরধ্বনি বলে। বাংলায় ই, এ, অ্যা সম্মুখ স্বরধ্বনি। ইংরেজিতে /i/ বা sit এর i, /e/ বা bed এর e, এবং /æ/ বা cat-এর a front vowel. অন্য দিকে, যেসব স্বরধ্বনি উচ্চারণের সময় জিহ্বা কিছুটা পিছন দিকে সরে যায় তাদের পশ্চাৎ স্বরধ্বনি বা back vowel বলে। বাংলায় উ, ও, অ পশ্চাৎ

স্বরধ্বনি। ইংরেজিতে |u|, |ɔ| বা |ɒ| back vowel এর দৃষ্টান্ত। যে-স্বরধ্বনির উচ্চারণে জিহ্বা সামনে আসে না, পিছনেও যায় না, তাকে বলা হয় কেন্দ্রীয় স্বরধ্বনি (central vowel.)। বাংলার আ একটি কেন্দ্রীয় স্বরধ্বনি। ইংরেজিতে |ə| একটি central vowel. ইংরেজি again শব্দের উচ্চারণ |əgein| বা অগেইন্।

ঘ. জিহ্বার ওঠানামা অনুযায়ী স্বরধ্বনির শ্রেণিবিভাগ

স্বরধ্বনির উচ্চারণে জিহ্বা কখনো-কখনো একটু নীচে নেমে আসে, আবার কখনো-বা একটু উপরে ওঠে। এই ওঠানামায় ধ্বনির পার্থক্যও হয়ে যায়। যে-স্বরধ্বনির উচ্চারণে জিভ সবচেয়ে বেশি উপরে ওঠে তাকে বলা হয় ঊর্ধ্ব স্বরধ্বনি (high vowel.)। আমাদের ভাষায় ই, উ ঊর্ধ্ব স্বরধ্বনি। ইংরেজিতে দীর্ঘ ঈ অর্থাৎ |i:| এবং দীর্ঘ ঊ অর্থাৎ |u:| ঊর্ধ্ব স্বরধ্বনি। বাংলায় অবশ্য দীর্ঘ ঈ দীর্ঘ ঊ বর্ণমালায় থাকলেও উচ্চারণে নেই।

যে-স্বরধ্বনির উচ্চারণে জিহ্বার অবস্থান সবচাইতে নীচে তাকে বলা হয় নিম্ন স্বরধ্বনি (low vowel)। বাংলার আ একটি নিম্ন স্বরধ্বনি। এই ঊর্ধ্ব ও নিম্ন স্বরধ্বনির মাঝে আছে নিম্নমধ্য (lowmid vowel) ও ঊর্ধ্বমধ্য স্বরধ্বনি (highmid vowel.)। অ্যা, অ এই দুটি নিম্নমধ্য, এবং এ, ও ঊর্ধ্বমধ্য স্বরধ্বনি।

পাঠকের মনে হতে পারে—আমরা তো স্বরধ্বনি উচ্চারণের সময় ঠোঁটের বর্তুলতা বা উন্মুক্ততা যত স্পষ্ট দেখতে পাই বা বুঝতে পারি, তত সহজে জিহ্বার অগ্র-পশ্চাৎ গতি বা ওঠানামা দেখতে পাই না। আসল কথা এই যে, সাদা চোখে ব্যাপারটা তেমন দেখা বা বোঝা যায় না একথা সত্য। তার জন্য ধ্বনিবিজ্ঞানে কয়েকটি যান্ত্রিক পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে। সেগুলি হল palatography, spectogram ইত্যাদি। এইসব পরীক্ষাই আমাদের জানিয়ে দেয় স্বর ও ব্যঞ্জন উচ্চারণের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি ও প্রকার।

৭.৫.২ দীর্ঘ স্বরধ্বনি কি বাংলায় আছে?

বাংলা ভাষার বর্ণমালায় ঈ, ঊ এই দুটি দীর্ঘ স্বরবর্ণ থাকলেও তাদের উচ্চারণে দীর্ঘতা নেই। ঈ উচ্চারিত হয় ই-য়ের মতো, ঊ উচ্চারিত হয় উ-য়ের মতো। সেইজন্যই বলা হয় যে, বাংলায় দীর্ঘ স্বরধ্বনি নেই। কয়েকটা শব্দের উচ্চারণ দেখলেই এই কথাটার যাথার্থ্য বোঝা যাবে।

ক. নদী — /nodi/ নোদি
যদি — /Jodi/ জোদি

খ. ঈগল /igɔl/ ইগল্
ইলিশ /iliʃ/ ইলিশ

গ. বিনীত /binito/ বিনিতো
বিদিত |bidito| বিদিতো

শব্দের শেষে, মধ্যে ও আদিতে দীর্ঘ ঈ-কার থাকা সত্ত্বেও উচ্চারণ সর্বত্রই ই-কারের মতো। এবারে ঊ-র দৃষ্টান্ত—

ক. শত্রু — /ʃottru/ শোৎত্রু
বধূ — /bodɦu/ বোধু

খ. নূতন — /nutɔn/ নুতন্
সূতো — /ʃuto/ শুতো

গ. কুরূপ /kurup/ কুরুপ্
খেজুর /khejur/ খেজুর্

অর্থাৎ বাংলায় যে সাতটি স্বরধ্বনির কথা আগে বলা হয়েছে, সেই সাতটির মধ্যে কোনো স্বরধ্বনিই দীর্ঘ নয়।

সাধারণভাবে এই কথাটা যে নির্ভুল তা সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, মুহম্মদ আবদুল হাই এবং পবিত্র সরকারের মতো ভাষাতাত্ত্বিকরা দেখিয়েছেন। কিছুকাল আগে ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিকাল ইনস্টিটিউটের দুজন গবেষক জর্জ কসতিস (Djordje Kostić) ও রিয়া দাস (Rhea S. Das) তাঁদের A Short Outline of Bengali Phonetics গ্রন্থে (১৯৭২) দেখিয়েছেন যে, বাংলায় স্বরধ্বনির দীর্ঘতা নেই। কিন্তু বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে সব স্বরধ্বনিই দীর্ঘ উচ্চারিত হতে পারে। হতে যে পারে, তা তাঁরা স্পেক্টোগ্রাম যন্ত্রের গ্রাফে লক্ষ করেছেন। বর্তমানে সব ধ্বনিবিজ্ঞানীই মানেন যে, একটি বিশেষ ক্ষেত্রে স্বরধ্বনি একটু দীর্ঘ উচ্চারিত হয়। কী সেই বিশেষ ক্ষেত্র? সেই বিশেষ ক্ষেত্রটি হল একাক্ষরী শব্দ বা এক সিলেব্‌লের শব্দ। কয়েকটি শব্দ দেখা যাক—আল, আলো, কাল, কালা; পাল, পালা।

আল = এক সিলেবল, এবং আ দীর্ঘ।
আলো = দুই সিলেবল, এবং আ দীর্ঘ নয়।

কাল = এক সিলেবল, কা-র আ দীর্ঘ।
কালা = দুই সিলেবল, কা-র আ দীর্ঘ নয়, লা-র আ দীর্ঘ নয়।

পাল = এক সিলেবল, পা-র আ দীর্ঘ।
পালা = দুই সিলেবল, দীর্ঘ স্বর নেই।

দ্বিতীয় আর একটি ক্ষেত্রেও দীর্ঘ স্বরের কথা বলা হয়। কখনো-কখনো আবেগের প্রকাশে বা বিস্ময়ের প্রকাশে আমরা একটা স্বরধ্বনিকে কিছুটা টেনে উচ্চারণ করি। একে প্রলম্বিত স্বর বলে। **কী, এত বড়ো স্পর্ধা**! এই কী-কে একটু দীর্ঘ উচ্চারণ করা হয়। আবার কখনো-কখনো কবিতায় বা গানে মাত্রার দাবিতে কোনো স্বরধ্বনিকে টেনে দীর্ঘ করা হয়।

কিন্তু একে স্বরধ্বনির দীর্ঘতা বলা উচিত নয়। কারণ এই দীর্ঘতা কোনো স্বরধ্বনির

ধ্বনিচরিত্রের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বা বৈশিষ্ট্য নয়। কাজেই যেকোনো স্বরধ্বনি এক সিলেবলের শব্দে দীর্ঘ উচ্চারিত হয়—কেবল এই কথাটি মনে রাখাই যথেষ্ট। কুল-এর উ, আম-এর আ, বেল-এর এ, দোর-এর ও, নিম-এর ই (নি) দীর্ঘ উচ্চারিত হয়। অন্যত্র উ, আ, এ, ও, ই সবই হ্রস্ব।

৭.৫.৩ নিহিত স্বর (inherent vowel)

আমরা লিখিতভাবে ব্যঞ্জনবর্ণ আর ব্যঞ্জনধ্বনির মধ্যে পার্থক্য কীভাবে করি? আমরা ব্যঞ্জনবর্ণকে লিখি এইভাবে—ক, খ, গ, ঘ ইত্যাদি। অন্য দিকে, ব্যঞ্জনধ্বনিকে লিখি এইভাবে—ক্, খ্, গ্, ঘ্। এবং ব্যঞ্জনবর্ণ পড়বার সময় কিংবা বলবার সময় ক খ গ ঘ প্রভৃতির সঙ্গে একটা অ-ধ্বনিও উচ্চারণ করি, নইলে ব্যঞ্জনবর্ণ বলাই যায় না। তার মানে ক = ক্ + অ, খ = খ্ + অ, গ = গ্ + অ, ঘ = ঘ্ + অ। এই অ-কে চোখে দেখা যায় না, এই অ ব্যঞ্জনবর্ণ উচ্চারণে আমাদের সাহায্য করে। এই অ-কে বলা হয় নিহিত স্বর বা নিহিত স্বরধ্বনি (inherent vowel)।

লক্ষ করতে হবে যে, আমাদের ভাষায় শব্দের শেষে অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিহিত স্বর থাকে না বলে বহু শব্দ ব্যঞ্জনান্ত উচ্চারিত হয়—জল, ফল, কল, নল, সাপ, বাঁধ, প্রদীপ, শ্রাবণ, পথিক—এইরকম অজস্র শব্দের শেষে একটা অলিখিত হসন্ত আছে। জল্, ফল্, কল্, নল্ শাপ্, বাঁধ্ প্রোদিপ্, পোথিক্।

এই শব্দগুলির শেষে নিহিত স্বর নেই বলেই এগুলি ব্যঞ্জানান্ত বা হসন্ত উচ্চারিত হয়। অন্য দিকে, বাংলায় সচরাচর শেষে যুক্তবর্ণ থাকলে তা স্বরান্ত উচ্চারিত হয়। অর্থাৎ তার শেষে নিহিত স্বর থাকে বলেই সেগুলি স্বরান্ত উচ্চারিত হয়—ভক্ত, শাক্ত, মন্দ, যুগ্ম, ভঙ্গ ইত্যাদি। অবশ্য এইসব ক্ষেত্রে নিহিত অ-ধ্বনির বদলে থাকে নিহিত 'ও' ধ্বনি। এই শব্দগুলি এইভাবে উচ্চারিত হয়—ভক্‌তো, শক্‌তো, মোন্‌দো, জুগ্‌মো, ভংগো। এ থেকেই নিহিত স্বরের চরিত্রটা বোঝা যাবে।

৭.৫.৪ অনুনাসিক স্বর (nasal vowel)

সব ভাষায় অনুনাসিকতা থাকে না। ফরাসি ও পর্তুগিজ ভাষায় অনুনাসিকতা প্রচুর শ্রুত হয়। অনুনাসিকতা আছে বাংলা ভাষাতেও। যে সাতটি স্বরধ্বনির কথা আগে বলা হয়েছে তার প্রত্যেকটিই অনুনাসিক হতে পারে—ইঁ, এঁ, অ্যাঁ, আঁ, অঁ, ওঁ, উঁ। মূল স্বরধ্বনিগুলিকে মৌখিক স্বরধ্বনি বা oral vowel এবং এইগুলিকে অনুনাসিক স্বরধ্বনি বা nasal vowel বলা হয়। কোনো-কোনো ভাষাতাত্ত্বিক, যেমন দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু মৌখিক স্বরধ্বনিকে বলেছেন শুদ্ধ স্বরধ্বনি (pure vowels)। মৌখিক স্বরধ্বনি বলার কারণ ওই স্বরধ্বনি উচ্চারণের সময় ফুসফুস থেকে শ্বাসবায়ু মুখ দিয়ে নির্গত হয়। অন্য দিকে অনুনাসিকতার কারণ হল এই যে, শ্বাসবায়ু নাসাপথে নির্গত হয়। তার মানে এই নয় যে, অনুনাসিক স্বরধ্বনির উচ্চারণে মুখের কোনো ভূমিকাই নেই। মুহম্মদ আবদুল হাই অনুনাসিক

স্বরধ্বনির উচ্চারণে 'combined resonance of nose and mouth' অর্থাৎ 'নাক ও মুখের মিলিত দ্যোতনা'-র কথা বলেছেন। এবারে আমরা অনুনাসিক স্বরধ্বনিযুক্ত কয়েকটি শব্দ দেখব—

ইঁদুর, ইঁদারা ; এঁচড়, এঁরা, এঁটো, এঁটুলি ; অ্যাঁ, খ্যাঁচড়া ; আঁক, আঁকা, আঁচড়, আঁখি ; পাঁচিশ (প্ + অঁ), গঁদ (গ্ + অঁ + দ্) ; ওঁচা, ওঁত, ওঁর, ওঁরাও ; উঁকি, উঁচু।

এই তালিকা থেকে বোঝা গেল যে, স্বরধ্বনির অনুনাসিকতা শব্দের আদিতে থাকতে পারে, শব্দের মাঝখানে থাকতে পারে (যেমন কেঁচো, গঁদ), আবার শেষেও থাকতে পারে (যেমন আজ্ঞে—আগ্গেঁ)।

৭.৫.৫ অর্ধস্বর (semi-vowel)

ধ্বনিতত্ত্বে semi-vowel বা অর্ধস্বর হল সেই বাগ্ধ্বনি যার উচ্চারণে ফুসফুসের শ্বাসবায়ু অতি অল্প ঘর্ষণসহ মুখ থেকে নির্গত হয়। ইংরেজিতে semi-vowel কে ব্যঞ্জনধ্বনিই ধরে নেওয়া হয়। ইংরেজিতে /j / একটি semi-vowel যেমন yes শব্দের অর্থাৎ /jes/-এর /j/ হল একটি semi-vowel. বলা যেতে পারে যে-স্বরধ্বনির ভূমিকা ব্যঞ্জনধ্বনির মতো তা-ই semi-vowel. 'In terms of their articulation, semi-vowels are very like vowels, but they function as consonants' (Longman Dictionary of Applied Linguistics, Longman, 1985, p.255)।

কিন্তু বাংলার ক্ষেত্রে 'অর্ধস্বর' কিছুটা অন্য অর্থ বহন করে। যে স্বরধ্বনি সম্পূর্ণ উচ্চারিত হয় না এবং যার দল বা অক্ষর বা সিলেবল গঠনের ক্ষমতা থাকে না, তাকেই বলা হয় অর্ধস্বর। বাংলায় অর্ধস্বর চারটি—ই্ এ্ উ্ ও্। এ্-কে য়্ লেখা যায়। অর্ধস্বর বোঝাবার জন্য এগুলির নীচে ব্যঞ্জনচিহ্নের মতো হসন্ত দেওয়া হয়। সাধারণত দল বা সিলেবলের শেষে আসে অর্ধস্বর। এবারে বোঝা যাবে কেন বলা হয় যে, অর্ধস্বরের সঙ্গে ব্যঞ্জনধ্বনির মিলই বেশি। উপরে বলা হয়েছে—'They function as consonants'.

পূর্ণ স্বরধ্বনি ও অর্ধস্বরধ্বনির তফাত বোঝার জন্য কয়েক জোড়া শব্দ দেখব—ইট, দই; এসো, যায় ; ওল, যাও ; উট, বউ। প্রতিটি জোড়ার প্রথম শব্দের প্রথম স্বরধ্বনি পূর্ণ ধ্বনি, দ্বিতীয় শব্দের শেষ ধ্বনিটি অর্ধস্বর।

ইট = ই (পূর্ণস্বর)
দই = ই্ (অর্ধস্বর)

এসো = এ (পূর্ণস্বর)
যায় = য়্ (অর্ধস্বর)

ওল = ও (পূর্ণস্বর)

যাও = ও্ (অর্ধস্বর)

উট = উ (পূর্ণস্বর)

বউ = উ্ (অর্ধস্বর)

পূর্ণ স্বরধ্বনি আর অর্ধস্বরধ্বনির পার্থক্য খুব ভালো বোঝা যাবে 'জাগো' শব্দের শেষের ও-ধ্বনির সঙ্গে যাও (জাও্) শব্দের শেষের ও্ ধ্বনির তুলনা করলে। দেখা যাবে যে, জাগো-র ও ধ্বনিকে সম্পূর্ণ উচ্চারণ করছি, অন্য দিকে, যাও-এর ও্-কে মাঝপথে যেন থামিয়ে দিচ্ছি—ব্যঞ্জনের মতো।

৭.৫.৬ দ্বিস্বরধ্বনি বা যৌগিক স্বরধ্বনি (diphthongs)

দ্বিস্বরধ্বনিকেই যৌগিক স্বরধ্বনি বলা হয়। কিন্তু কাকে বলে দ্বিস্বরধ্বনি? একটি পূর্ণ স্বরধ্বনি এবং একটি অর্ধস্বর নিয়ে হয় দ্বিস্বরধ্বনি। যখন ওই 'দেড়খানি' স্বরধ্বনি উচ্চারিত হবে একবারের চেষ্টায়, তখনই তাকে দ্বিস্বরধ্বনি বলা হবে। মনে রাখতে হবে দেড়খানি (একটি এবং আধটি) স্বরধ্বনি নিয়েও কিন্তু সিলেবল বা দল হবে একটি যেহেতু, আগেই বলা হয়েছে, অর্ধস্বরের সিলেবল গঠনের ক্ষমতা নেই। [বাংলা দ্বিস্বরধ্বনির সংখ্যার আলোচনার জন্য 'বাংলাভাষার বর্ণনামূলক ব্যাকরণ' দ্রষ্টব্য]

ইংরেজিতে diphthong সেইগুলি যেখানে একটি পূর্ণ স্বরের সঙ্গে আর একটি স্বরধ্বনি শ্রুতি বা glide হিসাবে যুক্ত হবে এবং দুইয়ে মিলে গঠন করবে একটিই সিলেবল বা দল। ইংরেজিতে peer ও here শব্দদুটির উচ্চারণ যথাক্রমে /piə/ এবং /hiə/। এখানে দুটি শব্দেই i একটি পূর্ণ স্বরধ্বনি এবং ə একটি semi-vowel বা অর্ধস্বর। এই অর্ধস্বরটি glide বা শ্রুতির মতো পূর্ণস্বরের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে, এবং দুটি ক্ষেত্রেই diphthong একটিই সিলেবল বা দল গঠন করছে।

এই প্রসঙ্গে ত্রিস্বরধ্বনি (triphthong) ও চতুঃস্বরধ্বনির (tetraphthong) কথাও বলা দরকার। খাও (আও্), দই (ওই্) প্রভৃতি শব্দে যেমন দ্বিস্বরধ্বনি পাই, তেমনি খাওয়া (আও্য়া), দেওয়া (এও্য়া) শব্দে পাই ত্রিস্বরধ্বনি। আবার খাওয়াই, নাওয়াও প্রভৃতি শব্দে আছে চতুঃস্বরধ্বনি। ইংরেজি fire শব্দে triphthong বা ত্রিস্বর আছে—/faiə/।

৭.৫.৭ অবিভাজ্য ধ্বনি (suprasegment)

বাগ্‌ধ্বনিগুলি পরস্পর জুড়ে জুড়ে শব্দ তৈরি করে। এই ধ্বনিগুলিকে চরিত্রগতভাবে ধ্বনিখণ্ড বা বিভাজ্য ধ্বনি বলা যেতে পারে। বিভাজ্য ধ্বনিকে ইংরেজিতে segmental sound বলা হয়। সমস্ত স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জনধ্বনি হল বিভাজ্য ধ্বনির দৃষ্টান্ত। শব্দের অন্তর্গত স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জনধ্বনিগুলিকে সুস্পষ্টভাবে এবং সুনির্দিষ্টভাবে বিভক্ত করা বা বিশ্লিষ্ট করা যায়। 'দারুণ' শব্দে দুটি সিলেবল বা দল আছে—দা + রুন্। এবার তার ধ্বনিগুলিকে বিশ্লেষণ করলে এইগুলি পাওয়া যায়—দ্ + আ + র্ + উ + ন্। অতএব আমরা দেখতে পাচ্ছি যে,

এগুলিকে বর্ণের সাহায্যে দৃশ্যমান করা যায়। কিন্তু কোনো শব্দ বা সিলেবলের মধ্যে যে সুর বা সুরপ্রবাহ থাকে কিংবা সুরের যে ওঠানামা থাকে তাকে যেমন ভাগ করা যায় না, তেমনি উপরোক্ত নিয়মে পরপর সাজানোও যায় না। তাই এগুলিকে অবিভাজ্য ধ্বনি বলা হয়। দুটি ইংরেজি বাক্য দেখা যাক—1. Which means of *transport* do you use? 2. His business is to *transport* goods. এই দুটি বাক্যের transport শব্দদুটির ধ্বনিগত চরিত্র এক নয়। প্রথম বাক্যে transport হল noun বা বিশেষ্য। এবং ওই শব্দে accent বা প্রস্বর পড়ে প্রথম সিলেবলে— tra′n - sport ; দ্বিতীয় বাক্যের transport verb বা ক্রিয়াপদ এবং ওই শব্দে accent পড়ে দ্বিতীয় সিলেবলে tran- spo′rt । ফলে দুটি শব্দের সুরে একটা পার্থক্য শোনা যায়। কিন্তু সে-পার্থক্য স্বরধ্বনি বা ব্যঞ্জনধ্বনির এলাকা ছাড়িয়ে দেখা দেয় সিলেবলের এলাকায়। এইজন্য প্রস্বর বা accentকে অবিভাজ্য ধ্বনির দৃষ্টান্ত বলা হয়। আবার কোনো বাক্যে যদি বিস্ময় বা প্রশ্ন প্রকাশিত হয় তার সুরও লেখায় দেখানো যায় না। কেবল কতকগুলো চিহ্ন দিয়ে তার ইঙ্গিত দেওয়া যায় মাত্র। এই প্রশ্ন বা বিস্ময়ের সুরকেও অবিভাজ্য ধ্বনির দৃষ্টান্ত বলা হয়। শব্দের অন্তর্গত glide বা শ্রুতিও অবিভাজ্য ধ্বনির উদাহরণ। এইসব প্রস্বর প্রশ্ন প্রভৃতিকে স্বরধ্বনি বা ব্যঞ্জনধ্বনির মতো ছোটো এককে বিশ্লেষণ করা যায় না। এমনকী junction বা juncture বা সন্ধিকেও (এই সন্ধি ব্যাকরণের সন্ধি নয়) অবিভাজ্য ধ্বনি বলা হয়।

৭.৫.৮ সংযুক্ত ব্যঞ্জন (consonant cluster)

দুটি বা তার বেশি ব্যঞ্জনধ্বনি যদি এমনভাবে উচ্চারিত হয় যে, তার মধ্যে কোনো স্বরধ্বনি থাকবে না, তাহলে সেই দুটি বা তার বেশি ব্যঞ্জনধ্বনির গুচ্ছকে যুক্তব্যঞ্জন বা সংযুক্ত ব্যঞ্জন (consonant cluster) বলা হবে। ইংরেজিতে দুটি, তিনটি ও চারটি ব্যঞ্জনের গুচ্ছ পাওয়া যায়। নীচে দুটি, তিনটি ও চারটি ব্যঞ্জনের গুচ্ছের দৃষ্টান্ত দেখা যাক—

claim	= /k*l*–/	দুই ব্যঞ্জনের সংযুক্তি
bright	= /br–/	দুই ব্যঞ্জনের সংযুক্তি
bolt	= /–lt/	দুই ব্যঞ্জনের সংযুক্তি
string	= /str–/	তিন ব্যঞ্জনের সংযুক্তি
spring	= /spr–/	তিন ব্যঞ্জনের সংযুক্তি
first	= /–rst/	তিন ব্যঞ্জনের সংযুক্তি
texts	= /–ksts/	চার ব্যঞ্জনের সংযুক্তি
twelfts	= /lfθ s/	চার ব্যঞ্জনের সংযুক্তি

বাংলায় যুক্তব্যঞ্জন হতে পারে দুটি-তিনটি উপাদান নিয়ে। মস্ত (স্ + ত্), বিঘ্ন (ঘ্ + ন্), ড্রাম (ড্ + র্) এগুলি দুটি ব্যঞ্জনের সংযুক্তির উদাহরণ। আবার সম্ভ্রম (ম্ + ভ্ + র্), স্ত্রী

(স্ + ত্ + র্) এগুলি তিনটি ব্যঞ্জনের সংযুক্তির দৃষ্টান্ত। এই বিষয়ে বিশদ আলোচনা পাওয়া যাবে এই বইয়ের তেইশতম অধ্যায়ে **'বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব'** অংশে।

যুক্তব্যঞ্জন থাকতে পারে শব্দের আদিতে, মধ্যে ও শেষে। আমরা এখানে এই তিনটি অবস্থানে যুক্ত ব্যঞ্জনের দৃষ্টান্ত দেখব।

শব্দের আদিতে—

train /tr–/

cluster /kl–/

cry /kr–/

shrink /ʃr/

শব্দের মধ্যে—

master /–st–/

ended /–nd–/

confuse /–nf–/

শব্দের শেষে—

robbed /–bd/

pushed /ʃt/

lamp /–mp/

বাংলার ক্ষেত্রে বিষয়টাকে একটু অন্যভাবে দেখতে হবে। বাংলায় এমন শব্দ আছে যাতে যুক্তব্যঞ্জন আছে, কিন্তু বানানে তা দেখা যায় না। যেমন, এমনি (ম্ন্), উলটো (ল্ট্), পাগলা (গ্ল্) ইত্যাদি। আবার বানানে দেখা যায় এমনও আছে—তেমন যুক্তব্যঞ্জনই বেশি। যেমন ক্লেদ (ক্ল্), শ্রাবণ (স্র্), কষ্ট (শ্ট্) ইত্যাদি। এই জন্যে বাংলার ক্ষেত্রে সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনি ও সংযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণ এই দুটিকে পৃথকভাবে দেখা দরকার। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে তেইশতম অধ্যায়ে **বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব** অংশে।

৭.৬ ধ্বনিমূল বা স্বনিম (phoneme)

স্বনিম বা ধ্বনিমূল হল phoneme এর পরিভাষা। আগের এক পরিচ্ছেদে বাগ্ধ্বনি বা speech sound এর কথা বলেছি। বাগ্ধ্বনি আর ধ্বনিমূল এক নয়। যেসব ধ্বনি নিয়ে ভাষা, সেগুলিই বাগ্ধ্বনি। অন্যভাবে বলা যায়, বাগ্ধ্বনিই ভাষার প্রধান উপাদান। তাহলে কী তফাত বাগ্ধ্বনি আর ধ্বনিমূল বা মূলধ্বনিতে? মূলধ্বনিও বাগ্ধ্বনি। কিন্তু যেকোনো বাগ্ধ্বনি বা সব বাগ্ধ্বনি নিশ্চয় মূলধ্বনি বা স্বনিম নয়। প্রতিটি শব্দ এক বা একাধিক ধ্বনি দিয়ে গঠিত। যেমন 'কলম' শব্দে আছে ক্ + অ + ল্ + ও + ম্ এইকটি ধ্বনি। আবার 'কলপ' শব্দে আছে ক্ + অ + ল্ + ও + প্ এইকটি ধ্বনি। এবার স্বনিম বুঝতে চেষ্টা করব আমরা। দুটি শব্দের মধ্যে একটি ছাড়া অন্য সব ধ্বনি যদি অভিন্ন হয় তবে

যে-ধ্বনিটির পার্থক্যের জন্য শব্দদুটি আলাদা হয়ে যাচ্ছে, অর্থাৎ দুটি শব্দের অর্থ বদলে যাচ্ছে, সেই ধ্বনিটিকেই phoneme বা স্বনিম বা ধ্বনিমূল বলা হবে। আমাদের উপরের উদাহরণে 'কলম' ও 'কলপ' শব্দে ম্ ও প্ এইদুটি হল ফোনিম বা স্বনিম বা মূলধ্বনি। মনে রাখতে হবে যে, শুধু দুটি ধ্বনি আলাদা হয়ে যাওয়াই এক্ষেত্রে যথেষ্ট নয়। দেখতে হবে ওই ধ্বনির পার্থক্যের জন্য দুটি শব্দের অর্থ বদলে যাচ্ছে কি না, অর্থাৎ দুটি ভিন্ন শব্দ তৈরি হচ্ছে কি না। ইংরেজি দৃষ্টান্ত নিয়েও phonemeকে বোঝানো যায়। আমরা দুটি ইংরেজি শব্দ দেখব—kit ও sit এদুটির ধ্বনি যথাক্রমে /k/, /i/, /t/ এবং /s/, /i/, /t/ এখানে দেখা যাচ্ছে যে k আর s এই দুটির জন্য দুটি পৃথক অর্থপূর্ণ শব্দ তৈরি হয়ে যাচ্ছে। কাজে কাজেই বলা যায় p আর s এই দুটি হল phoneme বা স্বনিম। এই যে দুটি স্বনিমের মধ্যে পার্থক্য, একেই প্রাগ-স্কুলের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ভাষাবিজ্ঞানী ত্রুবেৎস্কই বলেছেন phonic contrast. এই contrast বা বিরোধই অন্যান্য বাগ্‌ধ্বনি থেকে স্বনিমকে পৃথক করে দেয়।

ফরাসি ভাষাবিজ্ঞানী ফ্যর্দিনাঁ দ্য সোস্যুর ফোনিমকে বলেছেন, 'the fundamental unit of sound in any language'. তাঁর মতে একটি ফোনিমের সঙ্গে অপর একটি ফোনিমের পার্থক্যের জন্যেই শব্দের অর্থ বদলে যায় ('differences between phonemes are crucial in generating value')।

৭.৭ স্বনিম বা ধ্বনিমূলের স্বাতন্ত্র্যসূচক বৈশিষ্ট্য (distinctive features of phonemes)

আমরা দেখলাম যে, দুটি ফোনিম বা স্বনিমের পার্থক্য থাকে বলেই আলাদা দুটি শব্দ তৈরি হয়। আবার যেদুটি স্বনিমকে পৃথক বলছি তারাও যে সব দিকে থেকেই পৃথক তা কিন্তু নয়। তাদের মধ্যেও মিল আছে, তফাতও আছে। যদি দেখা যায়, দুটি স্বনিমের মধ্যে উচ্চারণস্থান বা উচ্চারণপ্রকৃতির দিক থেকে মিল থাকলেও একটি বিষয়ে অমিল আছে, তাহলে সেই অমিলটিকেই বলা হবে তাদের 'স্বাতন্ত্র্যসূচক বৈশিষ্ট্য'। একটি-দুটি উদাহরণ দিলেই স্পষ্ট হয়ে যাবে বিষয়টা। ধরা যাক, sip আর zip শব্দদুটি। এদের ধ্বনিগুলি হল যথাক্রমে /s, i, p/ এবং /z, i, p/ দেখাই যাচ্ছে যে s আর z এই দুটি ফোনিমের জন্য দুটি শব্দ আলাদা হয়ে যাচ্ছে। এখন দেখব এদের ধ্বনিচরিত্র। /s/ একটি voiceless (অঘোষ), alveolar (দন্তমূলীয়), এবং fricative (উষ্ম) ধ্বনি। অন্যদিকে, /z/ হল একটি voiced (সঘোষ), alveolar (দন্তমূলীয়) এবং fricative (উষ্ম) ধ্বনি। তাহলে অন্য সব দিকেই এদের মিল রয়েছে। কেবল একটি voiced এবং অন্যটি voiceless. এই পার্থক্যই এদের distinctive feature বা স্বাতন্ত্র্যসূচক বৈশিষ্ট্য।

এবারে বাংলা ধ্বনির দৃষ্টান্ত দিয়ে বুঝতে চেষ্টা করা যাক। 'তালা' ও 'থালা' এই দুটি শব্দ নিয়ে দেখব এদের ধ্বনি—ত্ + আ + ল্ + আ এবং থ্ + আ + ল্ + আ।

অতএব ত্ ও থ্ এইদুটি স্বনিমই শব্দদুটিকে পৃথক করে দিল। ত্ একটি অঘোষ দন্ত্য অল্পপ্রাণ ধ্বনি ; অন্যদিকে, থ্ একটি অঘোষ দন্ত্য মহাপ্রাণ ধ্বনি। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, দুটি ধ্বনির মধ্যে পার্থক্য কেবল অল্পপ্রাণতা ও মহাপ্রাণতায়। এই হল এ-দুটির স্বাতন্ত্র্যসূচক বৈশিষ্ট্য।

৭.৮ ধ্বনির অবস্থান

সব ভাষাতেই ধ্বনির অবস্থান ও ধ্বনিসমাবেশ কতকগুলি নিয়ম মেনে চলে। সে-নিয়ম এক-এক ভাষায় এক-এক রকম। ইংরেজিই বলি, আর বাংলাই বলি, প্রতিটি ধ্বনির তিনটি অবস্থান সম্ভব—initial বা আদি, medial বা মধ্য এবং final বা অন্ত্য। প্রথমে একটি-দুটি vowel বা স্বরধ্বনির আদি, মধ্য ও অন্ত্য অবস্থান দেখব—

স্বরধ্বনির অবস্থান	**আদি**	**মধ্য**	**অন্ত্য**
i	it	sit	booty /bu:ti/
æ	annex |æneks|	cat |kæt|	এই ধ্বনি ইংরেজিতে শেষে থাকে না
ও	ওল (ওল্)	কপোল (কপোল্)	নত (নতো)

ব্যঞ্জনধ্বনির অবস্থান	**আদি**	**মধ্য**	**অন্ত্য**
k	cat /kæt/	bookish /bukiʃ/	back /bæk/
ক্	কবি (কোবি)	নকল (নকোল্)	বুক (বুক্)

ধ্বনির অবস্থান সম্পর্কে কয়েকটা কথা মনে রাখা দরকার। বাংলায় ঙ্ ড় ঢ় এই তিনটি ব্যঞ্জনধ্বনি কখনো শব্দের গোড়ায় আসতে পারে না। খাঁটি বাংলা শব্দে ড্ অন্ত্য অবস্থানে আসে না। বিদেশি শব্দে আসতেও পারে—বেহেড, রড এই ধরনের কিছু শব্দের শেষে ড্ পাওয়া যায়। তেমনি ইংরেজি ভাষায় কোনো শব্দে hl– lh–, gw, এসব বিন্যাস পাওয়া যাবে না।

৭.৯ ধ্বনির সমাবেশ

প্রত্যেক ভাষারই একটা নিজস্ব ধ্বনিচরিত্র আছে যা অন্য ভাষা থেকে তাকে আলাদা করে চিনিয়ে দেয়। এই ধ্বনিচরিত্রের তফাতের জন্য দুটি ভাষায় সমান সংখ্যক স্বরধ্বনি ও সমান সংখ্যক ব্যঞ্জনধ্বনি থাকা সত্ত্বেও ধ্বনিগতভাবে সে-দুটি ভাষা আলাদা হয়ে যেতে পারে। নানান ধ্বনিগত কারণের জন্য দুটি ভাষা আলাদা হয়ে যেতে পারে—ধ্বনির দৈর্ঘ্য বা পরিমাণের জন্য, সিলেবল-পদ্ধতির তফাতের জন্য। কিন্তু দুটি ভাষার পার্থক্য সবচেয়ে বেশি ঘটে ধ্বনিসমবায়ের পার্থক্যের জন্য। ভাষাবিজ্ঞানী এডওয়ার্ড সাপির এই ধ্বনিসমবায়কে

ভাষায়-ভাষায় পার্থক্যের সবচেয়ে বড়ো কারণ বলে মনে করেন—'Most important [differences] of all, perhaps, are the very different possibilities of combining the phonetic elements. Each language has its peculiarities.' যেমন ধরা যাক *ts* এই ধ্বনিসমবায়ের কথা। ইংরেজি ও জার্মান উভয় ভাষাতেই *ts* ব্যবহৃত হয়। তবে ইংরেজিতে কেবল শব্দের শেষে আসতে পারে—*cats, mats, hats;* অন্য দিকে জার্মান ভাষায় শব্দের গোড়াতেও দিব্যি ব্যবহৃত হয় এই **ts** ধ্বনিসমবায়—শব্দের গোড়ায় যেমন *Zeit* (ট্‌সাইট্‌), শব্দের শেষেও তেমনি *Kauz* (কাউট্‌স্‌)।

বাংলায়ও ধ্বনির সমাবেশ ও অবস্থানের কতকগুলি নিয়ম আছে। ১. বাংলায় অ্যা ধ্বনি সচরাচর শব্দের শেষে আসে না, কিছু ধ্বন্যাত্মক শব্দে পাওয়া যায় বটে—ব্যা ব্যা। ২. ঙ্‌ ধ্বনি কোনো শব্দের গোড়ায় আসে না। ৩. তেমনি ড়্‌, ঢ়্‌ দিয়েও শব্দ শুরু হয় না। ৪. বাংলা ভাষায় শব্দের শেষে সংযুক্ত ব্যঞ্জন ধ্বনি সচরাচর থাকে না। সংযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণ স্বরান্ত উচ্চারিত হয়—অন্ত, মস্ত, খড়্গ, বন্ধ, স্তব্ধ—এসব শব্দের শেষের সংযুক্ত ব্যঞ্জন স্বরান্ত উচ্চারিত হয়—অন্‌তো, মস্‌তো, খড়্‌গো, বন্‌ধো, স্তব্‌ধো। তবে কিছু বিদেশি বা প্রতিবেশী ভাষার শব্দের শেষের সংযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণ হসন্ত উচ্চারিত হতে পারে—বন্‌ধ্‌ (bandh), গার্ড (guard), ফার্স্ট (first) ইত্যাদি। আবার আঞ্চলিক বা ঔপভাষিক শব্দের শেষেও কখনো কখনো সংযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণ ব্যঞ্জনের মতেই অর্থাৎ হসন্ত উচ্চারিত হয়। যেমন চান্দ (চান্‌দ্‌ অর্থাৎ চাঁদ)।

(এ বিষয়ে এই গ্রন্থের দ্বিতীয় পর্বে বিশদতর আলোচনা করা হয়েছে)

৭.১০ ন্যূনতম শব্দজোড় (minimal pair)

দুটি শব্দের মধ্যে যদি একটিমাত্র স্বনিম বা ধ্বনিমূলের পার্থক্য থাকে, আর শব্দদুটির অর্থও যদি আলাদা হয়ে যায়, তবে এ-দুটিকে minimal pair বা ন্যূনতম শব্দজোড় বলা হয়। দুটি ইংরেজি শব্দ দিয়ে এর উদাহরণ দেওয়া যাক—mill, pill প্রথম ও দ্বিতীয় শব্দের মধ্যে m ও p এইদুটি ধ্বনিমূলের পার্থক্য দেখা যাচ্ছে, অন্য কোনো পার্থক্য নেই, এবং এইদুটি শব্দের অর্থও আলাদা। তাই এরা minimal pair বা ন্যূনতম শব্দজোড়ের দৃষ্টান্ত। বাংলায় কাল/খাল, কোল/খোল, মান/পান এইসব জোড়াকে অনুরূপভাবে ন্যূনতম শব্দজোড় বলা যাবে। এমন হতে পারে যে, দুটি শব্দের একটি ধ্বনি অল্পপ্রাণ (যেমন ক্‌), অন্যটির ধ্বনি মহাপ্রাণ (খ্‌)। আবার অনুনাসিক ধ্বনি নিয়েও ন্যূনতম জোড় করা যায়। যেমন—

আশ—আঁশ
পাক—পাঁক
দাও—দাঁও

এখানে উল্লেখ করা যায় যে, minimal pair drill বা ন্যূনতম শব্দজোড়ের অনুশীলন দিয়ে ভাষার শিক্ষার্থীকে বা বিদেশিকে ভাষা শেখানো যায় সহজে। অল্পপ্রাণ-মহাপ্রাণ ধ্বনি দিয়ে ন্যূনতম জোড়ের অনুশীলন দেওয়া যায়—

চাল—ছাল
দাম—ধাম
চা—ছা

প্রতিটি ক্ষেত্রে একটি মাত্র ধ্বনি বা মূলধ্বনির জন্য শব্দ আলাদা হয়ে গেল, অর্থও বদলে গেল।

আগেই দেখেছি অনুনাসিকতা দিয়েও ন্যূনতম জোড় করা যায়—

বাস (বাশ্)—বাঁশ
পাক—পাঁক

আবার সঘোষ-অঘোষ ধ্বনির ন্যূনতম শব্দজোড়ও হতে পারে—

থান—ধান
খাই—ঘাই

৭.১১ পূরক ধ্বনি বা সহধ্বনি (allophone)

কোনো-কোনো ভাষায় পূরকধ্বনি বা সহধ্বনি থাকে। কোনো ধ্বনির বা ধ্বনিমূলের ভিন্ন রূপকেই পূরকধ্বনি বা সহধ্বনি বলা হয়। ইংরেজিতে /p/ ধ্বনির দুটি পৃথক উচ্চারণ আছে। শব্দের গোড়ায় put, policy, pen প্রভৃতি শব্দে p কিছুটা মহাপ্রাণিত হয়ে ফ্-ধ্বনির মতো উচ্চারিত হয়—ফুট্, ফলিসি, ফেন্। কিন্তু আন্তর্জাতিক ধ্বনিমূলক লিপিতে (IPA) এর কোনো পৃথক চিহ্ন নেই—/put/, /polisi/, /pen/ আবার sport, spin প্রভৃতি শব্দের p প্ বা /p/ উচ্চারিত হয়। এই উচ্চারণে মহাপ্রাণতা বা aspiration নেই। এক্ষেত্রে aspirated বা মহাপ্রাণিত উচ্চারণকে /p/ ধ্বনিমূলের উচ্চারণভেদ বলা যেতে পারে। ধ্বনিতত্ত্বে এই উচ্চারণভেদকেই পূরকধ্বনি বা সহধ্বনি বলা হয়। বাংলায় যখন 'লতা', 'লাঠি' বলি তখন ল্-ধ্বনি যেভাবে উচ্চারণ করি, 'উলটো' শব্দে ল্-ধ্বনিকে সেভাবে উচ্চারণ করি না—'উলটো'-র ল্ কিছুটা প্রতিবেষ্টিত বা retroflex. এই দ্বিতীয় ল্-ধ্বনিটি সাধারণ ল্-ধ্বনির পূরকধ্বনি।

৭.১২ সিলেবল, দল, অক্ষর (syllable)

অক্ষর শব্দের একটি অর্থ বর্ণ, দ্বিতীয় অর্থ সিলেবল। সিলেবলকে সিলেবল কিংবা দল বলাই সংগত। সিলেবলের সংজ্ঞার্থ সম্বন্ধে ভাষাতাত্ত্বিক ও ধ্বনিবিজ্ঞানীরা বহুকাল পর্যন্ত একমত হতে পারেননি। তবে বিতর্ক এড়িয়ে সাধারণভাবে বলা যায়, শ্বাসবায়ুর স্বল্পতম প্রয়াসে উচ্চারিত ধ্বনি বা ধ্বনিগুচ্ছই সিলেবল বা দল। আমরা ধ্বনিগুলিকে ছোটো-ছোটো অংশে ভাগ করে নিয়ে উচ্চারণ করি। তারই এক-একটি ভাগ সিলেবল। মনে রাখতে হবে, সিলেবল বা দল ধ্বনি নিয়ে গঠিত, বর্ণ নিয়ে নয়। অর্থাৎ আমরা যেমন কানে শুনি তেমনিভাবে সিলেবল বিচার করি, বানান দিয়ে নয়। 'পুস্তক' কথাটির সিলেবল-ভাগ এইরকম—পুস্-তক্।

মা, আম, আমরা, সেলাই, পৃথগন্ন এই শব্দগুলির সিলেবল-ভাগ যথাক্রমে

মা = মা (এক সিলেবল)
আম = আম্ (এক সিলেবল)
আমরা = আম্-রা (দুই সিলেবল)
সেলাই = শে + লাই্ (দুই সিলেবল)
পৃথগন্ন = প্রি-থ-গন্-নো (চার সিলেবল)

এই শব্দগুলি থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ প্রভৃতি সংখ্যক সিলেবল নিয়ে শব্দ গঠিত হতে পারে। সিলেবলে অন্তত একটি স্বরধ্বনি থাকবেই।

আবার একটিমাত্র সিলেবল নিয়েও শব্দ হতে পারে—'ইলিশ' শব্দে দুটি সিলেবল—ই আর লিশ্। 'ই' একটি সিলেবল। ইংরেজি ভাষায়ও সিলেবল অনুরূপভাবে ধ্বনির উচ্চারণ দিয়ে স্থির হয়। 'defame' শব্দে আছে দুটি সিলেবল্ di-feim বা ডি-ফেইম্, expensive শব্দে তিনটি—ik-spen-siv বা ইক্-স্পেন্-সিভ্।

দল বা সিলেবল সম্বন্ধে আরও কয়েকটি কথা বলা প্রয়োজন। প্রথমত, সিলেবলের গঠনে থাকে আদি বা onset, কেন্দ্র বা core এবং অন্ত বা coda. দলের কেন্দ্র অবশ্যই হবে একটি স্বরধ্বনি। দ্বিতীয়ত, দল হতে পারে মুক্ত ও রুদ্ধ (open ও closed)। যে-সিলেবলের শেষে স্বরধ্বনি থাকে, তাকে মুক্ত দল বা মুক্ত সিলেবল এবং যে-সিলেবলের শেষে অর্ধস্বর বা ব্যঞ্জনধ্বনি থাকে, তাকে রুদ্ধ দল বলা হয়। খা, দে, পা, যা এইগুলি মুক্ত দলের দৃষ্টান্ত এবং বই, যাই, যাক, মন এইগুলি রুদ্ধ দলের দৃষ্টান্ত। তৃতীয়ত, অর্ধস্বর সিলেবল তৈরি করে না। যা (জা) এবং যাই (জাই্) দুটিই একটি দলের দৃষ্টান্ত।

গ্রন্থপঞ্জি

১. আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ—আধুনিক ভাষাতত্ত্ব (১৯৯৭)
২. কাজী সিরাজ—আধুনিক ভাষাবিজ্ঞান (১৯৯৭)
৩. বসু, দ্বিজেন্দ্রনাথ— বাংলা ভাষার আধুনিক তত্ত্ব ও ইতিকথা (১৯৮০)
৪. ভট্টাচার্য, সুভাষ—বাঙালির ভাষা (২০০০)
৫. পাল, পলাশ বরন—ধ্বনিমালা বর্ণমালা (২০০১)
৬. শ', রামেশ্বর—সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা, দ্বিতীয় খণ্ড (১৯৮৮)
৭. সরকার, পবিত্র—বাংলা ব্যাকরণ প্রসঙ্গ (২০০৬)
—পকেট বাংলা ব্যাকরণ (১৯৯৪)
৮. হাই, মুহম্মদ আবদুল—ধ্বনিবিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব (২০০৪)
৯. Bloomfield, Leonard—Language (1933)
১০. Gleason, H.A.—An Introduction to Descriptive Linguistics (1961)
১১. Hockett, C.F.—A Course in Modern Linguistics (1958)
১২. Laver, John—Principles of Phonetics (2000)
১৩. O'Connor, J.D—Better English Pronunciation (1989)
১৪. Radford, A & others—Linguisties : An Introduction (2002)

৭ (ক). আন্তর্জাতিক ধ্বনিমূলক লিপি
(International Phonetic Alphabet)

৭.ক.১ আন্তর্জাতিক ধ্বনিমূলক লিপির ইতিহাস

আন্তর্জাতিক ধ্বনিমূলক লিপি হল রোমান বর্ণমালার উপর ভিত্তি করে রচিত এমন এক লিপি যা পৃথিবীর সমস্ত ভাষার উচ্চারণকে স্বচ্ছভাবে নির্দেশ করতে পারে বা বোঝাতে পারে। অবশ্য রোমান বর্ণমালায় কতকগুলি বাড়তি চিহ্ন যোগ করেই তৈরি হয়েছে এই ধ্বনিমূলক লিপি। বিশেষ-বিশেষ ভাষার উচ্চারণ-নির্দেশের প্রয়োজনেই তা করতে হয়েছে। এই ধ্বনিলিপি প্রস্তুত করেছে একটি সংস্থা যার নাম International Phonetic Association. ১৮৮৬ সালে এই আর্ন্তজাতিক সংস্থাটির পত্তন হয় ফ্রান্সে। প্রথম অবশ্য কেবল ইংরেজি ভাষার ক্ষেত্রেই সংস্থার সূত্র বা নিয়ম প্রয়োগ করা হবে বলে স্থির হয়। তবে শীঘ্রই ইয়োরোপের বিভিন্ন দেশের ধ্বনিবিজ্ঞানীরা এর সঙ্গে যুক্ত হন। যুক্ত হন অটো ইয়েসপেরসেন (Otto Jespersen), ভিল্‌হেল্‌ম ফিয়্যটর (Wilhelm Viëtor), হেনরি স্যুইট (Henry Sweet) প্রভৃতি বিশেষজ্ঞরা। সকলের চেষ্টায় ইংরেজি ছাড়াও জার্মান ও ফরাসি ভাষার জন্য ধ্বনিলিপির চিহ্ন ও সূত্র তৈরি হয়ে যায়। ১৮৮৬ সালে এবং পরে ১৮৮৮ সালে The Phonetic Teacher নামে একটি পুস্তক প্রকাশিত হয় যাতে আন্তর্জাতিক ধ্বনিলিপির প্রধান সূত্র বা নীতিগুলি বিবৃত হয়। সেগুলি এইরকম—

১. 'There should be a separate letter for each distinctive sound' অর্থাৎ প্রত্যেক ধ্বনির জন্য আলাদা অক্ষর বা বর্ণ থাকবে।

২. 'When any sound is found in several languages, the same sign should be used in all'.
যদি একই ধ্বনি একাধিক ভাষায় থাকে, তবে সেই একই অক্ষর বা বর্ণ সবকটি ভাষাতেই ব্যবহৃত হবে।

৩. 'The alphabet should consist as much as possible of the ordinary letters of the 'Roman' alphabet, as few new letters as possible being used.'
রোমক বর্ণমালায় ব্যবহৃত সাধারণ ও সর্বজনপরিচিত অক্ষরই ব্যবহার করা হবে, যতদূর সম্ভব নতুন অক্ষর কমই ব্যবহারের চেষ্টা করা হবে।

৪. 'Diacritic marks should be avoided, being trying for the eyes and troublesome to write'.

ডায়াক্রিটিক চিহ্ন বা ধ্বনি নির্দেশক চিহ্ন (অক্ষরের মাথায় বা নীচে) এড়াবার চেষ্টা করা হবে, কেননা ওইসব চিহ্ন চোখের পক্ষে পীড়াদায়ক, লেখার পক্ষে কষ্টকর।

সূত্র আরও কয়েকটি ছিল, তবে প্রধান সূত্র এগুলিই। আমরা পরে দেখতে পাব যে, পরবর্তীকালে চতুর্থ সূত্রটির বদল হয়েছে। অর্থাৎ কিছু diacritic চিহ্ন ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত পরে নেওয়া হয়েছে। অন্যান্য সূত্রগুলি ১৮৮৮ সাল থেকে আজ পর্যন্ত অপরিবর্তিত আছে। কোথাও কোথাও দু-একটি উপনিয়ম যোগ হয়েছে মাত্র।

আজ সারা পৃথিবীর ভাষাতাত্ত্বিক ও ধ্বনিবিজ্ঞানীরা আন্তর্জাতিক ধ্বনিমূলক লিপি বা IPA গ্রহণ করেছেন এবং তাঁদের সর্বপ্রকার আলোচনায় এবং গ্রন্থাদিতে এই আন্তর্জাতিক ধ্বনিলিপি ব্যবহার করছেন। পৃথিবীর অধিকাংশ উন্নত অভিধানে উচ্চারণ-নির্দেশের জন্য IPA ব্যবহৃত হচ্ছে।

৭.ক.২ আন্তর্জাতিক ধ্বনিমূলক লিপি—সংযোজন

১. ১৯৪৯ সালে আন্তর্জাতিক ধ্বনিমূলক সংস্থা নতুন করে কয়েকটি সূত্রের কথা বলে। যেমন বলা হল যে, উচ্চারণ-নির্দেশক চিহ্ন বা diacritical signs পুরোপুরি এড়ানো সম্ভব নয় বলে কতকগুলি চিহ্ন প্রবর্তিত হল। যেমন ejective stop (বহিঃস্ফোটক স্পর্শধ্বনি বোঝাতে þ', t', c', k' প্রভৃতি ; t^h, d^h, ụ, ẽ, ë, b̤, ইত্যাদি বেশ কিছু চিহ্ন যোগ করা হয়। উচ্চারণের সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনা বা আভাসগুলিও (shades) যাতে দেখানো যায় তার জন্যই এই ডায়াক্রিটিক চিহ্নগুলির সংযোজন। এর ফলে শুধু কোনো ভাষার মান্য উচ্চারণই নয়, উপভাষার উচ্চারণও অত্যন্ত নিখুঁতভাবে নির্দেশ করা সম্ভব হল।

২. আন্তর্জাতিক ধ্বনিমূলক লিপি যাতে কোনো ভাষার পরস্পর-সংবদ্ধ পাঠবস্তুর (connected text) উচ্চারণ দেখাতে পারে তারও ব্যবস্থা করা হল। একটা উদাহরণ দিয়ে বিষয়টাকে বোঝানো যেতে পারে।

   'মা আমার' কথাটি যখন স্বতঃস্ফূর্তভাবে উচ্চারিত হয় তখন আমরা বলি **'মায়ামার'**। আন্তর্জাতিক ধ্বনিলিপিতে এই connected উচ্চারণ বোঝাতে লেখা হয়—ma(ĕ)amar।

   অর্থাৎ 'মা' এবং 'আমার' এই দুটি শব্দের মধ্যে একটা glide বা শ্রুতিধ্বনি চলে আসে। তাকে বোঝাবার জন্যই ĕ চিহ্নটি ব্যবহৃত হয়। বিশেষত সুর ও প্রস্বর বোঝাতে ডায়াক্রিটিক চিহ্নের অপরিহার্যতা স্বীকৃত হল।

৩. রোমক বর্ণমালাই কেবল ব্যবহৃত হবে এই সিদ্ধান্তের একটু বদল হল পরে। যেমন গ্রিক বর্ণমালা থেকে থিটা বা θ এবং delta δ নেওয়া হল।

৭.ক.৩ কিল সম্মেলনে (Kiel Convention 1989) সংযোজন

১৯৮৯ সালে উত্তর জার্মানির কিল শহরে ধ্বনিবিজ্ঞানীদের এক সম্মেলনে আন্তর্জাতিক ধ্বনিমূলক লিপিতে কয়েকটি পরিবর্তন ও সংযোজনের কথা বলা হয়। যে প্রস্তাবগুলি

গৃহীত হয় এবং পরে International Phonetic Association-এর নিয়মাবলির অন্তর্ভুক্ত হয় সেগুলি এই রকম—

১. ১৯৮৮ সালে ভাষাবিদ কোলার (O.P. Köhler), স্নাইম্যান (J. Snyman), ট্রেইল (A. Trail) এবং ফস্‌সেন (R. Vossen) শীৎকার ধ্বনির জন্য কয়েকটি চিহ্নের প্রস্তাব করেছিলেন। সেই প্রস্তাব কিলে গৃহীত হল। বিশেষত আফ্রিকার ভাষাসমূহের উচ্চারণ-নির্দেশের জন্যই এই প্রস্তাব।
২. Suprasegments বা অবিভাজ্য ধ্বনি যথাযথভাবে বোঝাবার জন্য কতকগুলি চিহ্ন উদ্‌ভাবিত হল। সেগুলির মধ্যে ∩, ∪, ↗, ↘, ˥, ˦, ˧ ˨, ˩ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

৭.ক.৪ বিভিন্ন ভাষার জন্য ব্যবহৃত ধ্বনিচিহ্ন

আন্তর্জাতিক ধ্বনিমূলক সংস্থার সূত্র অনুসারে কয়েকটি প্রধান ভাষার ধ্বনিচিহ্ন দেখানো যেতে পারে।

১. ইংরেজি ভাষার ধ্বনিচিহ্ন

বিভিন্ন রকমের এবং বিভিন্ন সময়ে পরিবর্তন-সংযোজনের পরে ইংরেজি ভাষায় ধ্বনিচিহ্ন হিসাবে কতকগুলি বিশেষ চিহ্নের ব্যবহার স্বীকৃত হয়েছে।

ব্যাঞ্জনধ্বনি—b, d, δ, f, g, h, k, l, m, n, ŋ, p, r, s, ʃ, t, θ, v, w, z, ʒ

স্বরধ্বনির চিহ্ন— ʌ, i, e, ɒ, ʊ, ə, æ

দীর্ঘস্বর— i:, a:, ɔ:, u:, ɜ:

দ্বিস্বরধ্বনি (diphthong)— ei, ai, ɔi, əʊ, aʊ, iə, eə, ʊə

অর্ধস্বর—j

বিশেষভাবে খেয়াল রাখার মতো হল—

δ = দ
ŋ = ং, ঙ্‌
ʃ = শ (sh)
θ = থ
ʒ = জ় (measure)
j = য়্‌

He went home. My brother went to school. I heard the sound of thunder.

এই তিনটি বাক্য IPA-তে লেখা হবে এইভাবে—

hi: went həʊm mai brʌδə(r) went tə sku:ℓ. ai hɜ:d δə saʊnd əv θʌndə(r)

২. **ফরাসি ভাষার ধ্বনিলিপি**

স্বরধ্বনি—a, *a*, e, ɛ, ə, i, o, ɔ, œ, ɸ, u, y

অর্ধস্বর—j, ɥ, w

অনুনাসিক স্বর—ã, ɛ̃, ɔ̃, œ̃

ব্যঞ্জনধ্বনি—b, d, f, g, k, l, m, n, ɲ, ŋ, p, R, s, ʃ, t, v, z, ʒ

মনে রাখতে হবে ফরাসি ভাষার উচ্চারণের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য—

t = ত্

th = ত্

d = দ্

z = জ়্

ʒ = জ়্

ɲ = ঞ্

ŋ = ং, ঙ্

R = র্‌হ্

একটি-দুটি বাক্য ও বাক্যাংশ নিয়ে ধ্বনিলিপি দেখা যাক—

le moment venu (যখন সময় আসবে) [lə mɔmã vəny] ল্য মমাঁ ভ্যন্যু

deux grandes fenêtres (দুটি বড়ো জানালা) [dɸgrã:d fəneɛ:tr] দ্য গ্রাঁদ্ ফ্যন্য-ত্র্।

৩. **জার্মান ভাষার ধ্বনিচিহ্ন**

স্বরধ্বনি—*a*, e, i, ə, ɔ, u, æ

দ্বিস্বরধ্বনি— ai, aʊ ei, ɔy, uɔ, iə, ɛə

ব্যঞ্জনধ্বনি—b, d, f, g, h, k, l, m, n, p, r, s, ʃ, t, v, x (kh), z, ʒ

অর্ধস্বর—j

Brand (আগুন) [brant] ব্রান্ট্

Christ-baum (ক্রিসমাস ট্রি) [Kristbaʊm] ক্রিস্ট্ বাউম্

Verweis (তিরস্কার) [fɛrvais] ফের্‌ভাইস্

৪. **বাংলা ভাষার ধ্বনিচিহ্ন**

স্বরধ্বনি—

i	ই	দিন, দীন	[din]
a	আ	বাসা	[baʃa]
e	এ	মেদিনী	[medini]
o	ও	কোদাল	[kodal]
ɔ	অ	বসন্ত	[bɔʃonto]

æ	অ্যা	বেলা	[bæla]
u	উ	পুলক	[pulɔk]

অর্ধস্বর ও হ্রস্বস্বর—

ĭ	ই্	যাই	[Jaĭ]
ĕ	য়্	দায়	[daĕ]
ŏ	ও্	গাও	[gaŏ]
		খাওয়া	[khaŏa]
ŭ	উ্	দাউ দাউ	[daŭ daŭ]

অনুনাসিক স্বরধ্বনি—

Ĩ	ইঁ	ইঁদুর	[Ĩdur]
ã	আঁ	কাঁসা	[kãʃa]
ẽ	এঁ	কেঁচো	[kẽco]
õ	ওঁ	ভোঁদড়	[bɦõdorɽ]
ɔ̃	অঁ	গঁদ	[gɔ̃d]
æ̃	অ্যাঁ	স্যাঁতসেঁতে	[ʃæ̃tʃẽte]
ũ	উঁ	কুঁচো	[kũco]

ব্যঞ্জনধ্বনি

p, ph, b, bɦ, m, t, th, d, dɦ, s, n, r,
ʈ, ʈh, ɖ, ɖɦ, r, rɦ, c, ch, J, Jh, ʃ, k, kh, g, gɦ, ŋ, ɦ

লক্ষণীয়

bɦ (ভ্), dɦ (ধ্), ʈ (ট্), ʈh (ঠ্), ɖ (ড্), ɖɦ (ঢ্), ɽ (ড়্),
ɽɦ (ঢ়্), c (চ্), J (জ্), Jɦ (ঝ্), ʃ (শ), gɦ (ঘ্), ŋ (ং, ঙ্), ɦ (হ্)

কয়েকটি বাংলা বাক্যের ধ্বনিলিপি দেখব এবার—

পথের ধারে বসেছিলাম। পথেই দেখা হল তার সঙ্গে। তাঁর অসামান্য কীর্তির কথা কে না জানে। দুর্বল লোক মরার আগেই মরে।

[pɔther dɦare boʃechilam / pɔtheĭ dækha ɦolo tar ʃɔŋge / tãr ɔʃamanno kirtir kɔtha ke na Jane/ durbɔl lokmɔrar ageĭ mɔre]

গ্রন্থপঞ্জি

১. ভট্টাচার্য, সুভাষ—সংসদ বাংলা উচ্চারণ অভিধান (২০০৩)
২. Chatterji Suniti Kumar—A Bengali Phonetic Reader (1986)
৩. International Phonetic Association—The Principles of the International Phonetic Association (1949, 1969)
৪. Laver, John—Principles of Phonetics (2000)

৮. রূপতত্ত্ব (morphology)

৮.১ রূপতত্ত্ব কী?

ভাষায় ব্যবহৃত শব্দের গঠন-নির্মাণই রূপতত্ত্ব (morphology)। Morphology কথাটি এসেছে morph থেকে, যার অর্থ হল রূপমূল বা রূপিম। সেই রূপমূল থেকে শব্দ কীভাবে গঠিত হয়, কীভাবে তা বাক্যে ব্যবহৃত হয়, সেসবই রূপতত্ত্বের আলোচ্য। রূপমূল (morph বা morpheme) হল ভাষার ক্ষুদ্রতম অর্থপূর্ণ খণ্ড অর্থাৎ ভাষার ক্ষুদ্রতম অর্থপূর্ণ টুকরো। সেই টুকরোগুলি কীভাবে একে অপরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে শব্দগঠন করে, তা-ই হল রূপতত্ত্বের মূল কথা।

এখানে দু-একটি কথা স্পষ্ট করে নেওয়া প্রয়োজন। বুঝে নেওয়া দরকার যে, রূপমূল ভাষার ক্ষুদ্রতম অর্থপূর্ণ একক বটে, তবে সেই এককটি আবার গঠিত হয় একটি বা একটির বেশি ফোনিম বা ধ্বনিমূল নিয়ে।

রূপমূলের তাহলে কয়েকটি লক্ষণ আছে। প্রথমত, তাকে হতে হবে **ভাষার ক্ষুদ্রতম একক**। অর্থাৎ তাকে আর ক্ষুদ্রতর অংশে ভাগ করা যাবে না। দ্বিতীয়ত, তাকে হতে হবে **একটি বা একাধিক ধ্বনিমূল দিয়ে গঠিত**। তৃতীয়ত, কোনো **রূপমূল অর্থহীন নয়**।

এবারে দেখা যাক কয়েকটি রূপমূলের দৃষ্টান্ত।

The boy eats rice.

এই বাক্যে the, boy, eat, s, rice এই পাঁচটি morpheme বা রূপমূল আছে। বাংলা থেকে উদাহরণ নিতে পারি—

ছেলেটিকে রোজ দেখি

এই বাক্যে ছেলে, টি, কে, রোজ, দেখ্ ই এই ছয়টি রূপমূল পাচ্ছি। এখানে লক্ষ করবার বিষয় এই যে, কোনো কোনো রূপমূলের অর্থ থাকলেও তা পৃথকভাবে বাক্যে ব্যবহৃত হতে পারে না। উপরের ইংরেজি উদাহরণে—s এবং বাংলা বাক্যের উদাহরণে—'টি', 'কে' আলাদাভাবে বাক্যে ব্যবহৃত হয় না।

ঠিক এইখানে এসে আর একটা কথা বলা দরকার। মার্কিন ভাষাবিজ্ঞানী লেনার্ড ব্লুমফিল্ড দু-রকম রূপমূলের কথা বলেছেন—free morph বা মুক্ত রূপমূল এবং bound morph বা বদ্ধ রূপমূল। যেসব রূপমূল অন্য রূপমূলের সাহায্য ছাড়াই বাক্যে ব্যবহৃত হতে পারে, সেগুলিকে মুক্ত রূপমূল বলা হবে। যেমন boy, eat, rice; ছেলে, রোজ। আবার যেগুলো নিজে নিজে বাক্যে ব্যবহৃত হতে পারে না সেগুলোই বদ্ধ রূপমূল। প্রত্যয়, বিভক্তি, উপসর্গ প্রভৃতি হল বদ্ধ রূপ বা রূপমূল। তার মানে the, a, -ing, -ed; টি, -তে, -কে এগুলো বদ্ধ রূপ বা রূপমূল।

এবারে দেখা যাক শব্দ বা পদের সঙ্গে রূপমূলের পার্থক্য কী? সব শব্দই স্বাধীনভাবে বাক্যে ব্যবহৃত হতে পারে। আর বাক্যে ব্যবহৃত শব্দই পদ। অন্য দিকে, সব রূপমূল স্বাধীনভাবে বাক্যে ব্যবহৃত হতে পারে না। একটু আগে আমরা যে বদ্ধ রূপ বা closed morph-এর কথা বলেছি সেগুলো স্বাধীনভাবে বাক্যে ব্যবহৃত হতে পারে না।

৮.২ রূপমূল দিয়ে শব্দগঠন ও পদগঠন

আমরা আগেই দেখেছি যে, রূপমূল দু-রকমের হতে পারে—মুক্ত রূপমূল ও বদ্ধ রূপমূল। শব্দ তৈরি হয় এক বা একাধিক রূপমূল দিয়ে। মা, না এগুলি একটি রূপমূলের দ্বারা গঠিত শব্দের দৃষ্টান্ত। আমরা দেখে নেব এক ও একাধিক রূপমূল কীভাবে শব্দ তৈরি করে।

একটি মুক্ত রূপমূল নিয়ে তৈরি শব্দ—

মা, না, হ্যাঁ, চা।

একটি মুক্ত রূপমূল ও একটি বদ্ধ রূপমূল—

ছেলেটি (ছেলে + টি)

বাঁদরের (বাঁদর + এর)

একটি বদ্ধ রূপমূল ও একটি মুক্ত রূপমূল—

আকণ্ঠ (আ + কণ্ঠ)

উপনগরী (উপ + নগরী)

একটি বদ্ধ রূপমূল, একটি মুক্ত রূপমূল, একটি বদ্ধ রূপমূল—

উপনগরীগুলি (উপ + নগরী + গুলি)

ইংরেজি ভাষার কয়েকটি word নিয়ে morpheme বা রূপমূল দেখানো যেতে পারে—

uncompleted (ʌn, kəmplit, id)

boys (bɔi, z)

প্রথম শব্দে un একটি বদ্ধ রূপমূল, complete মুক্ত রূপমূল -ed বদ্ধ রূপমূল।

দ্বিতীয় শব্দে boy মুক্ত রূপমূল, -s বদ্ধ রূপমূল।

৮.৩ রূপতত্ত্বের আলোচ্য বিষয়

রূপতত্ত্বে সাধারণভাবে শব্দের গঠন ও গঠনপ্রক্রিয়াই আলোচ্য বিষয়। তবে বিশদভাবে বলতে গেলে, ভাষায় শব্দগঠনের যতরকম প্রক্রিয়া আছে সেসবই রূপতত্ত্বে আলোচিত হয়। কাজেই প্রত্যয়, বিভক্তি, সমাস, শব্দের দ্বিত্ব, উপসর্গ, অনুসর্গ প্রভৃতি সব প্রকরণই রূপতত্ত্বের আলোচনায় আসবে।

প্রত্যয় ও উপসর্গযোগে শব্দগঠন ; বিভক্তি

শব্দগঠনের একটি প্রধান প্রক্রিয়া হল প্রত্যয় ও উপসর্গযোগ। এ ব্যাপারে প্রত্যয়ের

ভূমিকা খুবই গুরত্বপূর্ণ। ইংরেজি ভাষায় inflexional suffixes এবং derivational suffixes অর্থাৎ বিভক্তি ও প্রত্যয় রূপতত্ত্বের অন্তর্গত বিষয়। সাধারণভাবে প্রত্যয় শব্দের শেষে বসে। বাংলায় তিন রকমের প্রত্যয়ের ব্যবহার হয়—সংস্কৃত প্রত্যয়, বাংলা প্রত্যয়, বিদেশি প্রত্যয়। আবার প্রত্যয়ের চরিত্রও বিভিন্ন রকম—লিঙ্গপ্রত্যয়, বহুবচনসূচক প্রত্যয়, নির্দেশক প্রত্যয়। কৃৎ ও তদ্ধিত প্রত্যয় তো আছেই—বাংলা ও সংস্কৃত দুই ভাষারই। উপসর্গযোগেও শব্দ তৈরি হয়—উপবাস, উপনদী, অপমান ইত্যাদি তার উদাহরণ।

সমাসযোগে শব্দগঠন

শব্দগঠনে সমাসের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। দুই বা তার বেশি শব্দকে সমাসবদ্ধ করা হলে একটি নতুন শব্দ তৈরি হয়। ঘর ও জামাই দুটি পৃথক শব্দ। এ-দুটিকে জুড়ে যখন *ঘরজামাই* শব্দটি তৈরি হয় তখন পাওয়া যায় একটি নতুন শব্দ।

শব্দের দ্বিত্ব করে শব্দগঠন

অনুরূপভাবে একই শব্দকে পরপর দুবার ব্যবহার করেও নতুন শব্দ তৈরি করা যায়। তার দৃষ্টান্ত হল—জ্বরজ্বর, বছর-বছর, মরোমরো, হাসি-হাসি (মুখ)। এইভাবে শব্দের দ্বিত্ব করা হয় নানান অর্থে, কখনো 'প্রায়' অর্থে, যেমন মরোমরো, হাসি-হাসি। আবার বারংবারতা বা প্রাচুর্য বোঝাতেও শব্দের দ্বিত্ব করা হয়, যেমন বছর-বছর, গাছে-গাছে, মুঠো-মুঠো ইত্যাদি। এছাড়া প্রযোজক ব্যবহার করে, সন্ধির যোগে, অনুকার শব্দ ব্যবহার করে, ধ্বনির বদল ঘটিয়ে নতুন নতুন শব্দ তৈরি হয়।

৮.৪ রূপতত্ত্বের বিষয়ীভূত অন্যান্য প্রকরণ

রূপতত্ত্বে আলোচিত হয় আরও বহু বিষয়। যেমন পদপ্রকরণ বা শব্দশ্রেণি, শব্দের গঠনগত শ্রেণি, কারক-বিভক্তি, লিঙ্গপ্রকরণ ; বচন ; বাচ্য ইত্যাদি। এই প্রসঙ্গে আরও একটি প্রকরণের কথা আমরা বিশেষভাবে উল্লেখ করব—রূপধ্বনিতত্ত্ব (morphophonemics)। শব্দগঠনের প্রক্রিয়ায় কখনো-কখনো ধ্বনিগত পরিবর্তন ঘটে। সেই পরিবর্তনে যেহেতু রূপমূল ও ধ্বনিমূল দুই-ই জড়িত, তাই একে morphophonemics বা রূপধ্বনিতত্ত্ব বলা হয়। দু-একটা উদাহরণ দিয়ে এই বিষয়টিকে স্পষ্ট করি।

'ঘট' (ঘট্), কিন্তু 'ঘটি' উচ্চারণ ঘোটি
ব্যাটা কিন্তু বেটি
ফেলা (ফ্যালা) কিন্তু ফেলি
বেলা কিন্তু বেলাবেলি (ব্যালাবেলি)
বক্তা (বক্‌তা) কিন্তু বক্তৃতা (বোক্‌ত্রিতা)

এইসব ক্ষেত্রে একটি শব্দ থেকে অন্য শব্দ তৈরি করার সময় ধ্বনিগত পরিবর্তন ঘটে যাচ্ছে। এই পরিবর্তনের নাম হল স্বরের উচ্চতাসাম্য (vowel height assimilation)। এসসময় একে স্বরসংগতি বা vowel harmony বলা হত। পবিত্র সরকার সংগতভাবেই এই নামটির পরিবর্তে 'স্বরের উচ্চতাসাম্য' বলার প্রস্তাব করেছেন (দ্র. বাংলা ব্যাকরণ প্রসঙ্গ, ২০০৬, পৃ.১০১)।

৮.৫ সহরূপমূল (allomorph)

ধ্বনিমূলের ভিন্ন রূপ যেমন পূরকধ্বনি বা সহধ্বনি, তেমনি রূপমূলের ভিন্ন রূপ হল সহরূপ। কি ইংরেজিতে, কি বাংলায় কোনো-কোনো রূপমূলের ভিন্নতা দেখা যায়। ইংরেজি ভাষায় বহুবচনসূচক morph /s/, যার দৃষ্টান্ত *cats, books, roots* আবার কখনো-কখনো এই morph-এর বিভিন্নতা দেখা যায়। যেমন boys-এ /z / (bɔiz), pens-এ /z / (penz)। আবার কোথাও-কোথাও /iz / যেমন noises-এ /nɔiziz / বা নইজ়িজ়্। এই /z / ও /iz / হল /s / morph বা morpheme এর ভিন্ন রূপ বা সহরূপ। এখন প্রশ্ন হল, কোথায় /s /, কোথায় /z / আর কোথায়ই বা /iz / হয়? তার কি নিয়ম আছে কোনো? নিশ্চয় আছে।

প্রথমত s রূপমূলটির উচ্চারণ /z / হবে শুধুই ঘোষধ্বনি পরে থাকলে। pens-এর s রূপমূলটির উচ্চারণ /z / হচ্ছে, কেননা /n / একটি সঘোষ (voiced) ধ্বনি। আবার যেসব রূপমূলের শেষে অর্ধস্বর বা স্বরধ্বনি থাকে তাদেরও বহুবচনের s উচ্চারিত হবে /z /, যেমন হয় boys-এর s রূপমূলটি।

দ্বিতীয়ত, রূপমূলের শেষে অঘোষ ধ্বনি (voiceless) থাকলে বহুবচনের s উচ্চারিত হবে /s / যেমন cats, bats প্রভৃতি শব্দের s।

তৃতীয়ত, রূপমূলের শেষে ঘৃষ্ট ধ্বনি (affricates) থাকলে s-এর উচ্চারণ /iz / হবে। যেমন উপরে আমরা দেখেছি যে noise /nɔiz /-এর শেষে /z / এই ঘৃষ্টধ্বনি থাকায় বহুবচনের s উচ্চারিত হল /iz /।

বাংলা ভাষায় বহুবচনসূচক রা, গুলি, গুলো একটি রূপমূলের সহরূপমূল। অর্থের দিক থেকে এরা অভিন্ন, কিন্তু ধ্বনিগত দিক থেকে পৃথক।

৮.৬ রূপধ্বনিতত্ত্ব (morphophonemics)

ইংরেজি ভাষার বহুবচন-প্রত্যয় s-এর তিন রকমের উচ্চারণ দেখলাম উপরে। রূপমূলের এই ধ্বনিগত পরিবর্তনের সূত্রে আমরা রূপধ্বনিতত্ত্বে এসে পড়লাম। একটি রূপমূলের ভিন্ন ভিন্ন প্রতিবেশে যে ধ্বনিগত পরিবর্তন ঘটে তাকেই রূপধ্বনিগত পরিবর্তন বা morphophonemic change বলা হয়। বাংলায় এই ধরনের পরিবর্তন প্রায়ই হয়। ধ্বনিতত্ত্বের আলোচনায় আমরা স্বরের উচ্চতাসাম্যের (vowel height assimilation) কথা বলেছি। যে নিয়মে ঘট-এর 'ঘ' ঘটিতে গিয়ে

'ঘো' উচ্চারিত হচ্ছে, যে নিয়মে শকুন-এর 'শ' 'শো' উচ্চারিত হচ্ছে, সেই নিয়মকেই বলা হয় রূপধ্বনিগত পরিবর্তন।

৮.৭ রূপমূল-শনাক্তকরণ

রূপমূল বা রূপিম চেনার উপায় কী? কীভাবে বোঝা যাবে শব্দের কোন অংশটি রূপমূল বা রূপিম, আর কোন অংশ রূপমূল নয় বা রূপিম নয়? এই বুঝতে পারাকেই বলা হয়েছে রূপমূল শনাক্তকরণের প্রক্রিয়া। এ বিষয়ে পাশ্চাত্য ভাষাবিজ্ঞানীরা কয়েকটা সূত্রের কথা বলেন। বস্তুতপক্ষে রূপমূলের ধারণাটি আমাদের আলোচনায় এসেছে পাশ্চাত্য ভাষাতত্ত্বের জগৎ থেকে। আমরা দেখব আমেরিকার মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত ইউজিন নিডা (Eugene Nida) নামে এক ভাষাবিজ্ঞানী এই রূপমূল চেনার কী কী উপায়ের কথা বলেছেন তাঁর Morphology (1965) নামক বইয়ে।

প্রথমত একাধিক শব্দের যেসব অংশ সব অবস্থানে একই অর্থ প্রকাশ করে, আর সেগুলো ধ্বনিগতভাবেও অভিন্ন, সেই অংশগুলোকে রূপমূল বলা যাবে। প্রথমে দেখব ইংরেজির উদাহরণ—quicker, faster, slower এই শব্দগুলোর দিকে তাকালে দেখা যাচ্ছে যে -er বিভিন্ন adjective-এর সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে। সব ক্ষেত্রেই -er ধ্বনিগতভাবে অভিন্ন। অতএব আমরা -er কে একটি morpheme বা রূপমূল বলতে পারি। বাংলায় চিমটা, ছেলেটা, বইটা এই তিনটি শব্দের -টা হল যাকে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেছেন পদাশ্রিত-নির্দেশক, মণীন্দ্রকুমার ঘোষ বলেছেন নির্দেশক সংকেত। প্রতি ক্ষেত্রেই অর্থ এক, ধ্বনিও অভিন্ন। কাজে কাজেই -টা একটা রূপমূল বা রূপিম।

দ্বিতীয়ত, একাধিক শব্দের যেসব অংশ একই অর্থ প্রকাশ করে, কিন্তু সেই অংশগুলির মধ্যে ধ্বনিগত পার্থক্য আছে, সেই অংশগুলিকেও রূপমূল বলে ধরা হবে, যদি তাদের সেই ধ্বনিগত পার্থক্যকে ধ্বনিপরিবর্তনের নিয়ম বা সূত্র দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায়। কয়েকটি ইংরেজি শব্দ নেওয়া যাক—intolerant, inconstant, impossible, impersonal. এই চারটি শব্দের শুরুতে negative বা নঞর্থবোধক in-, in-, im-, im- রয়েছে। প্রত্যেকটির অর্থ একই। ধ্বনিগত পার্থক্য সত্ত্বেও এগুলিকে রূপমূল ধরা হবে কেননা im- হয় পরে যদি ওষ্ঠ্য বা labial ধ্বনি থাকে, যেমন এক্ষেত্রে -p আছে। অন্যত্র in- হয়। এভাবে এদের ব্যাখ্যা করে দেখানো গেল যে, in- এবং im- এরা একই রূপমূলের ভিন্ন রূপ মাত্র।

তৃতীয়ত, একাধিক শব্দের যেসব অংশ একই অর্থ প্রকাশ করলেও তাদের মধ্যে ধ্বনিগত মিল নেই, আবার ধ্বনিতত্ত্বের সূত্র দিয়ে ধ্বনিগত পার্থক্যকে ব্যাখ্যাও করা যায় না, সেগুলিও রূপমূল বা রূপিম বলে গণ্য হতে পারে, যদি সেগুলি পরিপূরক অবস্থানে (complementary distribution) থাকে অর্থাৎ সেই অংশগুলি একটির

বদলে অন্যটি ব্যবহৃত হতে পারবে না। বাংলায় হস্তিনী, মৎসী, ভুজগী এই শব্দগুলির শেষে যে স্ত্রীপ্রত্যয়গুলি ব্যবহৃত হয়েছে, যথা -নী, -সী, -গী সেগুলি একই অর্থবোধক হলেও ধ্বনিগত দিক থেকে আলাদা, আবার এদের ধ্বনিগত পার্থক্যকে ধ্বনিতত্ত্বের সূত্র দিয়েও ব্যাখ্যা করা যায় না। তবু এদের রূপমূল বলা হবে কেননা এরা রয়েছে পরিপূরক অবস্থানে, অর্থাৎ একটি বদলে অন্যটি ব্যবহার করা যায় না। আমরা বলতে পারব না হস্তিগী, মৎনী, ভুজসী। তাই -নী, -সী, -গী রূপমূল বা সহরূপমূল।

৮.৮ রূপমূলের শ্রেণিবিন্যাস

ক. মুক্ত ও বদ্ধ রূপমূল

মার্কিন ভাষাবিজ্ঞানী লেনার্ড ব্লুমফিল্ড দু-রকম morpheme বা রূপমূলের কথা বলেছেন—মুক্ত (free) ও বদ্ধ (bound) রূপমূল। খুব সহজ ভাষায় বলা যায়, যে রূপমূল অন্য রূপমূলের সঙ্গে যুক্ত না হয়েও স্বাধীনভাবেই শব্দ হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে, সেই রূপমূলই মুক্ত রূপমূল.।

পাখি ফল খায়
আমি ভাত খাই

এই দুই বাক্যের 'ফল' ও 'ভাত' শব্দদুটি মুক্ত রূপমূল, কেননা এরা অন্য রূপমূলের সঙ্গে যুক্ত না হয়েই স্বাধীনভাবে ব্যবহৃত হতে পারে। কিন্তু নীচের দুটি বাক্যে

পাখিটা ফলটা খেল
আমি ভাতের সঙ্গে মাখন খেলাম

-টা (পাখিটা, ফলটা) এবং -এর (ভাতের) এই রূপমূলগুলি বদ্ধ, কেননা এরা স্বাধীনভাবে ব্যবহৃত হতে পারে না। ইংরেজি দৃষ্টান্ত দিয়ে দেখা যাক এবার। Fitness শব্দের fit একটি free morpheme, কিন্তু -ness একটি closed morpheme, প্রথমটি স্বাধীনভাবেই ব্যবহৃত হতে পারে, দ্বিতীয়টি অর্থাৎ -ness পারে না। বদ্ধ রূপমূলকে আশ্রিত রূপমূলও বলা হয়।

খ. সম্প্রসারিত (inflectional) ও সাধিত (derivational) রূপমূল

একাধিক রূপমূল দিয়ে গঠিত শব্দকে জটিল শব্দ বলে। একটি মুক্ত রূপমূলের সঙ্গে বদ্ধ রূপমূলের সংযুক্তির ফলে যদি শব্দটি বদলে না যায়, যদি কেবল তার বচন, পুরুষ, ক্রিয়াকাল ইত্যাদিই বদ্ধ রূপমূল দিয়ে প্রকাশিত হয়, তবে সেই রূপমূলকে inflectional morpheme অর্থাৎ সম্প্রসারিত রূপমূল বলা হয়। Boy > boys, play > played এসব ক্ষেত্রে boys ও played এই দুটি পৃথক শব্দ নয়, বরং boy ও play-র ভিন্ন রূপমাত্র। একে ভাষাতত্ত্বে inflectional morpheme বলে। শিক্ষক > শিক্ষকেরা, মেঘ > মেঘরাশি বস্তুতপক্ষে একই শব্দের ভিন্নরূপ।

অন্যদিকে, যদি boyish বলা হয়, কিংবা player বলা হয় তাহলে একই শব্দ থাকছে না। শব্দ বদলে যাচ্ছে। একেই বলা হয় derivational morpheme বা সাধিত রূপমূল। 'মেঘ' আর 'মেঘলা' এক শব্দ নয়, অর্থও এক নয়। এই হল সাধিত রূপমূলের দৃষ্টান্ত।

গ. **সমধ্বনিজাত রূপমূল (homophonous morpheme)**

দুটি রূপমূল যদি ধ্বনিগতভাবে অভিন্ন হয় তবে তাদের সমধ্বনিজাত রূপমূল বলে। এইরকম দুটি সমধ্বনিজাত রূপমূল যদি আলাদা অর্থ প্রকাশ করে তবে তাদের আলাদা অর্থাৎ দুটি রূপমূল হিসাবে গণ্য করা হয়। 'আমায়' ও 'যায়' শব্দদুটির-য় দুটি সমধ্বনিজাত পৃথক রূপমূল। আবার একই অর্থবোধক ভিন্ন ভিন্ন সমধ্বনিজাত রূপমূল একটি রূপমূল হিসাবে গণ্য হবে যদি তাদের অর্থ অবস্থানগত পার্থক্যের জন্য হয়।

ঘ. **শূন্য রূপমূল (zero morph)**

ইংরেজি ভাষায় কোনো-কোনো শব্দের বহুবচনে কোনো রূপমূল বা morpheme যোগ হয় না। যেমন, put, cut, hit অতীত কালের রূপ put (রেখেছিল, রাখল) , cut (কেটেছিল, কাটল), hit (আঘাত করল/করত)। গ্লিসন (H.A. Gleason) এদের zero morph বলেছেন, বিকল্পে zero allomorph-ও বলেছেন। অর্থাৎ ধরে নিতে হবে যে, put + O morph, cut + O morph, hit + O morph এইভাবে গঠিত হয়েছে এই অতীত রূপগুলি। একই ভাবে sheep শব্দের বহুবচনে কোনো plural affix বা বহুবচনসূচক প্রত্যয় যোগ হয় না। কাজেই এখানেও সেই sheep + O morph। তবে এক্ষেত্রে বিষয়টা একটু জটিল কেননা sheep বললে একবচন বা বহুবচন যেকোনোটিই বোঝাতে পারে। একেই ভাষাতত্ত্বে zero morph বা zero allomorph অর্থাৎ শূন্য রূপমূল বা শূন্য সহরূপমূল বলা হয়। বাংলা ভাষার শব্দ দিয়েও শূন্য রূপমূলের উদাহরণ দেখানো যায়।

ছেলেটি ভাত খাচ্ছে
সে গান গাইছে

'ভাতকে' খাচ্ছে এবং 'গানকে' গাইছে বললে ব্যাকরণের দিক থেকে হয়তো ঠিক হত। কিন্তু বাংলা ভাষার রীতি অনুসারে 'ভাত'-এর সঙ্গে এবং 'গান'-এর সঙ্গে বিভক্তি যোগ হল না। কাজেই বলা যায় যোগ হয়েছে শূন্য রূপমূল।

৮.৯ রূপমূল ও দল বা অক্ষর

রূপমূল ও সিলেবল বা দল বা অক্ষরের তুলনা করলে রূপমূলের ধারণাটি সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। রূপমূল আর অক্ষর বা দলকে অভিন্ন বলে কেউ-কেউ ভাবতে পারে। কিন্তু এরা অভিন্ন নয়। রূপমূল ও দলকে অভিন্ন ভাবার কারণ দুই-ই ক্ষুদ্রতম

ধ্বনিগুচ্ছ। কোনো-কোনো ক্ষেত্রে রূপমূল আর দল অভিন্ন। 'আম' শব্দটি একটিমাত্র রূপমূল নিয়ে গঠিত। আবার ওই শব্দটি একটি সিলেবল বা দল নিয়ে গঠিত। সিলেবল অর্থপূর্ণ হতে পারে; আবার অর্থহীনও হতে পারে। কিন্তু রূপমূলের অর্থ থাকবেই, নইলে তা রূপমূলই হবে না। 'বাচ্চা' শব্দটি ধরা যাক। এতে দুটি সিলেবল বা দল আছে—বাচ্ + চা। আলাদাভাবে এই দুটির কোনো অর্থ নেই। আবার 'বাচ্', কিংবা 'চা' রূপমূল নয়, কেননা বাচ্, চা এর কোনোটিরই অর্থ হয় না। দুইয়ে মিলে একটি রূপমূল—বাচ্চা।

গ্রন্থপঞ্জি

১. কাজী সিরাজ—আধুনিক ভাষাবিজ্ঞান (১৯৯৭)
২. দাশ, শিশিরকুমার—ভাষাজিজ্ঞাসা (১৯৯২)
৩. বসু, দ্বিজেন্দ্রনাথ—বাংলা ভাষার আধুনিক তত্ত্ব ও ইতিকথা (১৯৮০)
৪. ভট্টাচার্য, সুভাষ—বাঙালির ভাষা (২০০০)
৫. সরকার, পবিত্র—পকেট বাংলা ব্যাকরণ (১৯৯৪)
—বাংলা ব্যাকরণ প্রসঙ্গ (২০০৬)
৬. Bloomfield, Leonard—Language (1933)
৭. Crystal, David—The Cambridge Encyclopaedia of Language (1997)
৮. Gleason, H.A.—An Introduction to Descriptive Linguistics (1961)
৯. Radford, A & Others—Linguistics : An Introduction (2002)

৯. বাক্যতত্ত্ব—অন্বয় (Syntax)

৯.১ বাক্য কী? বাক্য সম্বন্ধে প্রথাগত ধারণা

বাক্য কী? এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সহজ নয়। প্রথাগত ব্যাকরণে বলা হয় যে, বাক্য এমন কতকগুলি পদের সমাহার যাতে একটি সম্পূর্ণ অর্থ প্রকাশিত হয়। এই সংজ্ঞার্থ কিন্তু বিনা প্রশ্নে মেনে নেওয়া যায় না। সংগঠনগতভাবে একটিমাত্র শব্দ দিয়েও বাক্য তৈরি হতে পারে।

ক. তুমি কোথায় গিয়েছিলে?

খ. স্কুলে।

ক যে একটি বাক্য তা সকলেই মেনে নেবে। কিন্তু খ? একটিমাত্র পদ দিয়ে তৈরি খ-ও বাক্য। তফাত এই যে, ভাষাবিজ্ঞানী ডেভিড ক্রিস্টালের ভাষায়, এই এক-পদের বাক্যটি dependent on a previous sentence. তিনি এই ধরনের বাক্যকে elliptical sentence বলেছেন।

ফ্র্যাংক পামার তাঁর Grammar (1971) বইয়ে বলেছেন—It (the sentence) is the largest unit to which we can assign a grammatical structure. আরও আগে এডওয়ার্ড সাপির তাঁর Language (1949) বইয়ে বলেছেন—It is the linguistic expression of a proposition. অর্থাৎ বাক্য কোনো একটি বক্তব্যকে ভাষায় প্রকাশ করে।

একালের ভাষাবিজ্ঞানীরা লক্ষ করেছেন যে, বাক্যের প্রথাগত ব্যাখ্যা খুব-একটা সন্তোষজনক নয়। কোনো কোনো লিখিত ভাষায় বাক্য সম্বন্ধে একটা সহজ কথা বলা যায়। বলা যেতে পারে বাক্য হল capital হরফের শব্দ দিয়ে শুরু এবং ফুল স্টপ দিয়ে শেষ। এই কথাটা বলেছেন ডেভিড ক্রিস্টাল। কিন্তু এশিয়ার অনেক ভাষাতেই capital letter, small letter নেই, ফুল স্টপও নেই। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, এই ব্যাখ্যা মুখের ভাষার ক্ষেত্রে তেমন কাজে আসে না। তাছাড়া, কথ্য বা অনাচারিক (informal) ভাষায় লিখিত ভাষার মতো ব্যাকরণের সংগঠন ততটা নিখুঁত হয় না প্রায়ই। এমন নয় যে, কথ্য ভাষায় ব্যাকরণ নেই। আছে অবশ্যই। কিন্তু সেখানে বিরাম বা যতির চিহ্ন নেই, নেই আবেগ-উচ্ছ্বাসেরও চিহ্ন। বক্তার সুর, বিরাম ইত্যাদি কানে শুনে বুঝে নিতে হয়। কাজেই এসব ক্ষেত্রেও বাক্য সম্বন্ধে প্রথাগত ব্যাকরণ ততটা নির্ভরযোগ্য নয়।

কেউ-কেউ পুরোনো subject-predicate বা উদ্দেশ্য-বিধেয় বিভাগের কথা বলে বাক্যের সংজ্ঞার্থ দেন। সেখানেও সমস্যা দেখা দিতে পারে।

It is raining

বৃষ্টি হচ্ছে।

যাঁরা বলেন subject হল বাক্যের মূল topic, তাঁদের কাছে যদি প্রশ্ন করা হয় উপরের বাক্যদুটিতে 'মূল topic' কোন্‌টি তার কিন্তু স্পষ্ট জবাব পাওয়া যাবে না। কিংবা,

Ram asked Shyam for an umbrella.

এই বাক্যে topic বা মূল বিষয় কোন্‌টা? রাম, শ্যাম, ছাতা-এর কোন্‌টা? তারও স্পষ্ট উত্তর পাওয়া যাবে না।

৯.২ বাক্যের গঠনগত ভাগ ও উপাদান

প্রথাগত ব্যাকরণে বাক্যের যে দুটি প্রধান ভাগের কথা বলা হত, সে-দুটি হল subject ও predicate, অর্থাৎ উদ্দেশ্য ও বিধেয়। বাক্যে যার বিষয়ে কোনো বক্তব্য বলা হয় তাকে উদ্দেশ্য, এবং যা বলা তাকে বিধেয় বলা হয়। কিন্তু আধুনিক ভাষাতত্ত্বে বাক্যের এই উদ্দেশ্য-বিধেয় ভাগকে অসম্পূর্ণ ও ত্রুটিপূর্ণ বলে মনে করা হয়। ডেভিড ক্রিস্টালের মতো কোনো-কোনো ভাষাবিজ্ঞানী বাক্যকে উপর থেকে নীচে কতকগুলি অংশে ভাগ করে দেখান। ক্রিস্টাল এই ভাগকে বলেছেন hierarchy. তাঁরই অনুসরণে আমরা বিষয়টি বুঝে নেব।

Ram / couldn't open / the windows.

দৃশ্যত এই বাক্যকে তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়।

1. Ram
2. couldn't open
3. the windows

couldn't open এবং the windows এই দুটিকে ইংরেজিমতে phrase এবং বাংলামতে শব্দগুচ্ছ বলা যায়। এই phrase দুটিকে আরও ছোটো করে ভাগ করতে পারি—

couldn't + open
the + windows

আরও ছোটো করে অর্থাৎ morpheme বা রূপমূলে ভাগ করা যায়—

could + n't
window + s

Ram ও the এই দুটির কথা বললাম না, কেননা এই দুটিকে আর ভাগ করা যায় না।

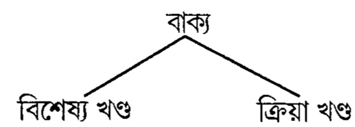
এ থেকে ডেভিড ক্রিস্টাল বাক্যের একটা পাঁচ স্তরের (five-level) ভাগ দেখিয়েছেন—

sentences (বাক্য)
↓
clauses (বাক্যাংশ)
↓
phrases (পদগুচ্ছ)
↓
words (শব্দ/পদ)
↓
morphemes (রূপমূল)

এই ভাগ অনুসারে morpheme বা রূপমূল নিম্নতম সীমায় রয়েছে। নিম্নতম, কেননা রূপমূলকে আর ছোটো অংশে ভাগ করা যায় না।

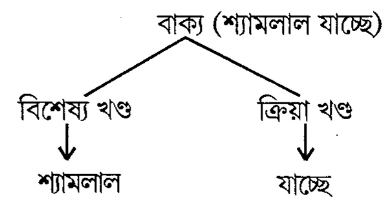
৯.২.১ বাক্যের উপাদান

বাক্যের উদ্দেশ্য-বিধেয় ভাগ যে একেবারে বাতিল হয়ে গেছে তা বলা যায় না, তবে একালের ভাষাবিজ্ঞানীরা বাক্যকে ভাগ করেন একটু অন্যভাবে। বলা হয় যে বাক্যের প্রধান ভাগ দুটি—Noun Phrase (NP) ও Verb Phrase (VP)। বাংলায় আমরা বিশেষ্য খণ্ড আর ক্রিয়া খণ্ড বলতে পারি। ভাগটিকে নক্‌শায় এভাবে দেখানো যায়—

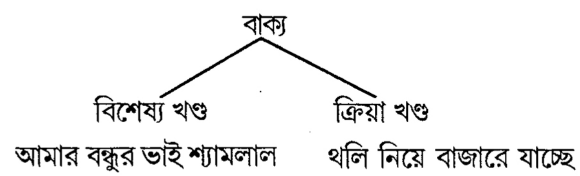


এখন প্রশ্ন হল, কী থাকে বিশেষ্য খণ্ডে, আর কী থাকে ক্রিয়া খণ্ডে?

একটা খুব সহজ বাক্য নেব—শ্যামলাল যাচ্ছে। তার ভাগটা হবে এই রকম।



কিন্তু যদি একটা বড়ো বাক্য নিই?—আমার বন্ধুর ভাই শ্যামলাল থলি নিয়ে বাজারে যাচ্ছে।



এই দুটি ভাগকে অবশ্য আরও সূক্ষ্মভাবে ভাগ করা চলে। তবে তার আগে দেখে নেওয়া দরকার কী কী থাকে বিশেষ্য খণ্ডে, আর কী কী থাকে ক্রিয়া খণ্ডে।

'বিশেষ্য খণ্ড' নামে বিশেষ্য হলেও তাতে যেমন বিশেষ্য পদ থাকে, তেমনি সর্বনামও থাকতে পারে। এরা কর্তৃস্থানীয় অর্থাৎ বিশেষ্য বা সর্বনাম কর্তার স্থান দখল করে। এছাড়া বিশেষণ থাকতে পারে, বিশেষণের বিশেষণ থাকতে পারে, সংযোজক পদ থাকতে পারে (যেমন, রাম ও শ্যাম)। শুধু লক্ষ করতে হবে যে, এই অংশে ক্রিয়া থাকবে না।

এবারে দেখা যাক, কী থাকে ক্রিয়া খণ্ডে। ক্রিয়া খণ্ডে ক্রিয়া নিশ্চয় থাকবে। তাছাড়া থাকতে পারে গৌণ কর্ম, মুখ্য কর্ম, ক্রিয়াবিশেষণ, কালবাচক পদ ইত্যাদি।

একটা দৃষ্টান্তবাক্য দেখা যাক—

বাক্য

বিশেষ্য খণ্ড — ক্রিয়া খণ্ড

রামের অতি সুন্দরী স্ত্রী — লক্ষ্মণকে ফল দিলেন

এখানে বিশেষ্য খণ্ডে—	ক্রিয়া খণ্ডে—
রামের—সম্বন্ধ পদ	লক্ষ্মণকে—গৌণ কর্ম
অতি—বিশেষণের বিশেষণ	ফল—মুখ্য কর্ম
সুন্দরী—বিশেষণ	দিলেন—ক্রিয়াপদ
স্ত্রী—বিশেষ্য	

৯.৩ অন্বয়—অব্যবহিত উপাদান ও পদগুচ্ছের সংগঠন

বহুকাল পর্যন্ত প্রথাগত ব্যাকরণে অন্বয় (syntax) বলতে বোঝানো হত বাক্যের পদক্রমকে বা word orderকে। বাক্যে কোন্ পদের কী অবস্থান, তা দেখানোই দীর্ঘকাল ধরে প্রথাগত ব্যাকরণের অন্বয় ধারণার কেন্দ্রীয় বিষয় ছিল। ফলে এ থেকে বাক্যের সংগঠন, বাক্যে পদগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক প্রভৃতি বোঝার কোনো উপায় ছিল না। বাক্যসৃষ্টির নিয়মই যে অন্বয়ের মূল বিষয় এই ধারণা প্রথাগত ব্যাকরণে আমল পায়নি। বাক্যতত্ত্ব সম্বন্ধে প্রথম একটা পরিবর্তন আসে সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞানের আলোচনায়।

যাঁকে মার্কিন সংগঠনবাদের জনক বলে মনে করা হয় সেই লেনার্ড ব্লুমফিল্ড (Leonard Bloomfield) অন্বয়ের ব্যাখ্যায় তথা বাক্যবিশ্লেষণের প্রসঙ্গে Immediate Constituents (IC) বা অব্যবহিত উপাদানের কথা বলেছেন। অব্যবহিত উপাদান হল একটি বাক্যের অন্তর্ভুক্ত পদগুলিকে নিকটতম বা অব্যবহিত সম্পর্কের ভিত্তিতে ভাগ করার নাম। এই অব্যবহিত উপাদান অনেকদিন পর্যন্ত বাক্য বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থা হিসাবে গৃহীত হয়েছিল। আমরা সংক্ষেপে এবং সহজ ভাষায় এই অব্যবহিত উপাদানে বাক্যকে কীভাবে ভাগ করার কথা বলা হয়েছে তা দেখে নেব।

প্রথমেই একটি বাংলা বাক্য নেব—

দুটি মেয়ে বিড়ালগুলোকে তাড়িয়ে দিল

১. এই বাক্যের দুটো প্রধান ভাগ এইরকম—

ক. দুটি মেয়ে

খ. বিড়ালগুলোকে তাড়িয়ে দিল

২. ক অংশকে এভাবে ভাগ করা যায়—

দুটি/মেয়ে

খ অংশকে এভাবে ভাগ করা যায়—

বিড়ালগুলোকে/তাড়িয়ে দিল

৩. খ অংশের প্রথম অংশকে আবার এভাবে ভাগ করা যায়—

বিড়াল/গুলোকে

দ্বিতীয় অংশকে আবার ভাগ করব—

তাড়িয়ে/দিল

প্রথম অংশের আরও ভাগ

বিড়াল/গুলো/কে

এইভাবে অব্যবহিত উপাদানে ভাগ করবার পর আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, প্রতিটি উপাদান তার নিকটবর্তী বা অব্যবহিত উপাদান থেকে আলাদা হয়েও ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত।

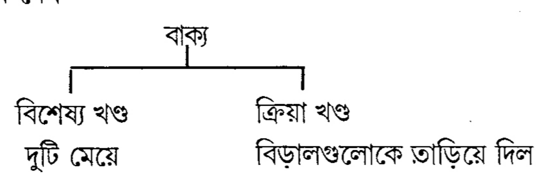
কিছুদূর পর্যন্ত এই অব্যবহিত উপাদানের ভাগ ভালোই কাজ করে। কিন্তু এমন বহু বাক্য আছে বা হতে পারে যেগুলিকে অব্যবহিত উপাদানে ভাঙা যায় না। একটা সহজ বাক্য নিই—*শিমলায় আমরা অনেক উঁচু গাছ আর পাহাড় দেখেছি।*

এই বাক্যের মাঝের ওই 'উঁচু গাছ আর পাহাড়' অংশকে কীভাবে ভাগ করা হবে? যদি বলি ভাগটা এইরকম হবে—উঁচু গাছ/আর/পাহাড় তাহলে প্রশ্ন উঠে পড়বে—শুধু কি উঁচু গাছই দেখেছি? উঁচু পাহাড় কি দেখিনি? বাস্তবিকপক্ষে বাক্যকে অব্যবহিত উপাদানে ভাগ করার সময় অর্থকে উপেক্ষা করা বা বিকৃত করা চলবে না।

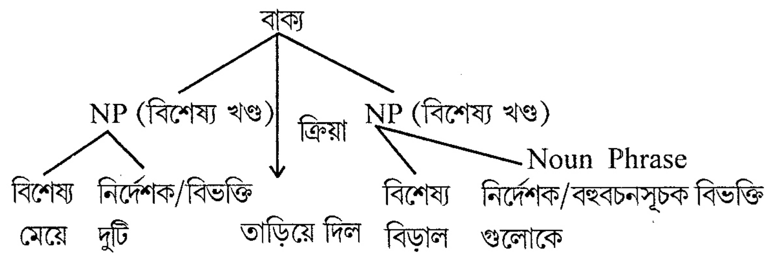
এই সমস্যার সমাধান করেছেন নোয়াম চমস্কি। তিনি পদগুচ্ছের সংগঠনকে (phrase structure) অধিকতর গুরুত্ব দিয়েছেন। তার সূত্রও (phrase structure rules) আবিষ্কার করেছেন। আমরা খুব সহজ ভাষায় এই পদগুচ্ছের সংগঠন ও তার সূত্র দেখে নেব। তা করার জন্য আমরা আগের বাক্যটিকেই নেব।

দুটি মেয়ে বিড়ালগুলোকে তাড়িয়ে দিল

পদগুচ্ছের সংগঠনে দেখা যায় যে, NP বা বিশেষ্য খণ্ডে বিশেষ্য ছাড়াও থাকে determiner. অর্থাৎ নির্দেশক সংকেত বা পদাশ্রিত—ছেলেটি-র 'টি', একটি মেয়ে-র 'একটি' ইত্যাদি। এর মধ্যে বহুবচনসূচক বিভক্তিও থাকবে। আবার VP বা ক্রিয়াখণ্ডের মধ্যেও একটা NP বা বিশেষ্য খণ্ড থাকতে পারে। আমরা বাক্যটিকে একটা নক্শায় দেখে নেব—



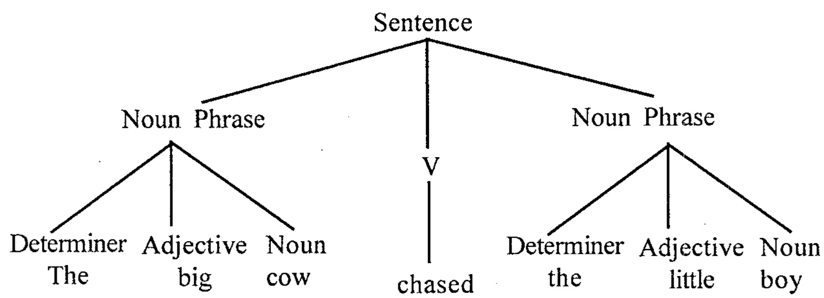
এবারে একটু অন্যরকম ভাগ দেখা যাক—



আরও সহজ হয় একটা ইংরেজি বাক্য নিয়ে পদগুচ্ছের সংগঠন দেখানো হলে। বাক্যটি ধরা যাক এইরকম—

The big cow chased the little boy..

এবারে তার বৃক্ষনক্‌শা (tree diagram.) হবে এইরকম—



এবারে তাহলে পদগুচ্ছ-সংগঠনের সূত্রগুলোকে (phrase structure rules) দেখে নেব আমরা।

কেবল সহজ সরল বাক্য নিয়ে এই সংগঠন দেখানোই যথেষ্ট নয়। দেখতে হবে সমস্ত জটিল ও দীর্ঘ বাক্যকে এইভাবে সূত্রের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা যায় কি না। তার জন্য ভাষাবিজ্ঞানীরা phrase structure rules বা পদগুচ্ছের সংগঠনের সূত্র আবিষ্কার করেছেন। এই নিয়ম বা সূত্রের কথা প্রথম নেয়াম চম্‌স্কিই বলেন তাঁর Syntactic Structures (1957) বইটিতে। তাঁর দেওয়া সূত্রে যথেষ্ট জটিলতা আছে। এখানে জটিলতাকে যতদূর সম্ভব এড়িয়ে অত্যন্ত সহজে সূত্রগুলিকে দেখাতে চেষ্টা করব।

S (sentence)	→	NP + VP
VP	→	V + NP
NP	→	Determiner + N
V	→	Chased
Determiner	→	the, the
N	→	cow, boy

প্রথম সূত্র বা নিয়মে বলা হচ্ছে যে, একটি বাক্যে থাকবে একটি বিশেষ্য খণ্ড ও একটি ক্রিয়া খণ্ড ; দ্বিতীয় সূত্র বলছে, ক্রিয়া খণ্ডে থাকবে একটি ক্রিয়া এবং একটি বিশেষ্য খণ্ড ; তৃতীয় সূত্র বলছে, বিশেষ্য খণ্ডে থাকবে নির্দেশক, বিভক্তি বা প্রত্যয় এবং একটি বিশেষ্য। এই সূত্র অনুসারে বহু বহু বাক্যকে ব্যাখ্যা করা যাবে। কীভাবে অসংখ্য বাক্য generate করা বা তৈরি করা যাবে সেটাই দেখা যাক এবার।

V → chased, got, saw, put, loved......
Det. → the, a, an
N → boy, cow, girl, man, horse, tiger.....

এইভাবে বলা যায়—

The boy saw a tiger ...
The boy saw the tiger ...
The girl loved the boy ...
The cow chased the little boy ...
The horse saw the man ....

এইভাবে উপরের সূত্রের সাহায্যে আমরা অনন্ত সহজ সরল বাক্য তৈরি করতে পারি আর তাদের সংগঠনকে ব্যাখ্যা করতে পারি।

৯.৪ চমস্কির সঞ্জননী-সংবর্তনী ব্যাকরণ (Transformational-Generative Grammar—TG)

উপরে আমরা দেখলাম যে, পদগুচ্ছ-সংগঠনের সূত্র দিয়ে আমরা বহু 'সহজসরল' বাক্য তৈরি করতে বা ব্যাখ্যা করতে পারি। ওই 'সহজসরল' কথাটি লক্ষ করতে হবে। বাক্য প্রায়ই একরৈখিক হয় না। নানা ধরনের বাক্য হতে পারে। তার মধ্যে বহু জটিলগঠন বাক্যও থাকতে পারে। নোয়াম চমস্কি নিজেই একসময় তাঁর আগেকার তত্ত্ব (১৯৫৭ সালের) কিছুটা বদলে নিয়েছেন। তিনি লক্ষ করলেন যে, পদগুচ্ছের সংগঠন দিয়েও বহু বাক্য সৃষ্টি করা বা তাদের ব্যাখ্যা করা যায় না। এবার চমস্কি উদ্ভাবন করলেন তাঁর সংবর্তনী-সঞ্জননী ব্যাকরণ। বিষয়টি অত্যন্ত দুরূহ ও জটিল। আমরা খুব সহজ ভাষায় এবং সংক্ষেপে চমস্কির এই তত্ত্বটির মূল কথা জেনে নেব। কেবল একটা কথা বলে নেওয়া দরকার। চমস্কির তত্ত্বে হাত লাগিয়েছেন তাঁর কোনো-কোনো ছাত্র ও অনুগামীও। এঁরা হলেন জে ক্যাট্‌জ্, হাল, জর্জ ল্যাবফ, পল পোস্টাল প্রভৃতি।

চমস্কিকে অনুসরণ করে আমরা প্রথমেই দেখব কী সমস্যা পদগুচ্ছ সংগঠনের, দেখব কোথায় তার সীমাবদ্ধতা। বোঝাবার জন্য চমস্কি একটা বাক্য নিয়েছেন—

Flying planes can be dangerous.

পৃথিবী জুড়ে বিখ্যাত হয়ে আছে এই দৃষ্টান্ত বাক্যটি। কী অর্থ এই বাক্যটির? উড়ন্ত বিমান বিপজ্জনক হতে পারে? না কি, বিমান চালানো বিপজ্জনক হতে পারে? এই অস্পষ্টতা

শুধু এই বাক্যেরই নয়, হতে পারে অন্য বহু বাক্যেরও। সেক্ষেত্রে এই ধরনের বাক্যের পদগুচ্ছ-সংগঠন বাক্যের অর্থ সুস্পষ্টভাবে বুঝতে সাহায্য করবে না। উপরের বাক্যে flying শব্দটাকে বিশেষণ ধরলে অর্থ দাঁড়ায় উড়ন্ত বিমান। আবার verbal noun ধরলে অর্থ দাঁড়ায় বিমান ওড়ানো বা বিমান চালানো। কাজেই অস্পষ্টতা থেকেই গেল।

এই সমস্যার সমাধানের জন্য চম্‌স্কি তাঁর সংবতনী-সঞ্জননী বা রূপান্তরীয়-সৃষ্টিশীল (Transformational-Generative) ব্যাকরণের কথা বললেন। চমস্কির তত্ত্বের সার কথাটি এইভাবে বলা যায়—

চমস্কির TG-র তিনটি পর্যায় রয়েছে। **ক. পদগুচ্ছ-সংগঠন ; খ. রূপান্তর ; গ. রূপধ্বনিগত** (morphophonemic) **সূত্র**। প্রথম থেকে তৃতীয় পর্যায়ে এসে আমাদের উদ্দিষ্ট লক্ষ্যে অর্থাৎ অনন্ত বাক্য সৃষ্টির লক্ষ্যে পৌঁছতে পারব। এবং সেই অনন্ত বাক্যে উপরোক্ত অস্পষ্টতা থাকবে না। পদগুচ্ছ-সংগঠনের উপর ভিত্তি করে তার উপর রূপান্তরের সূত্র বা নিয়ম প্রয়োগ করে তৈরি করা যাবে অসংখ্য বাক্য। অর্থাৎ একটি মৌল বাক্য থেকে অসংখ্য বাক্য সৃষ্টি করা যাবে।

এখন প্রশ্ন হল : রূপান্তরের কোন্ সূত্র প্রয়োগ করে অসংখ্য বাক্য সৃষ্টি করা হবে? সূত্রগুলিকে এভাবে বলা যায়—

ক. বাক্যের উপাদানগুলির জায়গা বদল।
খ. কোনো একটি উপাদানের লোপ।
গ. কোনো নতুন উপাদানের যোগ।

এইভাবে

একটি ছেলে খেলছে।

এই মৌল বাক্য থেকে বদল-লোপ-যোগ সূত্র ধরে সৃষ্টি করা যায় নীচের বাক্যগুলি

ছেলেটি খেলছে।
দুটি (তিনটি, পাঁচটি ইত্যাদি) ছেলে খেলছে।
ভালো ছেলেটি খেলছে।
একটি মেয়ে খেলছে।
একটি ছেলে খেলছিল।
একটি ছেলে দেখছিল।

রূপান্তরের তৃতীয় অংশ হল রূপধ্বনিগত সূত্র প্রয়োগ। রূপধ্বনিগত সূত্র প্রয়োগ করে বাক্যের ধ্বনিরূপ ও পূর্ণ লিখিত রূপ পাওয়া যায় এবং সম্পূর্ণ হয় রূপান্তরী-সৃষ্টিশীল বা সংবর্তনী-সঞ্জননী প্রক্রিয়া।

৯.৫ পারংগমতা (competence) ও ভাষাপ্রয়োগ (performance)

চমস্কি-প্রবর্তিত সংবর্তনী-সঞ্জননী ব্যাকরণের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল পারংগমতা ও ভাষাপ্রয়োগের তত্ত্ব। ফরাসি ভাষাবিজ্ঞানী ফ্যর্দিনাঁ দ্য সস্যুর (Ferdinand de

Saussure) ব্যক্তির ভাষার প্রসঙ্গে লাঁগ্ (langue) ও পারোল (parole) নামে দুটি বিষয়ের উল্লেখ করেছেন। লাঁগ্ হল ভাষার নিয়মবদ্ধ ও প্রণালীবদ্ধ রূপ। আবার, ব্যক্তির ভাষাব্যবহারে সবসময় শৃঙ্খলা থাকে না। তাতে ভাষিক সীমাবদ্ধতা থাকে, স্বতঃস্ফূর্ততা থাকে, ভুল থাকে। একেই সস্যুর 'পারোল' বলেছেন। চমস্কির competence বা পারংগমতা বা সামর্থ্য অনেকটা সস্যুর-কথিত এই লাঁগ্-এর মতো। কেউ-কেউ একে 'ভাষাবোধ' বলেন। আবার ব্যক্তি যেভাবে ভাষাকে প্রয়োগ করে তাতে উপরের 'পারোল'-এর মতো সীমাবদ্ধতা, ভুল প্রভৃতি থাকে। চমস্কির performance হল এই ভাষাপ্রয়োগ। চমস্কির সংবর্তনী-সঞ্জননী ব্যাকরণের একটি স্তম্ভ হল এই পারংগমতা বা competence.

ভাষাবোধ বা পারংগমতার সাহায্যে ব্যক্তি ক্রমাগত 'নতুন অভিনব ও অশ্রুতপূর্ব' বাক্য সৃষ্টি করতে পারে এবং অন্যের উচ্চারিত বাক্য বুঝতে পারে। চমস্কির সংবর্তনী-সঞ্জননী ব্যাকরণ এই ভাষিক পারংগমতার উপর অনেকটাই নির্ভরশীল। কেননা ওই ব্যাকরণ চায় বক্তা-শ্রোতার পারংগমতাকে যথাযথভাবে প্রকাশ করতে। অনন্ত বাক্য সৃষ্টি চমস্কির তত্ত্বের প্রধান কথা। এবং সে-কাজে তাঁর একটি বড়ো অস্ত্র হল 'ভাষিক' পারংগমতা।

৯.৬ অধোগঠন (deep structure) ও অধিগঠন (surface structure)

চমস্কির সংবর্তনী-সঞ্জননী ব্যাকরণের দুটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ধারণা হল অধোগঠন বা অন্তর্গঠন এবং অধিগঠন বা বহির্গঠন। চমস্কির মতে প্রতিটি বাক্যের দুটি স্তর থাকবেই, একটি আন্বয়িক গঠনের স্তর (syntactic level) এবং অন্যটি অর্থের স্তর বা অন্তর্লীন স্তর। আন্বয়িক গঠনের স্তরকে বলা হয়েছে অধিগঠন বা বর্হির্গঠন এবং অর্থের স্তরকে বলা হয়েছে অধোগঠন বা অন্তর্গঠন। বাক্যের আন্বয়িক গঠনকে (surface structure) বদলানো যায়, কিন্তু অধোগঠন বা অন্তর্গঠন অপরিবর্তনীয়। বাক্যের অন্তর্নিহিত অর্থই অধোগঠন। আর বাক্যের প্রকাশভঙ্গি হল অধিগঠন বা বহির্গঠন। প্রকাশভঙ্গির বদল হয়, অন্তর্নিহিত অর্থ একই থাকে।

একটু অন্যভাবে বলা যায় যে, বাক্যের রূপান্তরে পূর্ববর্তী স্তরে থাকে অধোগঠন বা অন্তর্লীন অর্থের স্তর এবং রূপান্তরের পরের ধাপে আসে অধিগঠন। দু-জোড়া বাক্য নিয়ে বিষয়টাকে স্পষ্ট করা যায়।

ক. লোকটা ডাকাতের ভয়ে লুকিয়ে রইল।
খ. (লোকটা ডাকাতকে ভয় পায় বলে লুকিয়ে রইল।)

এখানে বন্ধনীর মধ্যে যে দ্বিতীয় বাক্যটি আছে, সেটিই অধোগঠন (deep structure)। অর্থাৎ বাক্যটির আসল অর্থ এটাই। তাকেই প্রকাশ করা হয়েছে ক-বাক্যে।

অনেক সময় আমরা যে বাক্য বলি তাতে অস্পষ্টতা থাকে। যেমন চমস্কির সেই

দৃষ্টান্তে—Flying planes can be dangerous. এটাকে surface structure বা অধিগঠন বলব। তাহলে অধোগঠন কী? অধোগঠনে আছে দুটি deep structure—

Planes fly.

(Planes) can dangerous.

এবং Someone flies planes.

(That) can be dangerous.

এই প্রসঙ্গে এই কথাটাও বলা দরকার যে, চমস্কির এই deep structure বা অধোগঠনের কথা অনেকেই যেমন মেনে নিয়েছেন, তেমনি অনেকেই আবার একে বাতিলও করেছেন। রাফায়েল স্যাল্‌কি (Raphael Salkie) পল কব্‌লি সম্পাদিত Semiotics and Linguistics বইয়ে লিখেছেন—'Although popular outside mainstream generative grammar, this conception of deep structure was quickly abandoned by specialists, for various empirical and theoretical reasons.' (2001, p.178)

গ্রন্থপঞ্জি

১. আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ—আধুনিক ভাষাতত্ত্ব (১৯৯৭)

২. চক্রবর্তী, উদয়কুমার—বাংলা পদগুচ্ছের সংগঠন (২০০০)
—বাংলা সংবর্তনী ব্যাকরণ (১৯৯৮)

৩. দাশ, শিশিরকুমার—ভাষাজিজ্ঞাসা (১৯৯২)

৪. ভট্টাচার্য, সুভাষ—বাঙালির ভাষা (২০০০)

৫. শ', রামেশ্বর—সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা, দ্বিতীয় খণ্ড (১৯৯৮)

৬. সরকার, পবিত্র—পকেট বাংলা ব্যাকরণ (১৯৯৪)

৭. হুমায়ুন আজাদ—বাক্যতত্ত্ব (১৯৮৪)

৮. Cobley, Paul (ed.)—The Routledge Companion to Semiotics and Linguistics (2001)

৯. Crystal, David—The Cambridge Encyclopaedia of Language (1997)

১০. Gleason, H.A.—An Introduction to Descriptive Linguistics (1961)

১১. Palmer, Frank—Grammar (1971)

১০. বাগর্থতত্ত্ব/শব্দার্থতত্ত্ব—(Semantics)

১০.১ শব্দার্থতত্ত্ব কী?

শব্দার্থতত্ত্ব বা বাগর্থতত্ত্ব (semantics) কথাটির অর্থ ভাষায় শব্দ ইত্যাদির অর্থের চর্চা (the study of meaning)। Semantics শব্দটি অবশ্য বিংশ শতকের আগে তেমন ব্যবহৃত হত না, যদিও বিষয়টা বহু প্রাচীন। প্লেটো ও অ্যারিস্টটলের সময় থেকেই বিষয়টির চর্চা হত। 'অর্থ' নিয়ে প্রথম বিতর্ক হয়েছিল গ্রিসে। গ্রিক দার্শনিকরাই সর্বপ্রথম অর্থের প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা করেন। তাঁদের আলোচনা বা বিতর্কে দুটি দৃষ্টিভঙ্গি দেখা গেছে। প্রথমটি হল প্লেটোর 'naturalist' বা প্রকৃতিবাদী মত। প্লেটো ও তাঁর অনুগামীদের মতে শব্দের ধ্বনি ও অর্থের মধ্যে আছে স্বাভাবিক ও অন্তর্লীন সম্পর্ক ('intrinsic connection between sound and sense')। দ্বিতীয়টি হল অ্যারিস্টটলের 'conventionalist' বা প্রথাগত দৃষ্টিভঙ্গি। অ্যারিস্টটল বললেন যে, ধ্বনি ও অর্থের এই সম্পর্ক নিতান্তই আপতিক ও আকস্মিক। আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানে এই দুটি মতবাদের কোনোটিকেই গ্রহণ করা হয় না। প্লেটোর কথাই যদি ঠিক হত, তাহলে কোনো শব্দ উচ্চারিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা তার অর্থ বুঝে ফেলতাম। কেবল ধ্বন্যাত্মকশব্দ সম্পর্কেই তাঁর বক্তব্য খাটে। তবে সেই ধন্যাত্মক শব্দও এককে ভাষায় এককে রকম। অ্যারিস্টটলের 'প্রথাগত' মত তবু কিছুটা মানা যায়, যেহেতু শব্দ ও অর্থের সম্পর্কে যে প্রায়ই কোনো যুক্তিসিদ্ধ সম্পর্ক থাকে না তা তিনি দেখিয়েছেন।

যাই হোক, স্থূলভাবে বলা যায় যে, শব্দের অর্থ সম্পর্কিত আলোচনাই শব্দার্থতত্ত্বের মূল বিষয়। তবে কেবল ওটুকুই নয়। শব্দের অর্থ একটা জটিল বিষয়। একই শব্দের বহু অর্থ থাকতে পারে, আবার একাধিক শব্দের একই অর্থ থাকতে পারে। একটি শব্দ ভিন্ন ভিন্ন প্রতিবেশে ভিন্ন অর্থ ধারণ করতে পারে। আবার অর্থেরও অর্থ থাকতে পারে। সেও একটা আলোচনার বিষয়। অর্থের সঙ্গে শব্দের সম্পর্ক, অর্থের সঙ্গে চিন্তার সম্পর্ক এসবও শব্দার্থতত্ত্বের আলোচ্য বিষয়। শব্দার্থের পরিবর্তনও শব্দার্থতত্ত্বে আলোচিত হয়।

১০.২ শব্দের অর্থ ব্যাখ্যা করার অসুবিধা

১৯২৩ সালে C.K. Ogden এবং I.A. Richards The Meaning of Meaning নামে একটি যুগান্তকারী গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। সেই বইয়ে তাঁরা mean ও meaning শব্দদুটির ষোলোটি ভিন্ন ভিন্ন অর্থ দিয়েছেন। একটি শব্দের অর্থ ব্যাখ্যা করা যে কতদূর কঠিন তা বোঝাবার জন্যই তাঁদের এই দৃষ্টান্ত দেওয়া। বাংলা 'হাত' শব্দটি যে কত অর্থে ব্যবহৃত হয় তা দেখলেই অগডেন ও রিচার্ডসের কথার যাথার্থ্য বোঝা যায়।

দুই **হাতে** কালের মন্দিরা যে সদাই বাজে।
আমার **হাতেই** তোমার মরণ।
এই টাকাকটিই আমার **হাতের** পাঁচ।
হাতে মারব না, ভাতে মারব।
কর্তাকে **হাত** করা সহজ হবে না।

এ থেকে একথা বোঝা গেল যে, একটা শব্দের অর্থ তার প্রতিবেশের উপর অর্থাৎ বাক্যের সংগঠনের উপর অনেকখানি নির্ভর করে। শুধু কি তাই? শব্দের অর্থ ব্যাখ্যা করলে বা বিবৃত করলে তা কি সবসময় বোধগম্য হয়? ধরা যাক dog শব্দটি। Coucise Oxford English Dictionary (10th ed.) বলছে—a domesticated carnivorous animal probably descended from the wolf, with a barking or howling voice, an acute sense of smell and non-retractile claws. এ থেকে আমরা কী কী বৈশিষ্ট্য পাচ্ছি কুকুরের? ১. গৃহপালিত, ২. মাংসাশী, ৩. সম্ভবত নেকড়ে গোত্রের প্রাণী, ৪. জোরালো গর্জন, ৫. তীক্ষ্ণ ঘ্রাণশক্তি, ৬. পায়ের নখ গুটিয়ে রাখতে পারে না। সমস্যা এই যে, যে-লোকটি জীবনে কুকুর দেখেনি, সে এই বর্ণনা দেখে বা শুনে কুকুরকে শনাক্ত করতে পারবে কি না। এই বর্ণনা থেকে কিন্তু অস্ট্রেলীয় কুকুর ডিংগোকে শনাক্ত করা যাবে না। প্রধানত, দুটো কারণে। ডিংগো ওইভাবে howl করে না, দ্বিতীয়ত ডিংগো গৃহপালিত নয়। আরও অসুবিধা আছে। dog শব্দের একটা অর্থ তো 'ঘৃণিত লোক'।

১৯৩৩ সালে মার্কিন ভাষাবিজ্ঞানী লেনার্ড ব্লুমফিল্ড (Leonard Bloomfield (1887-1949) Language নামে একটি বই প্রকাশ করেন। তাতে তিনি শব্দার্থতত্ত্বের এইসব অসুবিধা দূর করার জন্য বিজ্ঞানভিত্তিক ব্যাখ্যার পক্ষে জোরালো সওয়াল করেন। তিনি বলেন, যদি salt শব্দটিকে বলা হয় যে, ওটি হল sodium chloride তাহলে আর সংশয় বা ধোঁয়াশা থাকে না। একথা ঠিক যে, বহু রাসায়নিক, প্রাণীবিষয়ক বা উদ্ভিদবিষয়ক নাম বা শব্দকে ওইভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। কিন্তু মানুষের আবেগ-অনুভূতির বেলায়? 'প্রেম', 'অপমান', 'অভিমান' বা ইংরেজি love, hate প্রভৃতি শব্দের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা তো সম্ভব নয়।

প্রকৃতপক্ষে, শব্দের অর্থকে একটিমাত্র আধারে ফেলে বোঝা যায় না। বিশিষ্ট ভাষাবিজ্ঞানী জেফ্রি লিচের (Geoffrey Leech) কথায় অর্থের একাধিক রং থাকে, শব্দের অর্থকে বুঝতে হলে নানাভাবে বুঝতে হয় তাকে—শব্দের conceptual meaning বা cognitive meaning অর্থাৎ বোধমূলক অর্থ থাকে ; connotative অর্থ বা দ্যোতিত অর্থ থাকে ; থাকে affective বা আবেগচালিত অর্থ। ইংরেজ ভাষাতাত্ত্বিক সিমিয়ন পটার (Simeon Potter) সহজ ভাষায় শব্দার্থের তিনটি দিকের কথা বলেছেন—semantic বা নিছক অর্থগত ; lexical বা শব্দগত; contextual বা প্রসঙ্গগত।

ভাষার শব্দমাত্রেই যে এক-একটা প্রতীক সেকথা বারবারই বলেন ভাষাতাত্ত্বিকরা। আর বস্তুর সঙ্গে অর্থের এই প্রতীক-সম্পর্ক নিতান্তই arbitrary বা নিয়মবর্হির্ভূত। অর্থাৎ একটা শব্দের মানে বা প্রতিশব্দ যা-ই হোক না কেন তার পিছনে কোনো যুক্তি থাকে না। একটি বিশেষ ফুলের নাম 'গোলাপ' না হয়ে অন্য কিছুও হতে পারত। আরও একটা কথা এই যে, শব্দের অর্থই বলি বা তাৎপর্যই বলি, তা কেবল বোধগম্য হয় একটি বাক্যের প্রতিবেশে। শব্দের অর্থকে বুঝতে হয় সেই ভাষাগত প্রতীক এবং আমাদের অভিজ্ঞতাকে মিলিয়ে।

প্রথমেই দেখা যাক, পটার যাকে শব্দের semantic value বলেছেন সেই ব্যাপারটি। এখানে semantic value বলতে বোঝানো হচ্ছে ধ্বনি বা স্বনিমের অর্থগত মান। আমরা ইংরেজি **sat** শব্দটি নেব। এই শব্দের আদ্য শিস্‌ধ্বনিটির (sibilant) কোনো স্বতন্ত্র মানে নেই। তবু এর অর্থগত মূল্য আছে, কেননা ওই শিস্‌ধ্বনিটি **sat** শব্দটিকে **bat, cat, hat, fat, put** প্রভৃতি শব্দ থেকে আলাদা করে দিচ্ছে। শুধু তাই নয়, sat শব্দের a বা /æ / স্বরধ্বনিটিরও অর্থগত মূল্য আছে, কেননা ওই স্বরধ্বনির জন্য **sat** শব্দটি **sit, set, sort, sought, site** প্রভৃতি শব্দ থেকে আলাদা হয়ে যাচ্ছে। আবার একই ভাবে **sat** শব্দের অন্ত্য স্পৃষ্ট (plosive) t ধ্বনিটিরও অর্থগত মূল্য আছে, যেহেতু এর জন্যই **sat** শব্দটি **sad, sack, sang, sap** ইত্যাদি শব্দ থেকে পৃথক হয়ে যাচ্ছে।

এবারে শব্দের বা ধ্বনিমূলের শাব্দিক অর্থের কথা, বলব। শাব্দিক অর্থ বা lexical meaning-এর প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় স্থাননাম বা ব্যক্তিনামে অর্থাৎ নামসংজ্ঞায় (proper name)। অধিকাংশ নামসংজ্ঞা একটিমাত্র বস্তু বা প্রাণী বা ব্যক্তিকে বোঝায়। তবে যেহেতু একই নামে অনেক ব্যক্তি থাকতে পারে, তাই স্যার অ্যালান হেন্ডারসন গার্ডিনার (Sir Alan Henderson Gardiner) বলেছেন কেবল অনন্য নামই উদাহরণ হিসেবে নেওয়া উচিত। Chicago, Arizona, কলকাতা, শিলিগুড়ি, প্রভৃতি নামের শাব্দিক মূল্য এখানেই যে, এই নামগুলি দ্বিতীয় কোনো স্থানের হয় না। শাব্দিক অর্থ জ্ঞাপন করা বা বোঝাবার উপায় সাধারণত তিনরকম—ইশারায় বা ইঙ্গিতে বা নির্দেশ ক'রে অর্থাৎ demonstrate ক'রে ; দ্বিতীয়ত ঘুরিয়ে-পেঁচিয়ে কথা বলে অর্থাৎ circumlocution-এর দ্বারা ; এবং তৃতীয়ত, অনুবাদের মাধ্যমে, অর্থাৎ translation-এর দ্বারা।

সব শেষে শব্দের প্রাসঙ্গিক অর্থ বা contextual meaning এর কথা বলব। বিংশ শতকের গোড়ার দিক পর্যন্ত অর্থের প্রয়োগগত দিক (empirical বা observational) সম্পর্কে অনেক কথা বলা হয়েছে। একে contextual বা 'প্রসঙ্গগত অর্থ'ও বলা হয়েছে। বিখ্যাত অস্ট্রীয় দার্শনিক ভিট্‌গেন্‌স্টাইন (Ludwig Wittgenstein) বলেছেন—'The meaning of a word is its use in the language.' অর্থাৎ একটা শব্দের অর্থ বোঝা যায় ভাষায় তার প্রয়োগ থেকে। Context বা প্রয়োগ-প্রসঙ্গের কথা অন্যভাবে বলেছেন

ব্লুমফিল্ডও। জেফ্রি লিচ তাঁর Semantics বইয়ে লিখেছেন—'In practice, therefore, linguists like Bloomfied espoused a weaker form of contextualism, in which the relation between context and meaning was more indirect.' ব্লুমফিল্ড বলতে চেয়েছেন যে, শব্দের অর্থ বোঝা যায় প্রসঙ্গ থেকেই।

কিন্তু আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানে, আরও নির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে, আধুনিক শব্দার্থতত্ত্বে প্রসঙ্গের উল্লেখকে (context বা reference) অনেকেই তেমন গুরুত্ব দিতে চান না। বরং প্রাধান্য দেওয়া হয় বাক্যের, তথা বাক্যের অন্তর্গত শব্দের, নিহিত অর্থের (sense) উপর, reference বা context বা প্রসঙ্গের উপর নয়।

১০.৩ শব্দার্থ ও ব্যাকরণ

শব্দার্থের সঙ্গে ব্যাকরণের কি কোনো যোগ আছে? আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে নেই যোগ। কিন্তু বস্তুতপক্ষে এই দুইয়ের মধ্যে একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। ব্যাকরণগত লিঙ্গ (gender) এবং ক্রিয়ার কাল (tense)-এর আলোচনায় ব্যাকরণ ও শব্দার্থের সম্পর্ক স্পষ্ট বোঝা যায়। ইংরেজি ভাষায় বহু বিশেষ্যের পুংলিঙ্গ-স্ত্রীলিঙ্গ রূপ আলাদা। যেমন boy-girl, father-mother, gander-goose, man-woman ইত্যাদি। আবার একটি সর্বনামেও আছে পার্থক্য। যেমন he-she. কিন্তু ক্রিয়াপদে বা বিশেষণে সে-পার্থক্য নেই। অন্য দিকে, ফরাসি ভাষায় নির্দেশকে (article) স্ত্রীলিঙ্গ-পুংলিঙ্গের ভেদ আছে **le garçon** (ল্য গার্সঁ) মানে ছেলেটি। আবার **la femme** (লা ফেম্) মানে স্ত্রীলোকটি। ফরাসি ভাষায় le পুংলিঙ্গ, la স্ত্রীলিঙ্গ। ফরাসি ভাষায় স্ত্রীলিঙ্গ বাস্তব লিঙ্গের উপর নির্ভর করে না। ফরাসি ভাষায় gender হল grammatical. ফরাসি **table** (তাব্‌ল্) স্ত্রীলিঙ্গ। সেইজন্য টেবিলটি = **la table.** আবার **livre** (লিভ্র্) মানে বই। এই শব্দটি পুংলিঙ্গ। তাই বইটি = **le livre.**

বাংলা ভাষায় লিঙ্গ হল স্বাভাবিক লিঙ্গ। স্ত্রীলিঙ্গ প্রাণী হলে তবেই শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ রূপ হয়। সুন্দরী, বুদ্ধিমতী সবসময়ে মেয়েদের সম্পর্কেই প্রযোজ্য। স্বাভাবিক লিঙ্গ বলার কারণ বাঘ পুংলিঙ্গ, বাঘিনি স্ত্রীলিঙ্গ। এইভাবে দাদা, ভাই পুংলিঙ্গ, আর দিদি, বোন স্ত্রীলিঙ্গ। বাংলায় biological sex ব্যাকরণের লিঙ্গকে নির্ধারিত করে। এভাবেই শব্দ ও তার অর্থ বদলে যায়।

আরও একটি ব্যাকরণগত বর্গের (category) আলোচনা করে শব্দার্থ ও ব্যাকরণের সম্পর্ক দেখানো যায়। সেই category বা বর্গ হল tense বা ক্রিয়ার কাল। Tense-কে বলা হয় সময় বা কালের ব্যাকরণীকরণ (grammaticalization)। অনেক ভাষাতেই ক্রিয়ার রূপ বদল ক'রে tense বা কাল বদল করা হয়। ইংরেজিতে go, gone, went একই ক্রিয়ার তিনটি রূপ। এই তিনটি শব্দের অর্থও ভিন্ন—যাওয়া, গেছে, গেল বা যেত। ইংরেজিতে প্রকৃতপক্ষে tense তিনটি নয় দুটি। তার মানে ইংরেজিতে present ও past-

এর পৃথক ক্রিয়ারূপ আছে—do, did ; go, went, eat, ate ইত্যাদি। কিন্তু ভবিষ্যৎ বা future-এর কোনো ক্রিয়ারূপ নেই, will, shall ব্যবহার করে future করতে হয়। বাংলায় তিনটি কালই আছে—যায়, গেল, যাবে ; খায়, খেল, খাবে। চীনা ভাষায় কোনো tense নেই। ভাষাতাত্ত্বিক R.L. Trask দেখিয়েছেন কীভাবে চীনা ভাষায় ক্রিয়ার কাল প্রকাশিত হয়। I go now, I go yesterday, I go tomorrow, I go ten minutes, I go twenty years ago. এইভাবে ক্রিয়ার রূপটিকে অপরিবর্তিত রেখে কেবল বর্তমানবাচক বা অতীতবাচক বা ভবিষ্যৎবাচক শব্দ ব্যবহার ক'রে বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্যতের অর্থ প্রকাশ করা হয়।

কখনো-কখনো ইংরেজিতে বা বাংলায় ভবিষ্যৎ কালের অর্থ প্রকাশিত হয় ক্রিয়ারূপকে বর্তমানে রেখে। কয়েকটা দৃষ্টান্ত দেব—

He goes to Delhi tomorrow (অর্থাৎ He will go to Delhi tomorrow.)

She is leaving India next week (অর্থাৎ She will be leaving India next week.)

বাংলায় আমরা এভাবে বলি—

তুই কি চাস আমিও যাই?

আবার ইংরেজিতে অনেক সময় অতীত কালের ক্রিয়াপদ ব্যবহার করে ভবিষ্যতের অর্থ প্রকাশ করা হয়—

I wish you played.

It's time you went to his house.

দুটি বাক্যেই ভবিষ্যতের অর্থ প্রকাশিত হয়েছে ব্যাকরণগতভাবে যা অতীতকালে তারই ক্রিয়ারূপ দিয়ে।

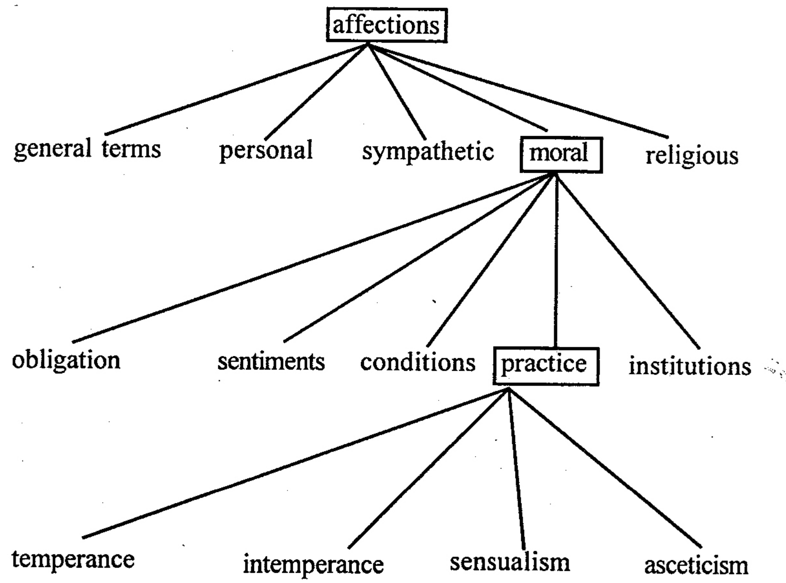
১০.৪ শব্দার্থের ক্ষেত্র ও থিসরাস

শব্দজগৎকে সুশৃঙ্খল বিন্যাসযুক্ত করার একটা উপায় হল অর্থের ক্ষেত্র সমূহকে (fields of meaning) সংবদ্ধ করা।

দৃষ্টান্ত দিলে বিষয়টা স্পষ্ট হবে। অর্থ অনুযায়ী শব্দকে এক-একটা গুচ্ছে ভাগ করাই হল শব্দার্থের ক্ষেত্র নির্দেশ। যেমন 'মাথা', 'পা', 'চোখ', 'হাত' এসব শব্দ দেহের অংশ বা অঙ্গ নামের ভাগে যাবে। 'গোলাপ', 'চাঁপা', 'শিউলি' যাবে ফুলের ভাগে। ইংরেজিতে flowers, fruits, furniture ইত্যাদি ভাগে বহু শব্দ আসবে। আমরা দেখতে পাই যে, অভিধানে শব্দ সচরাচর বর্ণানুক্রমিকভাবে সাজানো থাকে। কোনো একটা শব্দ যদি খুঁজে পেতে চাই তাহলে অভিধানে বা dictionaryতে তা পেতেও পারি, নাও পেতে পারি।

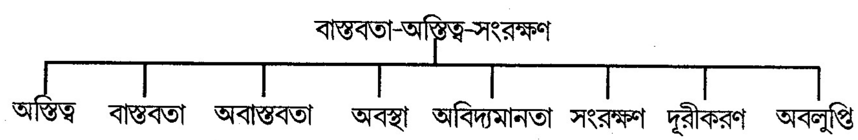
ধরা যাক আমার মাথায় আছে 'শিউলি' শব্দটা, কিন্তু মনে আসছে না। তাহলে কীভাবে সেটিকে অভিধানে খুঁজে পাব? কোথায় খুঁজব তাকে?

এই কারণে ১৮৫২ সালে পিটার মার্ক রজে Peter Mark Roget (1779-1869) এমন একটি অভিধান রচনা করলেন যাতে যাবতীয় শব্দকে তিনি অর্থ অনুযায়ী কতকগুলি গুচ্ছে ভাগ করলেন। এই অভিনব অভিধানের নাম থিসরাস (Thesaurus)। ধরা যাক, আমার মাথায় রয়েছে tulip ফুলটি, কিন্তু টিউলিপ কথাটা মনে আসছে না। সেক্ষেত্রে থিসরাসে flowers গুচ্ছের মধ্যে অনায়াসে পেয়ে যাব tulip. রজে ইংরেজি শব্দগুলিকে কীভাবে ভাগ করলেন তার একটা নমুনা দেখা যাক—



[সূত্র : David Crystal-এর The Cambridge Encyclopaedia of Language, 1997, p.104]

একটি বাংলা থিসরাসে (অশোক মুখোপাধ্যায়ের সমার্থ শব্দকোষ, ১৯৯০) কীভাবে অর্থ অনুযায়ী শব্দসমূহকে কয়েকটি গুচ্ছে ভাগ করা হয়েছে দেখা যাক—



এইভাবে অর্থের নৈকট্য অনুযায়ী শব্দকে নানা গুচ্ছে ভাগ করলে অর্থবোধ সহজ হয়। সাধারণ অভিধানের পরিকল্পনায় তা হয় না।

১০.৫ অর্থগত দিক থেকে শব্দের পারস্পরিক সম্পর্ক (sense relationships)

উপরে যে শব্দার্থ-ক্ষেত্রের কথা বলা হয়েছে, তা থেকে একটা কথা পরিষ্কার হয়ে যায়। তা এই যে, কোনো ভাষার শব্দ-এককগুলির (lexemes) পারস্পরিক অর্থসম্পর্ক সম্বন্ধে অভিধান কোনো হদিশ দেয় না। ধরা যাক, kick the bucket এই শব্দগুচ্ছের কথা। এর অর্থ 'মরে যাওয়া'। kick, the, bucket এই তিনটি শব্দের পৃথক পৃথক অর্থ অভিধানে আছে। কিন্তু সেই পৃথক অর্থ ওই idiomটির অর্থের কোনো ইঙ্গিত দেয় না। অভিধানের বর্ণানুক্রমিক শব্দসজ্জা এ বিষয়ে আমাদের কোনোরকম সাহায্যই করে না। শুধু তাই নয়, নিকট অর্থসম্পর্কযুক্ত শব্দগুলিকে দূরে দূরে স্থাপন করার ফলে এ-বিষয়ে অভিধান কোনো সাহায্য করে না। Big, large, huge এই তিনটি কাছাকাছি অর্থের শব্দ অভিধানে দূরে দূরে থাকে, b, h, আর l-এর ঘরে এদের স্থান।

আগেই বলেছি, এ দিক থেকে thesaurus আমাদের অনেক বেশি সাহায্য করে। শব্দের সঙ্গে শব্দের যে অর্থসম্পর্ক তার ভিত্তিতে নানান ভাবে শব্দকে বিন্যস্ত করা যায়। তার একটি হল paradigmatic বা প্রকরণগত সম্পর্ক। প্রকরণগত সম্পর্কও নানারকম হতে পারে, যেমন synonymy সমার্থকতা বা প্রতিশব্দমূলক সম্পর্ক ; hyponymy বা অর্থান্তর্ভুক্তি ; antonymy বা বিপরীতার্থকতা ইত্যাদি। এখানে প্রত্যেকটির কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিয়ে এই semantic category বা শব্দার্থগত বর্গের বিষয়টা বুঝে নেব।

Synonymy বা সমার্থকতা

decoration, embellishment, trimming
excuse, forgive, pardon
sad, sorrowful, morose
বেষ্টন, আবেষ্টন, পরিবেষ্টন, ঘেরা, বেড়
শীতল, ঠান্ডা, হিম, হিমেল
উপাসনা, আরাধনা, অর্চনা, পূজা

Synonymy হল শব্দার্থের সমতা বা sameness. সেই অর্থসাম্য অনুসারেই সাজানো হয়েছে উপরের শব্দগুলি। প্রত্যেক গুচ্ছের শব্দগুলি অর্থের দিক থেকে কাছাকাছি, 'প্রায়' সমার্থক।

Hyponymy বা অর্থান্তর্ভুক্তি

একটি বড়ো আয়তনের মধ্যে ছোটো আয়তনের বস্তুর ঢুকে যাওয়ার মতোই এই hyponymy অর্থাৎ ফুল বললে যেমন তার মধ্যে গোলাপ, জুঁই, টিউলিপ ইত্যাদি ঢুকবে, তেমনি furniture-এর মধ্যে আসবে টেবিল, চেয়ার ইত্যাদি। এই কথাগুলি মাথায় রেখে আমরা বলতে পারি যে, table হল furniture-এর hyponym, গোলাপ হল ফুল-এর hyponym. তেমনি bird, fish, man এগুলি হল animal-এর hyponym. অর্থাৎ animal-রাজ্যের অন্তর্গত প্রাণী হল পাখি, মাছ, মানুষ।

Antonymy বা বিপরীতার্থকতা

বিপরীতার্থকতাই হল antonymy. দুটি শব্দের মধ্যে অর্থের বৈপরীত্য-সম্পর্ক এতে ফুটে ওঠে।

big, small ; large, little
wide, narrow ; good, bad
full, empty ; yes, no
go, come ; get, give
প্রশস্ত, সংকীর্ণ ; দূর, নিকট
মোটা, সরু ; মোটা, রোগা
দীর্ঘ, হ্রস্ব ; স্ত্রী, পুরুষ

Antonymy-তে দুই রকম শব্দ আসতে পারে যাদের gradable আর non-gradable বলা হয়। Gradable শব্দ হল সেইগুলি যেগুলিকে তারতম্য বা মাত্রা দিয়ে প্রকাশ করা যায়। যেমন very small, quite big ইত্যাদি। আর non-gradable শব্দে very, quite ইত্যাদি যোগ করা যায় না, যেমন child, father, man, go, take ইত্যাদি।

১০.৬ শব্দার্থের পরিবর্তন (semantic change)

আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানের উদ্ভব ও বিকাশের আগে শব্দার্থতত্ত্ব বলতে বোঝানো হত শব্দার্থের পরিবর্তনকে, ইংরেজিতে যাকে semantic change বা semantic shift বলা হয়। শব্দের অর্থবদল একটা অত্যন্ত স্বাভাবিক ঘটনা। সেই অর্থবদলের কারণও একটা কৌতূহলোদ্দীপক বিষয়। এই আলোচনা করার আগে কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিয়ে বিষয়টাকে পরিষ্কার করা যেতে পারে। প্রাচীন বাংলায় 'আহ্মি' শব্দটি বারবার ব্যবহৃত হয়েছে। তার অর্থ তখন ছিল বহুবচনাত্মক 'আমরা'। পরে মধ্য বাংলায় গিয়ে অর্থবদল হল, অর্থ দাঁড়াল 'আমি'। এমন দৃষ্টান্ত ইংরেজিতেও যথেষ্টই আছে। প্রত্ন ইংরেজিতে (Old English) bird (তখন বানান ছিল briddle) শব্দের অর্থ ছিল পাখির ছানা। আবার meat (পুরোনো বানান mete) শব্দের অর্থ ছিল food বা খাদ্য। 'সন্দেশ' শব্দটির অর্থ ছিল খবর, সংবাদ। পরে অর্থ বদলে গেল।

শব্দার্থের পরিবর্তনকে সুকুমার সেন বলেছেন 'শব্দের অর্থচাঞ্চল্য'। অর্থাৎ অর্থ স্থির থাকে না, যুগে যুগে তার যে-পরিবর্তন হয়, তাকেই বলেছেন অর্থের অ-স্থিরতা বা চাঞ্চল্য। অর্থের এই যে চাঞ্চল্য, বা সরে-যাওয়া তা কীভাবে ঘটে? শব্দের অর্থ কখনো-কখনো একটিই থাকে, কখনো-বা একাধিক থাকে। একটি অর্থই মুখ্য অর্থ, অন্যগুলি গৌণ। আমরা ১০.২ পরিচ্ছেদে 'হাত' শব্দটির নানান অর্থে প্রয়োগ দেখেছি। বলা বাহুল্য হাত শব্দের মুখ্য অর্থ হল দেহের দুটি অঙ্গ যা দিয়ে কিছু ধরা হয়। অন্য অর্থগুলি হল— নিয়ন্ত্রণ, অধিকার, প্রভাব ইত্যাদি। এগুলি গৌণ অর্থ হলেও এসেছে মুখ্য অর্থ থেকেই।

কখনো-কখনো এই গৌণ অর্থগুলির মধ্যে কোনো একটি-দুটিই মুখ্য হয়ে উঠতে পারে, আবার কখনো-বা মুখ্য অর্থটিই লোপ পেয়ে যেতে পারে।

শব্দের অর্থবদলে 'ভাষাসম্প্রদায়ের অতীত ইতিহাসের ও চিন্তাধারার আভাস-ইঙ্গিত লুকানো থাকে', বলেছেন সুকুমার সেন। ভাষার ইতিহাস তথা ভাষাসম্প্রদায়ের ভাষাব্যবহারের ইতিহাস আলোচনা করলে সেই ভাষাসম্প্রদায়ের আচার-ব্যবহার, রীতিনীতি ও অভ্যাস সম্বন্ধে অনেক তথ্য জানা যায়। বাংলা প্রবচন 'ফেলো কড়ি মাখো তেল', 'লাগে কড়ি দেবে গৌরী সেন' এবং 'টাকাকড়ি'-র মতো শব্দ থেকে অতীতে পণ্য বিনিময়ে টাকার বদলে বা টাকা হিসাবে কড়ির ব্যবহারের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। আবার কখনো-কখনো শব্দের অর্থ এমনভাবে বদলে যায় যে, মূল অর্থের কোনো চিহ্নই আর থাকে না। 'কৃপণ' শব্দের মূল অর্থ ছিল 'কৃপার পাত্র' বা 'দয়ার পাত্র'। বাংলায় সে-অর্থ বদলে হল কঞ্জুস। এইভাবেই দেখা যায়, শব্দার্থের পরিবর্তন একটা অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক বিষয়। এর নানান পর্যায়, নানান কারণ, নানান ধারা। শব্দের অর্থবদল কতকগুলি পথ ধরে চলে, তার কতকগুলি প্রক্রিয়া আছে। তিনটি প্রক্রিয়ার কথা বলেন ভাষাতাত্ত্বিকরা অর্থের সংকোচন, অর্থের সম্প্রসারণ, অর্থারোপণ বা সংশ্লেষ। (এ বিষয়ে আরও আলোচনা আছে ২৯.২ পরিচ্ছেদে)

যদি কোনো শব্দের অর্থের ব্যাপ্তি বা ব্যাপকতা বা বিস্তার কমে যায়, সংকুচিত হয় অর্থের প্রয়োগক্ষেত্র, তবে তাকেই বলা হয় **অর্থের সংকোচন**। সংস্কৃত 'মৃগ' শব্দটি একটি অতিচেনা উদাহরণ। এর মূল অর্থ ছিল পশু, সাধারণভাবে পশু, কোনো বিশেষ পশু নয়। রাজাদের মৃগয়া বলতে পশুশিকারকে বোঝানো হত। সেই অর্থ বদলে বাংলায় এর অর্থ সব পশু থেকে কমে একটি বিশেষ পশু হল—হরিণ। এটি অর্থসংকোচনের দৃষ্টান্ত। এমন দৃষ্টান্ত আরও দেওয়া যায়। ইংরেজি hound শব্দটির অর্থ ছিল কুকুর, কোনো বিশেষ কুকুর নয়। পরে অর্থসংকোচন ঘটল, অর্থ দাঁড়াল শিকারি কুকুর। ইংরেজিতে এই প্রক্রিয়ার নাম **narrowing of meaning.**

দ্বিতীয় প্রক্রিয়ার নাম **অর্থের সম্প্রসারণ** বা **widening of meaning.** শব্দের উৎপত্তির মুহূর্তে তার একটি অর্থ থাকে, একটি বিশেষ অর্থ জড়িয়ে থাকে শব্দটির সঙ্গে। পরে সময়ের সঙ্গে প্রায়ই দেখা যায় সেই অর্থের এলাকা ছেড়ে শব্দটি আরও নানান অর্থ পরিগ্রহ করছে। নতুন নতুন ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হচ্ছে শব্দটি। বাংলায় আমরা 'হাত' শব্দের নানান অর্থ লক্ষ করেছি। এটি অর্থসম্প্রসারণের দৃষ্টান্ত। 'কপাল' শব্দের অর্থ ছিল করোটি। যুক্ত হল 'ভাগ্য' বা 'অদৃষ্ট' অর্থ। অর্থের এলাকা প্রসারিত হয়ে গেল।

তৃতীয় প্রক্রিয়ার নাম **অর্থারোপণ বা অর্থ-সংশ্লেষ**। যদি কোনো শব্দের মূল অর্থ এমনভাবে বদলে যায় যে, মূল অর্থের সঙ্গে নতুন অর্থের কোনো সম্পর্কই থাকবে না, আরোপিত হবে নতুন একটা অর্থ, তবে তাকেই বলা হবে অর্থ-সংশ্লেষ। 'জ্যাঠামি'

শব্দের সঙ্গে জ্যাঠামশাইয়ের কোনো অর্থসম্পর্কই নেই। এর অর্থ 'পাকামি' বা 'এঁচড়ে পাকা স্বভাব'। অর্থের সংকোচন ও সম্প্রসারণের সঙ্গে সংশ্লেষের তফাতটা বুঝে নেওয়া দরকার। অর্থের বদল সংকোচনে হয়, সম্প্রসারণেও হয়। কিন্তু সেখানে মূল অর্থও থাকে, তা বাতিল হয়ে যায় না। শুধু অর্থের ক্ষেত্র কমে যায় বা বেড়ে যায়। অর্থসংশ্লেষে মূল অর্থ বাতিল হয়ে যায়।

গ্রন্থপঞ্জি

১. ইসলাম, রফিকুল—ভাষাতত্ত্ব (১৯৮৬)
২. কাজী সিরাজ—আধুনিক ভাষাবিজ্ঞান (১৯৯৭)
৩. দাশ, শিশিরকুমার—ভাষাজিজ্ঞাসা (১৯৯২)
৪. বসু, দ্বিজেন্দ্রনাথ—বাংলা ভাষার আধুনিক তত্ত্ব ও ইতিকথা (১৯৮০)
৫. ভট্টাচার্য, বিজনবিহারী—বাগর্থ (১৯৭৭)
৬. সেন, সুকুমার—ভাষার ইতিবৃত্ত (১৯৯৪)
৭. Bloomfield, Leonard—Language (1933)
৮. Crystal, David—The Cambridge Encyclopaedia of Language (1997)
৯. Gleason, H.A.—An Introduction to Descriptive Linguistics (1961)

১১. ভাষা-পরিকল্পনা—(Language Planning)

১১.১ ভাষা-পরিকল্পনা কী?

কোনো দেশের বা জাতির ভাষাজগতের অস্থিরতা, অনিশ্চয়তা, ভাষার বা উপভাষার বহুলতা, ভাষাসম্প্রদায়গুলির মধ্যে নিজনিজ ভাষার শ্রেষ্ঠতা বা প্রাধান্য প্রমাণ বা প্রতিষ্ঠিত করার জন্য অত্যন্ত সক্রিয় হয়ে ওঠা—ইত্যাদি বহু কারণে কোনো জনসমাজে ভাষাপরিস্থিতি বহু সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে, করে থাকে। দেশের সরকার বা কর্তৃপক্ষ উদ্যোগী হয়ে ভাষাপরিস্থিতিতে শৃঙ্খলা বা নিয়ম প্রবর্তন করার এবং জটিলতা দূর করে ভাষাপরিস্থিতিকে সুস্থির করে তোলার যে কার্যক্রম গ্রহণ করে, তাকেই ভাষা-পরিকল্পনা বলা হয়। এই অর্থে ভাষা-পরিকল্পনা সমাজভাষাবিজ্ঞানেরই এলাকাভুক্ত বিষয়।

Language Planning কথাটি একালে সম্ভবত প্রথমে ব্যবহার করেন স্বল্পজীবী ইডিশ-পোলিশ ভাষাবিজ্ঞানী উরিয়েল ভেইনরাইখ (Uriel Weinreich)। বিভিন্ন সময়ে রুবিন (J. Rubin) ও ইয়েরনুড (B.H. Jernudd) প্রভৃতি ভাষাবিজ্ঞানীরা সমাজভাষাবিজ্ঞানের আলোচনার সূত্রে ভাষার পরিবর্তন ও সচেতন ভাষাপরিকল্পনা সম্বন্ধে যা বলেছেন তা থেকে কয়েকটা বিষয় খুবই স্পষ্ট হয়ে যায়। প্রথমত, ভাষা সদাপরিবর্তমান, এবং সেই পরিবর্তমান ভাষাপরিস্থিতি কোনো-কোনো দেশে সমূহ সমস্যার সৃষ্টি করে থাকে। দ্বিতীয়ত, সেই সমস্যার সমাধান যদি আপনা থেকে না হয় (প্রায়ই তা হয় না), তবে প্রয়োজন হয়ে পড়ে সরকারের হস্তক্ষেপের। তৃতীয়ত, এ থেকেই আসে ভাষা-পরিকল্পনার প্রশ্নটি। চতুর্থত, ভাষা-পরিকল্পনা সামাজিক প্রয়োজনেই হয়, যেকথা মার্কিন ভাষাবিজ্ঞানী উইলিয়াম লেবোভ (W. Labov, জন্ম 1927) বিশেষভাবে বলেছেন।

১১.২ ভাষা-পরিকল্পনা কেন?

কেন দরকার হয় ভাষা-পরিকল্পনার? এই প্রশ্নের একটা মোটামুটি উত্তর আমরা পেয়ে গেছি আগের (১১.১) পরিচ্ছেদেই। তবু বিষয়টাকে আরও ভালোভাবে আরও স্পষ্ট করে বোঝাবার জন্য ট্রাস্ক-এর (R.L. Trask) দেওয়া একটি বিবরণ আমরা এখানে তুলে ধরছি তাঁর Language : The Basics (2003) বইটি থেকে।

বহু শতাব্দী ধরে নরওয়ে ছিল ডেনমার্কের অধীনস্থ এবং ডেনীয় ভাষাই হয়ে দাঁড়িয়েছিল নরওয়ের জনগণেরও ভাষা। অথচ নরওয়ের একটা নিজস্ব ভাষাও ছিল, যার নাম Norwegian বা নরওয়েজীয় ভাষা। কিন্তু সে-ভাষা ছিল পুরোপুরি ডেনীয় ভাষার দ্বারা প্রভাবিত। ১৮১৪ সালে যখন নরওয়ে স্বাধীনতা অর্জন করল, তখন স্বাভাবিকভাবেই নরওয়ের জনগণ চাইল ডেনিশ ভাষার বদলে নরওয়েজিয়ান ভাষার

প্রতিষ্ঠা জীবনের সব ক্ষেত্রে। এই চাওয়ায় অস্বাভাবিক কিছুই ছিল না। বিদেশি রাষ্ট্রের পদানত কোনো উপনিবেশ স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পর অনুরূপ দাবি করেই থাকে। তারা যে আর দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক নয়, তাদেরও যে আত্মপরিচয় (identity) আছে, তা প্রমাণ করার একটা তাগিদ থাকাই স্বাভাবিক এবং সেই আত্মপরিচয়ের একটা বড়ো চিহ্ন তাদের নিজস্ব ভাষা।

অতএব স্বাধীন নরওয়ের প্রতিটি নাগরিক চাইলেন যে, সদ্যস্বাধীন জাতির ভাষা হবে নরওয়েজীয় ভাষা। মনে হতে পারে, এ তো স্বাভাবিক, আর এ নিয়ে তো সমস্যা কিছু নেই। না তা নয়। সমস্যা ছিল এবং সে-সমস্যা বেশ গুরুতর। একদল লোক বললেন, সমস্ত শিক্ষিত নরওয়েজীয় নাগরিক যে-ভাষা ব্যবহার করে তাতে ডেনিশ ভাষার প্রভাব আছে, মিশেল আছে। অতএব সেই Dano-Norwegian অর্থাৎ ডেনিশ-প্রভাবিত নরওয়েজিয়ানই নরওয়ের জাতীয় ভাষা হোক। আর একদল বললেন, Dano-Norwegian হল একটা মিশ্র ভাষা, বিকৃত ভাষা। তাঁরা অতএব চাইলেন ডেনীয় ভাষার প্রভাব-বর্জিত খাঁটি বা বিশুদ্ধ নরওয়েজীয় ভাষাকে জাতীয় ভাষার মর্যাদা দিতে।

এই দ্বিতীয় দল যা চাইল সেটাই যেকোনো সদ্যস্বাধীন দেশের জাতীয়তাবাদী নাগরিকদের স্বাভাবিক চাহিদা। অর্থাৎ এঁরা চেয়েছিলেন যে, তাঁদের ভাষা ডেনীয় ভাষা থেকে দূরে থাকুক, দুটি দেশের দুটি ভাষার মধ্যে পার্থক্য বা দূরত্ব থাকুক। জার্মান ভাষায় এই নীতিকে **Abstand** বা আপ্‌স্টান্ট্ অর্থাৎ ভাষিক দূরত্ব (linguistic distance) বলা হয়। এই নীতির সমর্থকদের ভয় ছিল যে, দুটি ভাষার মধ্যে একটা দূরত্ব বা পার্থক্য বজায় না রাখা গেলে বিদেশীয়রা মনে করতে পারে যে, নরওয়েজীয় ভাষা আসলে ডেনীয় ভাষারই একটা উপভাষা মাত্র।

নরওয়েতে অবশ্য দুটি দলের কোনোটিই বিতর্কে একতরফাভাবে জয়ী হয়নি। দেখা গেল যে, শেষ পর্যন্ত চল্লিশ লক্ষ (চার মিলিয়ন) অধিবাসীর দেশ নরওয়েতে দুটি মান্য নরওয়েজীয় ভাষা (standard Norwegian) গৃহীত হল। বলতে গেলে এই অদ্ভুত পরিস্থিতি চলতে থাকে বহুকাল পর্যন্ত। অদ্ভুত বলছি, তার কারণ, প্রত্যেক নাগরিককে দুটি ধরনের নরওয়েজীয় ভাষা শিখতেই হবে এইরকম নির্দেশই দেওয়া হল শাসকদের তরফ থেকে। কর্তৃপক্ষ অবিরাম চেষ্টা করে চলেছেন একটা মান্য ভাষার ব্যবস্থা করার জন্যে। প্রতিটি ছাত্রকে দুটি নরওয়েজীয় ভাষা শিখতে হবে। প্রতিটি দলিল বা নোটিশ দুটি ভাষায় লিখতে বা প্রচার করতে হবে। কী বিপুল অপচয়—অর্থের ও সময়ের।

এখানে আমরা একটিমাত্র দেশের উদাহরণ দিয়ে দেখালাম ভাষা পরিস্থিতি কতখানি জটিল আকার ধারণ করতে পারে। এও বোঝা গেল কেন ভাষা-পরিকল্পনার প্রয়োজন হয়। আধুনিক কালে ভাষা-পরিকল্পনার সূত্রপাত ১৯৬০-এর দশক থেকে হলেও প্রাচীন কালেও কোথাও কোথাও ভাষা-পরিস্থিতির জটিলতা ও বিশৃঙ্খলা দূর করার জন্য শাসকবর্গকে হস্তক্ষেপ করতে হয়েছে।

১১.৩ ভাষা-পরিকল্পনা, না ভাষা-নিয়মন?

এখানে স্বভাবতই একটা প্রশ্ন উঠতে পারে। এই যে language planning বলছি, তাকে আমরা কি ভাষা-পরিকল্পনাই বলব? না কি একে ভাষা-নিয়মন বলব? পবিত্র সরকার ভাষা-পরিকল্পনার চেয়ে 'ভাষা-নিয়মন' শব্দটি ব্যবহারের পক্ষপাতী (ভাষা দেশ কাল, ১৯৮৫, পৃ.১৮১-২)। এবং তিনি একথাও বলেছেন যে, ভাষা-নিয়মনের দুটি অংশ—একটি ভাষা-উন্নয়ন বা language-standardization এবং দ্বিতীয়টি ভাষা-নির্ধারণ। ভাষা-উন্নয়নের মধ্যে পড়ে বানান ও বর্ণমালা-সংস্কার, শব্দভাণ্ডার, ব্যাকরণ-শাসন, পরিভাষা-রচনা, লিপিসংস্কার ইত্যাদি। ভাষা-পরিকল্পনা বা ভাষা-নিয়মনের এই অংশে সচরাচর ব্যক্তিগত বা প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ দেখা যায় এবং সে-উদ্যোগ প্রধানত বেসরকারি। দ্বিতীয় অংশ শিক্ষার মাধ্যম নির্ধারণ, সরকারি বা জাতীয় ভাষা নির্ধারণ ইত্যাদি, যা প্রধানত দেশের সরকারের দ্বারা সম্পন্ন হয়। প্রথমটিতে অর্থাৎ বেসরকারি উদ্যোগে কোনো জবরদস্তি বা চাপিয়ে দেবার ব্যাপার থাকে না। কিন্তু সরকারি সিদ্ধান্ত সাধারণত জনগণের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়। তাতে কখনো তেমন প্রতিবাদ বা আপত্তির আওয়াজ ওঠে না, কখনো-বা ওঠে।

১১.৪ ভাষা-পরিকল্পনার ইতিহাস

ভাষাসচেতন হয়ে ভাষা-পরিকল্পনা বিষয়টিকে নীতি হিসাবে গ্রহণ করা এবং তাকে রূপায়ণ করা যদিও একেবারেই একালের বিষয়, তবে ভাষার বিশৃঙ্খলা এবং অনৈক্য দূর করার চেষ্টাকে যদি ভাষা-পরিকল্পনার প্রত্নরূপ বা আদিরূপ বলে মেনে নিই, তাহলে বলতেই হবে যে, এই বিষয়টার একটা ইতিহাস আছে। প্রথম মহাযুদ্ধের পরে তুরস্কে কামাল আতাতুর্কের ক্ষমতালাভের পরে, ১৯৩১ সালে পুরোনো লিপি বাতিল করে দেশময় রোমান বা রোমক লিপি গ্রহণ করা হয়েছে। একে ভাষা-পরিকল্পনা ছাড়া আর কী-ই বা বলা যায়? রুশ দেশে বিভিন্ন জাতির ভাষার লিপি যখন ছিল না, তখন প্রথম রোমক লিপি গ্রহণ করা হয়, রাষ্ট্রনায়কেরাই তা করেন। পরে Russification-এর জোয়ার এলে রুশ লিপির প্রবর্তন হয়। এও সেই ভাষা-পরিকল্পনারই দৃষ্টান্ত।

ভাষা-পরিকল্পনার আর একটি দৃষ্টান্ত আগেই দিয়েছি—নরওয়েজীয়-ডেনীয় ভাষার প্রসঙ্গে। এবারে বলি বাস্ক্ (Basque) ভাষার কথা। হাজার হাজার বছর ধরে পিরেনিজ পর্বতমালার পশ্চিমে ফ্রান্স ও স্পেন এবং তার আশপাশের অঞ্চলগুলিতে বাস্ক্ ভাষার প্রচলন ছিল। কিন্তু ঊনবিংশ ও বিংশ শতকে ফ্রান্স ও স্পেনের সরকার তাদের দেশে এই আঞ্চলিক বিভিন্নতাকে মেনে নিতে চাইল না। ফলে নানাভাবে বাস্ক্ ভাষা আক্রান্ত হতে লাগল। স্পেনে গৃহযুদ্ধের সময় ১৯৩৪-৩৬ সাল নাগাদ এই আক্রমণাত্মক নীতি চরমে ওঠে। স্পেনের স্বৈরশাসক ফ্রাংকো বাস্ক্ ভাষাকে স্পেনে বেআইনি বলে ঘোষণা করেন। কিছুদিন পরে যখন জেনারেল ফ্রাংকোর মৃত্যুর পর স্পেনে গণতান্ত্রিক সংস্কার চালু হচ্ছিল

একটু-একটু করে, তখন বাস্ক্‌ভাষী মানুষেরা রাজনৈতিক অধিকার দাবি করতে থাকে এবং একসময় স্পেনের বাস্ক্‌ভাষীরা রাজনৈতিক অধিকার যেমন অর্জন করে, তেমনি পাশাপাশি তাদের ভাষার মর্যাদাও কিছুটা বৃদ্ধি পায়। এরপর বাস্ক্ জনগণ তাদের ভাষার একটা মান্য রূপ গড়ে তোলার জন্য সচেষ্ট হয় এবং দাবি করতে থাকে যাতে তাদের ভাষা স্প্যানিশ ভাষার মতো সরকারি ভাষার মর্যাদা লাভ করে। এইবার শুরু হল আসল সমস্যা। বাস্কের অনেকগুলো আঞ্চলিক রূপ ছিল। কাজেই স্বাভাবিকভাবেই একটিমাত্র মান্য ভাষা থাকার প্রয়োজনীয়তা সকলেই উপলব্ধি করল, আবার কেউই নিজের আঞ্চলিক ভাষাটিকে বা উপভাষাটিকে ছাড়তেও রাজি ছিল না। মনে রাখতে হবে যে, বাস্ক্ ভাষার আঞ্চলিক রূপগুলোর কোনোটিতে স্পেনীয় ভাষার প্রাধান্য, কোনোটিতে ফরাসি ভাষার প্রাধান্য। স্পেনের বাস্ক্‌ভাষীরা দাবি করল যে, ফরাসি বাস্ক্‌রা বড়ো বেশি দাম্ভিক ও উদ্ধত। অন্য দিকে, ফ্রান্সের বাস্ক্‌ভাষীরা বলল, স্পেনের বাস্ক্‌রা স্থূলরুচির মানুষ। এই দ্বন্দ্বের মধ্যে তৈরি হল Basque Language Academy এবং তারই চেষ্টায় একটা মান্য বাস্ক্ ভাষা (United Basque) তৈরি হল। বাস্ক্ ভাষায় যার নাম এউস্কারা বাতুয়া (Euskara Batua)। ধীরে ধীরে সমস্ত অঞ্চলের বাস্ক্‌ভাষীরাই এই মান্য বাস্ক্ ভাষাটিকে গ্রহণ করল।

এই যে প্রশ্নটা—অর্থাৎ কোন্ ভাষা চর্চা করব, কোন্ ভাষা গ্রহণ করব সেটা যতটা শাসক-কর্তৃপক্ষের নীতি হিসেবে নেমে আসে, ততটাই আবার বেসরকারি বিশেষজ্ঞদের মত হিসেবে আসে। ভাষা-পরিকল্পনা বা ভাষা-নিয়মনের সেও একটা দিক। উনিশ শতকে জার্মানিতে একসময় একটা বিতর্ক দেখা দিয়েছিল ভাষা নির্বাচনের প্রশ্নে। ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস তাঁর অ্যান্টি-ড্যুরিং (Anti-Dühring) গ্রন্থে ইউগেন ড্যুরিং-এর (Eugen Dühring) মতের তীব্র বিরোধিতা করেছেন। ড্যুরিং বলতে চেয়েছিলেন যে, স্কুলের পাঠ্য তালিকা থেকে প্রাচীন মৃত ভাষার চর্চা বাতিল করা উচিত। আবার সচল বা জীবন্ত বিদেশি ভাষার শিক্ষারও বিরোধিতা করেছেন তিনি। এঙ্গেলস এই মতের বিরোধিতা করে লিখেছেন যে, মৃত হলেও প্রাচীন ক্লাসিক্যাল ভাষার চর্চা মানুষের মনের দিগন্তকে প্রসারিত করে ; অন্য দিকে, আধুনিক বিদেশি (পাশ্চাত্য) ভাষা জাতির আধুনিকীকরণে সহায়ক হয়। পরবর্তী কালে কি জার্মানিতে, কি রাশিয়ায়, এঙ্গেলসের বক্তব্যই সত্য প্রমাণিত হয়েছিল। রুশ দেশে বহু ভাষা আছে। বলশেভিক বিপ্লবের আগে ও পরে সেদেশের ভাষানীতি নিয়ে লেনিনের বক্তব্যও প্রণিধানযোগ্য। লেনিন স্পষ্ট ভাষায় linguistic plurality বা বহুভাষিকতার সপক্ষে জোরালো সওয়াল করেছেন। বেরেজিন (F.M. Berezin) তাঁর Lectures on Linguistics (1969) বইয়ের শেষে লেনিনের একটি বক্তৃতার শিরোনাম উদ্ধৃত করেছেন—'Stop Spoiling the Russian Language'. ভাষা-নিয়মনের এ হল আর একটি দৃষ্টান্ত।

বিদেশি শক্তির অধীনস্থ দেশে শাসকগোষ্ঠী যখন শাসিত জনগণের ভাষানীতি স্থির

করে, তখন সচরাচর 'সাম্রাজ্যবাদী' দৃষ্টিভঙ্গি বা স্বার্থ কাজ করে। অতীতে সব দেশেই তা হয়েছে। এটা ভারতে ব্রিটিশ শাসনের আমলে বারবার দেখা গেছে। মনে রাখতে হবে যে, শাসিত জনগণের ভাষামাধ্যম কী হবে, কিংবা মাতৃভাষায় সংবাদপত্র প্রকাশের স্বাধীনতা দেওয়া হবে কি না, সে-সবই এক অর্থে জবরদস্তিমূলক ভাষাপরিকল্পনারই অন্তর্গত।

১১.৫ কৃত্রিম ভাষা, বিশ্বভাষা

ভাষা-পরিকল্পনা যে কেবল একটি দেশের ভিতরের বিষয়, তা নয়। ভাষা-পরিকল্পনা সারা বিশ্বকে এক সূত্রে বাঁধার লক্ষ্যেও অনেকসময় সম্পন্ন হয়। ভাষা দিয়ে পৃথিবীকে বাঁধার চেষ্টা হয় এবং এই উদ্দেশ্যেই কৃত্রিম ভাষার উদ্ভব বা নির্মাণ। ইংরেজি যে আজ প্রায় বিশ্বভাষাই হয়ে দাঁড়িয়েছে সেটা আগাম আন্দাজ করতে পারেননি 'বিশ্বভাষা' (World Language) আন্দোলনের পুরোধা ব্যক্তিরা। কৃত্রিম বিশ্বভাষা হল সেই ভাষা যাকে এডওয়ার্ড সাপির (Edward Sapir) বলেছেন 'নির্মিত ভাষা' (constructed language)। ফরাসি দার্শনিক র‍্যনে দেকার্ত্-ই (René Descartes, 1596-1650) সম্ভবত কৃত্রিম বিশ্বভাষার কথা প্রথম বলেন। ঠিক বিশ্বভাষার কথা না বললেও কৃত্রিম ভাষা নির্মাণের কথা বলেছিলেন ফ্রান্সিস বেকন (Francis Bacon 1561-1626) এবং জন উইলকিন্স (John Wilkins, 1614-72)। উনিশ শতকে ইয়োহান মার্টিন শ্লেইয়ার উদ্ভাবন করেন 'ভোলাপুক' (Volapück) নামের কৃত্রিম বিশ্বভাষা (১৮৮০)। ১৮৮৭ সালে পোলিশ ভাষাবিদ লুড্ভিগ জ়ামেনহফ নির্মাণ করেন এসপেরান্তো (Esperanto)। এসপেরান্তো জনপ্রিয় হলেও ভোলাপুক তেমন চলেনি। আরও বহু কৃত্রিম ভাষা তৈরি হয়েছিল, যদিও সেগুলি বিশেষ গুরুত্ব পায়নি। জ়ামেনহফ (L.L. Zamenhof, 1859-1917) প্রথমে রুশ ভাষায় তাঁর প্রস্তাব পেশ করেন। নিজে ছদ্মনাম ব্যবহার করেন—Doktoro Esperanto, যার মানে Doctor Hopeful. এ থেকেই দ্রুত তাঁর প্রস্তাবিত ভাষাটির নাম দাঁড়িয়ে যায় Esperanto.

এইভাবে বিশ্বভাষা কৃত্রিমভাবে রচনার প্রাথমিক ও প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, পবিত্র সরকার যাকে বলেছেন 'সমস্ত মানবজগৎকে এক সূত্রে বাঁধার একটা ইচ্ছে'। এবং এর মধ্যেই বিশ্বব্যাপী ভাষা-নিয়মনের একটা প্রশ্ন এসে যায়। তবে একথাও সত্যি যে, শেষ পর্যন্ত বিশ্বভাষা তৈরি করে মানুষে-মানুষে সেতুবন্ধনের স্বপ্ন অধরাই থেকে গেছে। বরং আমরা লক্ষ করছি, বিগত পঞ্চাশ-ষাট বছরে ইংরেজি একটা বিশ্বভাষায় পরিণত হচ্ছে। ইংরেজির এই প্রাধান্য কোথাও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কোনো দেশের বা জাতির নিজস্ব প্রয়োজনে, রাজনৈতিক বা বাণিজ্যিক বা সাংস্কৃতিক কারণে ; আবার কোথাও ইংরেজি ভাষা অন্যের উপর চেপে বসেছে, সেখানে ইংরেজিকে আবাহন করতে হয়নি। এই বিষয়টাকে বিশিষ্ট ইংরেজ ভাষাবিদ Robert Phillipson বলেছেন Linguistic Imperialism এবং সেই সাম্রাজ্যবাদের প্রধান হোতা ইংরেজি ভাষা।

১১.৬ ভাষা-পরিকল্পনার জটিলতা ও সমস্যা

ভাষাবিজ্ঞানীদের মধ্যে একটি দল ভাষা-পরিকল্পনার প্রসঙ্গে দুটি প্রক্রিয়ার কথা বলেছেন। তার একটি হল **corpus planning** এবং অন্যটি **status planning** ভাষা পরিকল্পনার উদ্দেশ্য যদি হয় ভাষাশরীরে পরিবর্তন, অর্থাৎ বানান, বর্ণমালা, লিপি প্রভৃতির সংস্কার, ব্যাকরণকে বিধিবদ্ধ করা বা তাতে শৃঙ্খলা আনা, তবে তাকেই বলা হবে corpus planning. অন্য দিকে, ভাষা-পরিকল্পনার দ্বারা শিক্ষার মাধ্যম নির্বাচন করা, সরকারি ভাষা কী হবে তা নির্ধারণ করা এইসব যদি উদ্দেশ্য হয়, তবে তাকেই বলা হবে status planning, অর্থাৎ যে-পরিকল্পনায় কোনো একটি ভাষার মর্যাদা বৃদ্ধি বা প্রতিষ্ঠা করা হয়, সেই পরিকল্পনাকে status planning বলা হবে। এও লক্ষ করতে হবে যে, corpus planning সচরাচর বেসরকারি ব্যক্তিগত বা প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগে সাধিত হয়। অন্য দিকে, status planning-এ সরকারের ভূমিকাই প্রধান।

কিন্তু কথা হল এই যে, ভাষা-পরিকল্পনার বিষয়টি প্রায়শই জটিল ও সমস্যাসংকুল। প্রথমত, আসে নির্বাচনের প্রশ্ন। কোনো দেশে যদি একাধিক ভাষা প্রচলিত থাকে, তাহলে সরকারি কাজের জন্য এবং শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে সেই নানান ভাষার ভিতর থেকে একটিকে বেছে নিতে হয়। এই কাজটি যেমন কঠিন তেমনি স্পর্শকাতর। ভারতে সরকারি ভাষা হিসাবে হিন্দির নির্বাচন কিংবা ঘানায় ইংরেজির নির্বাচন আদৌ সহজ ছিল না, সে-নির্বাচন নির্বিবাদেও হয়নি।

ভাষা-পরিকল্পনার দ্বারা নির্বাচিত ভাষাটির শব্দভাণ্ডারের আধুনিকীকরণ (modernization of vocabulary) একান্তই প্রয়োজন, নইলে সেই ভাষায় আইন, বিজ্ঞান, চিকিৎসাশাস্ত্র প্রভৃতি বিষয় প্রকাশ করা যাবে না। পরিভাষা-রচনাও এক্ষেত্রে একটা গুরুত্বপূর্ণ বাধ্যবাধকতা। সেক্ষেত্রেও সমস্যা হবে। কেননা, পরিভাষা রচনায় দেশজ ভাষার শব্দই গৃহীত হবে, না কি বিদেশি ঋণেরই দ্বারস্থ হওয়া উচিত—এই প্রশ্নেরও একটা সমাধান চাই।

এমনকী, কোনো-কোনো ভাষার ক্ষেত্রে বর্ণমালা বা লিপিও একটা বাড়তি বিড়ম্বনা হয়ে উঠতে পারে। চীনা ভাষার কথাই ধরা যাক। উনিশ শতক থেকেই চৈনিক হরফ ও লিপির সংস্কারের প্রয়াস চলেছে। চৈনিক লিপিকে কিছুটা রোমক লিপির কাছাকাছি আনার একটা পরিকল্পনা ১৮৫৯ সালে করেন স্যার টমাস ওয়েড (Sir Thomas Wade) এবং হার্বার্ট জাইলস (Herbert Giles)। এই পদ্ধতি জনপ্রিয়ও হয়েছিল। কিন্তু বর্তমানে 'পিন য়িন' (Pinyin) নামে আর একটি পদ্ধতি আদি চৈনিক লিপির প্রতিস্পর্ধী হয়ে দাঁড়িয়েছে। Pinyin অর্থ হল 'উচ্চারণানুগ বানান' (phonetic spelling)। ভারতেও রোমক লিপি চালু করার জন্য একটা আন্দোলন হয়েই চলেছে 'রোমান লিপি পরিষদ' নামে একটি সংস্থার দ্বারা।

১১.৭ বাংলা ভাষার সংস্কার-পরিকল্পনা ও সংস্কার-প্রচেষ্টার ধারা

ভাষা-পরিকল্পনার দুটো দিক, একটা তার তত্ত্বের দিক বা theoretical aspect, আর একটা তার প্রয়োগের দিক বা ব্যাবহারিক দিক বা applied aspect. তত্ত্বের দিক নিয়ে থাকে নানা মত, নানা চিন্তা। কী উচিত হবে, কতদূর করা উচিত হবে এসব ভাবনা তত্ত্বচিন্তার কথা। অন্য দিকে, বাস্তবে ভাষা-উন্নয়ন বা ভাষার মান্যায়ন সম্পন্ন করা ভাষা-পরিকল্পনার ব্যাবহারিক বা প্রয়োগের দিক। তত্ত্বের আলোচনায় আমরা ভেইনরাইখ, ইয়েরনুড, লেবোভ প্রভৃতি তাত্ত্বিকের মতামত ও মন্তব্য আলোচনা করেছি। এবারে বাংলা ভাষার নিয়মন-প্রচেষ্টা বা উন্নয়ন-প্রচেষ্টার কথা বলা যাক।

লিখিত ভাষা মুখের ভাষাকে ভিত্তি করেই গড়ে ওঠে। সেই গড়ে ওঠার পর্বে মূলত মান্য কথ্য ভাষাই প্রাধান্য পায়। এবং এও দেখা যায় যে, প্রাথমিক স্তরে বহু কিছুই অনিরূপিত থাকে, বিশৃঙ্খলা প্রতিটি ক্ষেত্রে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে। একটা সময় আসে যখন কেউ-কেউ ভাবতে থাকেন, ভাষাকে সুশৃঙ্খল ও সুনিরূপিত করা দরকার। সাহিত্যের সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞান দর্শন প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনার বাহন হতে হলে ভাষাকে শব্দসম্পদে সমৃদ্ধ হতে হয়, বানানে নিয়ম ঐক্য ও একরূপতা আনতে হয়, পরিভাষা রচনা করতে হয়, ব্যাকরণকে বিধিবদ্ধ করতে হয়। বাংলা ভাষাকে বিধিবদ্ধ করার ও তার নিয়মনপ্রক্রিয়া শুরু করার চেষ্টা খুব বেশিদিন আগে শুরু হয়নি, যদিও বিভিন্ন সময়ে রাজেন্দ্রলাল মিত্র, শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায়, বিদ্যাসাগর, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রবীন্দ্রনাথ, প্রভৃতি লেখকরা বাংলা ভাষার নিয়মন বিষয়ে তাঁদের উদ্‌বেগ প্রকাশ করেছেন এবং তাঁদের পরামর্শ উপস্থিত করেছেন। বহুবছর আগে ১৮৭২ সালে জন বিমস (John Beams) বাংলা ভাষার শৃঙ্খলা সাধনের জন্য একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করার কথা বলেছিলেন। এ বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রও একমত হয়েছিলেন। কিন্তু রাজনারায়ণ বসু এভাবে প্রতিষ্ঠান তৈরি করে ভাষাকে বিধিবদ্ধ করার বিরোধিতা করেন। তাঁর মতে প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ ভাষার স্বাধীন বিকাশের পথে অন্তরায় হবে। অর্থাৎ একালে যাকে সচেতন ভাষা-পরিকল্পনা বলা হচ্ছে তারই প্রস্তাব করেছিলেন জন বিমস, আর তার বিরোধিতা করেছিলেন রাজনারায়ণ বসু ('বাঙলাভাষা-পরিকল্পনা : আনুগত্যের প্রশ্ন', মনসুর মুসা দ্র. বাংলাদেশের রাষ্ট্রভাষা, ২০০২)।

বাংলা ভাষার মান্যায়ন বা বিধিবদ্ধকরণের ইতিহাসে তিনটি প্রতিষ্ঠানের কথা বলতে হবে। ১৮৯২ সালে স্থাপিত হয় 'দ্য বেঙ্গলি অ্যাকাডেমি অব লিটরেচার'। তা-ই ১৮৯৩ সালে রূপান্তরিত হয় 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ'-এ। অন্য দুটি হল ১৯৬৭ সালে ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত বাংলা একাডেমি এবং ১৯৮৬ সালে প্রতিষ্ঠিত পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। এর মাঝে ১৯৩৬ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বানান সংস্কার ও পরিভাষা-রচনার উদ্যোগ নিয়েছিল। সেও এক প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ।

আপাতত বাংলার ভাষাপরিকল্পনায় status বা মর্যাদা বৃদ্ধির বিষয়টিকে বাদ দিয়ে আমরা কেবল corpus বা ভাষার আঙ্গিকের উন্নয়ন বা বিধিবদ্ধতার কথাই বলব। বাংলা

ভাষার corpus planning এর গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলি হল—১. লিপি সংস্কার, ২. অভিধান-রচনা, ৩. বানানসংস্কার ও বানানে একরূপতাসাধন, ৪. পরিভাষা-রচনা, ৫. ব্যাকরণের প্রমিতীকরণ। এছাড়া বাংলা ভাষার status planning এর ক্ষেত্রে মাতৃভাষার স্থান ও প্রয়োগক্ষেত্র নির্ধারণ এবং বাংলা ভাষার প্রচলন—এই পাঁচটা বিষয়ও আলোচনার যোগ্য।

প্রথম বিষয় : লিপিসংস্কার

বাংলা যে লিপিতে লেখা হয় তার বয়স এক হাজার বছর বা তার কিছু বেশি। এই লিপি ব্রাহ্মী লিপিরই বিবর্তিত রূপ। বিশিষ্ট লিপিবিশেষজ্ঞ গৌরীশংকর ওঝা ব্রাহ্মী লিপির ক্রমবিবর্তনের ধাপগুলো দেখিয়েছেন। ১০০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ব্রাহ্মী লিপির বিবর্তনের রূপটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, ওই লিপিই বাংলা লিপিতে এসেছে। সপ্তম শতকের পর থেকে ব্রাহ্মী লিপির পূর্বাঞ্চলীয় রূপ সরাসরি বাংলায় চলে এল। এই পূর্বাঞ্চলীয় রূপের নাম 'কুটিল লিপি'। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তাঁর 'বাঙ্গালার পুরাণ অক্ষর' প্রবন্ধে ৫০টি বাংলা হরফের রূপান্তর ছবি দিয়ে দেখিয়েছেন। মূল ব্রাহ্মী হরফের সঙ্গে অবশ্য বাংলা লিপির আপাত সাদৃশ্য তেমন নেই। ব্রাহ্মী ও বাংলা লিপিতে অ আ এ ঐ ও ঔ প ড এই অক্ষরগুলিতে সাদৃশ্য থাকলেও ধ ভ হ্ প্রভৃতি অক্ষরের ছাঁদে কোনো মিলই দেখতে পাওয়া যায় না। কিন্তু বিবর্তনের ধাপগুলি পরপর দেখলে মিল পাওয়া যায়।

ছাপাখানা আসার আগে বহু শত বছর বাংলা লিপির লিখনরীতি এগিয়ে নিয়ে গেছেন পুথিকাররা। পুথির অক্ষরের আদর্শেই তৈরি হয়েছিল ছাপার হরফ। ১৭৭৮ সালে হ্যালহেডের ব্যাকরণ ছাপার প্রয়োজন, অথচ ছাপাখানাই নেই। উইলকিনসের উৎসাহে তখন পঞ্চানন কর্মকার কাঠ খোদাই করে বাংলা হরফ তৈরি করেন, ছাপার সাঁট তৈরি করেন। তৈরি হল ছাপাখানা। মজার ব্যাপার এই যে, ছাপাখানার জন্য যে-অক্ষর তৈরি হল তার আদর্শ বা model হল পুথিকারদের হাতের লেখা অক্ষর। বহুদিন পর্যন্ত ওই অক্ষরই চলে এসেছে। কিন্তু সমস্যাও কিছু কম ছিল না। র-য় হ্রস্ব-উ, দীর্ঘ-ঊ লেখা হত ডান দিকে আঁকুড়ি কেটে। কেননা তলায় লিখলে বিন্দুর সঙ্গে মিশে যাবার সম্ভাবনা। এতে যদি বা কিছু যুক্তি থাকেও, আমরা বুঝতে পারি না কেন ত-য় র-ফলা ক-য় র-ফলা ওভাবে লেখা হত। 'কিন্তু' লিখতে লেখা হত কিন্ত, কেন? ঞ-য়, জ আর জয় ঞ নিয়ে বহুকাল পর্যন্ত বালকবৃদ্ধ সকলেই বিভ্রান্ত হয়েছে, ষ্ণ এই বানানটাকে পড়তে বললে অনেকেই বলত মূর্ধন্য ষ-য় ঞ। ব্রাহ্ম আর ব্রাক্ষ প্রায়ই গোলমাল হয়ে যেত।

বাঙালি বিদ্বজ্জনদের অনেকেই বিষয়টি নিয়ে চিন্তিত ছিলেন, তাঁদের অনেকেই বাংলা লিপির তথা বানানের স্বচ্ছতার কথা বলেছেন। তবে বিংশ শতকের আগে নয়। বিংশ শতকের তৃতীয় দশকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বানান সংস্কার সমিতি এই হরফ পরিবর্তন নিয়ে তেমনকিছু বলেনি। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, বাংলা ১৩২০ সনে যোগেশচন্দ্র

রায় বিদ্যানিধির 'বাঙ্গালা শব্দকোষ' অভিধানে সমস্ত হরফ স্বচ্ছ (transparent) করে ছাপা হয়েছে, আজ থেকে একশো বছর আগে। ওই অভিধানে রু, রূ, ঙ্গ, ঙ্ক, ক্র, ক্ত এসব তো আছেই, এমনকী, দ্ধ-ও আছে। এর বহুবছর পরে আজ থেকে কয়েক বছর আগে পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি লিপি বা লিখনরীতির যেসব সংস্কারের কথা বলেছে, যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি সেসবই করে দেখিয়েছেন আজ থেকে কত বছর আগে।

শুধু যুক্তাক্ষরের অস্বচ্ছতাই একমাত্র সমস্যা নয়। লিপির অন্য সমস্যাও আছে। বাংলা ভাষার জন্য লিপি তৈরি করার সময় সংস্কৃত বর্ণমালাই ছিল আমাদের আদর্শ। তার ফলে এমন ধ্বনি বাংলায় আছে যার জন্য বর্ণ বা অক্ষর নেই। 'অ্যা' ধ্বনি পাওয়া যায় অজস্র বাংলা শব্দে। অথচ বর্ণমালায় কোনো অক্ষর নেই—এ-কে দিয়ে কাজ চালাতে হয়। রাজশেখর বসু বা মণীন্দ্রকুমার ঘোষের প্রস্তাব কোনো কাজে আসেনি, তাকে আমল দেয়নি কেউ। কোনো বিকল্পও পাওয়া যায়নি।

দ্বিতীয় সমস্যা এই যে, সংবাদপত্রগুলি বানান বা লিখনরীতিতে স্বচ্ছতা আনার ব্যাপারে তেমন আগ্রহী নয় বলেই মনে হয়। ফলে সংগত, সঙ্গত, সঙ্গাত; রু, রু ; ক্র, ক্র এইসব ভিন্নতা সমানে চলেছে। লিপি ও লিখনরীতি নিশ্চয় আগের মতো বিশৃঙ্খল অবস্থায় নেই আর। কিন্তু বিভ্রান্তি যে সম্পূর্ণ দূর হয়ে গেছে তাও নয়।

দ্বিতীয় বিষয় : বানান-সংস্কার

অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত বাংলা বানানে শৃঙ্খলা তেমন ছিল না। মুদ্রণযন্ত্রের উদ্‌ভাবনের আগে লিপিকরদের শিক্ষা ও রুচির প্রতিফলন দেখা যেত বানানে। ফলে বাংলা বানানে কোনো সামঞ্জস্য বা একরূপতা ছিল না। আমাদের পরিচিত বহু শব্দের বিচিত্র বানান তখন দেখা যেত প্রায়ই। ইস্বর সিগ্র প্রীথুবি ভাঙ্গীল জৌবন সাহার্য্য স্বাস্তী—এসব যে কোন্ শব্দের বানান তা পাঠক অনুমান করতে পারেন এবং পেরে কৌতুকও নিশ্চয় বোধ করবেন। অবশ্য সেই অষ্টাদশ শতকেই বাংলা বানানকে কিছুটা নিয়ন্ত্রিত ও নিয়মশাসিত করবার চেষ্টা হয়েছিল যখন হ্যালহেডের ব্যাকরণ ছাপবার প্রয়োজনে পঞ্চানন কর্মকার এবং উইলকিনসন বর্ণমালার টাইপ ছাঁচে ঢালাই করেন। তবে ওই 'কিছুটা' শব্দটা লক্ষ করতে হবে। বিশৃঙ্খলা অনেকটাই থেকে গেল তখনও। এমনকী, উনিশ শতকের একেবারে গোড়ার দিকেও যুর্ধ রোদোন পরুস্কার ওপস্তিত রখ্যা এসব বানান দেখে অবাক হতে হয়। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ও রামমোহনের সময় পেরিয়ে এসে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, অক্ষয়কুমার দত্ত ও রাজনারায়ণ বসুর সময় পর্যন্ত বাংলা বানানকে নিরূপিত ও বিধিবদ্ধ করবার একটা সচেতন প্রয়াস লক্ষ করা গেছে। সত্যি কথা বলতে কী, এই সময়, অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের আগেই সাধুভাষার বানান অনেকটাই নিরূপিত হয়ে গিয়েছিল। তবে কিছু জটিলতা, কিছু সংশয় ছিল তখনও। তৎসম শব্দের বানান মোটামুটি স্থির হয়ে গেছে ইতিমধ্যে, যদিও সে-বানানের সঙ্গে আজকের বানানের সর্বৈব মিল নেই।

জ্যোতিঃ বিরাট্ চক্ষুঃ মনঃ পূর্ব্ব আচার্য্য এসব বানান তখন লোকের অভ্যাসের মধ্যে এসে গিয়েছিল। সে যাক, তবু এক ধরনের নিয়ম বা বিধিবদ্ধতা এসে গিয়েছিল তৎসম শব্দের বানানে। অনেক ক্ষেত্রে সাধু ক্রিয়াপদের এবং দেশজ ও অতৎসম শব্দের বানানও একটা নিরূপিত চেহারা পেয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সেই নিরূপিত চেহারাটা মোটেই আজকের মতো নয়। আশী (৮০), বাড়ী বা বাটী, তৈয়ারী ইংরাজী (আরও আগে যা ছিল ইঙ্গরাজী) তো ছিলই এমনকী পাল্কী, মাটী, বেঙ্গাচীও ছিল। অতৎসম শব্দে নির্বিচারে মূর্ধন্য-ণ ও মূর্ধন্য-ষ লাগানো হত। ষ্ট্রীট বার্ণিস কর্ণওয়ালিস ষ্টোর এসব বানান ছিল নিয়মিত ও অবিরল। এই ব্যাপারটা লক্ষ করি এই বিংশ শতকের দ্বিতীয় তৃতীয় দশক পর্যন্ত। এর পরে কিছুটা রবীন্দ্রনাথের আগ্রহে এবং সেকালের কোনো-কোনো লেখক ও পণ্ডিতের উৎসাহে গঠিত হল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বানান সংস্কার সমিতি। ১৯৩৬ সালে সেই সমিতি তাঁদের সুপারিশ পেশ করেন। এই প্রথম সংস্থাগত উদ্যোগে বাংলা বানানকে সরল ও যুক্তিনির্ভর করবার একটা প্রয়াস দেখা গেল। এই সময়ে বাংলা বানানকে বিধিবদ্ধ করা রীতিমতো প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। ইতিমধ্যে লৈখিক ভাষায় নতুন নতুন শব্দ আসতে শুরু করেছে, এমন সব শব্দ যেগুলো ইতিপূর্বে শিষ্ট লিখিত ভাষায় প্রবেশাধিকার পায়নি, এমনসব শব্দ যেগুলো মূলত কথ্য ভাষাতেই সীমাবদ্ধ ছিল। কাজে-কাজেই সেসব শব্দের বানানও ছিল অনির্দিষ্ট অনিরূপিত। এই সমস্ত শব্দের বানানকে নিরূপিত করার প্রাথমিক কাজটাই করে দিল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বানান সমিতির সুপারিশ। এই সময় থেকেই একটু-একটু করে রেফের নীচে ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব বিরল হয়ে এল, অতৎসম শব্দে হ্রস্ব স্বরচিহ্ন সম্পূর্ণ না হলেও অন্তত কিছুটা চালু হতে লাগল, অবশ্য স্ত্রীলিঙ্গে দীর্ঘ স্বরচিহ্ন থেকেই গেল। এমনকী, তৎসম শব্দেরও শেষের বিসর্গ ও শেষের হস্‌চিহ্নও ধীরে ধীরে অচলিত হল। অতৎসম শব্দে ণ ও ষ বিরল হল। এইসব সরলতা বা সংস্কারের কৃতিত্ব নিঃসন্দেহে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বানানসংস্কার সমিতিরই প্রাপ্য।

কিন্তু বানানের সমস্যা এর পরেও থেকে গেল। সেইসঙ্গে যুক্ত হল আরও নতুন সমস্যা। যেসমস্ত তৎসম শব্দের দুটি করে সিদ্ধ বানান আছে তার কোনটা গ্রহণ করব আমরা? ইন্-ভাগান্ত শব্দের সঙ্গে অন্য তৎসম শব্দের সমাস হলে ইন্-ভাগান্ত শব্দটাকে দীর্ঘ-হ্রস্ব কোন স্বরচিহ্ন দেব? ঙ এবং ং এর মধ্যে কোনটাকে গ্রহণ করা হবে, যেখানে দুটোই সিদ্ধ বিকল্প? তৎসম শব্দের বানান নিয়ে এসব প্রশ্নের মীমাংসা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বানানসমিতি করতে পারেনি।

তদ্ভব অর্ধতৎসম দেশি বিদেশি শব্দের বানান নিয়ে বহু প্রশ্ন থেকে গেছে অনির্ধারিত অমীমাংসিত। যেমন ক্রিয়াপদের বানান, স্ত্রীলিঙ্গে হ্রস্ব স্বরচিহ্ন হবে কি না সে প্রশ্ন, উচ্চারণানুগ বানানের প্রশ্ন, তৎসম শব্দের সঙ্গে বাংলা প্রত্যয় হলে সম্পূর্ণ শব্দটির বানান কী হবে সে প্রশ্ন (অর্থাৎ ভূতুড়ে/ভুতুড়ে, হীরে/হিরে, চীনে/চিনে), আরও বহু এইরকম প্রশ্ন লেখক-পাঠক-শিক্ষার্থী সকলকেই যথেষ্ট বিভ্রান্ত করছে।

এইসব প্রশ্নের মীমাংসা অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়েছে এবং গত দুই-এক দশক ধরে এ-নিয়ে তৎপরতাও শুরু হয়ে গেছে। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ঢাকার বাংলা একাডেমী, আনন্দবাজার পত্রিকা, সাহিত্য সংসদ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান বাংলা বানান সমস্যার সমাধানের জন্যে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে এবং উল্লিখিত প্রতিটি সংস্থাই বানানের সরলতা ও সমরূপতা সাধনের জন্যে নিজ-নিজ নিয়ম রচনা করেছে, এবং সেই নিয়ম অনুসারে সংকলিত হয়েছে কয়েকটি বানান অভিধান। একথা ঠিক যে, এইসব প্রতিষ্ঠানের নিয়ম পুরোপুরি একরকম নয় এবং যেসব বানান অভিধান সংকলিত হয়েছে সেগুলোর মধ্যেও রয়েছে অনেক তফাত। তবু একথাও স্বীকারযোগ্য যে, বানানের জটিলতা ক্রমেই কমে আসছে, মতভেদের এলাকাও ক্রমেই সংকুচিত হচ্ছে। এখন বহু ক্ষেত্রে একরূপতা এসে গেছে। অতৎসম স্ত্রীলিঙ্গ শব্দে হ্রস্ব-দীর্ঘ স্বরচিহ্নের ব্যাপারটা অবশ্য এখনও স্থির হয়ে যায়নি। অনেকেই সাপিনি বাঘিনি ধোপানি লিখতে শুরু করেছেন বটে, কিন্তু অনেকেই পুরোনো অভ্যাস ছাড়তে না পেরে বাঘিনী সাপিনী লিখছেন। শুধু অভ্যাস ছাড়ারই প্রশ্ন নয় এটা। অনেকে এখনও এসব শব্দে হ্রস্ব ইকার অনুচিত বলেই মনে করেন। অতৎসম শব্দে, বিশেষত বিদেশি শব্দে তালব্য-শ ও দন্ত্য-স বিষয়ক প্রশ্নটাও এখনও পর্যন্ত বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে চলেছে। এখনও অধিকাংশ লেখক-পাঠক-শিক্ষার্থী মজলিস আপস সরবত লিখতেই অভ্যস্ত। যাঁরা মজলিশ আপোশ শরবত লিখছেন, তাঁরাও শাদা জিনিশ হিশেব লিখতে পারছেন না, আর শাহেব শাবান তো দূরের কথা। দুরকম বানানের পক্ষেই যে বলবার মতো যুক্তি আছে তা মানতেই হবে। কিন্তু কথাটা এই যে, এসব ব্যাপারে দ্বিধা ও মতভেদ আরও কিছুকাল থাকলেও মোটামুটিভাবে বাংলা বানান অনেকটাই বিধিবদ্ধ ও নিরূপিত হয়ে এসেছে একথা স্বীকার করতে বাধা নেই।

তৃতীয় বিষয় : অভিধান-সংকলনের মাধ্যমে বাংলা ভাষার মান্যায়ন-প্রক্রিয়া

বাংলা ভাষার প্রমিতীকরণের (standardization) অনেকগুলো পর্যায়, অনেকগুলো দিক। অভিধানচর্চা তার একটি। শব্দের অর্থকে দেখিয়ে দেওয়াই অভিধানের একমাত্র কাজ নয়, যদিও এটা একটা প্রধান কাজ। শুধু প্রাথমিক ব্যাকরণগত বা ব্যুৎপত্তিগত অর্থই নয়, প্রয়োগগত অর্থ এবং আলংকারিক অর্থও দেখিয়ে দেয় অভিধান। অভিধানে শব্দের ঠিক ও ভুল প্রয়োগেরও নিশানা থাকে, থাকে বানানের নির্দেশ এবং কোথাও কোথাও উচ্চারণের নির্দেশও। কাজেই একথা বুঝতে কোনোই অসুবিধে নেই যে, ভাষার প্রমিতীকরণে অভিধানের গুরুত্ব খুবই বেশি।

১৭৪৩ সালে প্রকাশিত পাদরি মানোএল দা আস্‌সুম্পসাঁও-এর পর্তুগিজ-বাংলা-পর্তুগিজ অভিধানকেই প্রথম মুদ্রিত বাংলা অভিধান বলে ধরা হয়। অবশ্য আজ আমরা বাংলা অভিধান বলতে যা বুঝি এটি তা নয়। বাংলা শব্দার্থ অভিধানকেই বাংলা অভিধান বলে মনে করা হয় এখন। তেমন অভিধান সংকলিত হয়েছে অনেক পরে।

গোড়ার দিকে বাংলা শব্দ রোমান হরফে ছাপা হত। এবং শব্দার্থ বিবৃত হত ইংরেজিতে অনেকটা এখনকার বাংলা-ইংরেজি অভিধানের মতো। ধীরে ধীরে এল বাংলা হরফে মুদ্রিত অভিধান। ১৭৯৭ সালে প্রকাশিত 'ইঙ্গরাজি ও বাঙ্গালা বোকেবিলোরি'-ই সম্ভবত প্রথম প্রকৃত বাংলা অভিধান। এটি বর্ণানুক্রমিকভাবে সাজানোও ছিল। এর পরের গুরুত্বপূর্ণ অভিধান ১৭৯৯ ও ১৮০২ সালে পরপর প্রকাশিত ফর্স্টারের অভিধানের দুটি খণ্ড। তারপরে পাওয়া গেছে রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ও উইলিয়াম কেরির অভিধান। বাংলা অভিধানের ইতিহাসে কেরির অভিধানের গুরুত্ব অনুপেক্ষণীয়। শুধু বিশালতায় নয়, গুণমানেও অভিধানটি সম্ভ্রম জাগায়। দুহাজার পৃষ্ঠা এবং আশি হাজার শব্দ—এ থেকেই ওই অভিধানের বিপুলতা আন্দাজ করা যায়। এই অভিধানেও শব্দার্থ বিবৃত হয়েছে ইংরেজিতে। যেহেতু এই প্রথম শব্দের উৎপত্তি বা ব্যুৎপত্তি বা উৎস দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে তাই এই অভিধান আগেকার সব অভিধানের থেকে স্বতন্ত্র। তবে প্রচুর তৎসম শব্দের পাশাপাশি কেরি তাঁর অভিধানে বহু অপ্রয়োজনীয় শব্দ অনর্থক সন্নিবিষ্ট করেছেন। তাঁর অভিধানে এমন অজস্র নেতিবাচক শব্দ আছে যার কোনো প্রয়োগ বাংলা ভাষায় ছিল না, আজও নেই। 'অমৎস্য' শব্দটির কথাই ধরা যাক। এটি অভিধানে রাখার তো কোনো কারণই ছিল না। মাছ ছাড়া পৃথিবীর তাবৎ বস্তুই তো অমৎস্য বা অমৎস্য জাতীয়।

একটু আগে রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের অভিধানের কথা বলেছি, যার নাম 'বঙ্গভাষাভিধান'। এর প্রকাশকাল ১৮১৯ এবং এটিকেই আমরা প্রথম প্রকৃত বাংলা অভিধান বলে মনে করতে পারি, যেহেতু এতে সংকলিত শব্দ ও তার অর্থ দুই-ই বাংলা ভাষায় ও বাংলা হরফে মুদ্রিত হয়েছিল। এর পরেই প্রকাশিত হয় কেরির অভিধান যার কথা আগেই বলা হয়ে গেছে। তারপর তারাদাস চক্রবর্তীর অভিধান (১৮২৭), জন মেন্ডিসের অভিধান (১৮২৮), উইলিয়াম মর্টনের অভিধান (১৮২৮), হটনের অভিধান (১৮৩৩), রামকমল সেনের অভিধান (১৮৩৪) প্রভৃতি বাংলা অভিধানের ইতিহাসে বিশেষভাবে মনে রাখার মতো অভিধান। এর পরে উনিশ শতকের শেষ পর্যন্ত যেসব অভিধান প্রকাশিত হয়েছিল তার সংখ্যাও কম নয়। যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য তাঁর 'বাঙলা অভিধান গ্রন্থের পরিচয়'-এ ১৭৪৩ থেকে ১৮৬২ পর্যন্ত একশো কুড়ি বছরে সংকলিত একশো আটত্রিশটি অভিধানের কথা বলেছেন। ১৮৬২ সালের পরে প্রকাশিত অভিধানের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হল ১৮৬৪ সালে প্রকাশিত 'শব্দার্থমুক্তাবলী', ১৮৬৬-তে প্রকাশিত রামকমল বিদ্যালঙ্কার সংকলিত 'প্রকৃতিবাদ অভিধান' এবং ১৮৯০ সালে প্রকাশিত শশিভূষণ চট্টোপাধ্যায়ের 'বাংলা অভিধান'।

বিংশ শতকের গোড়ার দিকে বাংলা অভিধানচর্চায় একটা বড়ো রকমের পরিবর্তন ঘটে গেল। উনিশ শতকে বহু অভিধান সংকলিত হলেও ১৯০৬ সালে প্রকাশিত সুবলচন্দ্র মিত্রের সরল বাঙ্গালা অভিধান-ই প্রকৃতপক্ষে প্রথম বাংলা অভিধান। অবশ্য সুবলচন্দ্রের

অভিধান শুধু অভিধান নয়, বরং এটিকে বলা চলে একটি কোশগ্রন্থ। কেননা এতে আছে শব্দার্থ, জীবনচরিত, বহু সংস্কৃত ও বাংলা গ্রন্থের পরিচয়, বাংলা উপন্যাস ও নাটকের চবিত্রাবলি, বৈষ্ণব সাহিত্যে ব্যবহৃত শব্দবলি, আদালতে ব্যবহৃত এবং জমিদারি ও মহাজনি সেরেস্তায় ব্যবহৃত শব্দাবলি এবং প্রবাদ-প্রবচনের তালিকা। ১৩২৩ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত চতুর্থ সংস্করণে মোট সংকলিত শব্দের সংখ্যা ষাট হাজার। এতে আছে প্রত্যেকটি তৎসম শব্দের অর্থ ও ব্যুৎপত্তি। আরবি-ফারসি শব্দের স্বল্পতা এবং তৎসম শব্দের প্রাচুর্য এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

এর পরের গুরুত্বপূর্ণ অভিধান যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধির 'বাঙ্গালা শব্দকোষ'। ১৩২০ বঙ্গাব্দে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশ শুরু হয় এবং ১৩২২ বঙ্গাব্দে চারটি খণ্ড একসঙ্গে প্রকাশিত হয়। যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধির এই অভিধানের একটা বড়ো বৈশিষ্ট্য এই যে, এতে তৎসম শব্দের চেয়েও জোর দেওয়া হয়েছিল দেশজ শব্দ তদ্ভব শব্দ এবং বিদেশি ভাষা থেকে আগত শব্দের উপর। এই অভিধানের আরও একটা বৈশিষ্ট্য আছে, আর সেই বৈশিষ্ট্য আমাদের মতে আরও গুরুত্বপূর্ণ। এই প্রথম একটি বাংলা অভিধান পাওয়া গেল যাতে যুক্তাক্ষরের স্বচ্ছ রূপ দেখানো হল। আজও সর্বত্র যা চালু হতে পারেনি, সেই সুকঠিন কাজটি কীভাবে যোগেশচন্দ্র ও তাঁর প্রকাশক প্রায় একশো বছর আগে করতে পারলেন সেকথা ভেবে অবাক হতেই হয়।

১৯১৭ সালে প্রকাশিত হয় জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের 'বাঙ্গালা ভাষার অভিধান'। পরিমার্জনা ও সংশোধনের পরে এই অভিধানের শব্দসংখ্যা ছিল এক লক্ষ পনেরো হাজার। আরও কয়েক বছর পরে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হয় হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বঙ্গীয় শব্দকোষ'। প্রায় ত্রিশ বছর ধরে বিপুল শ্রমে ও কঠোর নিষ্ঠায় প্রস্তুত হয়েছে এই অভিধান। জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস ও হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরে বাংলা অভিধানচর্চা সাবালকত্ব অর্জন করেছে এইরকম একটা মন্তব্য করেছিলাম কয়েক বছর আগে অন্য একটি রচনায়। সেই মন্তব্য অনুচিত বা অতিরঞ্জিত ছিল না বলেই বিশ্বাস করি। হরিচরণ তৎসম শব্দের প্রতি কিছুটা পক্ষপাত দেখিয়েছেন একথা অস্বীকার করা যায় না। তবে আজকের দিনে যাঁরা অভিধানচর্চা করছেন তাঁদের বারবার ফিরে যেতে হয় তাঁরই কাছে। এ বড়ো কম কথা নয়। অন্য দিকে জ্ঞানেন্দ্রমোহন হরিচরণের তুলনায় আরবি-ফারসি শব্দ বেশি অন্তর্ভুক্ত করেছেন তাঁর অভিধানে। পক্ষান্তরে শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্দেশে জ্ঞানেন্দ্রমোহনের তুলনায় হরিচরণ বেশি নির্ভরযোগ্য, বেশি সহায়ক। এর পরবর্তী সময়ে যে দুটি বাংলা অভিধান বাংলা ভাষার অভিধানচর্চায় সমুজ্জ্বল সে দুটির একটি রাজশেখর বসুর 'চলন্তিকা' (১৯৩০) অন্যটি 'সংসদ বাঙ্গালা অভিধান' (১৯৫৫) দুটিই এক খণ্ডের অপেক্ষাকৃত হ্রস্বাকৃতি অভিধান। এছাড়া আছে ঢাকার বাংলা একাডেমীর প্রকাশিত ব্যবহারিক বাংলা অভিধান (১৯৭৪ এবং ১৯৯২) এবং কাজী আবদুল ওদুদের ব্যবহারিক শব্দকোষ (১৯৫৩)।

ভাষাকে বিধিবদ্ধ করতে অভিধানের ভূমিকা

অভিধান দুই রকমের হতে পারে। কথাটাকে একটু অন্যভাবেও বলা যায়। অভিধানে দুটি নীতি দেখা যায়। একটি হল নির্দেশাত্মক, ইংরেজিতে যাকে prescriptive বলা হয়, অন্যটি বর্ণনাত্মক, ইংরেজিতে যা descriptive নামে পরিচিত। শুধুমাত্র বর্ণনাত্মক কিংবা শুধুমাত্র নির্দেশাত্মক নীতি অনুসারে সংকলিত এমন কোনো অভিধানের কথা আমাদের জানা নেই। আসলে যে-অভিধান মূলত ভাষার দর্পণ হিসেবে রচিত, অর্থাৎ যাতে ভাষার এককালিক রীতিনীতির প্রতিফলন আছে, তাতেও পরোক্ষ একটা নির্দেশের ব্যাপার থাকেই। কাজেই আমরা বলতে পারি, অভিধানমাত্রেই কিছুটা বর্ণনাত্মক, কিছুটা নির্দেশাত্মক।

অভিধানকে সাধারণভাবে ভাষার দর্পণ বলে মনে হলেও ভাষার সমসাময়িক অবস্থার প্রতিফলন করাই অভিধানের একমাত্র কাজ নয়। অভিধান নানাভাবে ভাষাকে, ভাষার প্রয়োগকে বিধিবদ্ধ করে। শব্দের অন্তর্ভুক্তি অভিধানের একটি প্রাথমিক বিবেচনা। কোন শব্দ অভিধানে রাখা হবে, কোন শব্দ বর্জিত হবে তার বিচার সহজ নয়। এবং এই বিচার ভাষাকে বিধিবদ্ধ করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। অপ্রচলিত শব্দকে বাদ দিয়ে শব্দের গায়ে নানাবিধ লেবেল এঁটে দিয়ে, শব্দের নতুন অর্থের ইঙ্গিত দিয়ে অভিধান ভাষার প্রমিতীকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনা করে। কোন শব্দ গ্রাম্য প্রয়োগ, কোনটি অশিষ্ট বা অশালীন তা বলে দেয় অভিধান। যে শব্দকে একদা আঞ্চলিক বলে মনে করা হত একদিন তা-ই আঞ্চলিকতার গণ্ডি পেরিয়ে শিষ্ট ভাষার বৃত্তে এসে পড়ে। তারও নিশানা পাওয়া যায় অভিধানে। অশুদ্ধ শব্দের প্রয়োগ অনেক সময় অভিধান নিষেধ করে। আবার অতিপ্রচলিত শব্দ অশুদ্ধ হলেও প্রয়োগসিদ্ধ বলে অভিধানে গৃহীত হয়ে যায়।

শব্দের ঠিক বানান দেখিয়ে দেওয়া অভিধানের আর একটা বড়ো কাজ। উনিশ শতকের প্রথমার্ধের যে-কোনো অভিধানের বানানের সঙ্গে হরিচরণ বা জ্ঞানেন্দ্রমোহনের অভিধানের বানানের তফাত কিংবা উনিশ শতকের শেষ দিকের যে-কোনো অভিধানের সঙ্গে চলন্তিকা বা সংসদ অভিধানের বানানের তফাত কারও নজর এড়িয়ে যেতে পারে না। পুরোনো এবং নতুন অভিধানগুলো পাশাপাশি রাখলে সহজেই বোঝা যাবে কীভাবে শব্দের রূপ বা বানান বদলে গেছে আর বদলে গিয়ে আজকের চেহারা পেয়েছে। ইঙ্গরাজী/ইঙ্গরাজি → ইংরাজি → ইংরেজি; কএদ → কয়েদ ; ঊর্দ্দ/ঊর্দূ → উর্দু ; ঈমানদার → ইমানদার এইসব শব্দের বানানের বিবর্তন দেখেই বোঝা যায় বানান কোন পথে আর কীভাবে বিধিবদ্ধ হয়েছে। এমনকী কিছুকাল আগেও যা ছিল খান্ডারনী, খাঁটী, যোগাড়, যীশু, তীরধনুক, বাঘিনী, ইংরেজী, জাপানী, ষ্টেশন, পূজারিণী, রাণী এখন তার রূপ যথাক্রমে খান্ডারনি, খাঁটি, জোগাড়, জিশু, তিরধনুক, বাঘিনি, ইংরেজি, জাপানি, স্টেশন, পূজারিনি ও রানি। এইসব বানান একটু একটু করে অভিধানেও এসে গেছে। কাজে কাজেই বিধিবদ্ধ বানান দেখিয়ে দেবার ব্যাপারে এবং বানানকে বিধিবদ্ধ করবার কাজে অভিধানের ভূমিকাকে উপেক্ষা করা যায় না।

চতুর্থ বিষয় : বাংলা ভাষায় ব্যাকরণ চর্চা : ভাষার প্রমিতীকরণে ব্যাকরণের ভূমিকা

বাংলা ভাষা বিধিবদ্ধ হয়েছে ধীরে ধীরে অনেক দিন ধরে। সে এক সুদীর্ঘ প্রক্রিয়া। সে-প্রক্রিয়া এখনও চলছে, নিশ্চয় আরও কিছুদিন চলতে থাকবে। এই প্রক্রিয়ায় ব্যাকরণ বাদ যেতে পারে না। ব্যাকরণ ভাষার ভিতরের শৃঙ্খলা ও নিয়মগুলিকে আবিষ্কার করে, ব্যাখ্যা করে। এ হল ব্যাকরণ সম্বন্ধে আধুনিক ধারণা। তাই যদি হয় তবে ভাষার প্রমিতীকরণে বা তাকে বিধিবদ্ধ করার ব্যাপারে ব্যাকরণের একটা বড়ো ভূমিকা থাকারই কথা। কিন্তু উনিশ শতকে বাংলা ব্যাকরণের চর্চা যখন শুরু হয় তখন ব্যাকরণের উদ্দেশ্য ও ভূমিকা এমনভাবে সংস্কৃত ব্যাকরণের দ্বারা প্রভাবিত হয় যে, বাংলা ভাষার ব্যাকরণ বস্তুতপক্ষে হয়ে দাঁড়ায় সংস্কৃত ব্যাকরণের অনুসারী। অবশ্য ইংরেজ লেখকরা যখন বাংলা ভাষার চর্চায় আত্মনিয়োগ করেন তখন তাঁরা কিছুটা সংস্কৃতের আর কিছুটা ইংরেজি ব্যাকরণের দ্বারা প্রভাবিত হন। ফলে সেই সময়ের বাংলা ব্যাকরণ হয়ে দাঁড়ায়, হুমায়ুন আজাদের ভাষায়, 'ইংরেজি-সংস্কৃত ব্যাকরণ'।

উনিশ শতকের সূচনা থেকে শেষ পর্যন্ত বহু বাংলা ব্যাকরণ রচিত হয়েছিল। তার কোনোটি ইংরেজি রীতির অনুসৃতি, কোনোটি সংস্কৃত রীতির। আবার কোনো ব্যাকরণে পাওয়া গেছে এই দুইয়ের সংমিশ্রণ। যে রীতিতেই ব্যাকরণ রচিত হোক না কেন, সেসব বাংলা ব্যাকরণে থাকত নির্দেশ বা অনুশাসনের ব্যবস্থা। এই ভাবেই তৈরি হয়ে যায় নির্দেশাত্মক ব্যাকরণের একটা ঐতিহ্য, যে ঐতিহ্য বা ধারা আজও বহন করে চলেছেন আমাদের বৈয়াকরণেরা।

তবে এই সংস্কৃতানুসারী নির্দেশাত্মক ব্যাকরণের বিরুদ্ধে একটা জোরালো প্রতিবাদ উনিশ শতকেই জেগেছিল, বিংশ শতকের শুরুতে যা রীতিমতো বড়ো ধাক্কা দেয় প্রথাগত ব্যাকরণশাস্ত্রীদের ব্যাকরণকাঠামোকে। প্রতিবাদীদের মধ্যে ছিলেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী। এঁরা বিশ্বাস করতেন যে, বাংলা একটা স্বতন্ত্র ভাষা, তার ব্যাকরণ তাই সংস্কৃতকে অনুসরণ করে রচিত হতে পারে না। কাজেই একথা বলা যেতেই পারে যে, বাংলা ব্যাকরণের যে-চর্চার সূত্রপাত এঁরা করেছিলেন তার ফলেই ব্যাকরণের সংস্কার কিছুটা সম্ভব হয়েছে এবং বাংলা ব্যাকরণে কিছুটা আধুনিকতার ছোঁয়া লেগেছে। তবে এই প্রসঙ্গে একথাও মনে রাখা একান্তই দরকার যে, বাংলা ব্যাকরণের প্রথম সংস্কারক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, যিনি বাংলা বর্ণমালা থেকে দীর্ঘ ঋ, ঌ ও দীর্ঘ ঌ কে নির্বাসিত করেছিলেন। এইভাবে বাংলা বর্ণমালাকে কালোপযোগী ও আধুনিক করেছিলেন বিদ্যাসাগর। এই সংস্কার যে কতখানি প্রয়োজনীয় ছিল তা বোঝা যাবে একথা স্মরণ করলেই, যে বাংলা ভাষার একটিও এমন শব্দ খুঁজে পাওয়া যাবে না যাতে দীর্ঘ ঋ আছে, কিংবা ঌ আছে, কিংবা দীর্ঘ ঌ।

বাংলা ব্যাকরণকে 'বাংলা ভাষার ব্যাকরণ' করে তোলার যে প্রক্রিয়া ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর শুরু করেছিলেন সে প্রক্রিয়া আজও চলেছে। তবে রবীন্দ্রনাথ, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

কিংবা রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর চেষ্টা সত্ত্বেও বাংলা ব্যাকরণকে এখনও পর্যন্ত সংস্কৃত ব্যাকরণের প্রভাব থেকে মুক্ত করা যায়নি। আজ পর্যন্ত রচিত হয়নি প্রকৃত বাংলা ভাষার ব্যাকরণ। আমরা চাই এমন ব্যাকরণ যা মান্য বাংলা ভাষার প্রবণতা ও বৈশিষ্ট্যগুলোকে দেখিয়ে দেবে, মান্য বাংলা ভাষার প্রকৃতিকে ঠিকভাবে ব্যাখ্যা করবে। তেমন ব্যাকরণ এখনও রচিত হয়নি। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, রাজশেখর বসু এবং মণীন্দ্রকুমার ঘোষ বাংলা ভাষার ব্যাকরণের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন বারবার। বাংলার পক্ষে অস্বভাবী প্রকরণগুলোকে ব্যাকরণ থেকে ছেঁটে ফেলার কথা বারবার বলছেন তাঁরা।

একথা মানতেই হবে যে, বাংলা ভাষাকে বিধিবদ্ধ করতে হলে বাংলা ভাষার ব্যাকরণ থেকে যা-কিছু বাংলা ভাষার পক্ষে অস্বভাবী তাকে ছেঁটে ফেলে মান্য বাংলা ভাষার পক্ষে যা স্বাভাবিক তাকে স্থান করে দিতে হবে। এই কথা মনে রেখেই একদা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর দীর্ঘ ঋ, ৯ ও দীর্ঘ ৯ কে বাংলা বর্ণমালা থেকে বিদায় করেছিলেন। সেই সংস্কারের গুরুত্ব আজ আমরা উপলব্ধি করতে পারছি। কিন্তু বিদ্যাসাগরের প্রচেষ্টা সর্বাত্মক ছিল না। সংস্কৃত ব্যাকরণের প্রভাব পুরোপুরি এড়িয়ে বাংলা ভাষার ব্যাকরণ প্রণয়ন করা কিংবা তেমন ব্যাকরণের নীতি নির্ধারণ করে দেওয়ার একটা সার্বিক পরিকল্পনা তাঁর প্রচেষ্টার অন্তর্ভুক্ত ছিল না। শুধু তাই নয়, কিছুকাল পরে বাংলা-সংস্কৃত বিতর্ক এমনই জোরালো হয়ে উঠেছিল যে, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রবীন্দ্রনাথ, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এবং প্রমথ চৌধুরীর বিরাট উপস্থিতি ও প্রচেষ্টা সত্ত্বেও বাংলা ব্যাকরণকে সর্বৈব বাংলা ভাষার ব্যাকরণ করে তোলা সম্ভব হয়নি। আরও পরবর্তীকালে রাজশেখর বসু ও সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের প্রচেষ্টাও বাংলা ব্যাকরণের পক্ষে আন্দোলনকে নিঃসন্দেহে জোরদার করেছে। তাঁদের ব্যাকরণভাবনা আমাদের এই সময়ের ভাষাভাবুকদের প্রভাবিত করেছে। নানা আলোচনা ও বিতর্কের মধ্যে একথা এখন স্বীকৃতি পেয়ে গেছে যে, মান্য চলিত গদ্যে শিষ্ট চলিত শব্দ ব্যবহৃত হতে পারবে, বরং সেটাই স্বাভাবিক হবে। আজ দ্বিধাহীনভাবে আমরা ফিতে, জুতো, টুকরো, ধনে, জিরে, জন্যে, মুণ্ডু—এসব কথ্যরীতির শব্দ আলোচনামূলক রচনায়ও ব্যবহার করছি। বাংলা ব্যাকরণ নতুন করে যখন লেখা হবে তখন বাংলা শব্দের উদাহরণ হিসেবে 'ফিতা' থাকবে না, 'ফিতে' থাকবে, 'জুতা'র বদলে থাকবে 'জুতো'।

বাংলা ব্যাকরণে এখনও যেসব সংস্কার সাধনের অপেক্ষায় রয়েছে সেগুলো হল ১. উচ্চারণস্থানের আলোচনায় ভুল সংশোধন, ২. বাংলা সন্ধির আলোচনা, ৩. কারক থেকে বিভক্তিকে পৃথক করা, ৪. পদপ্রকরণ সম্বন্ধে নতুন ভাবনার রূপায়ণ এবং ৫. অব্যয়ের পুনর্বিবেচনা। উষ্মবর্ণের (এবং উষ্মধ্বনির) যে সংজ্ঞা আজ পর্যন্ত চালু আছে তা যে কতদূর ভ্রমাত্মক সেকথা অনেকদিন আগে যেমন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী দেখিয়েছেন, তেমনি দেখিয়েছেন একালের ভাষাবিজ্ঞানীরা। বাংলা সন্ধি যে সংস্কৃত সন্ধি থেকে বিস্তর আলাদা সুনীতিকুমার তা দেখিয়েছেন, যদিও বিস্তারিত আলোচনা তিনি করেননি। শতেক, জনেক, বারেক প্রভৃতি

শব্দই বলে দিচ্ছে বাংলা সন্ধির ঝোঁকটা কোন দিকে। বাংলা ভাষার স্বাভাবিক প্রবণতাকে এড়িয়ে ব্যাকরণ লেখা আজ আর সম্ভব নয়। কারক ও বিভক্তিকে সংস্কৃতের রীতি অনুযায়ী একই প্রকরণের অন্তর্ভুক্ত করা বাংলা ভাষার পক্ষে অস্বভাবী। এ নিয়ে রবীন্দ্রনাথ, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, বিজনবিহারী ভট্টাচার্য আলোচনা করেছেন। বাংলা ভাষার প্রদপ্রকরণকেও নতুন করে বিচার করা কর্তব্য—অনুসর্গ, ধ্বন্যাত্মক শব্দ, অনুকার শব্দ, প্রভৃতিকে পদপ্রকরণের আওতায় আনা যায় কি না তা ভেবে দেখা দরকার। সর্বোপরি, বাংলায় কোনগুলো প্রকৃত অব্যয় তাও বিচার্য।

এইভাবে বাংলা ভাষার প্রকৃতি বুঝে নতুন ব্যাকরণ রচনা করার কথা ভাবতে হবে। সে-ভাবনা শুরু যে হয়নি এমন নয়। তবে এখনও সেই ভাবনাকে রূপ দেওয়া হয়নি। বাংলা ভাষার প্রমিতীকরণে নতুন ব্যাকরণের ভূমিকা তুচ্ছ নয়।

পঞ্চম বিষয় : বাংলা ভাষার প্রমিতীকরণে পরিভাষার ভূমিকা

বাংলা ভাষাকে বিধিবদ্ধ করার আয়োজনে পরিভাষা রচনার গুরুত্ব বড়ো কম নয়। যত বেশি পরিভাষা তৈরি হবে এবং সেসব পরিভাষা যত সুরচিত ও সুগ্রাহ্য হবে ভাষার প্রমিতীকরণের পূর্ণতাপ্রাপ্তির সম্ভাবনাও ততই বাড়বে। বাংলা ভাষায় বিদ্যাচর্চা এখন নতুন নতুন খাতে বইছে। একসময় বাংলায় বিদ্যাচর্চা একটি ছোটো গণ্ডির মধ্যে আটকে ছিল। এখন বহু বিষয় আমাদের চর্চার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ফলে প্রতিদিন নতুন নতুন বিদেশি এবং টেকনিকাল শব্দ আমাদের ব্যবহার করতে হচ্ছে। আর ঠিক এই কারণেই পরিভাষারও প্রয়োজন বেশি করে অনুভূত হচ্ছে।

বাংলা ভাষায় পরিভাষা তৈরির প্রয়াস শুরু হয়েছিল শতাধিক বছর আগে। অক্ষয়কুমার দত্ত, রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রমুখ গবেষক ও লেখক পরিভাষা রচনার সূত্রপাত করেন। তার পর থেকে পরিভাষা তৈরির চেষ্টা প্রায় কখনোই থেমে থাকেনি। কিন্তু তা সত্ত্বেও একথা বলার মতো অবস্থায় পৌঁছোইনি আমরা যে, বাংলায় পরিভাষা রচনার কাজটা একটা সুনির্দিষ্ট চেহারা পেয়েছে।

আমরা যখনই পরিভাষার কথা বলি তখনই, প্রায় সবসময়েই, বৈজ্ঞানিক পরিভাষার কথাই মাথায় রাখি। এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে, বৈজ্ঞানিক পরিভাষা এই সমস্যার অনেকখানি জায়গা জুড়ে রয়েছে। কিন্তু সেটাই একমাত্র সমস্যাসংকুল এলাকা নয়। সাহিত্যতত্ত্ব বা সাহিত্যরীতির সব পরিভাষাই কি নিরূপিত হয়ে গেছে? কিংবা ভাষাতত্ত্বের পরিভাষা কিংবা শৈলীবিজ্ঞান বা স্টাইলিসটিকসের পরিভাষা? অর্থনীতি, সমাজতত্ত্ব এসবও আছে। কাজেই যখন পরিভাষার কথা বলব, তখন সামগ্রিক সমস্যার চেহারাটাই দেখতে হবে। মনে রাখা দরকার যে, কেবল বৈজ্ঞানিক পরিভাষার সমস্যার কথা বললে সমস্যার সম্পূর্ণ চিত্রটা ধরা পড়বে না।

কিন্তু পরিভাষার সমস্যাটা আসলে কী? প্রথমত, অনেক পরিভাষাই যথাযথ নয়, নির্ভুল নয়। কয়েকটা উদাহরণ দিলেই ব্যাপারটা বোঝা যাবে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিভাষা

সমিতি heterostyly-র পরিভাষা করেছেন অসম পুংদণ্ড। অথচ অভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই জানেন শব্দটির যথার্থ পরিভাষা হওয়া উচিত অসম গর্ভদণ্ড। Exospore-কে বলা হয়েছে রেণুবহিস্ত্বক। কিন্তু হওয়ার কথা বহিঃরেণু। Real focus-কে সদ্‌বিম্ব বললে অনেকেই হকচকিয়ে যাবেন। আসলে সৎ কথাটার একটা মানে, যার অস্তিত্ব আছে। সেই অর্থে সদ্‌বিম্ব। কিন্তু এইরকম পরিভাষা পাঠকের মনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতেই পারে। কাজেই শুধু যে ভুল পরিভাষা তৈরি হচ্ছে তা নয়, এমন পরিভাষাও প্রচুর তৈরি হচ্ছে যেগুলো মোটেই যথাযথ নয়, নিখুঁত নয়।

এ হল সমস্যার একটা দিক। দ্বিতীয়ত, বহু ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে যে, পরিভাষা তেমন জনপ্রিয় হচ্ছে না। অনেক ক্ষেত্রেই অপরিচিত ও কঠিন সংস্কৃত শব্দকে পরিভাষা হিসেবে নেওয়া হচ্ছে। ফলে সেসব পরিভাষা সাধারণ ভাষাব্যবহারকারীর বোধগম্য হচ্ছে না। Dome-কে কুম্ভক বললে, কিংবা Postmaster General-কে মহাপ্রৈষাধিকারিক বললে কিংবা personal-কে প্রাতিজনিক বললে আমাদের বিবেচনায় পরিভাষার উদ্দেশ্যই মাটি হয়ে যায়। Parole যে কেন সংগর হবে তা সাধারণ পাঠককে কে বোঝাবে?

পরিভাষা তৈরির সময় একথা প্রায়ই মনে রাখা হয় না যে, একটি পারিভাষিক শব্দ উদ্‌ভাবন করাই যথেষ্ট নয়। শব্দটি বিশেষ্য হলে বিশেষণে তার রূপ কী হবে, কিংবা শব্দটি শব্দটি বিশেষণ হলে তার বিশেষ্য রূপ কী হবে তাও ভেবে রাখতে হবে। অন্যভাবে বলা যায়, পদান্তরযোগ্য শব্দকেই পরিভাষা হিসেবে গ্রহণ করা উচিত। শুধু alkali-র পরিভাষা কী হবে তা ভাবলেই চলবে না, alkaline-এর পারিভাষিক শব্দ কী হবে তাও গুরুত্বপূর্ণ। Alkali ক্ষার এবং alkaline ক্ষারীয়। পরিভাষার বিষয়টাকে এইভাবে দেখা দরকার।

পরিভাষার ব্যাপারে আর যে সমস্যাটি আমাদের অসুবিধায় বা অস্বস্তিতে ফেলে তা এই যে, সকলে একটি শব্দের একই পরিভাষা ব্যবহার করছেন না। ছাত্রপাঠ্য বইয়ে একরকম পরিভাষা ব্যবহৃত হচ্ছে গবেষণামূলক রচনায় কিংবা উচ্চতর আলোচনার বইয়ে কিংবা প্রচারমাধ্যমে একই শব্দের ভিন্ন পরিভাষা ব্যবহৃত হচ্ছে। Percent এর প্রতিশব্দ বা পরিভাষা হিসেবে শতকরা বা প্রতিশতই যুক্তিযুক্ত। কিন্তু বহু বইয়ে শতাংশ চলছে ; সংবাদপত্রগুলিও শতাংশ লিখছে। Osmosis-এর পরিভাষা করা হয়েছে আস্রবণ। অথচ বইপত্রে চলছে অভিস্রবণ। Vertical section কে বলা হয়ে উর্ধ্বাধ ছেদ, বইপত্রে দেখছি উল্লম্ব ছেদ। এই বিভিন্নতা চলতে পারে না। পরিভাষায় একরূপতা একান্ত প্রয়োজন।

মোটামুটিভাবে এই হল পরিভাষা সমস্যার চেহারা। আমরা কী করতে পারি তা ভেবে দেখতে হবে। পরিভাষাকে জনপ্রিয় করতে হবে, লোকগ্রাহ্য করতে হবে। পরিভাষা যথার্থ হলেই চলবে না, তাকে যতদূর সম্ভব সরল ও সহজবোধ্য হতে হবে। কোনো-কোনো ক্ষেত্রে ইংরেজি শব্দটিকেই রেখে দেওয়া যেতে পারে। বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু এইরকম কথাই বলেছিলেন। বাংলা পরিভাষা যদি ইংরেজি শব্দের চাইতে কঠিন হয়ে যায় তবে বাংলা অনুবাদের কী দরকার? ইংরেজিই থাকুক না। লেভেল-ক্রসিং, প্রিমিয়াম,

হাইফেন, সেমিকোলন, নার্ভ, সিরাম, সিলেবল, গ্যালভানোমিটার প্রভৃতি শব্দের বাংলা অনুবাদের তেমন প্রয়োজন নেই।

একথা ঠিক যে, পরিভাষায় সংস্কৃতের সাহায্য একরকম অনিবার্য। কিন্তু সেক্ষেত্রে আমাদের যথেষ্ট সতর্ক থাকতে হবে। অতি দুরূহ পণ্ডিতি শব্দ গ্রহণ না করাই উচিত। সংস্কৃত শব্দ নিতে গিয়ে বাংলা ভাষার নিজস্ব চরিত্রকে অগ্রাহ্য করলে তার ফল ভালো হয় না। দুরূহ, দীর্ঘ ও অপরিচিত সংস্কৃত শব্দের জনপ্রিয় হবার সম্ভাবনা কম। হিন্দির সাহায্য নিতে পারি আমরা। সেক্ষেত্রে অবশ্য খেয়াল রাখতে হবে যে বহু শব্দের হিন্দি অর্থ বাংলায় প্রচলিত অর্থ থেকে আলাদা। সেখানে হিন্দি শব্দকে পরিভাষা হিসেবে নেওয়া ঠিক হবে না। প্রবন্ধ শব্দের যে-অর্থ হিন্দিতে চলে, কিংবা শোধ শব্দের যে অর্থ হিন্দিতে চলে তার সঙ্গে বাংলা অর্থের কোনোই মিল নেই। এ বিষয়ে সতর্ক থাকা দরকার।

এ ছাড়া যে কথাটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ তা এই যে, পরিভাষা রচনার দায়িত্ব যে সংস্থার উপর দেওয়া হবে, তাঁদের গৃহীত পরিভাষা যেন সবার কাছে গ্রহণীয় হয়, যেন একই পরিভাষা সবাই ব্যবহার করেন। একই শব্দের বিভিন্ন পরিভাষা কখনো চলতে দেওয়া উচিত নয়। মনে রাখতে হবে, পরিভাষার উদ্দেশ্য হল মাতৃভাষায় জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চাকে সর্বসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া। যতদিন পর্যন্ত সর্বসাধারণের উপযোগী পরিভাষা তৈরি না হচ্ছে ততদিন পরিভাষার উদ্দেশ্য সফল হবে না। ততদিন ভাষার বিধিবদ্ধতার প্রক্রিয়াও সম্পূর্ণ হবে না।

গ্রন্থপঞ্জি

১. আজাদ, হুমায়ুন—বাঙলা ভাষা, ১৯৮৪
২. নাথ, মৃণাল—ভাষা ও সমাজ, ১৯৯৯
৩. পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি—প্রসঙ্গ বাংলা ভাষা, ১৯৮৬
৪. ভট্টাচার্য, সুভাষ—ভাষা ও শৈলী, ২০০৬
৫. মুসা, মনসুর—ভাষাচিন্তা : প্রসঙ্গ ও পরিধি, ১৯৯১
৬. সরকার, পবিত্র—ভাষা দেশ কাল, ১৯৮৫
৭. Berezin, F.M–Lectures on Linguistics, 1969
৮. Crystal, David—The Cambridge Encyclopaedia of Language, 1997
৯. Sapir, Edward—Language, 1949
১০. Trask, R.L—Language : The Basics, 2003

১২. শৈলীবিজ্ঞানের গোড়ার কথা

১২.১ শৈলীর কী ও কেন

ভাষা দিয়ে আমরা মনের ভাব প্রকাশ করি। এটি ভাষার প্রাথমিক ও প্রধান কাজ নিশ্চয়। কিন্তু যদি ওই মনোভাব প্রকাশের বিষয়টাকে বিশিষ্ট করে তুলতে চাই, তাহলেই বড়ো হয়ে দেখা দেয় form বা রূপের কথা। এই রূপেরই অন্য নাম শৈলী। ভাষার রূপগত বিশ্লেষণ করে আমরা বুঝতে পারি বক্তব্যটি বা রচনাটি পুরুষের না নারীর, সমাজের উপর তলার কোনো বক্তার বা লেখকের, না অতি সাধারণ কারও, বুঝতে পারি বক্তার বা লেখকের বিশেষ মানসিকতা বা মুদ্রাদোষের কথা।

কেউ-কেউ stylistics বা শৈলীবিজ্ঞানকে 'রীতিবিজ্ঞান' বলেন বা বলেছেন। তবে মনে হয় 'শৈলীবিজ্ঞান' নামটিতেই বিষয়টির চরিত্র ঠিক ঠিক ধরা পড়ে। শৈলীবিজ্ঞানের ভিত্তিভূমি ভাষাবিজ্ঞান দিয়েই গড়া। বিখ্যাত শৈলীবিজ্ঞানী টার্নার (J.W. Turner) বলেছেন—Stylistics is that part of linguistics which concentrates on variation in the use of language, often, but not exclusively, with special attention to the most conscious and complex uses in literature. অর্থাৎ শৈলীবিজ্ঞান হল ভাষাবিজ্ঞানসম্মত সাহিত্যবিচার।

ঠিক এইখানেই তৈরি হল বিতর্কের জায়গা। সাহিত্য সমালোচনার বা বিশেষভাবে কবিতা আলোচনার যে-রীতি শত শত বছর ধরে প্রচলিত হয়ে আসছে তার সঙ্গে শৈলীবিজ্ঞানের একটা বিরোধের জায়গা আছে। সাহিত্য সমালোচনার সাবেক রীতি অনেকটাই subjective বা ব্যক্তিত্ব নির্ভর। অন্য দিকে, শৈলীবিজ্ঞান-সম্মত সাহিত্য বিচার objective বা নৈর্ব্যক্তিক। একটিতে সাহিত্যিকের মানসতা, রুচি, অভ্যাস প্রভৃতি গুরুত্ব পায়। অন্যটিতে তার কোনো সুযোগ নেই। যেহেতু সেখানে text বা পাঠবস্তুই কেবল বিবেচ্য, তার প্রয়োগরীতিই বিবেচ্য। এই দুই পদ্ধতির মধ্যে বিরোধ আছে আজও এবং কার্টিস হেজ (Curtis W. Hayes) একে বলেছেন Lang-lit বিতর্ক। Stylistics এর গোড়ার কথা হল style বা রীতি, ভাষারীতি। স্যামুয়েল ওয়েসলি (Samuel Wesley) একে বলেছেন the dress of thought, চিন্তার পরিচ্ছদ, তার মানে চিন্তাকে যা দিকে সাজানো হয়। জনাথান সুইফ্‌ট্ বলেছেন proper words in proper places. ইয়েটস বলেছেন high breeding in words and in argument. বলাবাহুল্য, এই কথাগুলো সবই সাবেক সাহিত্যভাবনা থেকে সঞ্জাত। তবে মোদ্দা কথা এই যে, style দু-রকমের হতে পারে—এক, evaluative বা মূল্যায়নভিত্তিক, এবং দুই, descriptive বা বর্ণনাত্মক। এক ধরনের শৈলী হল সেই বৈশিষ্ট্য সমূহের বিশ্লেষণ যেগুলি সাধারণ এবং মামুলি ও

অবিশিষ্ট রচনা থেকে একটি রচনাকে আলাদা করে চিনিয়ে দেয়। আর বর্ণনাত্মক শৈলী হল কতকগুলি বৈশিষ্ট্যের নিছক বর্ণনা।

বস্তুতপক্ষে শৈলীগত চর্চায় যে-বিষয়টির গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি তা হল choice বা নির্বাচন। সচেতনভাবেই হোক, আর অচেতনভাবেই হোক, ভাষার নানাবিধ প্রকরণ থেকে কতকগুলি প্রকরণ নির্বাচন করে বা বেছে নিয়ে ব্যবহার করে কোনো পাঠবস্তুকে 'বিশিষ্ট' করে তোলাই শৈলীর বড়ো কথা। শৈলীর আলোচনায় choice বা নির্বাচন যে একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তাতে কোনো সন্দেহ নেই। সচেতন ও অচেতন দুই ধরনের নির্বাচনই যে গুরুত্বপূর্ণ তাও মানতে হবে।

ল্যাং-লিট বিতর্কের কথায় আর একবার ফিরে আসি। ভাষাবিজ্ঞানীরা বা শৈলীবিজ্ঞানীরা যখন সাহিত্যকৃতির শৈলীবিজ্ঞানসম্মত বিচারের কথা বলেন, তখন সাবেক রীতির সাহিত্য সমালোচকেরা বলেন, কবিতার আলোচনায় ভাষাবিজ্ঞানের প্রয়োগে কবিতার ব্যবচ্ছেদ হয় বটে, কিন্তু হারিয়ে যায় কবিতার আনন্দ। এর জবাবে অবশ্য নিলস এরিক এক্কুইস্ট (Nils Eric Enkvist) বলেছেন যে, সাহিত্যকর্মের ভাষাবিশ্লেষণের উদ্দেশ্য তার চমক ও অসাধারণত্বের ধ্বংসসাধন নয়, বরং সেই চমক ও অসাধারণত্বের আবিষ্কার ও মূল্যায়ন।

১২.২ শৈলীবিজ্ঞান এবং রচনার শনাক্তকরণ : সংখ্যাতাত্ত্বিক শৈলীচর্চা

শৈলীবিজ্ঞানে সংখ্যাতত্ত্বের ব্যবহার একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। একে stylostatistical studies বলা হয়। ভাষিক উপাদান ব্যবহারের পৌনঃপুনিকতা ও প্রয়োগক্ষেত্র বিশ্লেষণ করারই নাম সংখ্যাতাত্ত্বিক শৈলীচর্চা। একজন সাহিত্যিকের ব্যবহৃত শব্দ কখনো আর একজনের মতো হয় না। শুধু শব্দের ব্যবহারই নয়, ব্যবহারের ক্ষেত্র ও পদ্ধতিও লেখকে-লেখকে আলাদা হতে বাধ্য। লেখকভেদে বাক্যগঠন ও শব্দপ্রয়োগে যে ভিন্নতা থাকে, এবং সেই ভিন্নতাই যে শৈলীবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়, সেকথা চার্লস হকেট (C.F. Hockett) এবং সেমুর চ্যাটম্যান (Seymour Chatman) আমাদের জানিয়েছেন। একই কথা বলেছেন স্টিভেন উলমান (Stephen Ullmann), গ্রেম হাফ (Graham Hough) প্রভৃতি ভাষাবিজ্ঞানী ও শৈলীবিজ্ঞানী। এই কারণে অনেক সময় অজানা বা অজ্ঞাতপরিচয় লেখকের রচনার শনাক্তকরণে stylostatistical method বা সংখ্যাতাত্ত্বিক শৈলীচর্চার পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। কোনো একটি পাঠবস্তুতে বিশেষ্য ও বিশেষণের সংখ্যাগত প্রাধান্য, ক্রিয়াপদ ও ক্রিয়াবিশেষণের অনুপাত, দীর্ঘ বাক্য ও হ্রস্ব বাক্যের অনুপাত, পুনরুক্তির পৌনঃপুনিকতা, আতিশয্যমূলক শব্দের ব্যবহার—এইসব শুধু বিশ্লেষণ করাই নয়, এইসবের সংখ্যাতত্ত্ব বিশ্লেষণ করাই এই পদ্ধতির মূল কথা।

১৭৬৯ থেকে ১৭৭২ এই তিন-চার বছরে লন্ডনের The Public Advertiser নামক পত্রিকায় Junius এই ছদ্মনামের আড়ালে জনৈক ব্যক্তি অনেকগুলি রাজনীতি-বিষয়ক চিঠি

লিখেছিলেন। চিঠিগুলি সেকালে খুবই আলোচিত হয় এবং পরে পৃথকভাবে ওই Junius নামেই আবার ছাপা হয়। কিন্তু তখন কিংবা পরে জানা যায়নি কে ওই জুনিয়াস। ১৯৬২ সালে সুইডিশ ভাষাতাত্ত্বিক আল্ভার এল্গর্ড (Alvar Ellegård, জন্ম 1919) জুনিয়াস-লিখিত চিঠিগুলির সংখ্যাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করেন। সমগ্র পত্রসম্ভারে তিনি আশি হাজার শব্দ (৮০,০০০) পেয়েছেন। সর্বসমেত ৪৫৮টি ভাষিক উপাদান (lexical items) ব্যবহৃত হয়েছে, সমার্থ শব্দ (synonym) ব্যবহৃত হয়েছে ৫১টি—যেমন on, upon; usually, commonly; till, until; know not how, do not know how ইত্যাদি। এইরকম আরও নানারকম সংখ্যাতাত্ত্বিক উপাদান খুঁজে সেগুলির সঙ্গে সেকালের অন্য কয়েকজন লেখকের রচনারীতির সঙ্গে মিলিয়ে দেখেছেন এল্গর্ড। তিনি বিশেষত স্যার ফিলিপ ফ্রান্সিসের ব্যবহৃত ২৩০,০০০ অর্থাৎ দুই লক্ষ ত্রিশ হাজার শব্দের সঙ্গে তুলনা করে প্রমাণ করেছেন যে, জুনিয়াস স্যার ফিলিপ ছাড়া আর কেউই নন।

আমাদের ভাষাতেও সংখ্যাতাত্ত্বিক শৈলীচর্চা শুরু হয়েছে প্রধানত ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিক্যাল ইনস্টিটিউটের ভাষা পরিষদ বিভাগে। ভক্তিপ্রসাদ মল্লিক, নীলাদ্রিশেখর দাশ প্রমুখ কয়েকজন ভাষাতাত্ত্বিক সাহিত্যের ভাষাবিশ্লেষণে সংখ্যাতত্ত্বের প্রয়োগ করেছেন।

১২.৩ শৈলীবিচারের প্রকরণ (tools)

কোনো সাহিত্যকৃতির শৈলী বিচার-বিশ্লেষণ করার সময় শৈলীবিজ্ঞানীরা কতকগুলি tool বা প্রকরণ ব্যবহার করেন। সেগুলি হল ১. foregrounding বা প্রমুখণ, ২. deviation বা বিচ্যুতি, ৩. parallelism বা সমান্তরালতা, ৪. code switching বা কোডবদল বা সংকেতবদল এবং ৫. polyphony বা বহুস্বরকতা বা বহুধ্বনিময়তা।

আমরা এবার খুব সহজ ভাষায় এই শৈলী-প্রকরণগুলির অর্থ বুঝে নেব। এই প্রকরণগুলির প্রত্যেকটিই আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানেরও প্রকরণ।

১. foregrounding বা প্রমুখণ

দুই ভাষাবিজ্ঞানী রোমান ইয়াকবসন (Roman Osipovic Jakobson) এবং ইয়ান মুকারোভ্স্কি (Ian Mukarovsky) এই foregrounding প্রকরণটিকে খুবই গুরুত্ব দিয়ে ব্যাখ্যা করেছেন। মুকারোভ্স্কি বলেছেন—'the function of poetic language consists in the maximum foregrounding of the utterance'. অর্থাৎ কবিতায় কবি তাঁর কাব্যভাষাকে বিশেষভাবে foreground করেন। আরও একটু স্পষ্ট করে বলি, কবি তাঁর বক্তব্যকে একেবারে সামনে নিয়ে আসেন। এবারে প্রশ্ন উঠবে—কাকে বলে foregrounding? প্রথমেই বলি foregrounding-এর বাংলা প্রতিশব্দ পবিত্র সরকার করেছেন 'প্রমুখণ'। সহজ ভাষায় বলা যায়—সামনে নিয়ে আসা। শিল্প মাত্রেই প্রচলিত ও স্বীকৃত আদর্শ থেকে কিছুটা সরে যায়। এই সরে যাওয়ার ইংরেজি

নাম deviation, বাংলায় বলব বিচ্যুতি বা বিসারণ। এই বিচ্যুতি বা বিসারণ শিল্পকে বিশিষ্টতা দেয়। কবিতায় এটা সবচেয়ে বেশি ঘটে। চেক ভাষাবিজ্ঞানী হাব্রানেক এবং মুকারোভ্স্কি একেই বলেছে *aktualisace.* পল গারভিন (Paul Garvin) এই চেক শব্দটির অনুবাদ করেই ইংরেজিতে foregrounding বলেছেন। মুকারোভ্স্কি একে বলেছেন শিল্পসৃষ্টির জন্য বা সৌন্দর্যসাধনের জন্য ইচ্ছাকৃত বিচ্যুতি (The aesthetically intentional distortion of the linguistic components)। আমরা background বলতে বুঝি পশ্চাৎপট, অর্থাৎ যা পিছনে থাকে। তারই বিপরীত হল foreground, অর্থাৎ সম্মুখপট। কবির বা শিল্পীর বক্তব্যকে সামনে এনে হাজির করার কৌশলের নামই foregrounding বা প্রমুখণ। শৈলীবিজ্ঞানের মতে শিল্পের যথাযথ চরিত্র বুঝতে হলে সেই শিল্পের ব্যতিক্রমী বৈশিষ্ট্যের প্রতি আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে হবে। তা যদি করি, তবে দেখতে পাব যে, শিল্পের বা কবিতার ভাষার গতানুগতিক ও নিয়মনির্দিষ্ট আদর্শগুলিকে পিছনে ফেলে ব্যতিক্রমী লক্ষণগুলো সামনে এসে হাজির হয়েছে। জেফ্রি লিচ (Geoffrey Leech) বলেছেন যে, প্রতিষ্ঠিত ও স্বীকৃত ভাষাগত বা অন্য আদর্শ থেকে বিচ্যুতিই foregrounding এবং এই বিচ্যুতি সবচেয়ে বেশি ঘটে কবিতায়। ভাষার সাধারণ নিয়মকে অনেকসময়েই কবিরা ভেঙে ফেলেন। তাই একে বলা হয় organised violation of language.

২. বিচ্যুতি বা বিসারণ (deviation)

প্রমুখণের প্রসঙ্গে বিচ্যুতির কথা উঠে এসেছে। গদ্যের চেয়ে কবিতায় ভাষাগত বিচ্যুতি ঘটে বা ঘটানো হয় অনেক বেশি। সব মহৎ শিল্পী বা কবি তাঁদের ভাব প্রকাশের জন্য ফর্ম (form) ভাঙেন, প্রচলিত মাধ্যমের (medium) মধ্যে আনেন বৈচিত্র। শুধু মহৎ কবিই যে ফর্ম ভাঙেন তা নয়। যেকোনো কবিকেই প্রচলিত ভাষারীতি থেকে একটু সরে যেতে হয়। বস্তুতপক্ষে, কাব্যভাষায় বিচ্যুতি থাকবেই। ভাষাগত বিচ্যুতি কবিতার অন্যতম চরিত্রলক্ষণ। কবিতায় বিচ্যুতি অনিবার্য ও অপরিহার্য। কবিমাত্রেই ভাষার ঘাটতি অনুভব করেন। কবিতার নিজস্ব প্রয়োজনেই তাই ভাষাগত বিচ্যুতি ঘটিয়ে ভাষায় নতুন মাত্রা যোগ করা হয়, ঘাটতি পূরণ করা হয়। কবি অরুণ মিত্র এই কথাগুলিই একটু অন্যভাবে বলেছেন। তিনি বলেছেন, আমরা প্রত্যক্ষ বক্তব্য বা দৈনন্দিন বক্তব্যের জন্য যেসব শব্দ ব্যবহার করি, তা দিয়ে প্রায়ই কবির মনোভাব ঠিকমতো ব্যক্ত করা যায় না। এই কারণে কবিকে নানান উপায় অবলম্বন করতে হয়। কখনো তিনি নতুন শব্দ উদ্ভাবন করেন, কখনো পুরোনো শব্দকে নতুন অর্থে ব্যবহার করেন। দীর্ঘ ব্যবহারে মলিন শব্দ দিয়ে কবির মনোভাব প্রকাশ ঠিকমতো না হলে 'স্থবির' শব্দগুলোকে বিভিন্ন উপায়ে নতুন ব্যঞ্জনায় জারিত করে তাঁর বক্তব্যকে আভাষিত করতে হয়।

মনে হতে পারে, সাহিত্য সমালোচকের ও ভাষাবিজ্ঞানীর দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে পার্থক্য তেমন নেই। মনে হতে পারে উভয়েই একই কথা বলেছেন। সাহিত্য সমালোচক বলেন কবিকে প্রচলিত ভাষার সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে ওঠার জন্য নতুন শব্দ বা শব্দের নতুন অর্থ উদ্ভাবন করতে হয়। আবার ভাষাবিজ্ঞানীও বলেন, কবিরা ভাষা-আদর্শের হেরফের ঘটান, বিচ্যুতি ঘটান। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই দুই দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে পার্থক্য আছে। সাহিত্য সমালোচক কবির ভাষা-উত্তরণের কথা বলেন না, তিনি কেবল শব্দগত (lexical) এবং শব্দার্থগত (semantic) পরিবর্তনের কথা বলেন। কখনো বা প্রসঙ্গক্রমে অলংকার ও ধ্বনিসংস্থানের অভিনবত্বের কথাও বলেন। কিন্তু ভাষাবিজ্ঞানী তথা শৈলীবিজ্ঞানী কবিতার ভাষাকে সামগ্রিকভাবে দেখেন। তিনি দেখেন কীভাবে কবি ভাষাকে সৃষ্টিশীল (creative) উপায়ে ব্যবহার করেন।

কবিতায় ভাষাগত বিচ্যুতির নানান রূপ হতে পারে। তবে সে সম্পর্কে কিছু বলার আগে একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রাসঙ্গিক বক্তব্য বলে নেওয়া প্রয়োজন। নোয়াম চমস্কির সংবর্তনী-সঞ্জননী (Transformational-Generative Grammar) ব্যাকরণে বাক্যের গঠনে দুটি স্তরের কথা বলা হয়। সেই দুটি হল অন্তর্বিন্যাস বা অধোগঠন (deep structure) এবং বহির্গঠন বা অধিগঠন (surface structure)। এই দুটি স্তর সম্বন্ধে এখানে বিস্তারিত আলোচনার দরকার নেই। এই বিষয়টি আগে নবম অধ্যায়ে দেখেছি আমরা (দ্র. ৯.৬)। এখানে কেবল এটুকুই বলব যে, প্রত্যেক বাক্যের এই যে দুটি স্তরের কথা বলা হল, তার একটি হল ব্যাকরণগত গঠনের দিক, যার নাম বহির্গঠন বা অধিগঠন (surface structure) এবং অন্যটি হল বাক্যের অন্তর্নিহিত অর্থের দিক। সেটি হল বাক্যের অন্তর্বিন্যাস বা অধোগঠন (deep structure)। অতএব কবিতায় যে ভাষাগত বিচ্যুতি ঘটে তাকে আমরা দুইভাবে দেখতে পারি—বহির্বিন্যাসের বিচ্যুতি বা উপরিস্তরে বিচ্যুতি এবং অন্তর্বিন্যাসের বিচ্যুতি। বহির্বিন্যাসের বিচ্যুতি বলতে শব্দগত, ব্যাকরণগত বা আন্বয়িক বিচ্যুতি বোঝায়। অন্য দিকে, অন্তর্বিন্যাসের বিচ্যুতি বলতে বাক্যের বা উক্তির অন্তর্নিহিত অর্থের বিচ্যুতি বোঝায়।

বিচ্যুতির যে নানান রূপ হতে পারে সেকথা আগেই বলেছি। এবারে আমরা দেখব বিচ্যুতি কত রকমের হয়। বিচ্যুতি হতে পারে শব্দগত (lexical), অন্বয়গত (syntactical), শব্দার্থগত (semantic) এবং ব্যাকরণগত (grammatical)।

প্রথমেই বলা হবে **শব্দগত বিচ্যুতির** কথা। শব্দগত বিচ্যুতি হতে পারে নানারকম। শব্দব্যবহারের স্বীকৃত ও প্রচলিত রীতির ব্যত্যয় ঘটানো শব্দগত বিচ্যুতির একটি ধরন। নীচের উদাহরণটি দেখা যাক—

যে বিদ্যা শিখিনু তাহা চিরদিন ধরে
অন্তরে জাজ্বল্য থাকে উজ্জ্বল রতন, ...

রবীন্দ্রনাথ এই যে 'জাজ্বল্য' শব্দটি ব্যবহার করেছেন, ব্যাকরণের কঠোর নিয়মে এই

প্রয়োগ একরকম বিচ্যুতি। কেননা প্রচলিত শব্দটি জাজ্বল্যমান। সংস্কৃত শানচ্ প্রত্যয়ান্ত 'জাজ্বল্যমান'-এর প্রথম অংশটুকুই কেবল নেওয়া হয়েছে। কখনো-কখনো অপ্রচলিত শব্দকে প্রচলিত করেন কবিরা। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত লিখেছেন—

সিদ্ধির অঙ্কুটে
সোনার স্বর্গের দ্বার খুলিত না তবু ....

'অঙ্কুট' একটি সংস্কৃত শব্দ, অর্থ 'চাবি'। বাংলায় এর প্রয়োগ নেই বললেই চলে। সুধীন্দ্রনাথ ব্যবহার করলেন এই অপ্রচলিত শব্দ।

শব্দার্থগত বিচ্যুতিও কবিতায় প্রায়ই ঘটানো হয়। শব্দের অর্থকে তার চেনা বা পরিচিত ও প্রচলিত অর্থে ব্যবহার না করে অপ্রচলিত অর্থে বা একদা-প্রচলিত (কিন্তু বর্তমানে অপ্রচলিত) অর্থে ব্যবহার করে শব্দার্থগত বিচ্যুতি ঘটানো হয়। ইংরেজি কবিতার একটি অত্যন্ত পরিচিত দৃষ্টান্ত হল ডিল্যান টমাসের (Dylan Thomas) *A Grief Ago* নামে একটি কবিতায় ব্যবহৃত শব্দগুচ্ছ—

A grief ago
She was who I hold, the fats and flower,
Or, water-lamned, from the scythe-side thorn,
Hell wind and sea....

আমরা যেমন বলি এক মাস আগে, এক যুগ আগে, তেমনি কবি ডিল্যান টমাস লিখলেন a grief ago. হয়তো তিনি বলতে চান a time of grief ago বা a grief-time ago, অর্থাৎ এক দুঃখভোগের কাল আগে। একে শৈলীবিজ্ঞানীরা বলেন semantic oddity অর্থাৎ অর্থগত 'উদ্ভটতা'। বাংলা কবিতা থেকেও এই semantic oddity বা অর্থের উদ্ভটতার উদাহরণ দেওয়া যায়—

কটাক্ষের কালো দ্যুতি সাক্ষ্য দেয় যুগান্তের
(অমিয় চক্রবর্তী, নাচঘরে)
ঋণ শোধ ক'রে দিতে গিয়ে এই অনন্ত রৌদ্রের অন্ধকারে
(জীবনানন্দ দাশ, নাবিকী)

'দ্যুতি' অর্থ তো উজ্জ্বলতা, দীপ্তি। তা কী করে কালো হয়? রৌদ্র-ই বা কীভাবে 'অন্ধকার' হয়? এ-হল অর্থগত বিচ্যুতির উদাহরণ।

অন্বয়গত বিচ্যুতিও কবিতার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। বাক্যে পদের সংস্থান বদলে দেবার নামই অন্বয়গত বিচ্যুতি। একে পদক্রমের বিপর্যাসও বলা হয়। তার উদাহরণ দেখা যাক—

ফুরাল দিন কখন নাহি জানি,
সন্ধ্যাবেলা ভাসিল জলে আবার তরীখানি।
(রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সাগরিকা)

এই অংশে স্বাভাবিক পদক্রম হবার কথা ছিল এইরকম—

নাহি জানি কখন দিন ফুরাল
সন্ধ্যাবেলা আবার তরীখানি জলে ভাসিল

এই ধরনের ব্যত্যয়কেই অন্বয়গত বিচ্যুতি বলা হয়।

ব্যাকরণগত বিচ্যুতি কবিতায় বারবার ব্যবহৃত হয়। আমরা আগে যে 'জাজ্বল্য' শব্দটির কথা বলেছি, সেটি একটি ব্যাকরণগত বিচ্যুতিরও উদাহরণ। এমন উদাহরণ আরও দেওয়া যায়—

অণুতম পরমাণু আপনার ভারে
সঞ্চয়ের অচল বিকারে,
(রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, চঞ্চলা)

'অণু' শব্দটিকে বিশেষণে ব্যবহার করে তার অর্থে কবি এসেছেন বৈচিত্র। এও ব্যাকরণগত বিচ্যুতির উদাহরণ।

৩. সমান্তরালতা (parallelism)

সমান্তরালতা শৈলীর আর একটি অত্যন্ত সমাদৃত প্রকরণ। কবিতাতেই এর প্রয়োগ বেশি, সন্দেহ নেই। আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানে ও শৈলীবিজ্ঞানে repetition বা পুনরাবৃত্তিকেই 'সমান্তরালতা' বলা হয়। সমান্তরালতা কোনো নতুন ব্যাপার নয়। প্রাচীন গান ও কবিতাতেও সমান্তরালতা ব্যবহৃত হত। বিখ্যাত লেখক জর্জ টমসন টোব্রিয়ান্ড নামে একটি দ্বীপের অধিবাসীদের গান তাঁর বইয়ে উল্লেখ করেছেন—

It passes, it passes
The breaking pair in the thighbone passes,
The ulceration of the skin passes....
It passes, it passes

এই passes শব্দটির পৌনঃপুনিক প্রয়োগকে বলা যায় সমান্তরালতা। একটি শব্দকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বারবার ব্যবহার করার নাম শব্দগত সমান্তরালতা বা verbal parallelism.

শত বসন্তের স্মৃতি জাগিছে ধরায়
শতলক্ষ কুসুমের পরশস্বপন
শত বসন্তের যেন ফুটন্ত অশোক
ঝরিয়া মিলিয়া গেছে দুটি রাঙা পায়।
(রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, চরণ)

বুদ্ধদেব বসুর কবিতায়—

যুগপৎ লাল ফুল, গুপ্ত কীট
যুগপৎ স্বর্গ ও শ্মশান,
যুগপৎ সব অসম্ভব।
(সৃষ্টির মুহূর্ত)

৪. কোড বদল বা সংকেত বদল (code switching)

একটি ভাষারীতির মধ্যে হঠাৎ অন্য ভাষারীতি থেকে শব্দ বা খণ্ডবাক্য আমদানি করারই নাম কোড বদল। এক অর্থে একে কোড মিশ্রণও (code mixing) বলা যেতে পারে, যদিও কোড বদল আর কোড মিশ্রণের মধ্যে সূক্ষ্ম একটা পার্থক্য আছে। খুব সহজ করে বলা যায়, বাংলা বলতে বলতে তার মধ্যে ইংরেজি বাক্যাংশ বা শব্দ ব্যবহার করা হলে, কিংবা এক উপভাষার কথন বা উক্তির মধ্যে অন্য এক উপভাষার বাক্যাংশ বা শব্দের ব্যবহার হলে তাকে কোডবদলের উদাহরণ বলা যায়। কোডবদলের দৃষ্টান্ত মুখের ভাষায় বেশি পাওয়া যায় বটে, তবে লিখিত ভাষাতেও তা অমিল নয়। বিশেষত, উপন্যাস ও নাটকের সংলাপ অংশে কোডবদল প্রায়ই লক্ষ করা যায়। কবিতায় কোড বদল বা কোড মিশ্রণের উদাহরণ কমই পাওয়া যায়। একটি উদাহরণ দেওয়া যাক—

ঘরে হাঁড়ি ঠনঠনাস্তি
মশা মাচি ভন্‌ভনাস্তি
শীতে শরীর কন্‌কনাস্তি
একটু কাপড় নাইক পিটে।।

দারাপুত্র হন্‌হনাস্তি,
অস্তি, নাস্তি, ন জানন্তি,
দিবে রাত্রি খেতে চান্তি,
আমি ব্যাটা মরি খেটে।।

(ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, পৌষড়ার গীত)

এখানে বাংলার সঙ্গে প্রথমে নকল সংস্কৃত (ঠনঠনাস্তি, ভন্‌ভনাস্তি, কন্‌কনাস্তি) আর পরে খাঁটি সংস্কৃত (অস্তি, নাস্তি) মেশানো হয়েছে।

যদি কোনো সংলাপ-অংশে এইরকম থাকে—

> আমি কিছুতেই তাকে এটা দেব না। No, never. কেন? never কেন? ও তো চাইতেই পারে। এটা তো ওর lawful claim. তবে দেবে না কেন?

তবে একে আমরা কোডবদলের দৃষ্টান্ত বলতে পারি।

৫. বহুস্বরকতা বা বহুধ্বনিময়তা (polyphony)

বিশেষত উপন্যাসের প্রসঙ্গে বহুধ্বনিময়তার কথা আলোচিত হয়। উপন্যাস বহু মানুষের আলাপে-সংলাপে নির্মিত হয়। তাই উপন্যাসে বহু মানুষের কণ্ঠস্বর শোনা যায়। রুশ দার্শনিক, ভাষাবিজ্ঞানী ও সাহিত্যতাত্ত্বিক মিখাইল বাখতিন উপন্যাসে

polyphony বা বহুধ্বনিময়তার তত্ত্ব উপস্থিত করেছেন। উপন্যাসে দেখা যায় বিভিন্ন চরিত্রের কথোপকথন, কোথাও শিষ্ট ভাষায় বিবৃতি, কোথাও কথ্য ভাষায় সংলাপ, কোথাও কোনো চরিত্র গান করছে, কোথাও কবিতার চরণ আবৃত্তি করছে। এই সবকিছু নিয়ে গড়ে ওঠে উপন্যাসের জটিল গ্রথন। একেই বাখতিন বলেছেন বহুধ্বনিময়তা। উপন্যাসের শৈলী বিচারে এই বহুধ্বনিময়তার পর্যালোচনা তাই খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

১২.৪ শৈলী ও নির্বাচন (style and choice)

স্টাইল বা শৈলী গড়ে ওঠার পিছনে সক্রিয় থাকে লেখকের তরফে তাঁর ভাষিক উপাদানের নির্বাচন। ভাষাবিজ্ঞানী নিলস এরিক এঙ্কুইস্ট বলেছেন শৈলীর মূল কথাই নির্বাচন। কিন্তু কী নির্বাচন? কীসের নির্বাচন? ভাষাবিজ্ঞানী ডেভিড ক্রিস্টাল এর খুব সহজ ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন—Style is seen as the (conscious or unconscious) selection of a set of linguistic features from all the possibilities in a language. অর্থাৎ কবিতাই হোক বা গদ্যই হোক, উপন্যাসই হোক বা নাটকই হোক, বা নিবন্ধ-জাতীয় রচনা, একজন লেখক সচেতনভাবে বা অচেতনভাবে তাঁর রুচি ও বিষয় অনুসারে নির্বাচন করেন তাঁর ভাষিক উপাদানগুলি। তিনি কী ধরনের শব্দ ব্যবহার করবেন, গদ্য বা পদ্যের কোন রীতি তিনি ব্যবহার করবেন ভাষাকে বিশিষ্ট করে তুলবার জন্য, কী কী প্রকরণ তিনি ব্যবহার করবেন—সে-সবই তাঁর নিজস্ব নির্বাচন। আর একেই বলা হয় linguistic choice.

এক-একজন লেখকের শব্দনির্বাচনে থাকতে পারে কিছু বিশেষ অভ্যাস বা মুদ্রাদোষ। সাধুভাষা, চলিতভাষা, তৎসম শব্দের ব্যবহারের মাত্রা এসবই লেখকের নিজস্ব নির্বাচনের বিষয়। ভাষার আদর্শ মান থেকে যে-বিচ্যুতির কথা উপরে ১২.৩ পরিচ্ছেদে বলা হয়েছে, সেই বিচ্যুতির চরিত্র ও মাত্রাও নির্বাচনের মাধ্যমে স্থির হয়।

উপরে বলেছি যে, ডেভিড ক্রিস্টাল নির্বাচন সম্বন্ধে বলেছেন conscious বা unconscious অর্থাৎ সচেতন বা অচেতন। এই প্রশ্নটা প্রথম তুলেছিলেন লুই মিলিচ—নির্বাচন কি সচেতন, না অচেতন? অর্থাৎ লেখক কি জেনেবুঝে তাঁর স্টাইল নির্বাচন করেন? না কি নির্বাচনের প্রক্রিয়াটি অচেতন? মিলিচ নিজেই এ-প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। তিনি বলেছেন নির্বাচন অচেতন ও সচেতন দুই-ই। কখন সচেতন, কখন অচেতন? পবিত্র সরকার সহজে এর উত্তর দিয়েছেন। যখন লেখক ভাষার মান্য বা আদর্শ লক্ষণগুলোই ব্যবহার করেন, তখন তাঁর নির্বাচন অচেতন, কারণ তাঁকে তখন ভাষা ব্যবহার সম্বন্ধে ততটা সতর্ক থাকতে হয় না, তাঁর শিক্ষা ও ভাষাবোধের স্তর তাঁর ভাষিক-উপাদানের নির্বাচনে অচেতনভাবে সাহায্য করে। অন্য দিকে, যখন লেখক প্রতিষ্ঠিত ভাষারীতি থেকে সরে যেতে চান বা 'বিচ্যুতি' ঘটাতে চান, তখন তাঁর নির্বাচন সচেতন। কেননা তখন তাঁকে সতর্ক হয়ে ভাষিক উপাদান বেছে নিতে হয়, বেছে নিতে হয় তাঁর শৈলীকে।

গ্রন্থপঞ্জি

১. কুণ্ডু, প্রণয়কুমার—'রীতি থেকে রীতিবিজ্ঞান' (দ্র. অরুণকুমার বসু সম্পাদিত বাঙলা গদ্য জিজ্ঞাসা, ১৯৮১
২. চক্রবর্তী, বিপ্লব (সম্পা)—শৈলী চিন্তাচর্চা, ২০০৩
৩. দে, আশিসকুমার—উপন্যাসের শৈলী, ১৯৮৩
৪. ভট্টাচার্য, তপোধীর—বাখতিন : তত্ত্ব ও প্রয়োগ, ২০১০
৫. ভট্টাচার্য, সুভাষ—ভাষা ও শৈলী, ২০০৬
৬. মজুমদার, অভিজিৎ—শৈলীবিজ্ঞান এবং আধুনিক সাহিত্যতত্ত্ব, ২০০৭
৭. মজুমদার, পরেশচন্দ্র ও মজুমদার অভিজিৎ—বাঙলা সাহিত্যপাঠ : শৈলীগত অনুধাবন, ২০১০
৮. রায় অপূর্বকুমার—শৈলীবিজ্ঞান, ২০০৬
৯. সরকার, পবিত্র—ভাষা দেশ কাল, ১৯৮৫
—'শৈলীবিজ্ঞানের গোড়ার কথা' (দ্র. বিপ্লব চক্রবর্তী সম্পাদিত শৈলী চিন্তাচর্চা, (২০০৩)
১০. Crystal, D & Davy, D—Investigating English Style, 1969
১১. Crystal, David—The Cambridge Encyclopaedia of Language, 1997
১২. Spitzer, Leo—Linguistics and Literary History, 1948
১৩. Turner, G.W—Stylistics, 1973
১৪. Welleck, R & Warren, A—Theory of Literature, 1949

১৩. সমাজভাষাবিজ্ঞান

১৩.১ সমাজভাষাবিজ্ঞান কী?

সহজ ভাষায় বলতে গেলে, ভাষা কীভাবে সমাজে কাজ করে এবং সমাজ কীভাবে ভাষার উপর প্রভাব বিস্তার করে তা যে শাস্ত্র আলোচনা করে সেটাই সমাজভাষাবিজ্ঞান। অর্থাৎ সমাজভাষাবিজ্ঞান হল ভাষা ও সমাজের পারস্পরিক ক্রিয়া ও ভূমিকা বিষয়ক শাস্ত্র। ভাষা হল সমাজকেন্দ্রিক বা আরও স্পষ্ট করে বলতে গেলে মানবসমাজকেন্দ্রিক। মানুষের সমাজেই ভাষার উদ্ভব ও বিকাশ। আমরা প্রথম অধ্যায়ে (১.১) দেখেছি যে, মানবসমাজের বাইরে ভাষার কোনো অস্তিত্ব থাকতে পারে না। সমাজে বিভিন্ন জাতির ও শ্রেণির মানুষের ভাষাব্যবহারের ভিন্নতা, বিভিন্ন বয়সের মানুষের ভাষাব্যবহারের ভিন্নতা, নারীপুরুষের ভাষার ভিন্নতা—এ সবই সমাজভাষাবিজ্ঞানের আলোচনার বিষয়। এমনকী প্রসঙ্গ ও বিষয়ভেদেও ভাষা বদলে যায়—যাকে ভাষাবিজ্ঞানে রেজিস্টার (register) বলে—তাও সমাজভাষাবিজ্ঞানের বিষয়ীভূত। কাকে 'আপনি' বলা হবে, কাকে 'তুমি' আর কাকে 'তুই' এবং কেন বলা হবে, সেটাও সমাজভাষাবিজ্ঞানের এলাকাভুক্ত বিষয়। মুসলমানের ভাষা আর হিন্দুর ভাষায় কি তফাত আছে কোনো? থাকলে কেন থাকে তাও আলোচিত হবে সমাজভাষাবিজ্ঞানে। এতেই বোঝা যায় যে, ভাষা ও সমাজ পরস্পরের উপর নির্ভর করে, পরস্পরের উপর ক্রিয়া করে। সমাজের উচ্চকোটির মানুষ যত সহজে একটি মান্য ভাষাকে বুঝে নেয় এবং আয়ত্ত করে, নিম্নবিত্ত বা নিম্নবর্গে থাকা মানুষ তা পারে না। তাদের ক্ষেত্রে তাদের এই পিছিয়ে থাকাটাই একটা বাধা বা ঘাটতি। একেই সমাজতাত্ত্বিক ও শিক্ষাবিজ্ঞানী বেজ়িল বার্নস্টাইন বলেছেন deficit. বার্নস্টাইন অবশ্য কথাটা বলেছেন শিক্ষার প্রসঙ্গে। ভাষার বেলাতেও একইভাবে তা প্রযোজ্য।

১৩.২ ভাষা ও সমাজ

ভাষাই সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যায়। প্রাচীন কালের মিশরীয়রা বলত, 'শব্দ হল চিন্তার উৎস বা জনক' ('The word is the father to the thought.')। তারা বুঝেছিল যে, ভাষা সমাজ-নামক ভাবনাটির একাধারে ভিত্তি ও উপকরণ ('Language is both the foundation and building material of the social house'.)। সামাজিক প্রক্রিয়ার যাবতীয় কার্যকলাপ ভাষার মাধ্যমেই চলে—সে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে আদানপ্রদানই হোক, ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির ঘনিষ্ঠ ও গভীর সম্পর্কই হোক আর আন্তর্জাতিক সম্পর্কই হোক। সামাজিক আচারব্যবহারে বিশ্বাস, মনোভাব, সংস্কার সবই প্রকাশিত হয় ভাষায়।

ভাষা না থাকলে সমাজজীবন অচল। ভাষা যে যুগে যুগে পরিবর্তিত হয়, সেও সামাজিক কারণে। লিখিত ভাষার পরিবর্তন লিপিবদ্ধ হয় বলে তা যত স্পষ্টভাবে বা সহজে বোঝা যায়, মুখের ভাষার পরিবর্তন তত সহজে ধরা যায় না। শেক্সপিয়ারের রচনা পড়লেই বোঝা যায় আজকের ইংরেজির সঙ্গে তার তফাত কতদূর। তেমনি বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এ চোখ বোলালে আমরা সহজেই বুঝতে পারি আজকের বাংলা কত দূরে সরে এসেছে বড়ু চণ্ডীদাসের সময় থেকে। চল্লিশ কি পঞ্চাশ বছর আগে বাংলা ভাষা যেভাবে বলা হত আজ কিন্তু ঠিক সেভাবে বলা হয় না। শব্দের ব্যবহার বদলে যাচ্ছে, নতুন নতুন শব্দ ব্যবহৃত হচ্ছে। ঘ্যাম, ফান্ডা, হাইট, কেলো—এসব শব্দ ছাত্রছাত্রীরা হরদম ব্যবহার করে এখন। তিন দশক আগে এসব ভাবাই যেত না।

কিন্তু কেন ভাষা বা ভাষার ব্যবহার বদলে যায় এভাবে? ভাষাবদলের প্রধান কারণ সামাজিক। বিখ্যাত ভাষাবিজ্ঞানী উইলিয়াম লেবোভ (W. Labov) ভাষা-পরিবর্তনের সামাজিক কারণ সবিস্তারে বর্ণনা ও ব্যাখ্যা করেছেন। মানুষের ব্যক্তিগত জীবন, বৈদেশিক সম্পর্ক বা সংযোগ, দ্বিভাষিকতা ইত্যাদি নানান কারণ আছে ভাষাবদলের পিছনে। যেসব বাঙালি ইংরেজি ও হিন্দি ভাষায় ভালোরকম সড়োগড়ো, তাদের বাংলায় ইংরেজি ও হিন্দির প্রভাব অন্ততপক্ষে কিছুটা পড়তে বাধ্য। টেলিভিশন, রেডিয়ো, সিনেমা প্রভৃতি আমাদের জীবনযাপনের অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভাষার উপর এসবেরও গভীর প্রভাব আছে। ভাষাবিজ্ঞানীরা বলেন যে, আঞ্চলিক উপভাষার মধ্যেই ভাষার প্রকৃত রূপ আধারিত থাকে। অথচ এখন গ্রামের বহু মানুষই নিজের উপভাষার অকৃত্রিম চরিত্র বজায় রাখতে পারে না। কেননা টেলিভিশন ও রেডিয়ো এখন গ্রামজীবনেও এসে গেছে। তার ফলে গ্রামের মানুষের ভাষায় একটা শহুরে টান এসে যায়। যে শব্দ আগে গ্রামের সাদাসিধে মানুষ কখনো ব্যবহার করত না, তারাই এখন যখন-তখন কতকগুলো পরিশীলিত শব্দ ব্যবহার করে ফেলে।

এক ভৌগোলিক অঞ্চল থেকে আর এক ভৌগোলিক অঞ্চলে অভিবাসী মানুষ নতুন অঞ্চলের ভাষা স্বাভাবিকভাবে আত্মস্থ করে এবং তার ফলে তার নিজের ভাষায় এসে যায় পরিবর্তন। বীরভূমের যে ছাত্রটি বরাবর ন্যকড়াকে 'কানি' বলেছে, আর ঘরের নর্দমাকে 'মুড়ি' বলেছে, কয়েকবছর কলকাতায় থাকার পর সেই 'কানি' ছেড়ে 'ন্যাকড়া' ধরে আর 'মুড়ি' ছেড়ে 'নালা' বা 'নর্দমা' বলে। সাড়ে চার হাজার বছর আগে গ্রিকরা ইজিয়ান সাগর অঞ্চলের আদিবাসীদের কাছে প্লিন্‌থস (plinthos), থালাস্‌সা (tha'lassa) প্রভৃতি প্রথম শোনে। প্লিন্‌থস হল ইট আর থালস্‌সা হল সমুদ্র। তার পর থেকে ও-দুটো শব্দ গ্রিক ভাষায় গৃহীত হয়ে গেছে।

১৩.৩ রেজিস্টার (register) কাকে বলে?

সমাজভাষাবিজ্ঞান সম্পর্কে যেসব ভাষাবিজ্ঞানী তত্ত্ব রচনা করেছেন তাঁদের মধ্যে প্রধান উইলিয়াম ব্রাইট (William Bright), উইলিয়াম লেবোভ (William Labov) এবং ফিশম্যান (J.A. Fishman)। প্রত্যেকেই স্বীকার করেছেন যে, ভাষার বৈচিত্র 'সামাজিক স্তরভেদের সঙ্গে সম্পর্কিত'। পবিত্র সরকার বলেছেন, ভাষা একটি বহুতল বাড়ির মতো। তার সবচেয়ে উপরতলায় থাকে সবচেয়ে শিক্ষিত ও সম্পন্ন মানুষ, সবচেয়ে নীচে থাকে শিক্ষাহীন বা শিক্ষাবঞ্চিত দরিদ্র মানুষের দল। এর মাঝখানে আছে আরও অন্যান্যেরা। উপরতলার মানুষের ভাষা পরিশীলিত, নীচের তলার মানুষের ভাষা তা নয়। বক্তা কার সঙ্গে কথা বলছে, কী উপলক্ষ্যে বা কোন্ বিষয়ে কথা বলছে সেটাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেননা সেই অনুযায়ী ভাষার ধরন বদলে যায়। ইংরেজিতে বক্তাকে বলা হয় speaker, শ্রোতা হল receiver এবং উপলক্ষ্য বা প্রতিবেশ হল setting. এই setting অনুযায়ী ভাষার যে বদল, তাকেই ইংরেজ ভাষাবিজ্ঞানীরা register বলেন। অর্থাৎ register হল language change according to use. রেজিস্টারের আলোচনায় মৃণাল নাথ প্রতিবেশের (setting) উপর বিশেষ জোর দিয়েছেন।

একটু সহজ করে বলতে গেলে, বিজ্ঞাপনী প্রচারের ভাষা একটা রেজিস্টার, বক্তৃতার ভাষা একটা রেজিস্টার, আবার মুটেমজুরের ভাষাও একটা রেজিস্টার। নরবার্ট ডিটমার (Norbert Dittmar) এবং ফিশম্যানের অনুসরণে আমরা রেজিস্টারকে বলতে পারি functional variety বা প্রাতিবেশিক ভূমিকাগত বৈচিত্র।

১৩.৪ কোড-বদল (code switching)

কোড-বদল সমাজভাষাবিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কোড হল বিশেষ ভাষাভঙ্গির নাম। কোড সীমিত গোষ্ঠীর ব্যবহৃত ভাষাভঙ্গি। কোনো ব্যক্তি যে বিশেষ উপভাষার বিশেষ রীতি ব্যবহার করে, সেটি একটি কোড। পরিবেশ বা পরিস্থিতি অনুযায়ী কোডের ব্যবহারকর্তা বা বক্তা যদি তার ভাষা-উপকরণ বা ভাষাভঙ্গি বদল করে তবে তাকে বলা হবে কোড-বদল (code switching)। ধরা যাক তিন ব্যক্তির কথোপকথন চলছে। দুজন হিন্দিভাষী এবং তৃতীয়জন হিন্দি বুঝলেও ততটা দক্ষ নয়। প্রথম দুজন নিজেদের মধ্যে হিন্দিতে কথা বলতে বলতে তৃতীয় ব্যক্তির উপস্থিতি খেয়াল হওয়ায় ইংরেজি বলতে শুরু করল। এও একরকম কোড-বদল। ঢাকার ভাষায় কথা বলতে বলতে হঠাৎ যদি কলকাতার মান্য ভাষায় কথা আরম্ভ হয়, সেও কোড-বদল।

১৩.৫ ভাষা ও লিঙ্গভেদ

সমাজভাষাবিজ্ঞানীরা নারীপুরুষের ভাষার ভিন্নতা শুধু যে লক্ষ করেছেন তা নয়, সেই ভিন্নতার কারণ ও স্বরূপ অনুসন্ধানও করেছেন। নারী-পুরুষের ভাষার ভিন্নতা সামাজিক

দূরত্ব বা social distance-এর জন্য ঘটে না, কেননা একই সামাজিক অবস্থানের নারী-পুরুষের ভাষাতেও ভিন্নতা লক্ষ করা যায়। নারী-পুরুষের ভাষার ভিন্নতা এতই যে তারা 'একই ভাষা' বললেও মনে হতে পারে যে, তারা যেন দুটি ভিন্ন ভাষায় কথা বলছে। একই সামাজিক অবস্থানে থাকা নারী-পুরুষের ভাষার পার্থক্যকে তাই social distance বা সামাজিক দূরত্বজনিত পার্থক্য বলা যাবে না। বরং ভাষাবিজ্ঞানী ট্রাড্‌গিলের অনুসরণে একে social difference বা সামাজিক তফাত বলা যায়। নারীর ভাষা যে পুরুষের ভাষা থেকে আলাদা হয়ে যায় তার নানান কারণের মধ্যে আছে জৈবিক কারণ, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক কারণ। ১৯৭৩ সালে রবিন লেকফ (Robin Lakoff) Language and Women's Place নামে একটি গ্রন্থে ভাষায় লিঙ্গভেদের আলোচনার সূত্রপাত করেন। তাঁর মতে নারীর ভাষা পুরুষের ভাষার চেয়ে বেশি নম্র বেশি কুণ্ঠাপূর্ণ এবং অপেক্ষাকৃত কম আত্মপ্রত্যয়ী ('more polite, more hesitant and less confident' (Lakoff (1973) p.57)। লেকফ আরও বলেছেন যে, মেয়েরা কতগুলি বিশেষণ বেশি ব্যবহার করে, যেমন admirable, charming, lovely, sweet. এমন নয় যে, এসব শব্দের সঙ্গে লিঙ্গের বা নারীত্বের কোনো অনিবার্য সম্পর্ক আছে। লেকফের মতে এইসব শব্দ কিছুটা কোমল, অদৃপ্ত, অকঠোর। বাংলাতেও আছে এমন শব্দ। 'দুষ্টু', 'মিষ্টি', 'মরণ', 'ছিরি' প্রভৃতি শব্দ পুরুষের তুলনায় মেয়েরাই বেশি ব্যবহার করে। স্বামীকে 'বর' মেয়েরাই বলে বেশি। 'বর' শব্দটা পুরুষের মুখে কমই শোনা যায়। মেয়েরা প্রবাদ-প্রবচন বেশি ব্যবহার করে। মেয়েদের ভাষায় বাক্যবিন্যাসগত পার্থক্যও যে ঘটে তা দেখিয়েছেন শর্মিলা বসু দত্ত ও মৃণাল নাথ।

নারীর ভাষার পার্থক্যের একটা বড়ো কারণ নিশ্চয় নারীর শারীরবৃত্তীয় গঠন যা তার মানসিক বিকাশেরও ভিত্তি। কিন্তু সমাজে নারীর তুলনায় পুরুষের প্রাধান্য এবং পুরুষের কাছে নারীর অধীনতা নারীর প্রকৃতি ও অভ্যাসে যেমন পার্থক্য গড়ে দেয়, ঠিক তেমনি তার ভাষাকেও করে অনুদ্ধত, কোমল ও কুণ্ঠাপূর্ণ। একথা সত্যি যে, বর্তমান কালে নারী-পুরুষ শিক্ষার ক্ষেত্রে সমান সুযোগ পায় বলে এবং মেয়েরা বহু ক্ষেত্রে শিক্ষাদীক্ষায় পুরুষের সমকক্ষ হয়ে ওঠে বলে এবং কখনো-কখনো পুরুষের চেয়েও এগিয়ে যায় বলে তার ভাষাতেও একটা আত্মবিশ্বাসের সুর এসে যায়। তবু একটা মৌলিক পার্থক্য থেকেই যায়।

১৩.৬ স্ল্যাং : অপভাষা, ইতর ভাষা (Slang)

সমাজভাষাবিজ্ঞানের আলোচনায় স্ল্যাং-এর প্রসঙ্গ আসবেই। ইংরেজিতে যাকে slang বলা হয় তার দুটি অর্থ। এক, সমাজের বিশেষ কতকগুলি গোষ্ঠীর মধ্যে প্রচলিত অ-মান্য বা অ-শিষ্ট ভাষা। ছুতোর, রাজমিস্ত্রি, ড্রাইভার, মাঝিমাল্লা প্রভৃতি গোষ্ঠীর মধ্যে যে বিশেষ শব্দ ব্যবহৃত হয় সেগুলিও স্ল্যাং। এই স্ল্যাং অ-মান্য বা non-standard বটে, তবে অশ্লীল

নয়। এগুলিকে 'অশিষ্ট পেশাগত বুলি' বলা যায়। দ্বিতীয়ত, পথে-ঘাটে বা আড্ডায় যে অশিষ্ট ও অশ্লীল ভাষা বা শব্দ ব্যবহৃত হয় তাকেও স্ল্যাং বলা হয়। ইংরেজি স্ল্যাংকে বাংলায় কী বলা হবে তা নিয়ে একমত হওয়া কঠিন। সুকুমার সেন বলেছেন 'ইতর ভাষা', পবিত্র সরকার বলেছেন 'অপভাষা', 'অপশব্দ', কুমারেশ ঘোষ বলেছেন 'জনবুলি'। বর্তমান লেখক বলেছেন 'অশিষ্ট পেশাগত বুলি' এবং 'অশিষ্ট বুলি'। সত্রাজিৎ গোস্বামী বলেছেন 'অকথ্যভাষা'।

ইংরেজি ভাষায় স্ল্যাং বিষয়ে শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ রচনা করেছেন এরিক পার্ট্রিজ (Eric Partridge)। তাঁর এ বিষয়ে দুটি বিখ্যাত গ্রন্থ হল A Dictionary of Slang and Unconventional English এবং Slang Today and Yesterday. বাংলায় আজ পর্যন্ত পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ রচিত হয়েছে তিন-চারটি—ভক্তিপ্রসাদ মল্লিকের 'অপরাধ জগতের ভাষা', 'অপরাধ জগতের শব্দকোষ'; অভ্র বসুর 'বাংলা স্ল্যাং—সমীক্ষা ও অভিধান' ; সত্রাজিৎ গোস্বামীর 'বাংলা অকথ্যভাষা ও শব্দকোষ' এবং মানস রায়চৌধুরী-র 'বাংলা অশিষ্ট শব্দের অভিধান'।

একথা সকলেই মেনে নিয়েছেন যে, স্ল্যাং প্রধানত একটা গোষ্ঠীর মধ্যে প্রচলিত 'অতিকথ্য' (of extreme colloquial nature) ধরনের শব্দ, যার সবগুলোই অ-শিষ্ট এবং কতকগুলো অশ্লীল বা অশালীন। আরও একটা কথা বলা হয়। বহু স্ল্যাংই অল্পকাল স্থায়ী হয়। টম ম্যাকআর্থার (Tom McArthur) নামে জনৈক সমাজভাষাবিজ্ঞানী বলেছেন স্ল্যাং বা অশিষ্ট বুলি যত দ্রুত চালু হয়, ততই দ্রুত বিস্মৃত হয়—'bursting into existence and falling out of use at a much more rapid rate than items of the general vocabulary.' এই মন্তব্য অবশ্য সম্পূর্ণ মেনে নেওয়া যায় না। এমন বহু স্ল্যাং আছে যেগুলি চসারের যুগ থেকে আজ পর্যন্ত চালু রয়েছে ইংরেজি ভাষায়। বাংলাতেও বহু অশিষ্ট বুলি যেমন হারিয়ে গেছে, তেমনি বহু বুলি আজও চালু রয়েছে। বড়ফট্টাই, হ্যাড্ডাব্যাড্ডা, উদোমাদা, কচ্‌লাকচ্‌লি-র মতো বুলি চালু আছে প্রায় দুশো বছর ধরে। আবার ইয়ারের টেক্কা বা চৈতনফক্কার মতো বুলির চল নেই। আবার বহু নতুন অশিষ্ট বুলি এসে বাজার দখল করেছে গত দুই-তিন দশকে—কিচাইন, কেলো, ঘ্যাম, র‍্যালা, ক্যালানো (মার দেওয়া)। এখানে একটা কথা বিশেষভাবে মনে রাখা দরকার। স্ল্যাং অশিষ্ট বা sub-standard হলেও লিখিত ভাষায় যে ব্যবহৃত হতেই পারবে না, এমন নয়। নাটকে বা উপন্যাসের সংলাপে এইসব ইনফরমাল বা অনাচারিক শব্দ অবশ্যই কোনো চরিত্রের মুখে বসানো যেতে পারে।

স্ল্যাং বা অশিষ্ট বুলির সৃষ্টি কীভাবে হয়, তা নিয়ে সমাজভাষাবিজ্ঞানীরা ভাবছেন অনেকদিন ধরেই। চেম্বার্স (J.K. Chambers) বলেছেন যে, শৈশব থেকে কৈশোর হয়ে যৌবনের দিকে এগোবার সময়ে ছেলেমেয়েদের মধ্যে—এবং অবশ্য ছেলেদের মধ্যেই বেশি—দেখা যায় আচারব্যবহারের একটা উগ্রতা, ঔদ্ধত্য এবং বাঁধ ভাঙবার একটা নেশা।

চেম্বার্স একে বলেছেন revolt বা বিদ্রোহ। আর প্রায়ই এই বিদ্রোহের প্রকাশ ঘটে ভাষাগত বিদ্রোহের মধ্যে। এভাবেই, চেম্বার্সের মতে সৃষ্টি হয় বহু teenage slang-এর। চেম্বার্সের তত্ত্বে মনে হয় একটা অতিসরলীকরণ হয়েছে। বরং ইংরেজ সমাজতাত্ত্বিক বেজ়িল বার্নস্টাইনের তত্ত্ব আমাদের বেশি গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়। বার্নস্টাইনের public language তত্ত্ব অনুসারে নিম্নবিত্ত বা বিত্তহীন শ্রমিক-কারিগর প্রভৃতির ভাষা হল তাদেরই যারা নিয়মিত শিক্ষা বা প্রথাগত শিক্ষা থেকে বঞ্চিত বা প্রায় বঞ্চিত। কাজে কাজেই তাদের ভাষা মার্জিত বা পরিশীলিত হবার কথা নয়। এই প্রসঙ্গে বার্নস্টাইন 'সীমিত ভাষা' বা restricted code-এর কথা বলেছেন। তাঁর এই public languageই সীমিত ভাষা। অন্য দিকে, formal language, যাকে বার্নস্টাইন বলেছেন elaborated code, হল শিক্ষিত ভদ্রলোকের ভাষা অর্থাৎ শিষ্ট ভাষা। এই অমার্জিত সীমিত ভাষা অনেকসময়েই অশিষ্ট বুলির জন্ম দেয়।

১৩.৭ লোকভাষা, লৌকিক ভাষা

লোকভাষা বা গ্রামের মানুষের ভাষাও সমাজভাষাবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়। লোকভাষা কোনো বিশেষ অঞ্চলের বা জেলার উপভাষা নয়। সাধারণভাবে গ্রামের ভাষাই লোকভাষা। লোকভাষার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য আছে। প্রথমত, গ্রামের ভাষায় বা লোকভাষায় পরিমার্জনা বা পরিশীলন থাকে না। দ্বিতীয়ত, গ্রামের ভাষায় শহুরে ভাষার 'নাগরিকতা' থাকে না। তৃতীয়ত, গ্রামীণ ভাষার কোনো নির্দিষ্ট সীমারেখা নেই। বীরভূমের গ্রামাঞ্চলে শুনি সেখানকার গ্রামের ভাষা, হাওড়ার গ্রামে শুনতে পাই সেখানকার গ্রামের ভাষা। তেমনি আবার বাঁকুড়ার গ্রামে শোনা যাবে বাঁকুড়ার গ্রামীণ ভাষা। 'নোক' (লোক), লিচ্চয় (নিশ্চয়), নেকাপড়া (লেখাপড়া), ছেলো (ছিল), য্যাখন (যখন), তেনার বা ত্যানার (তাঁর), পেরথোম (প্রথম), মুনিষ (মজুর) এইসব শব্দ গ্রামীণ ভাষাতেই লভ্য। গ্রামের যেসব মানুষ গ্রামেই থাকে, যাদের জীবন আবর্তিত হয় গ্রামকেই ঘিরে, তাদের ভাষার শব্দভাণ্ডার স্বভাবতই কিছুটা সীমিত। আবার যারা বা যাদের পুত্রকন্যারা অপেক্ষাকৃত আলোকপ্রাপ্ত, যাদের সঙ্গে বহির্জগতের সংযোগ ঘটে শিক্ষার জন্যে বা অন্য কারণে, তাদের জীবন কিছুটা মুক্ত এবং স্বভাবতই তাদের ভাষায় এসে যায় কিছুটা পরিশীলন। তবু বলব, গ্রাম্য ভাষা বা গ্রামের ভাষা বলতে সমাজভাষাবিজ্ঞানীরা বোঝেন অ-মার্জিত, পরিশীলনহীন গ্রামের ভাষা।

১৩.৮ ভাষায় ভাষায় সংযোগ এবং ভাষা-পরিবর্তন (Languages in contact and linguistic change)

এডওয়ার্ড সাপির বলেছেন, সংস্কৃতি যেমন কোনোরকম সংযোগ বা সংস্পর্শ ছাড়া এগোতেই পারে না, তেমনি ভাষাও সংযোগ-সংস্পর্শ ছাড়া 'সম্পূর্ণ' নয় ('Languages, like cultures, are rarely sufficient unto themselves.')। ব্যাবসা-বাণিজ্যের কারণে

বা রাজনৈতিক কারণে এক ভাষার ব্যবহারকারী অন্য এক ভাষার ব্যবহারকারীদের সংস্পর্শে আসে। ওলন্দাজ, পর্তুগিজ ও ইংরেজ বণিকরা ভারতে প্রথম এসেছিল ব্যাবসায়িক কারণে, চীনে ইংরেজরা আফিঙের ব্যাবসা করতেই গিয়েছিল। আবার আমেরিকায় ইংরেজরা উপনিবেশ গড়ে তুলেছিল। এইসব সংযোগ-সংস্পর্শের ফলে ভাষার পরিবর্তন একরকম অনিবার্য। বেশি পরিবর্তন অবশ্য হয়ে থাকে দুর্বলতর দেশের মানুষের ভাষায়। প্রাচীনকালে অনেক উপজাতির মানুষের সঙ্গে অন্য ভাষাভাষী উপজাতির মানুষের বিবাহ হবার ফলে উভয়ের ভাষাতেই পরিবর্তন দেখা যেত। এইভাবে যে সংযোগ ঘটে তাতে প্রভাব বেশি বিস্তার করে dominant বা প্রভাবশালী ভাষাটি। আর সেই প্রভাবের প্রধান প্রক্রিয়াটি হল borrowing বা ঋণ, শব্দঋণ। সকলেরই মনে পড়বে কীভাবে আমাদের বাংলা ভাষায় এসে গেছে বহু আরবি-ফারসি শব্দ। পৃথিবীর সমস্ত ভাষার ক্ষেত্রেই একথা বলা চলে। ভাষায়-ভাষায় দীর্ঘস্থায়ী সংযোগের ফলে দ্বিভাষিকতা, বহুভাষিকতা ও ভাষাবিকৃতির মতো ঘটনা ঘটতে দেখা যায়।

১৩.৯ দ্বিভাষিকতা (bilingualism) ও বহুভাষিকতা (multilingualism)

আমরা দেখেছি যে, ভাষায় ভাষায় সংযোগ-সংস্পর্শ থেকেই আসে দ্বিভাষিকতা ও বহুভাষিকতা। দ্বিভাষিকতার সহজ অর্থ কোনো ব্যক্তির দুটি ভাষার ব্যবহার—একটি অধিকাংশ ক্ষেত্রে তার মাতৃভাষা, অন্যটি অন্য কোনো ভাষা। কিন্তু দ্বিভাষিকতার মধ্যে আরও কিছু বিষয় আছে। কোনো ব্যক্তি তার দ্বিতীয় ভাষাটি হয়তো বহুকাল ব্যবহারই করেনি। এই ধরনের দ্বিভাষিকদের বলা হয় 'dormant bilinguals.' আবার কিছু লোক এমনও আছে যারা দ্বিতীয় ভাষাটি বুঝতে পারে, লিখতে ও পড়তে পারে কিন্তু ভালো বলতে শেখে না। এরাও দ্বিভাষিক। এমন দ্বিভাষিক নিশ্চয় আছে যারা দ্বিতীয় ভাষাটিও উত্তমরূপে আয়ত্ত করেছে। যদি বলা যায় একমাত্র তাদেরই দ্বিভাষিক বলা হবে যারা দ্বিতীয় ভাষাটিকেও অত্যন্ত ভালোভাবে আয়ত্ত করেছে—বুঝতে বলতে লিখতে ও পড়তে পারদর্শী—তাহলে বলতেই হবে তেমন দ্বিভাষিকের সংখ্যা তত বেশি নয়।

যদি প্রশ্ন করা হয়—দুটি ভাষা শেখার দরকার কী?—তাহলে এই প্রশ্নের প্রাথমিক এবং সহজ ও স্বাভাবিক উত্তর হল—অন্য ভাষার লোকের সঙ্গে আদানপ্রদানের জন্য, সে আদানপ্রদান লিখিত হোক বা মৌখিক হোক। কিন্তু এই প্রাথমিক সহজসরল উত্তর আদৌ যথেষ্ট নয়। একথা ঠিক যে, একজন দ্বিভাষিকের (যাকে 'ক' বলব) যদি বহুভাষী সমাজে এমন কোনো ব্যক্তির (যাকে 'খ' বলব) সঙ্গে কথা বলার প্রয়োজন হয়, যে একটি মাত্র ভাষা জানে, তখন তার সঙ্গে আদানপ্রদান ক খ-য়ের ভাষাতেই কথা বলবে, যা ক-য়ের দ্বিতীয় ভাষা। কিন্তু সচরাচর যা ঘটে, তা হল একজন দ্বিভাষিকের আদানপ্রদান হয় আর এক দ্বিভাষিকের সঙ্গে। দ্বিভাষিকতার মধ্যে আছে আরও কিছু জটিলতা। কখনো কখনো দুজন দ্বিভাষিকের কথোপকথনে ব্যবহৃত হয় একের মাতৃভাষা এবং অন্যজনের দ্বিতীয়

ভাষা এবং সেই কথোপকথনের মধ্যে অন্য ভাষার শব্দ, বাক্যাংশ বা বাক্য ঢুকে পড়ে যাকে ভাষাবিজ্ঞানে language switching বা code switching বলে। দ্বিভাষিকতা আলোচনার প্রসঙ্গে এইসবও উল্লেখ করতে হবে।

বহুভাষিকতা হল একজন ব্যক্তির দুটির বেশি ভাষার ব্যবহার। মনে হতে পারে একজন লোক দুটি বা তার বেশি ভাষা শেখে বা ব্যবহার করে স্বেচ্ছায়। অনেক ক্ষেত্রে একথা সত্য হলেও কখনো-কখনো বহুভাষিকতা মানুষের উপর চাপিয়েও দেওয়া হয়। ডেভিড ক্রিস্টাল বলেছেন—'Often the situation is of the people's own choosing; but it may also be forced upon them by other circumstances.' কী সেই পরিস্থিতি যা বহুভাষিকতা সৃষ্টি করে। বহুভাষিকতার বহু কারণের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হল রাজনৈতিক কারণ, ধর্মগত কারণ, সাংস্কৃতিক কারণ, শিক্ষাগত কারণ, আর্থনীতিক কারণ।

বহুভাষিকতার দুটি দিক। ব্যক্তির বহুভাষিকতা এবং দেশের বহুভাষিকতা। একজন ব্যক্তি তিনটি বা তার বেশি ভাষায় আদানপ্রদান করতে পারে এমন প্রায়ই দেখা যায়, তবে সবকটি ভাষায় সমান দক্ষতা বিরল ঘটনা। অন্য দিকে, একটি দেশে বহুরকমের ভাষাভাষী মানুষের সহাবস্থান ঘটলে সেই দেশকে বলা হবে বহুভাষিক দেশ, যেমন ভারত, রাশিয়া, সিঙ্গাপুর।

১৩.১০ ভাষার বিকৃতি : পিজিন ও ক্রিয়োল; মিশ্র ভাষা

পিজিন

এক সম্প্রদায়ের সঙ্গে অন্য এক সম্প্রদায়ের দীর্ঘকালীন সংযোগের ফলে ভাষায় বিকৃতি ঘটে। একে বিকৃতি না বলে কেউ-কেউ পরিবর্তন বলতে চান। এই পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট ভাষাকে সুকুমার সেন বলেছেন মিশ্র ভাষা। সেই পরিবর্তনেরই রূপ হল **পিজিন ও ক্রিয়োল**। **পিজিন** প্রধানত ইয়োরোপীয় জাতিগুলির উপনিবেশ বিস্তারের ফল। তবে অন্-ইয়োরোপীয় পিজিনও আছে, যেমন চিনুক জারগন (Chinook Jargon)। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর-পশ্চিমে আমেরিকান ইন্ডিয়ানদের ব্যাবসা প্রচেষ্টার ফলে চিনুক জারগনের সৃষ্টি হয়েছে। পিজিনের ব্যবহার খুবই সীমিত বলে পিজিন দীর্ঘস্থায়ী হয় না। এই কারণে ভিয়েতনামে ব্যবহৃত ফরাসি-পিজিন যেমন লোপ পেয়েছে, তেমনি লোপ পেয়েছে ভিয়েতনামের পিজিন ইংলিশ। কোনো-কোনো ক্ষেত্রে পিজিন অবশ্য সহায়ক ভাষার (auxiliary language) মর্যাদা পেয়ে যায়। ডেভিড ক্রিস্টাল এই পিজিনকে 'expanded pidgin' বলেছেন। পিজিনকে বলা যায় কোনো ভাষার সরলীকৃত রূপ যা বিদেশি বণিক প্রভৃতি ব্যবহার করে। যে পরিস্থিতিতে দুটি ভাষা-সম্প্রদায়ের মধ্যে সাধারণ ভাষা (common language) থাকে না, সেই পরিস্থিতিতে পিজিনের সৃষ্টি হয়। পিজিনে শব্দভাণ্ডার সংক্ষিপ্ত বা সীমিত, ব্যাকরণ সরলীকৃত, উচ্চারণেও লক্ষ করা যায় সরলতা। যেখানে ইংরেজরা ব্যাবসার কারণে যায় সেখানে pidgin English-এর উদ্ভব হয়, যেখানে

ফরাসিরা ব্যাবসার কারণে যায়, সেখানে French pidgin-এর উদ্ভব হয়। পিজিন স্বভাবতই অপর ভাষাগোষ্ঠীর পক্ষে বুঝে নেওয়া সহজ হয়। পিজিনের ভাষাগত সংগঠন সহজ বলে তা শেখাও সহজ।

ক্রিয়োল

পিজিন সবসময়ই সংযোগ-সংস্পর্শের ভাষা, পিজিন সহায়ক বা auxiliary ভাষা। তা কারও মাতৃভাষা নয়। কোনো পিজিন যদি কোনো গোষ্ঠীর মাতৃভাষায় পরিণত হয়, তখন তাকে আর পিজিন বলা হয় না, বলা হয় **ক্রিয়োল**। ক্রিয়োল উদ্ভূত হয় পিজিন থেকেই। কিন্তু আমরা তো জেনেছি যে, পিজিনের শব্দসম্ভার সীমিত, তার ব্যাকরণগত কাঠামোও অতি-সরল। কাজেই বিশেষ প্রয়োজনে শব্দভাণ্ডার বেড়ে ওঠে, ব্যাকরণগত কাঠামোতে নতুন প্রকরণ যুক্ত হয় এবং একসময় দেখা যায় যে, সেই পিজিন আর সহায়ক ভাষা শুধু নয়, একটি গোষ্ঠীর প্রধান ভাষা হয়ে উঠেছে। একেই বলে creolization অর্থাৎ পিজিন থেকে ক্রিয়োলে পরিণতি বা বিকাশ।

খণ্ডিত শব্দ (clipped words)

শব্দকে সামনে বা পিছনে ছেঁটে অনেকসময় তৈরি হয় নতুন শব্দ। এ হল এক ধরনের সংক্ষেপণ। এই সংক্ষেপণকে clipping বলা হয়। Clipping বা ছাঁটাইয়ের ফলে যে শব্দটির সৃষ্টি হল তাকে clipped word বা খণ্ডিত শব্দ বলা হয়। Fanatic থেকে fan, omnibus থেকে bus, refrigerator থেকে fridge, high fidelity থেকে hi-fi এই ছাঁটাইয়ের দৃষ্টান্ত। শিয়ালদা দক্ষিণ শাখার রেলযাত্রীরা বলেন লক্ষ্মী (লক্ষ্মীকান্তপুর), ডায়মন্ড (ডায়মন্ডহারবার)। মনে রাখতে হবে, যেকোনো সংক্ষেপণই clipping নয়। ক.পু. (কলকাতা পুলিশ), মাচবা (মান্য চলিত বাংলা) clipping নয়। এগুলি সংক্ষেপণ বটে, কিন্তু ছাঁটাই নয়।

গ্রন্থপঞ্জি

১. দাশ, শিশির—ভাষাজিজ্ঞাসা (১৯৯২)
২. নাথ, মৃণাল—ভাষা ও সমাজ (১৯৯৯)
৩. মনসুর মুসা—ভাষাচিন্তা : প্রসঙ্গ ও পরিধি (১৯৯১)
৪. সরকার, পবিত্র—ভাষা দেশ কাল (১৯৮৫)
—লোকভাষা লোকসংস্কৃতি (১৯৯৭)
৫. Crystal, David—The Cambridge Encyclopaedia of Language (1997)
৬. Fischer, Steven Roger—A History of Language (1999)
৭. Trudgill, P—Sociolinguistics (1974)

১৪. অভিধানবিজ্ঞান (Lexicology)

১৪.১ অভিধান কী? অভিধানতত্ত্ব : অভিধানবিজ্ঞান

'অভিধান কাকে বলে?' এই প্রশ্নের উত্তরে এক ইংরেজ বালক বলেছিল—'যে-বই থেকে সবকিছু জানা যায়'। ওই বালকের উত্তর ঠিক এবং বেঠিক দুইই। কেননা সব অভিধান সবকিছু জানায় না। ওই বালক হয়তো অভিধান বা dictionary বলতে কোশগ্রন্থ বা encyclopaedia বুঝেছিল। আর তা-ই যদি হয় তবে তার উত্তর নির্ভুল। অভিধান প্রধানত 'শব্দ' বা word এর তালিকা। বর্তমানে অভিধান বলতে সাধারণত বোঝায় বর্ণানুক্রম অনুসারে সাজানো শব্দ এবং সেইসব শব্দ সম্বন্ধে যাবতীয় সংবাদ—অর্থ, উচ্চারণ ব্যুৎপত্তি ইত্যাদি। কিন্তু অভিধান মাত্রেই যে বর্ণক্রম অনুসারে শব্দ সাজানো থাকবে তা নয়। প্রাচীনকালে বিষয় অনুসারে বা ভাবনা অনুসারে অভিধান সাজানো হত। যেমন সংস্কৃত ভাষার 'অমরকোষ' বা 'অমরার্থচন্দ্রিকা'। পাশ্চাত্যে অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে যতগুলি অভিধান রচিত হয়েছে সেগুলিতে বর্ণক্রম ধরে ধরে শব্দ পরপর সাজানো হয়েছে। একটি বিখ্যাত ব্যতিক্রম হল পিটার মার্ক রজে-র (Peter Mark Roget) থিসরাস, যাতে বিষয় এবং ভাবনাচিন্তা হিসাবে শব্দ সাজানো হয়েছে।

একসময় শব্দের প্রাথমিক অর্থ বা অভিধা যাতে বর্ণনা করা হত তাকেই বলা হত অভিধান। কিন্তু এখন বহুকাল যাবৎ শুধু শব্দের মুখ্য অর্থ বা প্রাথমিক অর্থের বিবৃতিই যথেষ্ট বলে মনে করা হয় না। শুধু তা-ই নয়, শব্দের অর্থ বিবৃত করাই অভিধানের একমাত্র কাজ নয়। শব্দ সম্বন্ধে অভিধানে থাকে আরও নানান সংবাদ। তাই মনে করা যেতে পারে dictionary-র বাংলা প্রতিশব্দ 'শব্দার্থকোশ' নয়, হওয়া উচিত 'শব্দকোশ'। 'ডিকশনারি' কথাটি লাতিন 'দিক্‌সিয়নারিয়ুম্' থেকে এসেছে। গ্রিকরা একে বলত lexikon, যা থেকে ইংরেজি lexicon শব্দটি পাওয়া গেছে। বলা বাহুল্য, lexicology ও lexicography-র মতো শব্দ ওই lexicon-এর সূত্রেই এসেছে।

এই প্রসঙ্গে lexicology ও lexicography-র পার্থক্য বুঝে নেওয়া প্রয়োজন। আমরা lexicologyকে বলব অভিধানতত্ত্ব বা অভিধানবিজ্ঞান। অভিধানের রূপ, সংগঠন প্রভৃতিই lexicologyর আলোচ্য। অন্য দিকে lexicography হল অভিধান সংকলনবিজ্ঞান। কাজেকাজেই অভিধানতত্ত্ব বা অভিধানবিজ্ঞানের মধ্যে অভিধানের তত্ত্ব বা রূপ সংগঠন ইত্যাদি যেমন আসছে, তেমনি আসবে অভিধান রচনার কথাও।

১৪.২ অভিধানের ইতিহাস

সম্ভবত প্রাচীনতম অভিধান রচনার কৃতিত্ব গ্রিকদেরই। খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতকে গ্রিসে রচিত হয়েছিল গ্লস্‌সাই (glossai), যা প্রকৃপক্ষে অভিধানই। গ্লস্‌সাই-য়ে হোমার এবং অন্যান্য লেখকদের রচনা থেকে দুরূহ শব্দ সংকলিত করে তার অর্থের বিবৃতি দেওয়া হত। কিন্তু এই গ্লস্‌সাই কিংবা খ্রিস্টীয় অষ্টম শতকে ইংল্যান্ডে যে অ্যাংলো-স্যাক্সন গ্লস (Anglo-Saxon gloss) রচিত হয়েছিল সেগুলি প্রকৃত অভিধান নয়, কেননা ওগুলিতে শব্দবিন্যাসে কোনো সুষ্ঠু পরিকল্পনা থাকত না। যাই হোক, অভিধান সংকলনের ইতিহাস মোটামুটিভাবে অন্ততপক্ষে দু-হাজার বছরের পুরোনো। গ্রিস, চীন, রোম এবং ভারতের অভিধানই প্রাচীনতম। আরব দেশে আরবি অভিধান প্রথম সংকলিত হয় খ্রিস্টীয় অষ্টম শতকে। সংস্কৃত অভিধানের মধ্যে প্রাচীনতম হল 'অমরকোষ' এবং 'অভিধান-চিন্তামণি'। দ্বাদশ শতকে সর্বানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'টীকাসর্বস্ব' বলতে গেলে প্রথম বাংলা অভিধান।

গ্রিসে খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতকে প্রোতাগোরাস (Protagoras) একটি glossai বা glossary রচনা করেছিলেন, যার কথা আগেই বলেছি। অনুরূপ glossary রচনা করেছিলেন গ্রিক সংকলক ফিলেতাস (Philetas)। খ্রিস্টীয় প্রথম শতকে রোমান সংকলক ফ্লাক্কুস (Marcus Flaccus) একটি লাতিন লেক্সিকন রচনা করেন। খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতকে শু শেন (Hsu Shen) সংকলন করেন প্রথম চীনা অভিধান। পঞ্চম শতকে হেজ়িকিয়ুস (Hesychius) ক্লাসিকাল গ্রিক ভাষার অভিধান রচনা করেন। খিস্টীয় ষষ্ঠ শতকে অমরসিংহ রচনা করেন 'অমরকোষ'। অষ্টম শতকে অল-খলিল ইব্‌ন্ আহমেদ রচনা করেন প্রথম আরবি অভিধান। একাদশ শতকে রচিত হয় একটি চীনা-জাপানি শব্দকোশ, রচয়িতা মিনামোতো শিতাগো। ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতকে গ্রিস ও রোমে কয়েকটি উৎকৃষ্ট কোশগ্রন্থ রচিত হয়েছিল। ১৪৭৭ সালে ভেনিসে ছাপা হয় পৃথিবীর প্রথম দ্বিভাষিক অভিধান। ১৪৯৯ সালে ইংল্যান্ডে ছাপা হয় একটি লাতিন-ইংলিশ অভিধান। ১৫১১ সালে ছাপা হয় প্রথম ডাচ ভাষার অভিধান। ১৫৩৯ এ ছাপা হয় ফরাসি-লাতিন অভিধান। ১৫৯৬ সালে ছাপা হয় প্রথম রুশ অভিধান। ১৬১১ সালে প্রথম বড়ো আকারের স্পেনীয় ভাষায় অভিধান ছাপা হয়।

ইয়োরোপে আধুনিক ধারার অভিধান-সংকলনের শুরু সপ্তদশ শতকেই। ইতালির Accademia della Crusca নামক সংস্থা ১৬১২ সালে একটি অভিধান প্রকাশ করে। দলগতভাবে রচিত অভিধানের প্রথম দৃষ্টান্ত এটি। ১৭২২ সালে ৬০০০ শব্দের একটি জার্মান-লাতিন অভিধান রচিত হয়। অষ্টাদশ শতকে নানান দিক থেকে অভিধান সংকলনের একটা জোয়ার দেখা যায়।

১৪.২.১ বিশেষ কয়েকটি অভিধান

আধুনিক পৃথিবীর কয়েকটি বিখ্যাত ও বিশিষ্ট অভিধানের কথা এবং তাদের রচয়িতার কথা বলা একান্তই প্রয়োজন এখানে। আমরা বিশেষভাবে বলব ১৭৫৫ সালে দুই খণ্ডে

প্রকাশিত ড. স্যামুয়েল জনসনের (Dr Samuel Johnson 1709-84) A Dictionary of the English Language নামক অসামান্য অভিধানের কথা। এই সুবৃহৎ অভিধানের title page বা আখ্যাপত্রেই বলা হয়েছে যে, এই অভিধান একাধারে ইংরেজি ভাষার অভিধান, ভাষার ইতিহাস ও ব্যাকরণ। ডক্টর জনসনের অভিধান ভবিষ্যৎ অভিধান-সংকলকদের পথ দেখিয়েছে এবং প্রভাবিত করেছে প্রভূতভাবে। ডক্টর জনসনই প্রথম শেকস্‌পিয়ার, মিল্টন, অ্যাডিসন, বেকন, পোপ প্রভৃতি লেখকদের রচনা থেকে দৃষ্টান্তবাক্য তুলে শব্দার্থের বিবৃতি দিয়েছেন।

দ্বিতীয় অভিধানটি নোয়া ওয়েবস্টারের (Noah Webster 1758-1483)। তাঁর সংকলিত An American Dictionary of the English Language প্রকাশিত হয় ১৮২৮ সালে। এই প্রথম ইংরেজি ভাষার মার্কিন রূপ পাওয়া গেল একটি অভিধানের মধ্যে। ১৯৬১ সালে ওয়েবস্টারের অভিধানের একটি বৃহত্তর সংস্করণ তৈরি হয়—Third New International Dictionary of the English Language নামে। দুই খণ্ডের সেই অভিধানে ছিল ৪৫০,০০০ entry word বা মুখশব্দ।

অভিধানের ইতিহাসে পরবর্তী দিক্‌চিহ্নটি হল জেমস মারি (James Murray 1837-1915) সম্পাদিত বিশ্ববিখ্যাত The Oxford English Dictionary যার প্রথম কিস্তি প্রকাশিত হয় ১৮৮৪ সালে। সম্পূর্ণ অভিধানটি প্রকাশিত হয় মারির মৃত্যুর পরে ১৯৩৩ সালে। অবশ্য ক্রমাগত এর পরিশিষ্ট প্রকাশিত হয়েছে। পরবর্তী কালে বিভিন্ন দিক্‌পাল সম্পাদকের দ্বারা পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত হয়ে ১৯৮৯ সালে The Oxford English Dictionary প্রকাশিত হয় কুড়ি খণ্ডে। এই ১৯৮৯ সালের সংস্করণটিকে দ্বিতীয় সংস্করণ বলা হয়। এতে ছিল ২১, ৭২৮ পৃষ্ঠা।

১৪.৩ অভিধানের শ্রেণিবিভাগ বা প্রকারভেদ

অভিধানের নানান শ্রেণি বা ধরন। তবে সমস্ত অভিধানেরই দুটি প্রধান শ্রেণি হল practical বা ব্যাবহারিক এবং theoretical বা তাত্ত্বিক। সহজ কথায় বলতে গেলে যেকোনো কাজের বা কেজো (workable) অভিধানই ব্যাবহারিক অভিধান (practical dictionary)। বিখ্যাত ভাষাতাত্ত্বিক ও বাগর্থবিজ্ঞানী (semanticist) জেফ্রি লিচ (Geoffrey Leech) ব্যাবহারিক অভিধানকে বলেছেন 'flesh-and-blood' dictionary (Semantics, 1976, p.203)। তিনি যেন বলতে চেয়েছেন এগুলি হল রক্তমাংসে গড়া অভিধান অর্থাৎ এগুলি বাস্তব প্রয়োজন মেটাবার অভিধান। Concise Oxford, Oxford Advanced Learners' প্রভৃতি হল ব্যাবহারিক অভিধানের দৃষ্টান্ত। বাংলা ভাষায় বঙ্গীয় শব্দকোষ, জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের অভিধান, সংসদ বাংলা অভিধান এই ব্যাবহারিক অভিধানের উদাহরণ। অন্য দিকে, theoretical dictionary বা তাত্ত্বিক অভিধানকে বলা যেতে পারে অভিধানের মডেল বা আদর্শরূপ। কিন্তু কথা হল, অভিধানের 'মডেল' বা আদর্শরূপ

বলতে কী বোঝায়? একটা কথা এখানে বলে নেওয়া ভালো যে, আদর্শ অভিধান যখন বলা হচ্ছে তখন মাথায় রাখা হচ্ছে একভাষিক বা দ্বিভাষিক শব্দাভিধানকে। অভিধানতাত্ত্বিকরা ব্যাবহারিক অভিধানকে তত্ত্বগতভাবে নিখুঁত বলে মনে করেন না, তবে সাধারণ ব্যবহারকারীর পক্ষে উপযোগী বলেও স্বীকার করেন। তাঁরা এমন একটি মডেল বা আদর্শের কথা বলেন যা ব্যাবহারিক অভিধানের চেয়ে বেশি বিজ্ঞানসম্মত, তত্ত্বসংগত। তবে তা সাধারণ ব্যবহারকারীর পক্ষে সহজবোধ্য না হবারই কথা। এই ধরনের অভিধানকে তাঁরা লেক্সিকন (lexicon) বলেন।

ভাষাবিজ্ঞানসম্মত এই আদর্শ (theoretical) অভিধানে প্রতিটি entry বা মুখশব্দের তিনটি স্তর থাকবে—শব্দের গঠনগত বিবৃতি বা morphological statement, অন্বয়গত বিবৃতি বা syntactic statement এবং বাগর্থগত বিবৃতি বা semantic statement. প্রথম স্তর শব্দের গঠনগত বিবৃতি। এই স্তরে প্রধানত একটি শব্দের গঠন ব্যাখ্যা করতে হয়। শব্দটিকে তার ক্ষুদ্রতম ধ্বনিতে অর্থাৎ মূলধ্বনি বা স্বনিমে (phoneme) ভেঙে দেখাতে হয়। শব্দটির মধ্যে যে ক্ষুদ্রতম অর্থপূর্ণ ভাগ আছে বা morpheme অর্থাৎ রূপমূল বা রূপিম আছে তা দেখাতে হবে। একটি উদাহরণ নেওয়া যাক—'বিলাপ' শব্দটি। বিলাপ শব্দের স্বনিম বা phoneme এইগুলি—ব্ + ই + ল্ + আ + প্, কিন্তু রূপমূল বা রূপিম বা morpheme আছে দুটি—বি + লাপ। একটি শব্দের ব্যাকরণগত ভাগও দেখাতে হবে—শব্দমূল বা ধাতু, উপসর্গ, বিভক্তি, প্রত্যয় প্রভৃতি। এছাড়া থাকবে দল বা সিলেবলের ভাগসহ উচ্চারণ।

দ্বিতীয় স্তর অন্বয়ের বিবৃতি। অন্বয় বা সিনট্যাক্স বলতে একসময় বোঝানো হত পদক্রমকে। এখন অন্বয় বলতে বোঝায় বাক্যের অন্তর্গত পদগুলির বিন্যাস বা ক্রম এবং বিভিন্ন পদের পারস্পরিক সম্পর্ক। এককথায় পদসংস্থান ও বাক্যে পদসমূহের পারস্পরিক সম্পর্ক। প্রকৃতপক্ষে অন্বয় এখন বোঝায় বাক্যরীতিকে। তৃতীয় স্তর হল বাগর্থের ব্যাখ্যা বা শব্দার্থের ব্যাখ্যা। এটিই অভিধানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক। সংক্ষেপে এই হল তাত্ত্বিক অভিধান বা লেক্সিকনের মডেল।

অভিধানের একটি অতিপরিচিত শ্রেণি হল একভাষিক অভিধান (monolingual dictionary) যাতে একটি ভাষার শব্দকে সেই ভাষাতেই ব্যাখ্যা করা হয়। ইংরেজি থেকে ইংরেজি, বাংলা থেকে বাংলা ইত্যাদি। একভাষিক অভিধানের অভাব নেই। The Oxford Concise English Dictionary, Oxford Advanced Learner's Dictionary, সংসদ বাংলা অভিধান, চলন্তিকা সবই একভাষিক অভিধান।

অভিধান দ্বিভাষিকও হতে পারে। অর্থাৎ ইংরেজি থেকে বাংলা, বাংলা থেকে ইংরেজি, হিন্দি থেকে ইংরেজি, সংস্কৃত থেকে বাংলা ইত্যাদি।

আর একরকম অভিধান হল ইতিহাসভিত্তিক অভিধান। তার শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত The Shorter Oxford English Dictionary. এই ধরনের অভিধানে একটি শব্দের প্রথম প্রচলন

কখন হয়েছিল, প্রথম প্রচলনের সময় তার কী অর্থ ছিল, পরে কখন কীভাবে অর্থবদল ঘটল এবং শব্দটির সাম্প্রতিকতম রূপ কী, অর্থই বা কী—এই হল ইতিহাসভিত্তিক অভিধানের উপজীব্য।

আর একটি শ্রেণি হল বিষয়-অভিধান (subject dictionary)। বিষয়-অভিধান প্রধানত আধুনিক কালেই রচিত হচ্ছে। বিদ্যাচর্চা যত এগোয় ততই বিষয়-অভিধানের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। বিষয়-অভিধান মানে বিজ্ঞানের অভিধান, ইতিহাস অভিধান, অর্থনীতি অভিধান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান অভিধান, সাহিত্যিক শব্দাবলির অভিধান, গণিত অভিধান, জীববিদ্যা অভিধান ইত্যাদি।

থিসরাস বা সমার্থক শব্দের অভিধান আর একটি শ্রেণি। উপরে পিটার মার্ক রজের থিসরাসের কথা বলেছি। ভাবনা বা বিষয় ধরে ধরে তাদের যতগুলি সমার্থক শব্দ হতে পারে তার বিবৃতিই হল থিসরাসের বিষয়। অর্থের দিক থেকে নিকটতর শব্দগুলিকে একটি গুচ্ছের মধ্যে রাখাই এই থিসরাসের নীতি।

১৪.৪ অভিধান-প্রণয়ন

অভিধান প্রণয়নের একটা পূর্বপ্রস্তুতি থাকেই। অভিধান-সংকলককে সিদ্ধান্ত নিতে হয় তিনি উপরে বর্ণিত শ্রেণিগুলির মধ্যে কোন্ শ্রেণির অভিধান সংকলন করতে চলেছেন। ধরা যাক, সংকলক একটি একভাষিক শব্দার্থ অভিধান সংকলন করতে চান। সেক্ষেত্রে প্রথমেই তাঁকে ভেবে নিতে হবে প্রস্তাবিত অভিধানটির আকার কেমন হবে, মোটামুটিভাবে কতগুলি মুখশব্দ (entry word) থাকবে সেই অভিধানে। অভিধান সংকলনে পূর্বসূরির প্রয়াস ও প্রচেষ্টাকে মনে হতে পারে সংকলকের পক্ষে খুবই সহায়ক। কেননা, তাঁকে পথ তৈরি করে নিতে হচ্ছে না। আবার কখনো কখনো এটা কিছু সমস্যাও সৃষ্টি করতে পারে। আগেকার অভিধানগুলির সীমাবদ্ধতা বা ক্রটিবিচ্যুতি কিছু থাকতেই পারে। সেগুলি কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা নিশ্চয় করবেন পরবর্তী সংকলক। আবার আগেকার অভিধানগুলির যা-কিছু সদর্থক গুণ বা বৈশিষ্ট্য তা বর্তমান সংকলককে দ্বিধায় ফেলতে পারে, তাঁর সংশয়কে বাড়িয়ে তুলতে পারে। ফলে আগেকার অভিধান বর্তমান সংকলকের সামনে একই সঙ্গে সহায় ও বাধা হয়ে দেখা দিতে পারে।

অভিধান-প্রণয়নের আগে একটি পরিকল্পনারও প্রয়োজন হয়। সংকলককে ভেবে নিতে হয় কারা তাঁর অভিধানের গ্রাহক—শিক্ষার্থী, বিশেষজ্ঞ, না সর্বসাধারণ? সংকলনে সংকলকের বুদ্ধি-বিবেচনা, সংযম ও অভিজ্ঞতার ভূমিকাই বড়ো কথা, আবেগ বা কল্পনার ভূমিকা গৌণ সেখানে। এমন যদি হয় যে, সংকলক এমন একখানি অভিধান প্রণয়ন করতে চান যেটি হবে সাধারণ শিক্ষিত পাঠকের পক্ষে সর্বার্থসাধক অভিধান, তাহলে সেই অভিধানে থাকবে অধিকাংশ প্রচলিত শব্দ, কিছু অপ্রচলিত শব্দ, ব্যুৎপত্তি, উচ্চারণ, শব্দার্থ এবং প্রয়োগবাক্য।

১৪.৪.১ করপাস বা শব্দসম্ভার (corpus)

বিংশ শতকের মাঝামাঝি থেকে corpus linguistics নামে একটি পদ্ধতির উদ্ভব হয়েছে। খুব সহজ করে বলতে গেলে, করপাস হল একটা ভাষার সমস্ত শব্দ বা শব্দমূল বা শব্দাণু-র (words ও lexemes) সম্ভার বা সংগ্রহ। উদাহরণ দিয়ে বলি, বাংলা ভাষার করপাস হল বাংলা ভাষার সমস্ত সম্ভাব্য শব্দের বিষয়ভিত্তিক বা বর্ণানুক্রমিক তালিকা। এমন এক তালিকা যার বাইরে কোনো বাংলা শব্দ থাকবে না। তাহলে কোনো অভিধান-প্রণেতার পক্ষে খুবই সহজ হবে ওই করপাস থেকে তাঁর পক্ষে প্রয়োজনীয় সমস্ত শব্দ বা শব্দমূল সংকলন। অভিধানে entry বা মুখশব্দ নির্বাচনে করপাস প্রভূত সাহায্য করতে পারে। ইংরেজি ভাষার বিস্তৃত অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে কম্পিউটার-নির্ভর করপাস যে কতদূর ব্যবহৃত হতে পারে তার একটি সর্বজনপরিচিত দৃষ্টান্ত COBUILD অর্থাৎ Collins Birmingham University International Language Database. এ ছাড়া আছে Brown Corpus বা Brown University Standard Corpus of Present-day American English (1961), Longman-Lancaster Corpus (1966), British National Corpus (1996) ইত্যাদি। Oxford Advanced Learner's Dictionary-র সপ্তম সংস্করণের (২০০৫) ভূমিকায় লেখা হয়েছে—'This dictionary is based on the British National Corpus, the Oxford Corpus Collection and the Oxford Reading Programme for Language Research.' তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, অভিধান সংকলনে—বিশেষত শব্দনির্বাচনে corpus খুবই সহায়ক। দুঃখের বিষয় বাংলা ভাষায় এখনও কোনো corpus বা সমস্ত বাংলা শব্দের তালিকা তৈরি হয়নি।

১৪.৫ অভিধানের বিভিন্ন পর্যায়

শব্দনির্বাচন

অভিধান সংকলনের প্রস্তুতিপর্ব শেষ হলে সংকলনের কাজ শুরু। বাংলা ভাষায় কোনো সর্বাত্মক করপাস বা শব্দভাণ্ডার নেই যা থেকে সংকলক তাঁর শব্দ বেছে নিতে পারেন। বিভিন্ন পূর্ববর্তী অভিধান থেকেই মূলত তাঁকে শব্দ নির্বাচন করতে হয়। এবারে একটা নীতির প্রশ্ন। সংকলক কি কেবল ভাষার প্রচলিত শব্দই গ্রহণ করবেন, না কি সেইসঙ্গে অচলিত শব্দও গ্রহণ করবেন? এমন বহু শব্দ আছে যেগুলি বৈষ্ণব সাহিত্যে ব্যবহৃত হত, এখন হয় না। সেগুলি কি উপেক্ষা করা হবে? এ এক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। মনে হয় এক্ষেত্রে একটা আপোশ সংকলককে করতেই হবে। প্রচলিত শব্দ যতদূর সম্ভব গ্রহণ করা নিয়ে প্রশ্ন নেই। উপরন্তু পুরোনো হয়ে-যাওয়া এবং একদা সাহিত্যে ব্যবহৃত এবং এখন স্বল্পপ্রচলিত শব্দও কিছু নিশ্চয় অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। কিন্তু কোথাও ব্যবহার নেই, আগেও তেমন ছিল না এমন কিছু শব্দ একটি এক-খণ্ডের একভাষিক অভিধানে নেবার কোনো যুক্তি থাকতে পারে না। করেণু, ধমিল্ল, ভামর, ইঙ্গন প্রভৃতি শব্দ বিবেচিত না

হলেই ভালো। ইংরেজি ভাষাতেও এমন বহু শব্দ আছে যা প্রায় কখনো কোনো পাঠকের গোচরে আসে না। তেমনই কতকগুলি শব্দ হল blont, appulse, bottine, intorsion ইত্যাদি। এসব শব্দ এতই অস্বাভাবিক অচেনা ও অব্যবহৃত যে সাধারণ অভিধান—এমনকী Oxford Concise Dictionary পর্যন্ত এইসব শব্দকে নেওয়া দরকার মনে করেনি। আর একটা কথা। আঞ্চলিক বা ঔপভাষিক শব্দ প্রচুর সংখ্যায় সাধারণ অভিধানে গ্রহণ করার প্রয়োজন নেই। আঞ্চলিক শব্দ যদি আঞ্চলিকতার সীমা অতিক্রম করে আদর্শ বা মান্য ভাষার আঙিনায় এসে পড়ে তাহলে তেমন কিছু শব্দ অন্তর্ভুক্ত হতেই পারে।

পদনাম বা পদপরিচয়

তত্ত্বগতভাবে বলা হয় যে, অভিধানে যা গৃহীত হয় তা হল শব্দ, এবং সেই শব্দ যখন বাক্যে ব্যবহৃত হয় তখন তাকে বলা হবে পদ। পদের সঙ্গে বিভক্তি-প্রত্যয়াদি যুক্ত হয়—যা অভিধানে দেখানো হয় না। 'গৃহ', 'পাখি', 'মর্যাদা' শব্দ। কিন্তু 'গৃহের' বা 'পাখিতে' বা 'মর্যাদায়' পদ। তার মানে অবশ্যই এই নয় যে, পদমাত্রেই বিভক্তিযুক্ত। বিভক্তি প্রত্যয়হীন পদও হতে পারে। *সে আজ বাড়ি যাবে*—এই বাক্যে 'যাবে' ক্রিয়াপদটি ছাড়া অন্য পদগুলি বিভক্তি-প্রত্যয়হীন। সে, আজ, বাড়ি এই তিনটিকে পদ এবং শব্দ দুইই বলা যাবে। যাই হোক, অভিধানে শব্দের পদপরিচয় থাকা উচিত। কেননা পদপরিচয় থাকলে তাকে বাক্যে ব্যবহার করার সুবিধা হয় অভিধানব্যবহারকারীর পক্ষে। বাংলা ভাষায় একই শব্দ একাধিক পদে ব্যবহৃত হতে পারে। সে বিষয়ে অভিধানে স্পষ্ট ইঙ্গিত থাকা দরকার।

উচ্চারণ ও দলবিভাজন

শব্দের উচ্চারণ-নির্দেশ অভিধান-সংকলনের একটি প্রধান শর্ত। কেবল দেখতে পাই, বাংলা হিন্দি সংস্কৃত প্রভৃতি ভারতীয় ভাষার অভিধানে উচ্চারণ দেখানো নিয়ে অনীহা দেখা যায় প্রকাশকদের। বাংলায় অবশ্য পৃথক উচ্চারণ অভিধান আছে। হিন্দি বা সংস্কৃত ভাষায় তা নেই। যাই হোক, উচ্চারণ-নির্দেশ করা একান্তই প্রয়োজনীয়। বিশেষত এই কারণেই প্রয়োজনীয় যে, বাংলা শব্দের উচ্চারণ বানানানুগ নয়। উচ্চারণ দেখানোর সময় মান্য চলিত ভাষার (Standard Colloquial) উচ্চারণই দেখাতে হবে। আর একটা কথা, উচ্চারণের সঙ্গে-সঙ্গে syllabification বা দলবিভাজনও দেখানো ভালো। বাংলা ভাষায় আজ পর্যন্ত একটিমাত্র অভিধান প্রকাশিত হয়েছে যাতে প্রতিটি শব্দের সিলেবল-ভাগ সহ উচ্চারণ নির্দেশ করা হয়েছে। সেটি বর্তমান লেখকের **'সংসদ কিশোর বাংলা অভিধান'**। বিষয়টাকে স্পষ্ট করা যাক। আমরা দুটি শব্দ নিয়ে দেখব—সুসম্পন্ন, প্রথাগত।

সুসম্পন্ন — শু-শম্-পন্-নো (চার সিলেবল)
প্রথাগত—প্রো-থা-গ-তো (চার সিলেবল)

শব্দার্থ

শব্দের অর্থ বিবৃত করা অভিধানের একটা বড়ো কাজ। বহুকাল যাবৎ শব্দের প্রতিশব্দ বা সমার্থক শব্দ বিবৃত করাকেই অভিধানের সংকলকরা অর্থের বিবৃতি বলে ভেবে

এসেছেন। কিন্তু একটি শব্দের অর্থ নির্দেশ করা আর সমার্থক শব্দ বিবৃত করা এক কথা নয়। 'কুকুর' অর্থ যদি বলা হয় সারমেয়, 'বিড়াল' অর্থ মার্জার তাহলে শব্দের অর্থের বদলে পাওয়া যায় প্রতিশব্দ। একালের বৈজ্ঞানিক ও আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি পাশ্চাত্যে বিশেষত ইংরেজি ভাষার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়ে আসছে প্রায় পাঁচ-ছয় দশক ধরে। আমরা কয়েকটি উদাহরণ দেব। দেখা যাক, Concise Oxford English Dictionary (দশম সংস্করণ ২০০৩) কী বলছে tiger সম্বন্ধে—a very large solitary cat with a yellow-brown coat striped with black, native to the forests of Asia. এর পাশাপাশি দেখব কী বলছে The New Penguin English Dictionary (2000)—a very large Asian cat having a tawny coat transversely striped with black. বাংলা অভিধানগুলির মধ্যে একমাত্র নতুন সংসদ বাংলা অভিধান (পঞ্চম সংস্করণ) ব্যাখ্যামূলক অর্থ বিবৃত করেছে: **বাঘ**—'বিড়াল গোত্রের ডোরা-কাটা মাংসাশী হিংস্র বন্য প্রাণীবিশেষ। এ থেকে এই বিষয়টাই পরিষ্কার হল যে, অভিধানে শব্দের অর্থনির্দেশে ব্যাখ্যামূলক অর্থ থাকবে। সমার্থক শব্দ এক-আধটা থাকতেই পারে, তবে ব্যাখ্যামূলক অর্থের পরিপূরক হিসাবে। আরও একটা কথা বলা দরকার এই প্রসঙ্গে। অভিধানে শব্দার্থ বিবৃত করার পাশাপাশি কিছু শব্দের প্রয়োগ দেখানো অত্যন্ত জরুরি। প্রয়োগবাক্য অভিধানে থাকা চাই।

ব্যুৎপত্তি

সবশেষে আসছে ব্যুৎপত্তি বা উৎসের প্রসঙ্গ। একটি শব্দ কোন্ উৎস থেকে ভাষায় এসেছে তা দেখানো দরকার। শব্দটি যদি সংস্কৃত থেকে এসে থাকে তবে তার ব্যুৎপত্তিও দেখানো যেতে পারে। শিশুকিশোরদের জন্য রচিত অভিধানে ব্যুৎপত্তির প্রয়োজন হয় না। তবে বয়স্কপাঠ্য অভিধানে ব্যুৎপত্তি ও উৎসনির্দেশ জরুরি।

১৪.৬ ভাষার প্রমিতীকরণে (standardization) অভিধানের ভূমিকা

যেকোনো ভাষার প্রমিতীকরণে বা বিধিবদ্ধকরণে অভিধানের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে। অভিধানের যেমন একটা বর্ণনাত্মক রূপ আছে, তেমনি একটা নির্দেশক (prescriptive) রূপও থাকে। কোন শব্দের কী বানান, কী অর্থ তা দেখিয়ে দেয় অভিধান। ভাষার বিশৃঙ্খলা বা অগোছালো অবস্থা দূর করতে সাহায্য করে অভিধান। অভিধান যে কীভাবে বাংলা ভাষার মান্যায়ন বা প্রমিতীকরণে সাহায্য করেছে তা আমরা আগের একাদশ অধ্যায়ে দেখেছি (দ্র.১১.৭)।

১৪.৭ বাংলা ভাষায় রচিত কয়েকটি বিশিষ্ট অভিধান

বাংলা ভাষায় মূলত দুই ধরনের একভাষিক অভিধান সংকলিত হয়ে থাকে। প্রথমটি হল বাংলা শব্দার্থ অভিধান। নামে শব্দার্থ অভিধান হলেও এই ধরনের অভিধানে শব্দের অর্থ ছাড়াও প্রয়োগ, ব্যুৎপত্তি ইত্যাদির বিবৃতিও থাকে। বিংশ শতকের শ্রেষ্ঠ কয়েকখানি অভিধান হল—

যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি—বাঙ্গালা-শব্দকোষ (১৯১৩)
জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস—বাঙ্গালা ভাষার অভিধান (১৯১৬)
হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়—বঙ্গীয় শব্দকোষ (১৯৩২-৫১)
সুবলচন্দ্র মিত্র—সরল বাঙ্গালা অভিধান (১৯০৬)
রাজশেখর বসু—চলন্তিকা (১৯৩০)
শৈলেন্দ্র বিশ্বাস—সংসদ বাঙ্গালা অভিধান (১৯৫৫)

(এই অভিধান সুভাষ ভট্টাচার্যের দ্বারা পরিমার্জিত হয়ে নতুন নামে প্রচারিত হয়েছে—সংসদ বাংলা অভিধান, ২০০০)

আকাদেমি বিদ্যার্থী বাংলা অভিধান—প.ব. বাংলা আকাদেমি (১৯৯৯)।
মুহম্মদ এনামুল হক—বাংলাদেশের ব্যবহারিক অভিধান (১৯৭৪)।
কাজী আবদুল ওদুদ—ব্যবহারিক শব্দকোষ (১৯৫৩)।
সুভাষ ভট্টাচার্য—সংসদ কিশোর বাংলা অভিধান (২০০৩)।

দ্বিতীয় শ্রেণির যে অভিধান সম্প্রতি খুবই জনপ্রিয় হয়েছে সেগুলি হল বিষয় অভিধান। কয়েকটি বিশিষ্ট বিষয় অভিধানের উল্লেখ করা হল।

অর্থনীতি অভিধান—হাফিজ গোলাম আজম সিদ্দিকী (১৯৮৪)
অপরাধ জগতের শব্দকোষ—ভক্তিপ্রসাদ মল্লিক (১৯৭১)
আঞ্চলিক ভাষার অভিধান—অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৯১)
আধুনিক বাংলা প্রয়োগ অভিধান—সুভাষ ভট্টাচার্য (১৯৮৪)
ইতিহাস অভিধান—যোগনাথ মুখোপাধ্যায় (১৯৭৩)
উদ্ভিদ অভিধান—অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ (১৯৮১)
উদ্ভিদবিদ্যার অভিধান—দিনেন ভট্টাচার্য (২০০৮)
পৌরাণিকী—অমলকুমার মুখোপাধ্যায় (১৯৮৫)
বিবিধ বিদ্যার অভিধান—সুভাষ ভট্টাচার্য (২০০৫)
বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অভিধান—বীতশোক ভট্টাচার্য (১৯৮৪)
বাংলা স্ল্যাং : সমীক্ষা ও অভিধান—অভ্র বসু (২০০৫)
বাংলা অকথ্যভাষা ও শব্দকোষ (২০০০)—সত্রাজিৎ গোস্বামী
বুৎপত্তি-সিদ্ধার্থ বাংলা কোষ—সুকুমার সেন (২০০৩)
লৌকিক অভিধান—কামিনীকুমার রায় (১৯৭১)
বঙ্গসাহিত্য অভিধান—হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য (১৯৮৭)
সংসদ ইতিহাস অভিধান—সুভাষ ভট্টাচার্য (২০০৬)
সংসদ বাংলা উচ্চারণ অভিধান—সুভাষ ভট্টাচার্য (১৯৯৬)
সংসদ বাগ্‌ধারা অভিধান—সুভাষ ভট্টাচার্য (১৯৯৬)

সংসদ বানান অভিধান—অশোক মুখোপাধ্যায় (১৯৯৮)
সংসদ ব্যাকরণ অভিধান—অশোক মুখোপাধ্যায় (১৯৮৯)
সংসদ বিজ্ঞান অভিধান—জিতেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (২০০১)
সংসদ সমার্থশব্দকোষ—অশোক মুখোপাধ্যায় (১৯৮৭)
লেখক ও সম্পাদকের অভিধান—সুভাষ ভট্টাচার্য (১৯৯৪)

গ্রন্থপঞ্জি

১. আজাদ, হুমায়ুন—বাঙলা ভাষা (১৯৮৪)
২. বিদ্যানিধি, যোগেশচন্দ্র রায়—বাঙ্গালা ভাষা (১৩২০-২২)
৩. ভট্টাচার্য, বিজনবিহারী—বাগর্থ (১৯৭৭)
৪. ভট্টাচার্য, সুভাষ—বাংলাভাষা চর্চা (১৯৯২)
ভাষা ও শৈলী (২০০৬)
সংসদ কিশোর বাংলা অভিধান (২০০৩)
৫. মিশ্র, সরস্বতী—বাংলা অভিধানের ক্রমবিকাশ (২০০০)
৬. সরকার, পবিত্র—বানান সংস্কার : সমস্যা ও সম্ভাবনা (১৯৮৭)
৭. হক, মাহবুবুল—বাংলা ভাষা : কয়েকটি প্রসঙ্গ (২০০৪)

১৫. উপভাষাতত্ত্ব (Dialectology)

১৫.১ উপভাষা কী?

উপভাষার সংজ্ঞার্থ ও চরিত্র সম্পর্কে স্বচ্ছ ও সুনির্দিষ্ট ধারণা সকলের নেই। বরং কিছু ভ্রান্ত ও অস্পষ্ট ধারণাই আছে। অনেকেরই ধারণা ভাষা হল শিক্ষিত লোকের ভাষা আর উপভাষা হল তুলনায় নিকৃষ্ট বা অপকৃষ্ট ভাষা, বিশেষত শহর ও গ্রামের অশিক্ষিত লোকের ভাষা। খুব সহজ ভাষায় বলতে গেলে, ভাষার বিভিন্ন ভৌগোলিক বা আঞ্চলিক রূপই উপভাষা। আরও এক ধরনের উপভাষাও আছে। তা হল সমাজের বিভিন্ন স্তরের বা গোষ্ঠীর মানুষের ব্যবহৃত বিশেষ ভাষা যার পারিভাষিক নাম হল সমাজভাষা (sociolect)। কিন্তু আমাদের এই আলোচনায় আমরা sociolect এর কথা বলছি না, বলছি ভৌগোলিক বা আঞ্চলিক উপভাষার কথা। পৃথিবীর অধিকাংশ দেশেই উপভাষা আছে। যে-দেশ অনেকগুলি বা কতকগুলি ভৌগোলিক অঞ্চলে বিভক্তি সেই দেশে ভাষার আঞ্চলিক বিভিন্নতা থাকাই স্বাভাবিক। সেই আঞ্চলিক বিভিন্নতাকেই উপভাষা বলা হয়। একসময়, বিশেষত মধ্যযুগে ইংল্যান্ডে উত্তর, পূর্ব, পশ্চিম ও দক্ষিণ এই চারটি ভৌগোলিক ভাষা-অঞ্চল ছিল। কিন্তু আধুনিক কালে ইংল্যান্ডে কেন্টিশ, মার্সিয়ান, নর্দাম্ব্রিয়ান, নরফোক, ওয়েস্ট মিড্‌ল্যান্ড প্রভৃতি উপভাষা স্বীকৃত হয়েছে। বাংলা ভাষারও আছে অনেকগুলি আঞ্চলিক রূপ। সেই আঞ্চলিক রূপ জেলারও হতে পারে, আবার একাধিক জেলার অংশ নিয়েও হতে পারে উপভাষা-অঞ্চল। কিন্তু যে কথাটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তা হল এই যে, উপভাষাও ভাষা। আরও একটা কথা এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন। মান্য চলিত বা মান্য কথ্য ভাষাও একটা উপভাষা। কোন উপভাষা শেষ পর্যন্ত মান্যতা পাবে সেটা একটা ঐতিহাসিক-রাজনৈতিক বিষয়। দক্ষিণ ইংল্যান্ডে লন্ডনের চার পাশের অঞ্চলের ভাষা ইতিহাসের বিবর্তনে মান্য ভাষার স্বীকৃতি পেয়েছে। বাংলায় নদিয়া, হাওড়া, হুগলি প্রভৃতি কলকাতার আশপাশের এলাকার ভাষার বৈশিষ্ট্য ও উপকরণ মিশে তৈরি হয়েছে মান্য কথ্য ভাষা। কোম্পানির আমল থেকে রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক কারণে কলকাতার গুরুত্ব বাড়তে থাকে। বাংলার সমস্ত অঞ্চলের মানুষ নানান কারণে কলকাতায় আসতে থাকে। বিভিন্ন অঞ্চলের উপভাষায় কথা বলে এমন লোক ক্রমাগত এবং বহুকাল ধরে সামাজিক মেলামেশা করতে থাকে। ফলে একসময় কলকাতায়

'সর্বাঞ্চলীয় বাঙালির বোধগম্য' একটা ভাষা গড়ে ওঠে। তাকেই বলা হল মান্য চলিত ভাষা।

১৫.২ উপভাষাতত্ত্ব কী?

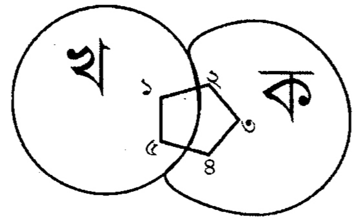
আঞ্চলিক বা ভৌগোলিক উপভাষা সম্বন্ধে ভাষাবিজ্ঞানসংগত চর্চারই নাম 'উপভাষাতত্ত্ব'। উপভাষা বিষয়ে কিছু চর্চা শতাধিক বছর আগে শুরু হলেও ভাষাবিজ্ঞানসম্মত চর্চা খুব পুরোনো নয়। উপভাষা-বিশেষজ্ঞেরা ইংরেজি জার্মান ফরাসি ও অন্যান্য ভাষার আঞ্চলিক রূপ সম্বন্ধে তথ্যাদি সংগ্রহ করে **উপভাষা-মানচিত্র** প্রস্তুত করেছেন। খুব সহজ ভাষায় বলা যায়, দেশের কোন্ অঞ্চলে একটি বিশেষ শব্দের কী কী রূপভেদ তা মানচিত্রে দেখানোই হল উপভাষা-মানচিত্রের কাজ। ধরা যাক girl শব্দটি। বিশিষ্ট ভাষাতাত্ত্বিক ট্রাস্ক (R.L. Trask) ট্রাড্‌গিলের The Dialects of England বইয়ের অনুসরণে ইংল্যান্ডের মানচিত্রে পাঁচটি ভাষা-অঞ্চল ভাগ করে দেখিয়েছেন যে, ওই শব্দটির রূপ উত্তর ইংল্যান্ডে lass, দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলে mawther, দক্ষিণে girl, পশ্চিমে wench এবং দক্ষিণ-পশ্চিমে maiden. এ অবশ্য বিংশ শতকের গোড়ার কথা। গত প্রায় একশো বছরে অন্য রূপভেদগুলিকে গ্রাস করেছে দক্ষিণ ইংল্যান্ডের girl, যা অবশ্য ইংরেজি ভাষার মান্য রূপ।

উপভাষা চর্চার একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিক হল **ঔপভাষিক ভূগোল** (dialect geography)। একটি বিশেষ উপভাষার উচ্চারণভঙ্গি, ব্যবহৃত শব্দ ইত্যাদির রূপরেখা নির্ণয় করে তার সাহায্যে উপভাষাটির গতিধারা সম্পর্কে তথ্য সন্নিবেশ করারই নাম উপভাষাগত বা ঔপভাষিক ভূগোল নির্মাণ। **উপভাষা-মানচিত্র** এই উপভাষা-ভূগোলেরই অংশ।

উপভাষা-মানচিত্র হল উপভাষাচর্চার বা উপভাষাতত্ত্বের প্রধান ভিত্তি। এবং সেই মানচিত্রে **সমধ্বনিরেখা** বা **ধ্বনিরেখাচিত্র** (isophone), **সমরূপরেখা** (isomorph) ও **সমশব্দসীমা** (isogloss) দেখানো একান্ত প্রয়োজনীয়।

১৫.২.১ সমশব্দসীমা ; সমধ্বনিরেখা ; সমরূপরেখা

উপভাষা-মানচিত্র রচনার উদ্দেশ্য হল কোন্ কোন্ অঞ্চলে একটি শব্দের একই রূপ (isogloss), কোন্ কোন্ অঞ্চলে একই ধ্বনি (isophone) এবং কোন্ কোন্ অঞ্চলে একই রূপ বা রূপমূল ব্যবহৃত হয়, তা সীমানা এঁকে দেখিয়ে দেওয়া। একটা দৃষ্টান্ত দিয়ে বিষয়টাকে স্পষ্ট করা যাক। রাঢ় বাংলার কোনো-কোনো অঞ্চলে, বিশেষত, বর্ধমান ও বীরভূমের কোনো-কোনো অঞ্চলে 'ঘসি' শব্দটি ব্যবহৃত হয়, যার মান্য বাংলা রূপ 'ঘুঁটে'। এখন যেসব মহকুমায় বা যেসব গ্রামে 'ঘসি' ব্যবহৃত হয় সেই স্থানগুলি রেখাঙ্কিত করা হল। যেকোনো ব্যক্তির পক্ষে বোঝা সম্ভব হবে যে, ওই রেখাঙ্কিত ঘেরা জায়গাটিতে 'ঘসি' শব্দটির ব্যবহার হয়।



উপরের চিত্রটিতে ধরা যাক ক হল বর্ধমান এবং খ বীরভূম। ওই দুই জেলার ১, ২, ৩, ৪ ৫ চিহ্নিত এলাকায় 'ঘসি' শব্দটি ব্যবহৃত হয়। ওই পাঁচটি স্থানকে রেখা দিয়ে যুক্ত করলে একটা ভাষা-অঞ্চল পাওয়া যাবে। এই হল সমশব্দসীমা বা সমশব্দরেখা (isogloss)। ঠিক এইভাবে রেখাঙ্কিত করা যায় সমধ্বনির এলাকা (isophone) এবং সমরূপ এলাকা (isomorph)।

১৫.৩ উপভাষায়-উপভাষায় মিল ও পার্থক্য

ভাষা-অঞ্চল যত ছোটো হবে, উপভাষার সংখ্যাও ততই কম হবে। কেননা ঔপভাষিকতার সঙ্গে ভৌগোলিক দূরত্বের একটা অনিবার্য সম্পর্ক আছে। এক উপভাষার সঙ্গে অন্য উপভাষার সম্পর্ক বিষয়ে কয়েকটা কথা বলা প্রয়োজন। প্রথমত, উপভাষায় উপভাষায় মূল পার্থক্য ধ্বনিগত। খেইয়েছে, খেইয়েচে ; গ্যাচে, গেইয়েচে এইসব শব্দের প্রধান তফাত ধ্বনিগত। 'নবান্ন'-কে কোথাও বলা হয় নবান্ন, কোথাও বা লবান্। 'অঞ্জন'-কে কোথাও অঞ্জন্, কোথাও রঞ্জন্ বলা হয়। শব্দগত তফাত যে নেই একথা বলা যাবে না। কিন্তু শব্দগত তফাত বড়ো ব্যাপার নয়। পদবিন্যাসগত তফাত নেই বললেই চলে। দুটি উপভাষা-অঞ্চলের মধ্যে দূরত্ব যত কম হবে, পারস্পরিক বোধগম্যতা (mutual intelligibility) তত বেশি হবে। দূরত্বের জন্য সাদৃশ্য কম হয়, তাই পারস্পরিক বোধগম্যতাও কমে যায়।

১৫.৪ উপভাষা-মানচিত্রে গণ্ডি আঁকার অসুবিধা

আমরা দেখেছি যে, উপভাষা-মানচিত্র রচনার একটা সাধারণ প্রক্রিয়া হল একই ভাষাগত বৈশিষ্ট্যযুক্ত এলাকাগুলিকে রেখা এঁকে গণ্ডিবদ্ধ করা। এইভাবেই সমশব্দরেখা বা isogloss আঁকা হয় ; এইভাবেই সমধ্বনিরেখা বা isophone এবং সমরূপরেখা বা isomorph আঁকা হয়। সমশব্দ রেখা বা isogloss আঁকার পরিকল্পনা উদ্ভাবিত হয় বা প্রথম ব্যবহৃত হয় ইয়োরোপে ১৮৯২ সালে। কিন্তু অচিরেই উপভাষাবিশেষজ্ঞেরা আবিষ্কার করলেন যে, এইভাবে isogloss চিহ্নিত করার অসুবিধা আছে। কেননা isogloss বা সমশব্দরেখা মানচিত্রের অন্যান্য স্থানগুলিকেও আড়াআড়িভাবে ছেদ করে। তার ফলে সমশব্দ-এলাকা নির্দিষ্টভাবে এবং সুস্পষ্টভাবে

চিহ্নিত করা যায় না। তার মানে অবশ্য এই নয় যে, সমশব্দরেখাকেই বাতিল করতে হবে। বিশেষজ্ঞেরা এই অসুবিধা দূর করার জন্য পরবর্তীকালে focal areas এবং transition areas এই দুটি এলাকাকে চিহ্নিত করলেন। Focal areas হল সেইসব উপভাষা-এলাকা যেখানে একটি শব্দের মোটামুটি একই প্রয়োগ হয় ; অন্য দিকে, transition areas হল সেইসব উপভাষা-অঞ্চল যেখানে মিল অস্পষ্ট বা কম।

১৫.৫ দেশে-দেশে উপভাষা চর্চার ইতিহাস

ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, ওয়েলস আর আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রেই সবচেয়ে আগে বিজ্ঞানসম্মত উপভাষাচর্চা শুরু হয়, শুরু হয় উপভাষা-মানচিত্র রচনাও। ইংল্যান্ডে হ্যারল্ড অর্টন (Harold Orton) এবং ইউজিন ডিথ (Eugene Dieth) ১৯৫০ থেকে ১৯৬১ সালের মধ্যে প্রায় এগারো বছরের অনুসন্ধানের পর ইংল্যান্ডের ৩১৩টি অঞ্চলকে নিয়ে রচনা করেন English Dialect Survey. তাঁদের পদ্ধতি ছিল—প্রশ্নপত্র রচনা করে সমাজের বিভিন্ন বয়সের, বিভিন্ন পেশার, বিভিন্ন শিক্ষাগত যোগ্যতার, বিভিন্ন এলাকার মানুষের কাছ থেকে ধ্বনিগত, শব্দগত, রূপমূলগত, বাক্যবিন্যাসগত তথ্য সংগ্রহ করা। সংগৃহীত তথ্যগুলিকে তাঁরা আন্তর্জাতিক ধ্বনিমূলক লিপিতে (International Phonetic Alphabet বা IPA-তে) লিপিবদ্ধ করেন। তাঁদের survey বা পর্যবেক্ষণের উপর ভিত্তি করে ১৯৬২ থেকে ১৯৭১-এর মধ্যে প্রকাশিত হয় চার খণ্ডের **Linguistic Atlas of England.** ওয়েলসে উপভাষাচর্চা চলে ১৯৬০ থেকে ১৯৭০ পর্যন্ত। নেতৃত্বে ছিলেন অ্যালান টমাস (Alan R. Thomas) এবং এই চর্চার ফলাফল প্রকাশিত হয় ১৯৭৩ সালে।

সেদিক থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিজ্ঞানভিত্তিক উপভাষাচর্চার সূত্রপাত ইংল্যান্ডেরও আগে। ১৯৩১ সালে হেনরি কুরাথের (Henry Kurath) নেতৃত্বে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ক্যানাডার একটা সুসংবদ্ধ উপভাষা মানচিত্র রচনার প্রয়াস শুরু হয়। ১৯৩৯-৪৩ সালের মধ্যে খণ্ডে খণ্ডে তা প্রকাশিত হয়। কুরাথের গবেষণা ও পর্যবেক্ষণের অন্যতম ফল হল **Word Geography of the Eastern United States.**

১৫.৬ উপভাষাচর্চার বর্তমান প্রবণতা

উপভাষাচর্চা যখন প্রথম শুরু হয়, তখন উপভাষা-মানচিত্র রচনায় কিংবা ভাষাবিষয়ক পর্যবেক্ষণে সচরাচর বয়স্ক অশিক্ষিত ও গ্রামজীবনে অভ্যস্ত ও আবদ্ধ মানুষজনের কথাবার্তার উপরই ভরসা করা হত। কিন্তু সাম্প্রতিককালে উপভাষাচর্চার ক্ষেত্র ও চরিত্র বদলে গেছে। প্রথমত, বয়স বা গ্রামীণতার চেয়ে সামাজিক অবস্থা (social status বা position) অধিকতর গুরুত্ব পেল। ভাষাগত পার্থক্যের কারণ অনুসন্ধানে সামাজিক অবস্থাকে নতুনভাবে দেখা শুরু হল। সেইসঙ্গে অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠল আর্থনীতিক অবস্থাও। দ্বিতীয়ত, উপভাষাচর্চার ক্ষেত্র এবার গ্রাম থেকে শহরমুখী হল। ইয়োরোপে

শিল্পায়ন ইত্যাদির কারণে শহরে বাস করে বহু মানুষ। তাদের বাদ দিয়ে উপভাষাচর্চা অর্থহীন বলে মনে করলেন বিশেষজ্ঞেরা। শহরকেন্দ্রিক উপভাষাচর্চা শুরু হল যাকে urban dialectology বলা হল।

তৃতীয়ত, আগে একটি-একটি শব্দ তুলে ধরে তার উচ্চারণ ইত্যাদি জেনে নেবার চেষ্টা করা হত। বুঝে নেওয়া হত কে কীভাবে ব্যবহার করে সেই শব্দ। তাতে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য নিশ্চয় বেরিয়ে আসত। কিন্তু এতে বক্তা সচেতন হয়ে যেত। ফলে তার বক্তব্যে স্বতঃস্ফূর্ততা (spontaneity) থাকত না। এখন তাই কথোপকথনের মধ্য দিয়ে বক্তার স্বতঃস্ফূর্ত বাচনভঙ্গি, উচ্চারণ ইত্যাদি রেকর্ড করে নেওয়ার উপর জোর দেওয়া হচ্ছে। প্রশ্নপত্রের বদলে টেপরেকর্ডারের উপর বেশি নির্ভর করা হচ্ছে। এতে বক্তা সবসময় সচেতন হবার সুযোগ পায় না।

১৫.৭ সামাজিক উপভাষা বা সমাজভাষা (sociolect)

সামাজিক স্তরভেদে বা শ্রেণিভেদে ভাষার যে পার্থক্য তাকেই **সামাজিক উপভাষা** বা sociolect বলা হয়। পবিত্র সরকার বলেন সমাজভাষা। মৃণাল নাথের ভাষায় **সমাজোপভাষা**। সমাজবদ্ধ প্রতিটি মানুষ সমাজে একাধিক ভূমিকা পালন করে। একই সঙ্গে তারা বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠীর সদস্য হতে পারে। ডেভিড ক্রিস্টাল বলেছেন—People acquire varying status as they participate in social structure; they belong to many social groups, and they perform a large variety of social roles.' কাজেই তাদের সামাজিক পরিচয় (social identity) নির্ণয় করা বেশ কঠিন কাজ। তাই ভাষার দিক থেকে তাদের সামাজিক পরিচয় বুঝে নেবার জন্য তাদের সামাজিক শ্রেণিগত অবস্থানটিই দেখা হয়। প্রত্যেক সমাজে মানুষ কয়েকটি ঊর্ধ্বাধ শ্রেণিতে বিভক্ত হয়ে থাকে—উপর থেকে নীচে। এক-একটি উপশ্রেণির বা স্তরের ভাষাবৈশিষ্ট্যকেই সামাজিক উপভাষা বা sociolect বলা হয়। সমাজের সর্বোচ্চ স্তরে যে আর্থিক প্রাচুর্যযুক্ত ও উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত মানুষজন আছে তাদের ভাষা নিশ্চয় অসচ্ছল ও শিক্ষাবঞ্চিত মানুষের ভাষার থেকে আলাদা। এই আলাদা আলাদা ভাষাই sociolect বা সামাজিক উপভাষা। সামাজিক উপভাষা নিয়ে ভাষাবিজ্ঞানসম্মত আলোচনা তেমন পুরোনো নয়। Sociolect বা সামাজিক উপভাষা নিয়ে যাঁরা গবেষণা করেছেন তাঁদের মধ্যে ট্রাড্‌গিল (P. Trudgill) এবং লেবোভ-ই (W. Labov) প্রধান। ট্রাড্‌গিল পূর্ব ইংল্যান্ডের নরফোকশায়ারের নরিচ (Norwich) শহরকে নিয়ে এক পর্যবেক্ষণ চালিয়েছিলেন। সেখানকার সমস্ত মানুষকে কতকগুলি শ্রেণিতে বিভক্ত করে তাদের কাছ থেকে তথ্য আহরণ করেন। অবশ্য ট্রাড্‌গিল তাঁর জরিপের আওতায় সমাজের উচ্চবিত্ত মানুষকে আনেননি।

গ্রন্থপঞ্জি

১. ভট্টাচার্য, সুভাষ—বাঙালির ভাষা (২০০০)
২. সরকার, পবিত্র—'কোনটি ভাষা কোনটি উপভাষা : একটি তাত্ত্বিক আলোচনা' দ্র. গৌতম গুহরায় সম্পাদিত **ভাষা : সংবেদন ও নির্মাণ** (১৪১৪)
—'কলকাত্তাই বুলি' দ্র. তাপস ভৌমিক সম্পাদিত **পশ্চিমবঙ্গের কথ্য ভাষা** (২০০৯)
৩. Bloomfield, Leonard—Language (1935)
৪. Crystal, David—The Cambridge Encyclopaedia of Language (1997)
৫. Trask, R.A.L—Language : The Basics (2003)

দ্বিতীয় পর্ব

১৬. বাংলা ভাষার উদ্ভব ও বিকাশের ধারা

১৬.১ ইন্দো-ইয়োরোপীয় ভাষাপরিবার

উনিশ শতকে ঐতিহাসিক বা তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের চর্চা শুরু হলে ভাষাতাত্ত্বিকগণ পৃথিবীর একটি প্রত্নভাষার একদা-অস্তিত্বের কথা অনুমান করেন। সেই আদি ভাষা থেকে উদ্ভূত ভাষাসমূহকে কতকগুলি ভাষাপরিবারে বিভক্ত করা হয়ে থাকে। সেই ভাষাপরিবারগুলির অন্যতম হল **ইন্দো-ইয়োরোপীয়** (Indo-European)। এই ভাষাপরিবারের এমন নামকরণের কারণ আছে। এই পরিবারের ভাষাগুলির সীমা এক দিকে ভারত এবং অন্য দিকে ইয়োরোপ। এই দুইয়ের মধ্যবর্তী বলে এই পরিবারভুক্ত ভাষাগুলিকে ইন্দো-ইয়োরোপীয় বলা হয়। ইন্দো-ইয়োরোপীয় ভাষার অনেকগুলি শাখা আছে। যেমন কেল্‌টিক বা কেলতীয়, ইটালিক, গ্রিক, ইন্দো-ইরানীয়, টিউটনিক বা জার্মানিক, বাল্‌তো-স্লাভীয় ইত্যাদি।

ইন্দো-ইয়োরোপীয় ভাষাগুলির কতকগুলি ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। **প্রথমত**, এই ভাষায় আছে vowel gradation বা অপশ্রুতি। **দ্বিতীয়ত**, এই ভাষায় শব্দের শেষে প্রত্যয় যুক্ত হয় এবং শব্দের আগে আদ্যপ্রত্যয় বা উপসর্গ (prefix) ব্যবহৃত হয়। **তৃতীয়ত**, এইসব ভাষায় হ্রস্বস্বর, দীর্ঘস্বর দুই-ই আছে। **চতুর্থত**, স্পৃষ্ট ব্যঞ্জন, পার্শ্বিক ব্যঞ্জন, কম্পিত ব্যঞ্জন এবং উষ্মব্যঞ্জন লক্ষণীয়।

১৬.২ কেন্তম্ ও সতম্ বর্গ

ইন্দো-ইয়োরোপীয় পরিবারের ভাষাগুলিকে ধ্বনিপরিবর্তনের ভিত্তিতে দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়। মূল ভাষার ক্-ধ্বনি যেসব ভাষায় শ-তে পরিণত হয়েছে সেগুলিকে **সতম্** (Satem) এবং যেসব ভাষায় কণ্ঠ্যধ্বনিই থেকে, গেছে সেগুলিকে **কেন্তম্** (Ceutum) বলা হয়। এই নামকরণ হয়েছে 'শত' শব্দের লাতিন ও আবেস্তীয় রূপ অনুসারে। দেখা যায় যে, 'শত' শব্দটি রুশ, ভারতীয় প্রভৃতি ভাষায় 'শ' হয়েছে ; অন্যদিকে লাতিনে ও আইরিশে ক্ হয়েছে। বলাবাহুল্য, রুশ ও ভারতীয় ভাষাসমূহকে 'সতম্' বর্গের এবং লাতিন, গথিক ও আইরিশকে 'কেন্তম্' বর্গের বলা হয়।

১৬.৩ ইন্দো-ইয়োরোপীয় ভাষা ও আর্যদের আদি বাসস্থান

ইন্দো-ইয়োরোপীয় মূল ভাষাকেই বলা হয় আর্য ভাষা। ক্রমশ 'আর্য' কথাটিতে শুধু ভাষাই নয়, সেই ভাষায় কথা যারা বলত তাদেরও আর্য বলা হল। আরও পরে অবশ্য ইন্দো-ইয়োরোপীয় ভাষার যে-শাখা ইরানে এবং ভারতে প্রবেশ করল তাদেরই 'আর্য' বলা হতে

থাকে। প্রথমেই এই কথা বলে রাখা ভালো যে, ইন্দো-ইয়োরোপীয় ভাষার চেহারা যে কেমন ছিল তার কোনো নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া যায় না। ওই ভাষার কোনো গ্রন্থ বা লিখিত নথি অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয়নি। তাহলে কীভাবে সেই ভাষার কথা জানা গেল? ভাষাতাত্ত্বিকদের অনুমান, ২৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ নাগাদ মূল ইন্দো-ইয়োরোপীয় ভাষা থেকে একটু একটু করে শাখাভাষাগুলি বিবর্তিত হতে থাকে। কিন্তু কোন্ অঞ্চল থেকে? আর্যদের আদি বাসস্থান সম্বন্ধে নিশ্চিতভাবে কিছু বলা যায় না। একসময় মনে করা হত তাদের আদি বাসস্থান ভারত। এই তত্ত্ব বহুকাল আগেই বাতিল হয়ে গেছে। একদল ঐতিহাসিক ও ভাষাতাত্ত্বিক মনে করেন আর্যদের আদি বাসস্থান পূর্ব ও মধ্য ইয়োরোপের কোনো অঞ্চল। বিশিষ্ট জার্মান প্রত্নজীববিজ্ঞানী শ্রেডার (O. Schräder) তাঁর ইন্দো-জার্মান ভাষা ও জাতি বিষয়ক গ্রন্থে প্রথম বলেন (১৯১১) যে, আর্যদের আদি বাসস্থান ছিল দক্ষিণ রাশিয়ার উরাল পার্বত্য অঞ্চল। তবে একটি ব্যাপার মোটামুটি নিশ্চিত। তা এই যে, আর্যদের একটি বড়ো গোষ্ঠী পশ্চিমে আয়ারল্যান্ডে চলে যায়। অন্য গোষ্ঠীগুলি সিরিয়া ও মেসোপটেমিয়ার দিকে যায়। একটি গোষ্ঠী ইরানে বসতি করে এবং পরে ভারতে আসে।

ইন্দো-ইয়োরোপীয় ভাষার মূল রূপ সম্পর্কে আমরা যা-কিছু জেনেছি তার উৎস ওই ভাষার প্রাচীন শাখাগুলির প্রত্নভাষা, যেমন প্রত্নগ্রিক, প্রাচীন আইরিশ, প্রাচীন কেলটিক ইত্যাদি। এক্ষেত্রে ভাষাতাত্ত্বিকগণ অগ্রসর হয়েছেন বিপরীত ক্রমে, অর্থাৎ বিবর্তিত রূপ থেকে মূল রূপে ফিরে যাবার চেষ্টা করা হয়েছে। উপরে ১৬.১ পরিচ্ছেদে আমরা মূল ইন্দো-ইয়োরোপীয় ভাষার যে বৈশিষ্ট্যগুলির কথা বলেছি তা এই বিবর্তনের ভিত্তিতেই।

১৬.৪ ইন্দো-ইরানীয় থেকে ভারতীয়-আর্য

আর্য বা ইন্দো-ইয়োরোপীয় ভাষাভাষী জনগণের একটা শাখা ইরানে বসতি করেছিল এবং তারাই কালক্রমে ইন্দো-ইরানীয় ভাষী বলে পরিচিত হয়। এরা নিজেদের বলত 'আর্য'। তাই ইন্দো-ইরানীয় শাখার অন্য নাম 'আর্য' ভাষা। **ইন্দো-ইরানীয়** ভাষার দুটি শাখা—অবেস্তীয় (Avestan) ও প্রাচীন পারসিক (Old Persian)। জরথুস্ত্র-পন্থী পারসিকদের প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ অবেস্তার ভাষাকেই বলা হয় অবেস্তীয়। অন্য দিকে প্রাচীন পারস্যের আকিমেনীয় বা হখামনিশীয় (Achaemenid) রাজা দরয়বুস বা দরায়ুস (Darius) এবং তাঁর পুত্র জেরক্সিজ (Xerxes) বা খয়ার্শ-এর শিলালেখর ভাষাই হল প্রাচীন পারসিক। ইন্দো-ইরানীয় ভাষা থেকে এল তিনটি ভাষা—**ইরানীয়** ; **দরদীয়** (Dardic) এবং **ভারতীয় আর্য** (Indo-Aryan)। ইন্দো-ইরানীয় ভাষার যে-শাখাটি ভারতে প্রবেশ করে এবং ভারতীয়-আর্য নামে পরিচিত হয় তার সময় আনুমানিক ১৬০০-১৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ।

১৬.৪.১ ভারতীয়-আর্য ভাষা

যাকে ভারতীয় আর্য বলা হয় তার ইতিহাসের সূত্রপাত সেই সময়ে যখন ইন্দো-ইরানীয় বা আর্য ভাষার সঙ্গে তার বিচ্ছেদ ঘটে যায়। ১৪০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের আগে পর্যন্ত ইন্দো-ইরানীয় বা আর্য ভাষা ইরান এবং মেসোপেটেমিয়ার কোনো-কোনো অঞ্চলে ব্যবহৃত হত। কাজে কাজেই ১৪০০-১৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দকে আর্য ভাষা ও

ভারতীয় আর্য ভাষার বিচ্ছেদকাল বলে ধরে নিতে পারা যায়, যদিও আর্যভাষী মানুষ কখন থেকে ভারতে আসতে শুরু করে তা সঠিকভাবে জানা যায় না। তবে এই অভিবাসন ১৪০০-১৩০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের আগে নিশ্চয় শুরু হয়নি। ভারতে আর্য অভিবাসন একবারে হয়নি, হয়েছে খেপে খেপে এবং অনেক বছর ধরে। যেসব মানুষ এইভাবে ভারতে এল তারা একই গোষ্ঠীভুক্ত ছিল না, তাদের ভাষাও হুবহু একরকম ছিল না। ভারতীয়-আর্য ভাষার প্রথম লিখিত নিদর্শন হল ঋগ্বেদ। পণ্ডিতগণ অনুমান করেন যে, ঋগ্বেদের রচনাকাল ১২০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ। অন্য দিকে, আমরা বলেছি আর্যগণ ভারতে আসতে শুরু করে আনু. ১৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে। তাহলে এই তিনশো বছরে তারা ভারতে তাদের অবস্থানকে দৃঢ় করেছে। এই সময়ে তারা যে-ভাষা ব্যবহার করত তাকে সুকুমার সেন বলেছেন Proto-Indo-Aryan বা **প্রত্ন-ভারতীয়-আর্য ভাষা** বা প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষা (History and Prehistory of Sanskrit, 2001, p.2)। এই ভারতীয়-আর্য ভাষা থেকেই আধুনিক ভারতের বাংলাসহ বহু আঞ্চলিক ভাষার উদ্ভব হয়েছে। বাংলাকে তাই ভারতীয় আর্য ভাষার এক সুদূর বংশধর বলা যায়।

প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার সূচনাকাল যদি ১৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ ধরি, তবে আজ পর্যন্ত ভারতীয় আর্য ভাষার জীবনকাল সাড়ে তিন হাজার বছর ধরতে হবে। এই সাড়ে তিন হাজার বছরের ইতিহাস তিনটি পর্বে বিভক্ত। (ক) **প্রাচীন ভারতীয়-আর্য** বা Old Indo-Aryan; (খ) **মধ্য ভারতীয়-আর্য** বা Middle Indo-Aryan, এবং (গ) **নব্য ভারতীয়-আর্য ভাষা** (New Indo-Aryan)। এদের স্থিতিকাল যথাক্রমে ১৫০০-৬০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ, ৬০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ-১০০০ খ্রিস্টাব্দ এবং ১০০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত।

১৬.৫ প্রাচীন ভারতীয়-আর্য

প্রাচীন ভারতীয়-আর্য ভাষার প্রাচীনতম নমুনা হল ঋগ্বেদ। পরবর্তী তিনটি বেদও প্রাচীন ভারতীয়-আর্য ভাষারই নিদর্শন। সেইজন্য প্রাচীন ভারতীয়-আর্য ভাষার সাধারণ নাম বৈদিক। এই বৈদিক ভাষারও রকমফের ছিল, ছিল নানান আঞ্চলিক বিভিন্নতা। পণ্ডিতগণ বলেন, **প্রাচীন ভারতীয়-আর্য ভাষার** তিনটি আঞ্চলিক রূপ ছিল, যথা - **উদীচ্য** বা **উত্তরাঞ্চলের ভাষা**, **মধ্যাঞ্চলীয় ভাষা** এবং **প্রাচ্য বা পূর্বাঞ্চলীয় ভাষা**। বৈদিক ভাষার প্রাচীনতর রূপকে বলা হয় প্রাচীন বৈদিক এবং নবীনতর রূপকে বলা হয় অর্বাচীন বৈদিক।

প্রাচীন ভারতীয়-আর্য ভাষার আবার দুটি পর্যায় বা পর্ব। প্রথম পর্বে আছে **বৈদিক ভাষা** ও সাহিত্য এবং দ্বিতীয় পর্যায় বা পর্বে আছে **সংস্কৃত**। সংস্কৃতকে বলা যেতে পারে বৈদিক ভাষারই বিবর্তিত এবং ঈষৎ পরিবর্তিত রূপ। অনেকে বৈদিক ভাষাকে সংস্কৃতেরই আদি রূপ বলে মনে করেন। যদি বৈদিক ভাষাকে সংস্কৃতেরই আদি রূপ বলে মেনে নিই, তাহলে সংস্কৃত ভাষার উদ্ভব ও প্রসারকাল দু-হাজার বছরেরও বেশি পুরোনো বলতে হবে। এর মধ্যে অবশ্য আছে বৈদিক সাহিত্য, ব্রাহ্মণ, উপনিষদ্, সূত্রসাহিত্য, ধ্রুপদি সংস্কৃত, মহাকাব্যের সংস্কৃত, পুরাণ সাহিত্য প্রভৃতি।

১৬.৬ সংস্কৃত ভাষা

আগেই বলেছি, প্রকৃতপক্ষে সংস্কৃত বলতে আমরা বুঝি বেদোত্তর শিষ্ট ভাষাকে, যে-ভাষাকে অনুশাসনে বেঁধে তাকে 'সংস্কৃত' করেছিলেন বিখ্যাত বৈয়াকরণ **পাণিনি**। যে-ভাষা ছিল মূলত কথ্য, যার ব্যাকরণে ও প্রয়োগে ছিল বিশৃঙ্খলা, তাকে নিয়মবদ্ধ করে, মার্জিত করে শিষ্ট লেখ্য ভাষায় পরিণত করেছিলেন পাণিনি। পাণিনি পৃথিবীর সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বৈয়াকরণ। সংস্কৃতের মতো এক বহুশাখায়িত জটিল ও ঋদ্ধ ভাষাকে যেভাবে তিনি বিশ্লেষণ করেছেন, যেভাবে তার নানা আঞ্চলিক রূপকে গ্রহণবর্জনের মাধ্যমে শিষ্ট ভাষায় পরিণত করেছেন, তা এক কথায় অতুলনীয়। সংস্কৃত ভাষাকে চিরকালের জন্য সুনির্দিষ্ট করেন তিনি। তাঁর ব্যাকরণে আছে আটটি অধ্যায়। সংস্কৃত ভাষার ব্যাকরণের সূত্রগুলিকে তিনি আটটি অধ্যায়ে ব্যাখ্যা ও বিবৃত করেছেন। সেইজন্য তাঁর ব্যাকরণের নাম **'অষ্টাধ্যায়ী'**। তবে সেকালে 'অপাণিনীয়' সংস্কৃতের একেবারে বিলোপসাধন সঙ্গে সঙ্গে হয়নি। অল্পশিক্ষিত লোকে পাণিনির আগে প্রচলিত অ-সাধু ভাষায় রচিত সাহিত্য পড়ত। তবে খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দের শেষ দিক থেকে অর্থাৎ পাণিনীয় সংস্কৃতের প্রচার ও প্রসার হতে থাকলে ধীরে ধীরে অপাাণিনীয় সংস্কৃত গৌণ বা গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে। পাণিনির সংস্কৃত ভাষা যে কিছুটা কৃত্রিম ছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই (পরেশচন্দ্র মজুমদার, সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষার ক্রমবিকাশ, ২০০০, পৃ.৬৬)। তবে প্রায় সমসাময়িক মহাকাব্যদুটির ভাষা ধ্রুপদি সংস্কৃতের উপর ভিত্তি করেই রচিত হলেও তাতে কৃত্রিমতা তেমন ছিল না। কেননা তাতে একটা 'লৌকিক ছাঁদ' ছিল।

১৬.৭ মধ্যভারতীয় আর্য

প্রাচীন ভারতীয়-আর্য ভাষার প্রথম পর্বের বৈদিক ভাষার সঙ্গে পরবর্তী পর্বের সংস্কৃত ভাষার কিছু ধ্বনিগত ও শব্দগত পার্থক্য থাকলেও একথা মনে রাখা দরকার যে, বৈদিক ভাষা ও সংস্কৃতির মূল কাঠামোতে তফাত তেমন ছিল না। কিন্তু খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ-পঞ্চম শতক থেকে ভারতীয়-আর্য ভাষায় এমনই ব্যাপক পরিবর্তন হল যে, প্রাচীন ভারতীয়-আর্য ভাষার কাঠামোটাই বদলে গেল। সুকুমার সেন বলেছেন—"ভারতীয়-আর্য ভাষা এখন যেন প্রাচীন বেশ অর্থাৎ 'সংস্কৃত' রূপ ছাড়িয়ে মধ্যকালীন বেশ ধরিল, সাধারণ ভাষায় '**প্রাকৃতে**' পরিণত হইল।" (ভাষার ইতিবৃত্ত, ১৯৯৪, পৃ.৯৪)। এই ভাষার নাম প্রাকৃত হওয়ার কারণ এ-ভাষা সাধারণ মানুষের অর্থাৎ প্রাকৃতজনের ভাষা। সুকুমার সেনের অনুমান, প্রাকৃত বিবর্তিত হয়েছে মূলত দুটি উৎস থেকে। একটি হল বৈদিক ভাষার কথ্য রূপের ক্রমশ সহজীভবন। আর দ্বিতীয়টি হল সংস্কৃতের সহজীভবন। কাজেই প্রথম থেকেই প্রাকৃত একাধিক রূপ নিয়ে হাজির হয়েছে। তার প্রধান দুটি রূপ হল **মাহারাষ্ট্রী** এবং **শৌরসেনী**।

বৈদিক কথ্য ভাষা বা সংস্কৃত যখন পরিবর্তিত হয়ে প্রাকৃতে রূপলাভ করল তখন, **পরিবর্তন হল তিনটি দিকে—ধ্বনির রূপে ; শব্দরূপে ও ধাতুরূপে ; পদপ্রয়োগে।**

ধ্বনির পরিবর্তন কেমন হয়েছিল তার কয়েকটি দেখা যাক প্রথমে। ক. ঋ-কার বদলে গিয়ে কেবল স্বরধ্বনি রইল। মৃগ হল মগ বা মিগ। কৃষি হয়েছে কসি। কোথাও কোথাও

ঋ-কার বা রেফ বদলে পরবর্তী ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব হয়েছে। ধর্ম হয়েছে ধম্ম, দীর্ঘ হয়েছে দিগ্‌ঘ। খ. শব্দের আদিতে যুক্তব্যঞ্জন থাকলে তা ভেঙে গিয়েছে। ত্রি হয়েছে তি বা তিরি। গ. পাশাপাশি দুটি ধ্বনি অনেক সময় সংকুচিত (contracted) হয়ে একক ধ্বনিতে পরিণত হয়েছে. পূজয়তি হয়েছে পূজেতি। ঘ. ঋ, র্‌, শ্‌, ষ্‌ ধ্বনির সংস্পর্শঘটিত দন্ত্য-ধ্বনি পরিণত হয়েছে মূর্ধন্য-ধ্বনিতে। কৃত > কট। ঙ. স্বরভক্তি বা সমীভবনের দৃষ্টান্ত প্রচুর—ভক্ত > ভত্ত, সর্বত্র > সব্বত্ত, চিকিৎসা > চিকিস্‌সা।

শব্দরূপ ও ধাতুরূপের পরিবর্তনও ঘটেছে এবং সে-পরিবর্তন হয়েছে সহজতার দিকে। ক. শব্দ বা পদের অন্ত্যব্যঞ্জন লুপ্ত হয়ে স্বরান্ত হয়েছে। কর্মণে > কম্মায়, রাজানঃ > রাজানো। খ. দ্বিবচন বদলে হল বহুবচন। গ. ধাতুরূপের ক্ষেত্রে আত্মনেপদ পরস্মৈপদে পরিণত হয়েছে। ধাতুর গণগুলির মধ্যে কেবল ভ্বাদিগণই (ভূ-আদিগণ) থেকেছে, অন্যগুলি লোপ পেয়েছে।

পদের ক্ষেত্রে দ্বিবচনের কোনো দৃষ্টান্ত প্রাকৃতে নেই একথা নিশ্চিত। কোনো-কোনো ক্ষেত্রে একবচনও লুপ্ত।

১৬.৭.১ পালি ভাষা

মধ্য ভারতীয় আর্য ভাষার প্রথম স্তরের একটি ভাষারূপ হল পালি। পণ্ডিতদের অনুমান উজ্জয়িনীর ভাষার মধ্যেই ছিল পালির বীজ। 'পালি' নামটি সিংহলি বৌদ্ধ পণ্ডিত বুদ্ধ ঘোষের দেওয়া বলে মনে করেন সুকুমার সেন। হীনযান মত যখন উত্তর ভারত থেকে ক্রমশ দক্ষিণ দিকে সরে যায় এবং সিংহলে বিস্তার লাভ করে, তখন থেকেই বুদ্ধের বাণীর সংরক্ষণ ও চর্চা পালি ভাষাতেই হতে থাকে। বুদ্ধদেব যে-ভাষায় তাঁর বাণী সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রচার করেছিলেন, সেই ভাষাকে পালির প্রাথমিক রূপ বলা যেতে পারে। **পালি ভাষা হল সংস্কৃত ও প্রাকৃতের মাঝামাঝি স্তর**। সংস্কৃতের দার্ঢ্য পালিতে নেই। পালি সেকালের লোকের উপযোগী সহজীকৃত ভাষা। সংস্কৃত কীভাবে পালিতে এসে সহজ হয়েছে তার কয়েকটি উদাহরণ দেখা যাক। সংস্কৃত '**শ্রেষ্ঠ**' পালিতে হয়েছে 'সেট্‌ঠ', 'অগ্নি' হয়েছে 'অগ্‌গি', 'বৃদ্ধ' হয়েছে 'বুড়ঢ'। পালি ভাষার ব্যাকরণ সংস্কৃতের চেয়ে অনেক সহজ। পালিতে সমীভবন অনেক বেশি দেখা যায়। মধ্যভারতীয় আর্য ভাষার বৈশিষ্ট্য পালিতে পুরোমাত্রায় রয়েছে। যেমন দ্বিবচনের ব্যবহার নেই, ধাতুর দশটি গণের মধ্যে ভ্বাদিগণীয় ধাতুই বেশি।

পালিকে ভাষাতাত্ত্বিকগণ প্রাকৃতেরই প্রাথমিক রূপ বলে মনে করেন। পালি ভাষাই থেরবাদী বা স্থবিরবাদী বৌদ্ধধর্মের যাবতীয় রচনাবলিতে ব্যবহৃত হয়েছে। সিংহল (বর্তমান শ্রীলঙ্কা), বর্মা (বর্তমান মায়ানমার) এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্যত্র বৌদ্ধধর্মাবলম্বীরা আজও মূলত পালি ভাষাই তাঁদের রচনাদিতে ব্যবহার করেন।

পালি ভাষায় যে-সাহিত্য রচিত হয়েছে তা সংখ্যায় যেমন বিপুল, সাহিত্যগুণেও উৎকৃষ্ট। পালি ভাষায় যা কিছু রচিত হয়েছে তার সবই ধর্মমূলক হলেও তার মধ্যে সাহিত্যগুণের অভাব নেই। সুকুমার সেন বলেছেন যে, 'সুত্তনিপাত', 'থেরগাথা' প্রভৃতি পালি সংকলনে উৎকৃষ্ট কবিতার অভাব নেই। পালি ভাষার আর একটি বিখ্যাত গ্রন্থ হল 'ধম্মপদ'।

১৬.৮ প্রাকৃত ভাষা

প্রাচীন ভারতীয়-আর্য ভাষাকে যেমন সাধারণভাবে 'সংস্কৃত' ভাষা বলা হয়, তেমনি মধ্যভারতীয়-আর্য ভাষার সাধারণ নাম 'প্রাকৃত', যদিও প্রাকৃত বলতে কেবল একটি নির্দিষ্ট ভাষারূপকেই বোঝায় না। প্রাকৃতের ছিল নানান রূপ ও বৈচিত্র্য। খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকই মোটামুটিভাবে প্রাকৃতের উদ্ভবকাল বলে মনে করা হয়। সংস্কৃত থেকেই উদ্ভব হয় প্রাকৃতের। অন্যভাবে বলা যায়, সংস্কৃত ভাষা সাধারণ মানুষের মুখে বিকৃত তথা সহজীকৃত হয়ে প্রাকৃতে পরিণত হয়েছে। এমনও দেখা গেছে যে, সংস্কৃত নাটকে অনেক সময়ই সংলাপে প্রাকৃত ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে। সংস্কৃত সহজ হয়ে প্রাকৃতে পরিণত হয় একথা সত্য। তবে সেই প্রাকৃতের প্রথম অবস্থা হল পালি, পরবর্তী পর্যায় হল প্রাকৃত। আর একটি কথা মনে রাখতে হবে। প্রাকৃত ভাষার স্থিতিকাল প্রায় দেড় হাজার বছর—খ্রিস্টপূর্ব ৬০০ থেকে আনুমানিক ১০০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত।

প্রাকৃত ভাষার এই দেড় হাজার বছরের ইতিহাসে **তিনটি পর্ব** বা পর্যায়ের কথা বলা হয়—**আদি পর্ব, মধ্য পর্ব** ও **অন্ত্য পর্ব**। আদি পর্বের নাম **পালি**, যার কথা আগেই বলা হয়েছে ; মধ্য পর্বই হল **মূল প্রাকৃত** ; অন্ত্য পর্ব হল **অপভ্রংশ**। এই অন্ত্য পর্বের শেষে অপভ্রংশ প্রাকৃতেরও কিছু বিকৃতি ঘটেছিল। সেই বিকৃত রূপকে বলা হল **'অবহট্‌ঠ'**।

প্রাকৃত ভাষা যে সংস্কৃতের চেয়ে অনেক সহজ তা বলাই বাহুল্য। সংস্কৃতের তুলনায় প্রাকৃত যে কোথায় আলাদা হয়ে গেল তা কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিয়ে দেখানো যেতে পারে। ১. যুক্তব্যঞ্জন অধিকাংশ ক্ষেত্রে যুগ্মধ্বনিতে পরিণত হয়েছে—ধর্ম > ধম্ম, কার্য > কজ্জ, অষ্ট > অট্‌ঠ। ২. শব্দের আদিতে যুক্তব্যঞ্জন থাকলে তা একক ধ্বনি হয়ে গেছে—ব্রাহ্মণ > বমহ্‌ণ, গ্রহণ > গহণ, দ্বাদশ > দুবাদস। ৩. পদের মধ্যের বা শেষের একক ব্যঞ্জনটি অল্পপ্রাণ হলে লুপ্ত হয়েছে, মহাপ্রাণ হলে তা হ্‌-তে পরিণত হয়েছে—শেফালিকা > সেহালিআ, লোক > লোঅ ; লঘু > লহু। ৪. পদের আদিতে বা মধ্যে ঐ-কার থাকলে তা হয়েছে এ-কার, এবং ঔ-কার থাকলে হয়ে ও-কার—বৈদ্য > বেজ্জ, তৈল > তেল ; পৌর > পোর। ৫. শব্দরূপে এবং ধাতুরূপে সংস্কৃতের দ্বিবচন প্রাকৃতে সম্পূর্ণ লোপ পেয়েছে। ৬. আত্মনেপদী ধাতুর প্রয়োগ নিয়ে নিয়েছে পরস্মৈপদী।

প্রাকৃত ভাষা কতকগুলি শাখায় বিভক্ত ছিল। সেগুলি হল **মাহারাষ্ট্রী, শৌরসেনী, অর্ধমাগধী, মাগধী** ও **পৈশাচী**। মাহারাষ্ট্রী প্রাকৃতই প্রধান। সংস্কৃত নাটকে যে শিষ্ট প্রাকৃত ব্যবহৃত হত তা এই মাহারাষ্ট্রী প্রাকৃত। **'গাথাসপ্তশতী'**, **'গৌড়বধ'** প্রভৃতি কাব্যের ভাষা মাহারাষ্ট্রী প্রাকৃতেরই দৃষ্টান্ত। সংস্কৃত নাটকে অশিক্ষিত পুরুষের মুখে এবং মেয়েদের মুখে যে ভাষা বসানো হয়েছে তা-ই হল শৌরসেনী প্রাকৃত। সম্ভবত মথুরা বা শূরসেন অঞ্চলের নাম থেকেই এর শৌরসেনী নাম হয়েছে। মগধ অঞ্চলের প্রাকৃতকে মাগধী বলা হত। মাগধীর মধ্যে কিছুটা কৃত্রিমতা ছিল। **অশ্বঘোষের নাটকে** মাগধীর ব্যবহার দেখা যায়। অর্ধমাগধী ব্যবহার করত মূলত জৈনরা। একে 'জৈনপ্রাকৃত'ও বলা হয়। অর্ধমাগধী অন্যান্য প্রাকৃতের তুলনায় বেশি সংস্কৃতঘেঁষা।

'পৈশাচী' প্রাকৃত নামটি কিছুটা বিতর্কিত। অন্য প্রাকৃতগুলি স্থানবিশেষের নাম থেকে সৃষ্ট, কেবল পৈশাচীই পিশাচভাষা বলে কথিত। পৈশাচীতে রচিত কোনো গ্রন্থ পাওয়া যায় না। সুকুমার সেনের মতে পৈশাচী পালি ভাষারই নামান্তর।

১৬.৯ মধ্যভারতীয়-আর্য ভাষার অন্ত্যপর্ব—অপভ্রংশ, অবহট্‌ঠ

মধ্য ভারতীয়-আর্য ভাষার বা প্রাকৃতের শেষ পর্বকে বলা হয় **অপভ্রংশ**। অর্থাৎ এই পর্বে প্রাকৃত বদলে যাচ্ছে, বা অন্যভাবে বলতে গেলে বিকৃত হচ্ছে। সুকুমার সেন বলেছেন যে, প্রাকৃত ভাষার ব্যাকরণকাররা অপভ্রংশকে একটি স্বতন্ত্র প্রাকৃত ভাষা হিসাবে ব্যবহার করেছেন। অন্য দিকে, গ্রিয়ারসনের মতো ভাষাতত্ত্ববিদেরা প্রাকৃতের শেষ উপস্তরকেই অপভ্রংশ বলেছেন। অর্থাৎ তাঁরা অপভ্রংশ আর অপভ্রষ্ট বা অবহট্‌ঠের মধ্যে তেমন তফাত করেননি। বস্তুতপক্ষে আমরা প্রাকৃতের শেষ পর্বের দুটি স্তরকে পৃথকভাবে দেখব—একটি **অপভ্রংশ** এবং তার পরের স্তরটি **অবহট্‌ঠ** বা **অপভ্রষ্ট**। সুকুমার সেন আরও স্পষ্ট করে বলেছেন, মধ্য ভারতীয়-আর্যের যে সর্বজনীন রূপটি অ-শিষ্ট লৌকিক সাহিত্যে ব্যবহৃত হচ্ছিল তাকেই অপভ্রংশ বলা উচিত, এবং সেই অপভ্রংশের পরবর্তী রূপই অপভ্রষ্ট বা অবহট্‌ঠ—যাকে তিনি বলেছেন আধুনিক কথ্য ভারতীয় আর্যভাষার (অর্থাৎ বাংলা হিন্দি ইত্যাদি ভাষার) জনক।

কালিদাসের 'বিক্রমোর্বশী' নাটকে কয়েকটি গান আছে যেগুলি অপভ্রংশে রচিত বলে মনে করেন ভাষাতত্ত্ববিদরা। অতএব একথা বোঝাই যাচ্ছে যে, কালিদাসের সময়েও অপভ্রংশের প্রচলন ছিল। অপভ্রংশের কতকগুলি আঞ্চলিক বিভিন্নতা ছিল যেগুলির নাম **বৈদর্ভী, গৌড়ী, পাঞ্চালী, ব্রাচড়ক** ইত্যাদি। এগুলিকে প্রাকৃত ও নব্য ভারতীয়-আর্যের মধ্যে সেতু বলে মনে করা যেতে পারে। অপভ্রংশের প্রথম ব্যাকরণকার সম্ভবত একাদশ শতকের **হেমচন্দ্র**। অপভ্রংশের পরবর্তী স্তরই হল **অবহট্‌ঠ**। অপভ্রংশের পরে অবহট্‌ঠ-তে এসে মধ্য ভারতীয়-আর্য ভাষার স্থিতিকাল শেষ হয়। অবহট্‌ঠ সম্বন্ধে একালের ভাষাতাত্ত্বিকদের মধ্যে বিশেষ আলোচনা করেছেন সুকুমার সেন (দ্র **A Comparative Grammar of Middle Indo-Aryan**) এবং তাঁর পুত্র সুভদ্রকুমার সেন (দ্র. **Proto-New-Indo-Aryan**)। তাঁদের পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণে আমরা জানতে পেরেছি যে, অবহট্‌ঠ ভাষা প্রচলিত ছিল খ্রিস্টীয় অষ্টম শতক থেকে চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতক পর্যন্ত। সাহিত্যিক রচনাবলিতে সে নিদর্শন আছে, যদিও কথ্য ভাষা হিসাবে অবহট্‌ঠ-র প্রচলন অত দিন ছিল না, তার প্রচলন ছিল সম্ভবত খ্রিস্টীয় অষ্টম শতক পর্যন্ত। সরহপাদের দোহাকোষ, প্রাকৃত- পৈঙ্গল প্রভৃতিতে অবহট্‌ঠের নির্দশন আছে। অবহট্‌ঠের ভাষাতাত্ত্বিক বা ব্যাকরণগত বৈশিষ্ট্য সংক্ষেপে উল্লেখ করা যেতে পারে—

ক. শব্দের আদিতে বা শেষে দীর্ঘস্বর সাধারণত হ্রস্বস্বরে পরিণত হত—মালা > মাল।

খ. শব্দের মধ্যে বা শেষে সানুনাসিকতা এল—কমল > কঁঅল।

গ. শব্দরূপে ও ধাতুরূপে দ্বিবচন বা বহুবচন রইল না—নির্বিশেষে একরকমই ব্যবহৃত হল।

ঘ. শব্দের আদ্য ও মধ্যবর্তী এ-কার ই-কারে পরিণত হল—এক্‌ক (ঐক্য থেকে) > ইক্‌ক।

৬. আধুনিক বাংলায় যুক্তক্রিয়ার যে ব্যাপক প্রচলন, তার উৎস অবহট্‌ঠে। অবহট্‌ঠে দেখতে পাওয়া গেল—করহু তান (ত্রাণ করো), বিসাম করু (বিশ্রাম করো)।

আমরা এখানে সুকুমার সেনের গ্রন্থ থেকে অপভ্রংশ ও অবহট্‌ঠের কিছু নমুনা উপস্থিত করছি।

অপভ্রংশ

১. যই ভমসি ভমসু এমেঅ কন্হ সোহগ্গগব্বিরা গোটে। মহিলাণং দোসগুণে বিআরইউং যই খমো সি।

[যদি বেড়াতে হয় বেড়াও সৌভাগ্যগর্বিত কৃষ্ণ, গোষ্ঠে মহিলাদের দোষগুণ বিচারে যদি সমর্থ হও।]

২. অপ্পানং অমুনন্তা যে আরম্ভন্তি দুগ্গমং কজ্জং।
পরমুহ-পলোইয়ানাং তানং কহ হোই জয়লচ্ছি॥
[নিজেকে বিবেচনা না করে যারা কাজ আরম্ভ করে,
পরমুখ-প্রত্যাশী তাদের কী করে জয়লক্ষ্মী (লাভ হয়)।]

অবহট্‌ঠ

১. মূল ছান্ডি যে ডাল চড়ি কহ তহা যোয়াভাসি
চীরু ণ বুণনহঁ যাই বড় বিণু উট্‌ঠই কপাসি।
[মূল ছেড়ে যে ডালে চড়েছে
তার যোগাভ্যাস কোথায়।
চেল বোনা যায় না বোকা
বিনা উঠিয়ে কাপাস (যথায়)]

২. ঘরি ঘরি বুল্লই সরল পিয়ারী
জিবন্তি বেরয়রী স হো নারী
বন্ধই মুচ্চই খনি একল্লি
তহি জানহ জহ জাই ন পেল্লি।
[ঘরে ঘরে বুলে (সেজে) সকলের প্যারী
জীবন্ত (থাকিতে) ঝগড়াটি সেই নারী
বাধা পায়, খোলা যায় অনেকে একেলা
তাই জানিহ তাকে (ঠেলে) না যায় ফেলা।]

১৬.১০ অপভ্রংশ-অবহট্‌ঠ থেকে বাংলা ভাষা : বিভিন্ন মত

একথা আজ সর্বস্বীকৃত যে, বাংলা ভাষার উদ্ভব হয়েছে অপভ্রংশ-অবহট্‌ঠ থেকে। কিন্তু অপভ্রংশেরও আঞ্চলিক বিভিন্নতা ছিল। সরাসরি প্রাকৃতের মধ্য স্তর থেকে যে বাংলার উদ্ভব হয়নি একথা সকলেই মানেন। তাহলে কোন্ স্তর থেকে, কিংবা কোন্ আঞ্চলিক বিভিন্নতা থেকে বাংলা ভাষার রূপান্তর? এই প্রশ্নে আমরা নানান মত বা তত্ত্ব দেখতে পাই। স্যার জর্জ গ্রিয়ারসন বলেছেন বাংলা এসেছে মাগধী অপভ্রংশ থেকে। এই মতটি সাধারণভাবে খুবই প্রচলিত। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ বলেন বাংলার উদ্ভব হয়েছে গৌড়ী

অপভ্রংশ থেকে। আর এক দল বলেন, বাংলা সংস্কৃতের দুহিতা, অন্যভাবে সংস্কৃতই বাংলা ভাষার জননী। আমরা এই মতগুলি যাথার্থ্য বিচার করে দেখব।

ক. সংস্কৃতই কি বাংলার জননী?

উনিশ শতকে একদল সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত বিশ্বাস করতেন যে, বাংলা ভাষা সরাসরি সংস্কৃত থেকেই উদ্ভূত হয়েছে। তাঁদের এই মতের কারণ, বাংলা ভাষার শব্দভাণ্ডারে আছে প্রচুর অবিকৃত সংস্কৃত শব্দ বা তৎসম শব্দ। সেই পণ্ডিতেরা এর বেশি কোনো যুক্তি অবশ্য দেখাতে পারেননি। সংস্কৃতপ্রেমী শিক্ষিত বাঙালিদের কাছে এই মতটি গ্রহণীয় হয়। কিন্তু এই মত আদৌ গ্রহণযোগ্য নয়। প্রথমত, শুধু তৎসম শব্দের সংখ্যা দিয়ে ভাষার গঠন বা কাঠামোর হদিশ পাওয়া যায় না। বাংলা ভাষার শব্দভাণ্ডারে আছে বহু আরবি-ফারসি শব্দ। তাই বলে একথা কি বলা যাবে যে, বাংলা ভাষা আরবি-ফারসি থেকে উদ্ভূত? দ্বিতীয়ত, প্রাচীন ভারতীয়-আর্য থেকে নব্যভারতীয়-আর্য ভাষার বিবর্তনের ধাপগুলি দেখলেও স্পষ্ট বোঝা যায় যে, বাংলা সরাসরি সংস্কৃত থেকে উদ্ভূত হয়নি। কেননা সংস্কৃত থেকে প্রাকৃত, প্রাকৃত থেকে অপভ্রংশ, অপভ্রংশ থেকে অপভ্রষ্ট বা অবহট্‌ঠ এবং অবহট্‌ঠ থেকে বাংলা—এই ধাপগুলিতে দেখা যাচ্ছে যে, সংস্কৃত বাংলার অতিদূরবর্তী এক আত্মীয়া, কখনো মাতৃস্থানীয়া হতে পারে না। তৃতীয়ত, সংস্কৃত বাক্যের গঠন এবং বাংলা বাক্যের গঠন এতটাই পৃথক, যে দুইয়ের মধ্যে নিকট সম্পর্ক সম্পর্কে সন্দেহ হওয়াই স্বাভাবিক। মুহম্মদ শহীদুল্লাহের অনুসরণে সংস্কৃত, প্রাকৃত, অপভ্রংশ ও বাংলা বাক্য নিয়ে বিষয়টি দেখানো যেতে পারে।

> [বাঙ্গালা—'তুমি আছ' ; সংস্কৃতে যূয়ং স্থ ; কিন্তু প্রাচীন প্রাকৃতে (পালি) তুম্‌হে অচ্ছথ ; মধ্য প্রাকৃতে ও অপভ্রংশে তুম্‌হে অচ্ছহ ; প্রাচীন বাংলায় তুম্‌হে আছহ; মধ্য বাংলায় তোহ্মে বা তুহ্মি আছহ ; আধুনিক বাংলায় 'তুমি আছ'।]

চতুর্থত, ভাষাচার্য সুকুমার সেন দেখিয়েছেন যে, অবহট্‌ঠে তৎসম শব্দের ব্যবহার ছিলই না প্রায়। কিছু সংস্কৃত পরিভাষার অবশ্য সন্ধান পাওয়া যায়, তার বেশি কিছু নয়। কারণ সংস্কৃতে 'শব্দের ধ্বনিপ্রবাহ ছিল অবহট্‌ঠের রীতিবিরুদ্ধ'।

খ. গৌড়ী প্রাকৃত থেকেই কি বাংলার উদ্ভব?

মুহম্মদ শহীদুল্লাহের মতে গৌড়ী অপভ্রংশ থেকেই বাংলা ভাষার উদ্ভব হয়েছে। প্রাকৃতে এবং অপভ্রংশে গৌড়ী রীতির কথা জানা যায়। গৌড়ী একটি আঞ্চলিক রূপ। ক. গৌড়ী অপভ্রংশে কর্তা ও কর্মে বিভক্তি লোপ হত ; খ. সম্বন্ধ পদ বিশেষণের মতো ব্যবহৃত হত ; গ. তৃতীয়ায় 'এ'-বিভক্তি ব্যবহৃত হত। এছাড়া বাক্যবিন্যাসও বাংলাকে স্মরণ করায়।

গৌড়ী রীতি	—	এহু গচ্ছে বড্ডে
বাংলা	—	এই গাছ বড়ো
গৌড়ী	—	মইঁ তেন্তিলী খাইল্লী
বাংলা	—	আমি তেঁতুল খেলাম

এইসব যুক্তিতে মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ বলেছেন বাংলার উদ্ভব হয়েছে গৌড়ী অপভ্রংশ থেকে। এই যুক্তির সারবত্তা অস্বীকার করা যায় না।

গ. বাংলা এবং মাগধী অপভ্রংশ

মুহম্মদ শহীদুল্লাহের মতটি পুরোপুরি উপেক্ষা করা না গেলেও এখন অধিকাংশ ভাষাতাত্ত্বিক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতটিই অধিকতর গ্রহণযোগ্য বলে মনে করেন। এখানে একটা কথা মনে রাখতে হবে। কেউ-কেউ **মাগধী প্রাকৃত** এবং **মাগধী অপভ্রংশকে** সমার্থক হিসাবে দেখেছেন। মাগধী প্রাকৃত থেকে বাংলা ভাষার উদ্ভবের কথা সুনীতিকুমার বলেননি। বলেছেন মাগধী অপভ্রংশের কথা। প্রাকৃত মধ্যভারতীয়-আর্য ভাষার দ্বিতীয় স্তরের ভাষা। অপভ্রংশ তার পরবর্তী অর্থাৎ তৃতীয় স্তরের ভাষা। দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু বলেছেন যে, মাগধী প্রাকৃতের যা বৈশিষ্ট্য তা বাংলায় তেমন দেখা যায় না। র > ল এবং -অঃ > -এ এগুলি মাগধী প্রাকৃতের বৈশিষ্ট্য।

মাগধী প্রাকৃতের পরের ভাষারূপ হল **মাগধী অপভ্রংশ** বা **অবহট্‌ঠ**। এবং এ **থেকেই বাংলা ভাষার উৎপত্তি**। একথা গ্রিয়ারসন বলেছেন, সুনীতিকুমার বলেছেন, বলেছেন সুকুমার সেনও। মাগধী অপভ্রংশের কোনো নিদর্শন যাওয়া যায়নি, তা ভাষাতাত্ত্বিকগণ অনুমান করেছেন মাগধী প্রাকৃতের নিদর্শন থেকে। অনুমান করাই যায় এইরকম একটি বিবর্তন-সূত্র : মাগধী প্রাকৃত > মাগধী অপভ্রংশ ও অপভ্রষ্ট > মৈথিলি, ওড়িয়া, অসমিয়া, বাংলা। এই সিদ্ধান্ত নিঃসন্দেহে প্রমাণিত নয়, তবে যুক্তিগ্রাহ্য। সেক্ষেত্রে বলাই যায়, সুনীতিকুমার, সুকুমার সেন ও দ্বিজেন্দ্রনাথ বসুর অনুসরণে যে, **মাগধী অপভ্রংশই বাংলাভাষার জননী।**

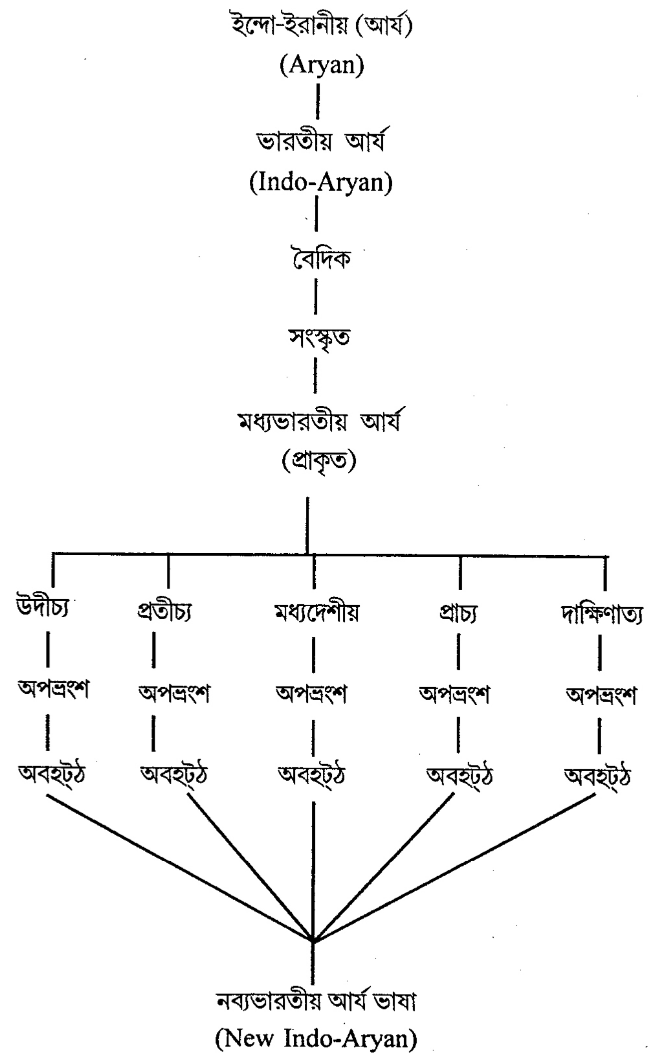
[এই অধ্যায়ের শেষের দুটি ছকে বাংলা ভাষার কুলজি দেখানো হয়েছে।]

গ্রন্থপঞ্জি

গোস্বামী, কৃষ্ণপদ—বাংলা ভাষাতত্ত্বের ইতিহাস (২০০১)
চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার—বাঙ্গালা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা (১৩৯৮)
চট্টোপাধ্যায়, হীরেন্দ্রনাথ—ভাষাতত্ত্ব ও বাংলা ভাষার ইতিহাস (১৯৯৩)
বসু, দ্বিজেন্দ্রনাথ—বাংলা ভাষার আধুনিক তত্ত্ব ও ইতিকথা (১৯৮০)
ভট্টাচার্য, পরেশচন্দ্র—ভাষাবিদ্যা পরিচয় (১৯৯৩)
ভট্টাচার্য, সুভাষ—বাঙালির ভাষা (২০০০)
মজুমদার, পরেশচন্দ্র—বাঙলা ভাষা পরিক্রমা, প্রথম খণ্ড (১৩৮৩)
মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্—বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত (১৯৯৮)
শ', রামেশ্বর—সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা (১৯৮৮)
সেন, সুকুমার—ভাষার ইতিবৃত্ত (১৯৯৪)
Chatterji, Suniti Kumar—The Origin and Development of the Bengali Language, Vol.II (1985)

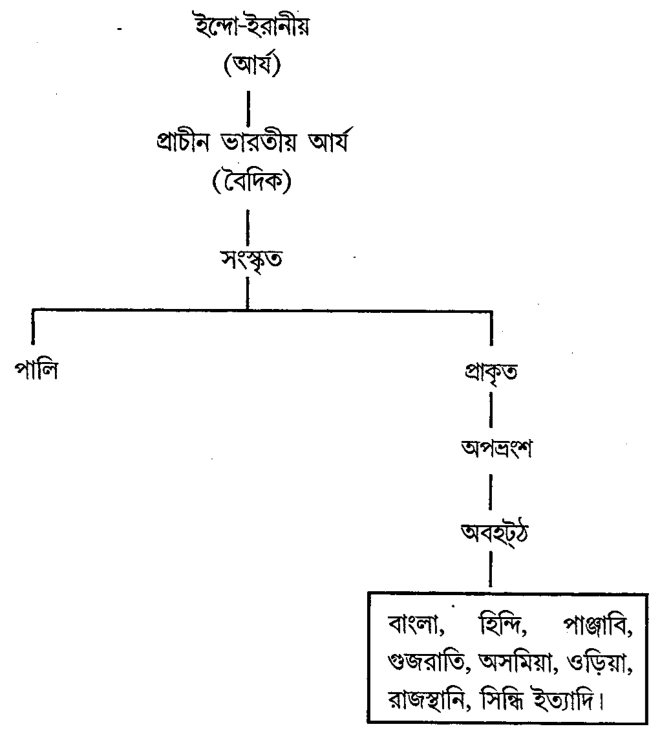
বাংলা ভাষার কুলুজি

ছক : ১



বাংলা ভাষার কুলুজি

ছক : ২



১৭. বাংলা লিপির উদ্ভব ও বিকাশের ধারা

১৭.১ বাংলা লিপির উদ্ভব ও বিকাশ

ভারতে প্রাচীনতম যে লিপি পাওয়া গেছে তা হরপ্পা-মহেনজোদড়োর লিপি। কিন্তু আজ পর্যন্ত সে-লিপির পাঠোদ্ধার সম্ভব হয়নি। তার ফলে ওই লিপি আদৌ ভারতীয় কি না, কিংবা তার সঙ্গে পরবর্তী কালের ভারতীয় লিপির কোনো সম্পর্ক আছে কি না তা এখনও পর্যন্ত বোঝা যায়নি। আমাদের জ্ঞানমতে প্রাচীনতম ভারতীয় লিপি দুই রকমের, **ব্রাহ্মী ও খরোষ্ঠী**। বাংলা লিপি যে ব্রাহ্মী লিপি থেকেই বিবর্তিত হয়ে এসেছে সে বিষয়ে আজ কোনো সন্দেহ নেই। কিছুকাল আগে পর্যন্ত ধারণা ছিল যে, অশোকের লেখমালাতেই ব্রাহ্মী লিপির প্রাচীনতম নিদর্শন আছে। অর্থাৎ ব্রাহ্মী লিপির প্রাচীনতম নিদর্শন খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতকের। কিন্তু গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে মৌর্যযুগেরও আগে ভারতের নানা স্থানে ব্রাহ্মী লিপির প্রচলন ছিল (দীনেশচন্দ্র সেন, বাঙলাভাষা ও সাহিত্য, প্রথম খণ্ড, ১৯৯১, পৃ.১০)। খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতকের মধ্যেই ব্রাহ্মী লিপি কাশ্মীর বাদে উত্তর ভারতের প্রায় সর্বত্র প্রচলিত হয়েছিল। এমনকী, দক্ষিণ ভারতেও ব্রাহ্মী লিপির একটি **'দক্ষিণী রীতি'** চালু হয়েছিল। প্রাচীন কালে ব্রাহ্মীর অবশ্য নানান নাম ছিল—**অশোক অক্ষর, ইন্দো-পালি** প্রভৃতি। বিখ্যাত লিপিবিদ **গৌরীশংকর ওঝা** ব্রাহ্মী লিপির ক্রমবিবর্তনের ধাপগুলি দেখিয়েছেন। অশোকের সময়ের লিপি থেকে ৩০০-৪০০ বছর পর পর ধাপগুলি তিনি দেখিয়েছেন। অর্থাৎ কুষাণ আমলের লিপি, গুপ্ত লিপি, হর্ষবর্ধনের সময়ের লিপি ইত্যাদি বিশ্লেষণ করে গৌরীশংকর ওঝা দেখিয়েছেন কীভাবে ব্রাহ্মী লিপি একটু একটু করে পরিবর্তিত হচ্ছিল। এইভাবে ১০০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ব্রাহ্মীর বিবর্তন বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, ব্রাহ্মী লিপির পূর্বাঞ্চলীয় একটি রূপ ছিল। সেই পূর্বাঞ্চলীয় রূপটি খ্রিস্টীয় সপ্তম শতক নাগাদ যে-চেহারা নিয়েছিল তা প্রকৃতপক্ষে চতুর্থ-পঞ্চম শতকের গুপ্ত লিপিরই বিবর্তিত রূপ। এই রূপটিকে **কুটিল লিপি** বলা হয়। বাংলা ভাষার লিপি ব্রাহ্মীর এই পূর্বাঞ্চলীয় কুটিল লিপিরই পরিবর্তিত রূপ। অক্ষর বা বর্ণের মাত্রার আকৃতি কুটিল ছিল বলেই ওই লিপিকে **কুটিল লিপি** বলা হয়।

পণ্ডিতদের মতে খরোষ্ঠী লিপির উৎস ভারতের বাইরে। ওই লিপি আরামীয় (Aramaic) লিপি থেকে উদ্ভূত হয়েছে। খরোষ্ঠী লেখা হত ডান দিক থেকে বাঁদিকে। ব্রাহ্মী লেখা হত বাঁ দিক থেকে ডান দিকে। খরোষ্ঠীর প্রচলন মূলত ছিল ভারতের উত্তর-

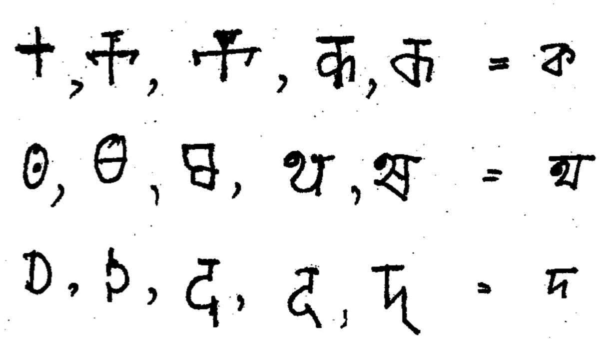
পশ্চিম অঞ্চলে। সম্ভবত খরোষ্ঠীর ডান থেকে বাঁদিকে লেখার অসুবিধার জন্য ওই লিপি ধীরে ধীরে লোপ পেয়ে যায়। কিন্তু ব্রাহ্মী লিপির ব্যাপক প্রচলন হয়। ব্রাহ্মীর পূর্বাঞ্চলীয় রূপ থেকে যেমন বঙ্গলিপির উদ্ভব হয়, তেমনি ব্রাহ্মীর উত্তরাঞ্চলীয় **শারদা লিপি** থেকে বিবর্তিত হয় **নাগরী** বা **দেবনাগরী** লিপি।

বাংলাদেশের প্রাচীনতম লিপির নিদর্শন হল খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতকের **মহাস্থানগড় লিপি**। এই লিপিতে নবম-দশম শতকের নারায়ণ পালের তাম্রশাসনের লিপির সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে ব্রাহ্মী থেকে বাংলা লিপির বিবর্তনের একটি রূপরেখা তৈরি করা যায়। প্রাচীন বাংলা লিপির বিশ্লেষণে বিশেষ সহায়ক হয় পাল ও সেন আমলে পাওয়া লিপি। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তাঁর 'বাঙ্গালার পুরাণ অক্ষর' প্রবন্ধে ৫০টি বাংলা হরফের রূপান্তর চিত্রসহযোগে দেখিয়েছেন (দ্র. হরপ্রসাদ রচনাবলী, প্রথম সম্ভার, ১৩৬৩, পৃ.২৯৬)।

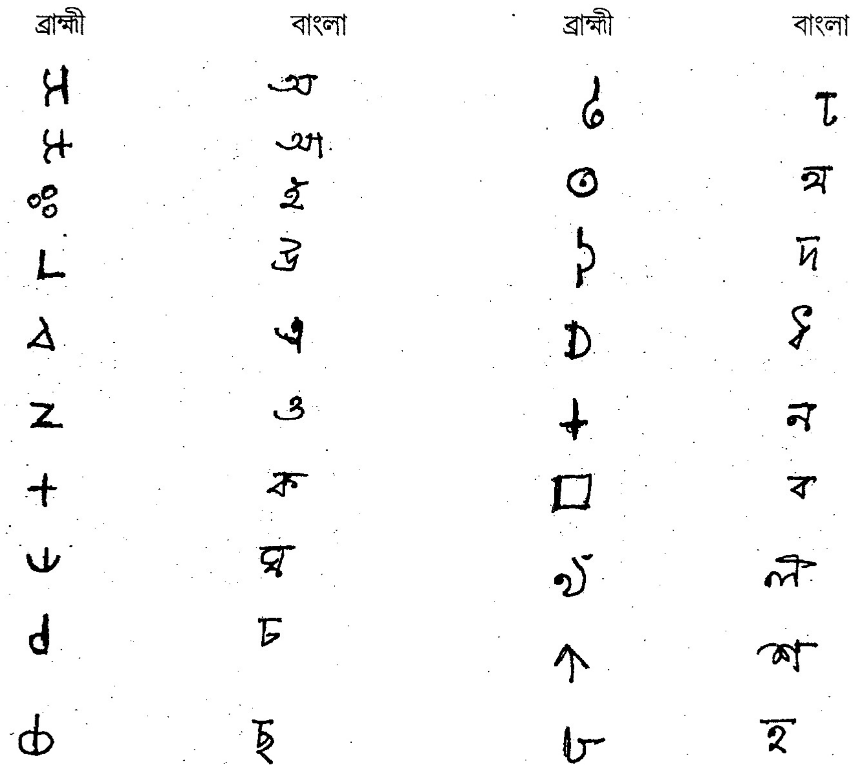
বাংলা লিপির উৎস ও বিবর্তন বিষয়ে অত্যন্ত মূল্যবান গবেষণা করেছেন ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (দ্র. The Origin of the Bengali Script, 1919)। রাখালদাসকে অনুসরণ করে উদয়নারায়ণ সিংহ বলেছেন যে, **কুটিল লিপি**, আসলে ব্রাহ্মীরই পরিবর্তিত রূপ ('reformed version of Brahmi')। তিনি আরও বলেছেন যে, যেখানে নাগরী বা দেবনাগরী মোটামুটি সুনিরূপিত রূপ লাভ করেছে ১০০০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ, সেখানে গৌড়ী বা প্রত্ন বঙ্গলিপি (the Gaudi or the Proto-Bengali writing system) রূপলাভ করেছে দশম থেকে চতুর্দশ শতকে।

ব্রাহ্মী ও বাংলা লিপিতে কতকগুলি অক্ষরে একটা সহজ সাদৃশ্য আছে, যেমন অ, আ, এ, ঐ, ও, ঔ, প, ড। অন্য দিকে ধ, ভ, হ ইত্যাদি অক্ষরে তেমন সাদৃশ্য নেই। এখানে কয়েকটি অক্ষর কীভাবে বিবর্তিত হয়ে ব্রাহ্মী থেকে বাংলায় এসেছে তা দেখানো যাক।

ব্রাহ্মী বাংলা



এবারে দেখা যাক বাংলার কয়েকটি হরফ ব্রাহ্মী থেকে কীভাবে এসেছে।



১৭.২ বাংলা ভাষার লিখনরীতিতে ব্রাহ্মীর প্রভাব

আগেই বলা হয়েছে যে, বাংলা লিপি প্রাচীন ভারতীয় ব্রাহ্মী লিপি থেকে উদ্ভূত হয়েছে। বাংলা এবং নাগরী বা দেবনাগরী দুটি লিপিই ব্রাহ্মী থেকে উদ্ভূত। **সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়** সেইজন্য বলেছেন যে, **নাগরী ও বাংলা লিপি ভগিনী-স্থানীয়** (দ্র. বাঙ্গলা ভাষা প্রসঙ্গে, ১৯৭৫, পৃ.৩৪৮)। একই উৎস থেকে বিবর্তিত হওয়ার জন্য এই দুটি লিপির 'অন্তর্নিহিত-নীতি' অভিন্ন। সেই অন্তর্নিহিত নীতির জন্যই বাংলা লিপি রোমান লিপি থেকে চরিত্রে সম্পূর্ণ আলাদা। ব্রাহ্মীর মতো বাংলা লিপি অক্ষরমাত্রিক বা syllabic ; অন্য দিকে রোমান লিপি বর্ণাত্মক বা alphabetical. রোমান লিপিকে ধ্বন্যাত্মকও বলা যায়। রোমান লিপিতে লেখা প্রতিটি শব্দে প্রতিটি ধ্বনিকে দেখানো হয়, তা স্বরধ্বনি বা ব্যঞ্জনধ্বনি যা-ই হোক। 'কমল' শব্দটি রোমান লিপিতে Kamal. বাংলায় কমল-ই লিখব। বাংলায় ম-তে একটি নিহিত স্বরধ্বনি (inherent vowel) আছে, লেখায় কিন্তু তা দেখানো

হচ্ছে না। ব্রাহ্মীর মতো বাংলা লিপিতে স্বরবর্ণ শব্দের গোড়ায় থাকলে তার পূর্ণরূপ দেখানো হয়, কিন্তু শব্দের মধ্যে থাকলে তাকে পূর্ণ রূপে প্রকাশ করা হয় না। অমল-এ অ পূর্ণ রূপে প্রকাশিত। ইলিশ-এ ই পূর্ণ রূপে প্রকাশিত। কিন্তু শব্দের মধ্যে থাকলে কেবল স্বরচিহ্ন দেখানো হয়—কু, শি, লি, না। রোমানে প্রতিটি ধ্বনি পূর্ণপ্রকাশিত।

গ্রন্থপঞ্জি

ভট্টাচার্য, পরেশচন্দ্র—ভাষাবিদ্যা পরিচয় (১৯৯৩)
ভট্টাচার্য, পার্বতীচরণ—বাংলা ভাষা (১৯৮২)
ভট্টাচার্য, সুভাষ—বাঙালির ভাষা (২০০০)
সেন, সুকুমার—ভাষার ইতিবৃত্ত (১৯৯৪)
Bandyopadhyay, Rakhaldas—The Origin of the Bengali Script (2009)

১৮. প্রাচীন বাংলা ভাষা

১৮.১ প্রাচীন বাংলা ভাষার পূর্বাভাস

আগেই বলা হয়েছে যে, প্রাকৃত ভাষা পরিবর্তিত হতে হতে প্রথমে অপভ্রংশে রূপ লাভ করে, এবং আরও পরে তা পরিণত হয় অপভ্রষ্ট ভাষায়, বা অবহট্‌ঠে। ভাষাতাত্ত্বিকদের অনুমান, এই অবহট্‌ঠ থেকেই ধীরে ধীরে অন্যান্য নব্য ভারতীয়-আর্য ভাষার মতো বাংলা ভাষারও উদ্ভব হয়েছে। তাই, প্রত্যাশিতভাবেই, অবহট্‌ঠ থেকে উদ্ভূত হয়েছে বলে, আদি বাংলা ভাষার সঙ্গে অর্থাৎ বাংলা ভাষার আদিরূপের সঙ্গে অবহট্‌ঠের অনেক সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়। একই কারণে অপভ্রংশে ও অবহট্‌ঠে রচিত কিছু কিছু কবিতায় বাংলা ভাষার পদধ্বনি যেন শোনা যায়, পাওয়া যায় আদি বাংলা ভাষার পূর্বাভাস। সুকুমার সেন দেখিয়েছেন যে, অষ্টম শতকেরও আগে অপভ্রংশ ও অবহট্‌ঠে কড়চা ও ছড়া ভারতীয় কিছু রচনা লিখেছিলেন বৌদ্ধ বজ্রযানিক ও শৈব নাথপন্থী যোগী সিদ্ধাচার্যেরা। এইসব পদ্যের ভাষা অবহট্‌ঠ বটে, তবে লৌকিক ও আঞ্চলিক কথ্য ভাষার লক্ষণ তাতে দুর্লক্ষ্য নয়। কাজে কাজেই বাংলা ভাষার চিহ্ন তাতে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে।

তো বিণু তরুণি নিরন্তর ণেহেঁ
বোধি কি লব্‌ভই এণ বি দেহেঁ॥

(হে তরুণী, তোর নিরন্তর স্নেহ ব্যতীত এই দেহে কি বোধি লাভ করা যায়?)

তো বিণু, তরুণি, বোধি, নিরন্তর, দেহেঁ—এইসব শব্দকে চিনে নেওয়া শক্ত নয়। আরও পরবর্তী কালের বৈষ্ণব পদাবলিতেও এমন শব্দ বারবার ব্যবহৃত হয়েছে। এমনকী, ণেহা (নেহা) শব্দটিকেও শনাক্ত করা যায় সহজেই। শৈব ও বৌদ্ধ তান্ত্রিক যোগী বা সাধক-কবিরা এ ধরনের সন্ধ্যাভাষা বা সন্ধাভাষায় কবিতা বা গান রচনা করেছেন। গূঢ় তত্ত্বের কথা বলেছেন, অথচ তার মধ্যে একটা আবরণ রেখেছেন, এ এক আলো-আঁধারি ভাষা। এইসব গানের দুটি করে অর্থ। একটি অর্থ তত্ত্বের কথা বলে, এটাই কবির অভিপ্রেত অর্থ। অন্য অর্থটি সহজ জীবনযাপনের কথা বলে। এইসব পদের কোনো-কোনোটির মধ্যে বাংলা ভাষার পূর্বাভাস দেখতে পাওয়া যায়। সরহপাদ অনেকগুলি দোহা রচনা করেছিলেন অবহট্‌ঠ ভাষাতেই।

কমল-কুলিস বেবি মজ্জ ঠিউ
জো সো সুরঅ বিলাস।
কো তহি রমই ণ তিহুঅণে
কস্‌স ণ পূরই আস॥

কয়েকটি শব্দ প্রায় একটু বদলে চলে এসেছে বাংলায়—কমল-কুলিশ, সুরতবিলাস, পূরই, আশ। কয়েকটি শব্দ অপভ্রংশ-অবহট্‌ঠের স্বাক্ষর বদল করছে। জো সো, সুরঅ, তিহুঅণ প্রভৃতি থেকে একটু এগিয়ে গেলেই আমরা পেয়ে যাব যথাক্রমে 'যে সে', 'সুরত', 'ত্রিভুবন'।

প্রবোধচন্দ্র বাগচী 'পাহুড়দোহা' নামে দিগম্বর জৈন সম্প্রদায়ের একটি গ্রন্থের কথা বলেছেন যাতে প্রচুর অপভ্রংশ দোহা সংকলিত আছে। তারই একটি এইরকম—

কিত্তহ তিত্থ তপোবণ জাই।
মোক্‌খ কি লব্‌ভই পাণি হ্লাই।।

(তীর্থে আর তপোবনে গিয়ে লাভ নেই। জলে স্নান করলেই মোক্ষ লাভ হয় না।)
আমরা বলতে পারি এ সবের মধ্যেই আছে বাংলা ভাষার পূর্বাভাস।

'প্রাকৃতপৈঙ্গলে'র কোনো-কোনো পদ যেমন ব্রজবুলিকে স্মরণ করায়, তেমনি মনে আনে বিদ্যাপতিকে, এবং অনিবার্যভাবে আদিমধ্য বাংলা কবিতার ভাষাকেও—

সোহ মহ কন্তা
দূর দিগন্তা।
পাউস আএ
চেলু দুলাএ।।

(আমার সেই কান্ত এখন দূর দিগন্তে। বর্ষা আসছে, আঁচল দোলাব।)
এই চূর্ণপদের একটি ভিন্ন পাঠও আছে—'ঢেউ দুলাএ'। পাউস বা পাউখ সম্ভব সংস্কৃত 'প্রাবৃট্' থেকে এসেছে। এই শব্দটি পরবর্তী কালের বৈষ্ণব পদাবলিতেও পাওয়া যায়।

১৮.২ প্রাচীনতম বাংলা ভাষার নমুনা

১৯১৬ সালের আগে জানাই ছিল না যে, কৃত্তিবাস ও মালাধর বসুর রামায়ণ ও শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের আগেও রচিত হয়েছিল কোনো বাংলা কবিতা। ১৮৭৭ সালে যখন রমেশচন্দ্র দত্ত তাঁর History of Bengal Literature লিখেছিলেন, তখনও আবিষ্কৃত হয়নি চর্যাগীতি। তাই তাঁর বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস শুরু হয়েছে বৈষ্ণব পদাবলি দিয়ে। তা জানা গেল ১৯১৬ সালে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর কল্যাণে, তাঁরই এক গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কারের সুবাদে।

এশিয়াটিক সোসাইটির জন্য বৌদ্ধ ধর্ম ও দর্শন সংক্রান্ত পুথি সংগ্রহের কাজ অনেক দিন ধরেই করছিলেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। এই উদ্দেশ্যে বারবার গিয়েছিলেন নেপালে। ১৯০৭ সালে তিনি তৃতীয়বার যান নেপালে এবং এবারে তাঁর সাফল্য হল আশাতীত। এবার তাঁর সংগ্রহের মধ্যে ছিল নেপাল রাজদরবারের গ্রন্থাগার থেকে পাওয়া বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের রচিত গানের একখানা পুথি। তিনি এই পুথির নামকরণ করেন '**চর্যাচর্যবিনিশ্চয়**'। এই নামকরণে তিনি নেপালি লিপিকারকেই অনুসরণ করেছেন। নেপাল থেকে তিনি উদ্ধার

করেছিলেন আরও তিনটি পুথি। ১৯১৬ সালে এই চারটি পুথি একত্র করে সম্পাদনা ক'রে তিনি প্রকাশ করেন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় '**হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা**' নামে। পরে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় দেখিয়েছেন যে, ওই চারটি পুথির মধ্যে কেবল প্রথমটির ভাষাই বাংলা। এবং সেটি আমাদের সকলের কাছে 'চর্যাগীতি' নামে পরিচিত। অন্যগুলি হল সরোজবজ্রের 'দোহাকোষ', কাহ্নপাদের 'দোহাকোষ' এবং 'ডাকার্ণব'।

হরপ্রসাদের এই সংকলনের মধ্যে কেবল চর্যাগীতি অংশই কালক্রমে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠল, বিশেষত বাংলা ভাষার আলোচনায়। সংকলনের দীর্ঘ ভূমিকায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলেন যে, প্রথমত, এই গানগুলির ভাষা বাংলা ভাষার প্রাচীনতম নজির হিসাবে গণ্য, কেননা আরও পূর্ববর্তী কোনো নজিরের কথা আমাদের জানা নেই। দ্বিতীয়ত, এই বৌদ্ধ গানগুলি পুরোপুরি বাংলা ভাষারই নমুনা। ১৯২৬ সালে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় চর্যাগীতিগুলির ভাষার ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ক'রে সিদ্ধান্ত করেন যে, কেবল চর্যাগীতির ভাষাকেই প্রাচীন বাংলা বলা যেতে পারে, অন্যগুলি অর্থাৎ দোহাকোষ ও ডাকার্ণব অবহট্‌ঠে রচিত। সুনীতিকুমারের আরও সিদ্ধান্ত, চর্যার গানগুলির রচনাকাল দশম-একাদশ শতক। পরে প্রবোধচন্দ্র বাগচী ও সুকুমার সেন সুনীতিকুমারের সিদ্ধান্তকেই মেনে নিয়েছেন।

চর্যাগীতির পুথির কথা

চর্যাগীতির যে-পুথিটি পাওয়া গেছে, সেটি চর্যার টীকার পুথি, টীকাকার মুনিদত্ত। তবে পুথিটির লিপিকর শুধু টীকাই লেখেননি, টীকার সঙ্গে মূলগানগুলিও লিখেছেন। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর আবিষ্কৃত পুথিটি খণ্ডিত, কেননা তার চারটি পৃষ্ঠা পাওয়া যায়নি। ফলে একটি পদের (২৩) অংশ এবং অন্য তিনটি (২৪, ২৫, ৪৮) সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। মোট পদ বা গান থাকার কথা পঞ্চাশটি। পাওয়া গেছে সাড়ে ছেচল্লিশটি। মোট কবির সংখ্যা ২৪। পুথিতে টীকাকারের নাম নেই। তাহলে কীভাবে জানা গেল টীকাকার মুনিদত্তের নাম? নেপালে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর এই আবিষ্কারের কয়েকবছর পরে প্রবোধচন্দ্র বাগচী নেপাল থেকে আরও একটি পুথি উদ্ধার করেন। সেটি চর্যাগীতিকোষের তিব্বতি অনুবাদ। সেই তিব্বতি অনুবাদ থেকেই জানা গেছে যে, মূল চর্যার টীকাকারের নাম মুনিদত্ত। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর পুথিতে যেটুকু ফাঁকফোকর ছিল তা প্রবোধচন্দ্রের পুথি ভরাট করে দিয়েছে এবং এই দুটিকে মিলিয়ে দেখে চর্যাগীতি সম্বন্ধে একটা স্বচ্ছ ধারণা গড়ে তোলা সম্ভব হয়েছে। সুকুমার সেন মূল চর্যার ভাষা ও টীকার ব্যাখ্যা ও অনুবাদ বিশ্লেষণ করে অনুমান করেছেন যে, মূল চর্যার রচনাকাল ও টীকার রচনাকালের মধ্যে অন্তত দুশো বছরের ব্যবধান থাকার কথা। অর্থাৎ মূল পদ রচনার দুশো বছর পরে রচিত হয়েছে টীকা। মুনিদত্তের টীকা চর্যাগানের

চরিত্র বুঝতে খুবই সহায়ক। কেননা চর্যাগানের দ্ব্যর্থকতার কথা মুনিদত্ত স্পষ্ট করে বলেছেন। তাঁর টীকাই বুঝিয়ে দেয় যে, চর্যার প্রতীয়মান অর্থের ভিতর থেকে উঁকি দেয় আরও এক অর্থ। এই আড়ালের অর্থই গূঢ় অর্থ যা পদকারের অভিপ্রেত।

চর্যার কবি বা গীতিকার

সাড়ে ছেচল্লিশটি চর্যাগানের রচয়িতারা সংখ্যায় ২৪ জন। তাঁরা হলেন লুইপাদ, শবরীপাদ, ভুসুকুপাদ, শান্তিপাদ, কাহ্নপাদ বা কাহ্নুপাদ, চাটিল, সরহপাদ, শবরপাদ, বিরুআ, ডোম্বী, গুন্ডরী, কুক্কুরীপাদ, মহীধর, দারিক, ঢেণ্ঢণ প্রভৃতি। এঁদের মধ্যে **কাহ্নপাদই** সর্বাধিক পদের রচয়িতা। একা তিনিই রচনা করেছিলেন তেরোটি গান। তাঁর পরেই আছেন **ভুসুকুপাদ** যাঁর রচিত গানের সংখ্যা আট। **সরহপাদের** চারটি গান পাওয়া গেছে। **কুক্কুরীপাদের** গান আছে তিনটি। **লুইপাদ, শবরপাদ** ও **শান্তিপাদের** দুটি করে গান আছে। চাটিল, মহীধর, বিরুআ, ডোম্বী, ঢেণ্ঢণ, গুন্ডরী, দারিক প্রভৃতির একটি করে গান পাওয়া গেছে। কেউ-কেউ লুইপাদকেই চর্যার আদিকবি বলে মনে করেন। আবার কারও কারও মতে লুই ছিলেন শবরপাদের শিষ্য। গানের সংখ্যা দেখে রচয়িতার গুরুত্ব বা শ্রেষ্ঠতার বিচার সম্ভব নয়। তবু যেহেতু সমগ্র চর্যাগীতিকোষের অধিকাংশ গানই কাহ্নপাদের রচিত, তাই অনিবার্যভাবে তিনিই সবচাইতে বেশি মনোযোগ পেয়ে এসেছেন। নাথ সাধনার কাহিনিতে তাঁকে কানুপা বলা হয়েছে। তিনি সম্ভবত হাড়িপার শিষ্য ছিলেন। কাহ্নপাদ অবশ্য শ্রেষ্ঠ চর্যাকার নন। কিন্তু তাঁর রচনায় বৈচিত্র্য আছে। তাঁর কোনো-কোনো গান নিছক তত্ত্বের বর্ণনা। যে-রূপক ব্যবহার করা হয়েছে তাতে সৌন্দর্য প্রকাশিত হয়নি, তত্ত্বের প্রকাশ ঘটেছে মাত্র। আবার কোনো-কোনো গানে আবেগের প্রকাশ সুস্পষ্ট। যে কারণেই হোক চর্যাগীতিকারদের মধ্যে **ভুসুকুর** নাম বাংলা সাহিত্যের পাঠকদের কাছে বেশি পরিচিত। সহজিয়া তত্ত্বকে গানে প্রকাশ করার বিশেষ পটুতা যে ছিল ভুসুকুর, তা অনস্বীকার্য। তত্ত্বকথা বলতে গিয়ে তিনি বারবার নানা উপমা বা রূপকের আশ্রয় নিয়েছেন। তবে সন্দেহ নেই যে, চর্যাকারদের মধ্যে কবিত্বশক্তিতে **শবরপাদই** শ্রেষ্ঠ। মাত্র দুটি পদের রচয়িতা তিনি। তবু এই দুটি রচনাতেই তাঁর শ্রেষ্ঠতার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর 'উঞ্চা উঞ্চা পাবত' গানটি সর্বজনপরিচিত। এই চর্যার দুটি পঙ্ক্তি এইরকম—

> হিঅ তাঁবোলা মহাসুহে কাপুর খাই।
> সুন নিরামণি কণ্ঠে লইআ মহাসুহে রাতি পোহাই॥

শঙ্খ ঘোষের ভাবানুবাদে যা এইরকম—

> হৃদয় যেন বা তাম্বূল, যেন কর্পূরে মহাসুখাতিপাত ;
> কণ্ঠাশ্লেষে লয়ে নিরাত্মা মহাসুখাবশে পোহায় রাত।

১৮.৩ চর্যাগীতির ভাষা : প্রাচীন বাংলার ভাষা

চর্যাগীতিগুলিকে প্রাচীনতম বাংলা ভাষার নিদর্শন বলা হয়। চর্যাগীতির ভাষার আলোচনা করার আগে একটা কথা বুঝে নিতে হবে। দেখা যাবে যে, সব গানের ভাষাই একরকম নয়। কোনো-কোনো গানকে আমাদের আজকের ভাষার নিরিখে খুবই অপরিচিত ঠেকে। আবার কোনো-কোনো গানের ভাষা যেন ততটা অচেনা নয়। নীচে দুটি গান থেকে দুটি উদাহরণ নেওয়া হয়েছে। তা থেকেই বিষয়টি স্পষ্ট হবে। প্রথমটি কাহ্নপাদের গান থেকে—

জো মণগোএর আলাজালা।
আগম পোথী টন্টা মালা॥

দ্বিতীয়টি ঢেণ্ঢনপাদের—

টালত মোর ঘর নাহি পড়বেষী।
হাড়ীত ভাত নাঁহি নিতি আবেশী॥

একথা বুঝিয়ে বলার দরকার হয় না যে দ্বিতীয় গানটির ভাষা একটু-যেন আমাদের আজকের ভাষার কাছাকাছি এসেছে। অন্তত এর ভাষা ততটা দুর্বোধ্য মনে হয় না। এ থেকে একথা মনে হতেই পারে যে, চর্যাগানগুলি এক সময়ের রচনা নয়। বিশেষজ্ঞরা বলেন যে, গানগুলির রচনাকাল দশম-দ্বাদশ বা ত্রয়োদশ শতকও হতে পারে। অর্থাৎ প্রায় তিনশত বছর ধরে রচিত হয়েছে গানগুলি। স্বভাবতই ভাষায় তারই ছাপ আছে।

চর্যাগীতির ভাষাতাত্ত্বিক পরিচয়

আগেই বলা হয়েছে যে, বাংলা ভাষা বিবর্তিত হয়েছে পূর্বাঞ্চলীয় মাগধী অপভ্রংশ থেকে অবহট্‌ঠের মাধ্যমে। স্বভাবতই উৎস ভাষার কিছু বৈশিষ্ট্য প্রাচীন বাংলায় রক্ষিত হয়েছে। নীচে আমরা চর্যাগীতির তথা প্রাচীন বাংলা ভাষার ধ্বনিতাত্ত্বিক রূপতাত্ত্বিক ও বাক্যবিন্যাসগত লক্ষণ বা বৈশিষ্ট্য সংক্ষেপে লক্ষ করব।

ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য (phonological features)

এক. চর্যার ভাষার একটি উল্লেখযোগ্য ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য হল **যুক্তব্যঞ্জনের সরলীভবন ও পরিপূরক দীর্ঘীভবন** বা compensatory lengthening. ‘পর্বত’ হল পাবত, ‘ধর্ম’ হল ধাম, ‘দর্পণ’ হল দাপন। এখানে দেখা যাচ্ছে যে, যুক্তব্যঞ্জন র্ব, র্ম সরল হল এবং পূর্ববর্তী স্বর দীর্ঘ হল। প হল পা, ধ হল ধা। অবশ্য এটা একটা সাধারণ বৈশিষ্ট্য হলেও কোথাও-কোথাও এর ব্যতিক্রমও দেখা যায় যেমন ‘বিপক্ষ’ হল বিপখ (চর্যা ১৬)।

দুই. দ্বিতীয়ত, **পদান্তে স্বরধ্বনি বজায় থাকা** চর্যার একটি বৈশিষ্ট্য। বসই (চর্যা ২৮), ভণই (চর্যা ১), দীসঅ (চর্যা ৬), বহুড়ই (চর্যা ৮)।

তিন. পদমধ্যে ও পদান্তে স্বরমধ্যবর্তী ব্যঞ্জন লোপের ফলে ‘উদ্বৃত্ত স্বর’ কোথাও কোথাও

এক স্বরে পরিণতি লাভ করেছে। যেমন 'সকল' থেকে সঅল, 'বিচার' থেকে বিআর, 'মরিলে' থেকে মইলেঁ। কোথাও কোথাও ব-শ্রুতি বা য়-শ্রুতি এসেছে। যেমন 'নিকটে' হয়েছে নিয়ড্ডী বা নিঅড্ডী (চর্যা ৬), 'ধরিত' হয়েছে ধরিঅ (চর্যা ১১), 'যোগীর' হয়েছে জোইর (চর্যা ১১)।

চার. অধ্যাপক দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু দেখিয়েছেন যে, বাংলার নিজস্ব **আদ্য শ্বাসাঘাত-রীতি অনাদ্য শ্বাসাঘাত-রীতির** পাশাপাশি দেখা দিয়েছিল। তার ফলে কোথাও কোথাও শব্দের আদ্যস্বর দীর্ঘ হয়েছে এবং মধ্যবর্তী বা অন্ত্য স্বর দুর্বল হয়েছে। সাঙ্গ, সান্ধি, অপনা, ভাণ্ডার ইত্যাদি দৃষ্টান্ত লক্ষণীয়।

পাঁচ. অধ্যাপক পরেশচন্দ্র মজুমদার বলেছেন যে, অনেক ক্ষেত্রেই **নাসিক্য ব্যঞ্জন সরল** হয়েছে। তবে পূর্ব স্বর দীর্ঘ হবার সঙ্গে সঙ্গে অনুনাসিক হয়ে গেছে। চর্যায় অনুনাসিকতা পুরোপুরি আসেনি এবং নাসিক্য ব্যঞ্জনের দুর্বলতা বা ক্ষীণতাই লক্ষ করা যায়। তাই অনেক ক্ষেত্রে পরিপূরক দীর্ঘীভবন ও নাসিক্য ব্যঞ্জন দুই-ই পাশাপাশি থেকে গেছে। যেমন—চন্দ, চান্দ ; ভন্তি, ভাংতি, ভান্তি ইত্যাদি।

রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য (morphological features)

এক. চর্যাগীতিতে বহু **তৎসম শব্দ** ব্যবহৃত হয়েছে, যদিও পুথিতে তৎসম শব্দের বানানে কোনো **সমতা বা একরূপতা** (uniformity) **বজায় থাকেনি**। চর্যা-১এ ব্যবহৃত হয়েছে **সকল, চঞ্চল, তরুবর, কাল, গুরু, পরিমাণ, পঞ্চ** এই তৎসম শব্দগুলি। চর্যা-১৯এ তৎসম শব্দের সমাবেশ আরও বেশি—**ভব, মন, পবন, বিবাহ, ধাম, সহজ, উন্মত্ত, যৌতুক**। অবশ্য এর কোনো-কোনোটির বানান কিছুটা বদলে গেছে—পবণ, জউতুক, উন্মত্তো। এর কতটা চর্যাকারের নিজস্ব বানান-অভ্যাস, আর কতটা লিপিকরের অভ্যাস তা বলা কঠিন।

দুই. প্রাচীন বাংলায় আধুনিক বাংলার মতোই **বহুবচন** বোঝাবার নানান উপায় ছিল। প্রথমত, সকল বা সঅল, লোঅ (লোকেরা) এইসব, বহুবচনবাচক শব্দ ব্যবহৃত হত। 'সঅল সমহিঅ কাহি করিঅই' (চর্যা ১), 'বিদুজণ-লোঅ তোরেঁ কণ্ঠ ন মেলঈ' (চর্যা ১৮) এই দুটি চরণে এইভাবে বহুবচনের দ্যোতনা আনা হয়েছে। এছাড়া আধুনিক বাংলার মতোই শব্দের দ্বিত্ব করেও বহুবচন বোঝানো হত—'উঞ্চা উঞ্চা পাবত' (উঁচু উঁচু পর্বত)। সর্বনামের দ্বিত্ব করেও বহুবচন হত—'জে জে আইলা তে তে গেলা' (চর্যা ৭), সংখ্যাশব্দকে সংখ্যাবাচক বিশেষণে ব্যবহার করে বহুবচন করা হত—'দশবর রঅণ হরিঅ দস দিসেঁ' (চর্যা ১)।

তিন. কারক-বিভক্তির ব্যবহারেও কিছু বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। এক কারকে অন্য কারকের বিভক্তি প্রায়ই ব্যবহৃত হত। অপাদানে করণ কারকের ও অধিকরণ কারকের বিভক্তি মাঝে মাঝেই ব্যবহৃত হয়েছে। 'ডোংবিত আগলি নাহি চ্ছিণালী' এইরকম একটি

উদাহরণ। বিভক্তিহীনতা বা শূন্য বিভক্তির উদাহরণও চর্যায় দেখা গেছে—'রূপা থোই নাহিক ঠাবী' (চর্যা ৮) ; 'বেঢ়িল হাক পড়অ চৌদীস' (চর্যা ৬), 'সুণ সইআঁ অপণা চটারিউ' (চর্যা ২৬)।

চার. স্ত্রীপ্রত্যয়ের ব্যবহারে নব্য ভারতীয় আর্য ভাষার যে বৈশিষ্ট্য দেখা গেছে, তার সূত্রপাত হয়েছিল চর্যাগীতিতেই। শুধু বিশেষণেই নয়, ক্রিয়াপদেও স্ত্রীপ্রত্যয়ের ব্যবহার দেখা গেছে চর্যায়। অনেক সময় -ই/-ঈ ব্যবহার করে স্ত্রীলিঙ্গ বুঝিয়ে দেওয়া হত, এবং পুংলিঙ্গ বোঝাতে -অ/-আ ব্যবহৃত হত। 'নিসিঅ অন্ধারী', 'হাড়েরী মালী' এইসব প্রয়োগে স্ত্রীলিঙ্গ বোঝানো হয়েছে।

পাঁচ. অনুসর্গের ব্যাপক প্রয়োগ হত প্রাচীন বাংলায়, তথা চর্যায়। তার মধ্যে **মাঝে, অন্তরে, বিনা, সম, সঙ্গে** এগুলোর ব্যবহারই বেশি। কয়েকটি দৃষ্টান্ত এইরকম—'অন্তে কুলিণজন, মাঝে কাবালী' (চর্যা ১৮), 'তোহোর অন্তরে মোএ খলিলি হাড়েরি মালী' (চর্যা ১০)।

ছয়. বিশিষ্টার্থক শব্দের আধিক্য বাংলা ভাষার একটি বৈশিষ্ট্য। চর্যাগীতিতে তারও সূত্রপাত লক্ষ করা যায়। অধ্যাপক দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু কতকগুলি বিশিষ্টার্থক শব্দগুচ্ছের উল্লেখ করেছেন—১. ভান্তি ণ বাসসি (চর্যা ১৫) অর্থাৎ ভুল করিস না ; ২. দিঢ় করিঅ (চর্যা ১) অর্থাৎ দৃঢ়ভাবে ; ৩. আঁখি বুজিঅ (চর্যা ১৫) অর্থাৎ চোখ বুজে।

সাত. ক্রিয়াপদে -ইল প্রত্যয়যুক্ত অতীতকাল তো ব্যবহৃত হতই। আবার ল-বিহীন অতীতও ব্যবহৃত হত। যেমন কিঅ (করল), গউ (গেল)।

চর্যাগীতির ভাষায় অবহট্‌ঠের লক্ষণ

ভাষাতাত্ত্বিকদের সিদ্ধান্ত এই যে, চর্যার গানগুলিই আদি বাংলা ভাষার প্রথম নিদর্শন। এই সিদ্ধান্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, সুকুমার সেন প্রভৃতি পণ্ডিতদের। তবে একথাও সত্য যে, চর্যার গানের ভাষায় অবহট্‌ঠের অভ্রান্ত চিহ্ন থেকে গেছে। সেটাই স্বাভাবিক। কেননা অবহট্‌ঠ থেকেই বাংলা ভাষার বিবর্তন হয়েছে। কাজেই উৎসের কিছু চিহ্ন থেকে যাওয়া খুবই স্বাভাবিক। এমনকী, অধ্যাপক পরেশচন্দ্র মজুমদার একথাও বলেছেন যে, চর্যার গানগুলি মূলত অবহট্‌ঠেও রচিত হয়ে থাকতে পারে। 'পরে হয়তো তা লোকমুখে ধীরে ধীরে জনগণের অজ্ঞাতসারে গানে গাথায় প্রত্ন-বাঙলায় পরিবর্তিত হয়ে চলেছিলো' (বাঙলা ভাষা পরিক্রমা, ২০০৩, প্রথম খণ্ড, পৃ.৪০)।

এবার দেখব **অবহট্‌ঠের** কোন্ কোন্ **বৈশিষ্ট্য** চর্যা গানেও পাওয়া যাচ্ছে।

এক. অবহট্‌ঠের ছন্দরীতি (পাদাকুলক) চর্যাগীতিতেও অনুসরণ করা হয়েছে।

দুই. শ ও স > হ হওয়ার প্রবণতা দেখা গেছে চর্যায়—দসদিস > দহদিহ ; দিবস > দিঅহা।

তিন. অবহট্‌ঠে যুক্তব্যঞ্জন যুক্ত থেকেছে এবং পরিপূরক দীর্ঘীভবন ঘটেনি—এমন দৃষ্টান্ত

প্রচুর। চর্যাতেও এই বৈশিষ্ট্য কোথাও কোথাও থেকে গেছে। যেমন—অচ্ছন্তে, মিচ্ছা, নিচ্চল ইত্যাদি।

চার. বর্তমান কালে উত্তম পুরুষে -মি বিভক্তির ব্যবহার সংস্কৃত > প্রাকৃত > অপভ্রংশ > অবহট্‌ঠতে থেকে গেছে। থেকে গেছে চর্যাতেও—পীবমি, পুছমি।

পাঁচ. শব্দরূপে অবহট্‌ঠের বিভক্তি বজায় থেকেছে চর্যায়। একবচনের প্রথমায় -ও বিভক্তি (যথা জো, সো) তৃতীয়ায় -ই বিভক্তি (ভন্তি)

১৮.৪ চর্যার ভাষা কি বাংলা?

চর্যার গানগুলির ভাষা যে বাংলা ভাষারই নিদর্শন, একথা সাধারণভাবে স্বীকৃত হলেও একালে কেউ-কেউ এ নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেছেন। বিষয়টির ব্যাখ্যা প্রয়োজন। সুকুমার সেন লিখেছেন যে, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সহজবুদ্ধিতে চর্যাপদের ভাষাকে বাংলা ভাষা বলে সাব্যস্ত করেছেন। অবশ্য হরপ্রসাদ শাস্ত্রী যে কোনো ভুল করেননি, সেকথাও সুকুমার সেন বলেছেন। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় চর্যাগীতির ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে, চর্যার গানগুলি বাংলা ভাষার 'প্রত্নমূর্তি' অর্থাৎ প্রাচীন বাংলার চেহারাটি চর্যার গানগুলিতে ফুটে উঠেছে। সাধারণভাবে পরবর্তী কালের পণ্ডিতগণ এই সিদ্ধান্ত মেনে নিয়েছেন। কিন্তু কিছু দিনের মধ্যেই কেউ-কেউ এই দাবিতে সরব হলেন যে, চর্যাগীতি আসলে মৈথিলীতে রচিত, কেউ-বা বললেন ওড়িয়াতে, আবার কারও দাবি ওগুলি অসমিয়া ভাষার বা হিন্দি ভাষার আদিরূপ। এই দাবিগুলি যে অকারণ তা বলা যায় না। অবহট্‌ঠ থেকে যখন নব্য ভারতীয়-আর্য ভাষার যুগে এইসব মৌখিক বা ভার্নাকুলার ভাষাগুলি বিবর্তিত হচ্ছিল, তখন স্বভাবতই সেইসব পূর্বাঞ্চলীয় আঞ্চলিক ভাষায় অবহট্‌ঠের কিছু 'অবশেষ' থেকে গেছে, কেননা সবগুলি ভাষারই উৎস অভিন্ন। তাই প্রত্ন-বাংলার সঙ্গে প্রত্ন-ওড়িয়ার, প্রত্ন-অসমিয়ার বা প্রত্ন-মৈথিলীর মিল থাকাই স্বাভাবিক।

কিন্তু চর্যাগীতির ভাষা বিশ্লেষণের সময় দেখা যাচ্ছে যে, ওতে রয়েছে বাংলা ভাষার বহু বৈশিষ্ট্যের অভ্রান্ত চিহ্ন। একথা ঠিক যে, বাংলা ভাষার সেই আদি স্তরে বাংলার সংগঠন আদৌ সুস্থির বা নিরূপিত ছিল না, তা থাকা কোনোমতেই সম্ভবও ছিল না। তবে, কি বিভক্তির ব্যবহারে, কি পদক্রমে, কি বাগ্‌ভঙ্গিতে সেই ভাষা দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গের ভাষার আধারেই রূপলাভ করেছে একথা বলাই যায়।

কেবল ভাষাতাত্ত্বিক প্রমাণই হয়তো এ ক্ষেত্রে যথেষ্ট হবে না। চর্যার গানগুলিতে যে সমাজ ও দেশাচারের বর্ণনা আছে, তার সঙ্গে বাংলার সমাজ ও দেশাচারের সাযুজ্য দেখতে পাওয়া যায়। কাজেই চর্যার ভাষাকে বাংলাই মনে হয়। এই কথাগুলি বলার সময় একথাও ভুলে গেলে চলবে না যে, সেকালের বাংলা ভাষার সঙ্গে অবহট্‌ঠের যেমন মিল ছিল, তেমনি, স্বাভাবিক কারণেই মৈথিলি, ওড়িয়া, অসমিয়ার প্রত্নরূপেরও মিল ছিল। মিল বা

সাক্ষাৎ সম্বন্ধ এক জিনিস, সম্পূর্ণ অভিন্নতা অন্য জিনিস। একই উৎস থেকে বিভিন্ন বস্তুর সৃষ্টি হতে পারে। সৃষ্ট বস্তুগুলির মধ্যে মিল থাকাই সম্ভব। কিন্তু তাই বলে তাদের অভিন্ন বলে দেওয়া উচিত নয়।

১৮.৫ প্রচীন বাংলা ভাষায় বিবিধ প্রভাব

সংস্কৃতের প্রভাব

আগের একটি অধ্যায়ে (দ্র. ১৬.১০) আমরা দেখেছি, সংস্কৃত ভাষাকে আদৌ বাংলা ভাষার জননী বলা যায় না। অর্থাৎ সংস্কৃত ভাষা থেকে প্রত্যক্ষভাবে উদ্ভূত হয়নি বাংলা ভাষা। একথার সত্যতা মেনে নিয়েও বলতে হবে যে, বাংলা ভাষায়, প্রাচীন বাংলা ভাষায়, সংস্কৃতের প্রভাব কিছু কম ছিল না। বেদোত্তর যুগে আনুমানিক ৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকে যে ধ্রুপদি সংস্কৃতের বিকাশ হয় তার প্রসার ঘটে আর্যাবর্তের বহু স্থানে, এবং ক্রমে পূর্বাঞ্চলেও তার ক্রমবিস্তার ঘটে। তাই পরবর্তী কালের আঞ্চলিক ভাষা ও সাহিত্যে সংস্কৃতের গভীর প্রভাব থাকাই স্বাভাবিক। চর্যাগীতির সময়েও সেই প্রভাব লক্ষ করা গেছে। চর্যগানের শব্দসম্ভার দেখলেই সংস্কৃতের প্রভাব প্রতীয়মান হবে। সংস্কৃতের প্রভাব প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ দুইরকমই। অর্থাৎ প্রাচীন বাংলা ভাষায় তৎসম শব্দ যেমন ব্যবহৃত হয়েছে, তেমনি বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয়েছে অর্ধতৎসম শব্দ। তদ্ভব শব্দও রূপলাভ করছিল ক্রমশ। শুধু শব্দব্যবহারেই যে সংস্কৃতের যাবতীয় প্রভাব তা নয়। সংস্কৃতের বচন, বিভক্তি, প্রত্যয় প্রভৃতিও কখনো অপরিবর্তিতভাবে, কখনো কিছুটা পরিবর্তিত হয়ে ব্যবহৃত হয়েছে প্রাচীন বাংলায়।

বাংলা ভাষায় অন্-আর্য প্রভাব

যতদূর জানা যায়, খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতক নাগাদ বঙ্গদেশে আর্য সংস্কৃতি বিস্তার লাভ করে। এবং এও অনুমান করা হয় যে, সাঁওতাল কোল মুন্ডা প্রভৃতি জাতির সঙ্গে আর্যভাষী জাতির সংস্রব ঘটেছিল সেই সময়েই। অনুমান করা হয় যে, ভণ্ডুল, অলাবু, ময়ূর, কম্বল প্রভৃতি শব্দ বাংলায় এসেছে অন্-আর্য ভাষা থেকেই। অন্-আর্য বলতে দ্রাবিড়, কোল, সাঁওতাল, মুন্ডা প্রভৃতি ভাষাকেই বুঝি। বাংলা ভাষায় এইসব অন্-আর্য ভাষার প্রভাব নিতান্ত কম নয়।

এক. বাংলায় মূর্ধন্য বর্ণ সংস্কৃত থেকে এসেছে একথা আমরা জানি। কিন্তু সংস্কৃতে এল কোথা থেকে? বিজয়চন্দ্র মজুমদার, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ মনে করেন সংস্কৃতে মূর্ধন্য বর্ণ ও ধ্বনি এসেছে দ্রাবিড় গোষ্ঠীর ভাষা থেকে।

দুই. বাংলা ভাষায় মহাপ্রাণ ধ্বনি আছে, যা আবার দ্রাবিড় ভাষায় নেই, কিন্তু কোল ভাষায় আছে। আমরা ধরে নিতে পারি যে, মহাপ্রাণতা কোল ভাষা থেকেই বাংলায় এসেছে।

তিন. বাংলা ভাষায় দ্বিস্বরধ্বনি (diphthong) আছে সতেরোটি—ইই্, ইউ্, এই্, এউ্, ওই্, ওউ্, আই্ ইত্যাদি। সংস্কৃতে ঐ এবং ঔ ছাড়া অন্য দ্বিস্বরধ্বনি নেই। তাহলে বাংলায় এল কোথা থেকে? ভাষাতাত্ত্বিকগণ অনুমান করেন, মুন্ডা ভাষা থেকেই এসেছে, কেননা দ্বিস্বরধ্বনি মুন্ডা ভাষারও বৈশিষ্ট্য।

চার. বাংলা ভাষায় যেকোনো স্বরধ্বনিই অনুনাসিক হতে পারে। মুন্ডা ভাষা থেকেই এই বৈশিষ্ট্যটি বাংলায় এসেছে বলে মনে করা হয় (দ্র. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত, ১৯৯৮, পৃ.৫১)।

পাঁচ. কোনো অতৎসম বাংলা শব্দ যুক্তব্যঞ্জন দিয়ে শুরু হয় না। একই বৈশিষ্ট্য মুন্ডা ভাষারও। মুন্ডা ভাষা থেকেই এই বৈশিষ্ট্য বাংলায় এসেছে বলে মনে করা হয়।

ছয়. ণ, ড়, ঢ় দিয়ে কোনো বাংলা শব্দ শুরু হয় না। এও মুন্ডা ভাষার প্রভাবের ফলে হতে পারে।

সাত. বাংলা ভাষায় শব্দদ্বৈতের বাহুল্য দেখা যায়। গোলগাল, আবোলতাবোল, এটাসেটা, রকমসকম, অলিগলি ইত্যাদি বহু শব্দদ্বৈত আছে বাংলা ভাষার শব্দভাণ্ডারে। এই বৈশিষ্ট্য দেখা যায় দ্রাবিড় গোষ্ঠীর ভাষায়, সাঁওতালি ও মুন্ডা ভাষায়।

আট. সবশেষে বলতে হবে, বাংলা শব্দভাণ্ডারে এসেছে বহু দ্রাবিড় শব্দ, সাঁওতালি শব্দ, মুন্ডারি শব্দ। কয়েকটি উদাহরণ হল—আখড়া, বড়শি, বেঁটে, কুড়ি (সাঁওতালি থেকে) ; ঢাল, ডেলা, চুলা, খুঁটি (মুন্ডারি থেকে)।

১৮.৬ প্রাচীন বাংলা ভাষার বানানরীতি

প্রাচীন বাংলা ভাষার বানানরীতি সম্বন্ধে ভাষা ও সাহিত্যে আগ্রহী ব্যক্তিমাত্রেরই কৌতূহল থাকার কথা। ভাষাতত্ত্বের ছাত্র-শিক্ষক-গবেষকদের তো থাকবেই। এর দুটি প্রধান কারণ। প্রথমত, প্রাচীন বাংলা ভাষা কী বানানে লেখা হত সে-বিষয়ে সকলের আগ্রহ মূলত ভাষাগত। প্রাচীন বাংলার বানান থেকে আধুনিক বানানের বিবর্তনের চর্চায় তা একান্ত অপরিহার্য। দ্বিতীয়ত, শব্দের উচ্চারণ সন্ধান করতে গেলেও বানানরীতি জানা একান্তই প্রয়োজন। সমিল পদ্যে অর্থাৎ অন্ত্যমিলযুক্ত পদ্যের শেষ শব্দের পরপর ধ্বনিগত মিল জেনে নেওয়া গেলে সংশ্লিষ্ট শব্দসমূহের উচ্চারণ বোঝা যায়। শব্দের ধ্বনিকে অনুসরণ করে বানান লেখাই স্বাভাবিক অধিকাংশ ক্ষেত্রে। একটি ছোটো উদাহরণ দিলেই পরিষ্কার হবে বিষয়টা।

বহুদিন পরে বঁধুয়া এলে।
দেখা না হইত পরাণ গেলে ॥
এতেক সহিল অবলা বলে।
ফাটিয়া যাইত পাষাণ হলে ॥

চণ্ডীদাসের এই পদের শেষে এলে/ গেলে এবং বলে/হলে মিল দেখে বোঝা যায় যে, ‘গেলে’-উচ্চারণ করা হত গে-লে, গ্যা-লে নয়। এবং বলে/হলে-র উচ্চারণ যথাক্রমে বো-লো এবং হো-

লে। যদিও সবক্ষেত্রে বানানের উপর একশোভাগ নির্ভর করা যায় না। কেননা, প্রাচীন বানান বিষয়ে পুথিকারদের সুনিরূপিত সূত্র বা নিয়ম ছিল না। তবুও বলব, প্রাচীনকালে বাংলা ভাষার উচ্চারণ অনুসন্ধানে অনেকটাই সাহায্য করে বানানপদ্ধতি।

পুরোনো পুথির বানানে শৃঙ্খলা ছিল না এবং নিয়মের চাইতে অনিয়ম ছিল বেশি এমন একটা ধারণা অনেকেই পোষণ করেন। এই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল নয় বটে, তবে নির্ভুলও নয়। বিজনবিহারী ভট্টাচার্য তাঁর '**প্রাচীন বাংলা ভাষার বানান পদ্ধতি**' নিবন্ধে (দ্র. বাগর্থ, ১৯৭৭, পৃ.৫১-৬৭) প্রাচীন বাংলা বানানের নিয়মনীতি বিষয়ে অত্যন্ত মূল্যবান আলোচনা করেছেন। প্রাচীন সাহিত্যের পুথির সংখ্যা কম নয়। এক-একটি বহু লিপিকারের দ্বারা বহুবার লিখিত হওয়ায় পুথি পাওয়াও গেছে অসংখ্য। তবে মুদ্রণের আবির্ভাবের পরে সম্পাদকরা অনেক সময়েই পুথির বানান বদলে দেন বা সংস্কার করেন। সম্পাদক যে-বানানকে অসমীচীন বা অশুদ্ধ মনে করেন তাকে বদলে দেওয়াই তাঁর কর্তব্য বলে মনে করেন। কিন্তু গবেষকের পক্ষে তা অত্যন্ত ক্ষতিকর। কেননা গবেষকের পক্ষে সেক্ষেত্রে মূল পুথির বানান সম্পর্কে কোনো ধারণা করাই সম্ভব হয় না।

একথা ঠিক যে, অনেকসময়েই কবি বা লেখক নিজে লেখেননি, পুথিকাররা লিখেছেন। ফলে কোনো-কোনো ক্ষেত্রে পুথির বানান দেখে কবি বা লেখকের বানাননীতি কী ছিল তা জানা সম্ভব হয় না। কিন্তু বিভিন্ন পুথির বানান তুলনা করে প্রাচীন পুথিকার বা লিপিকাররা কী বানান লিখতেন বা লিখতে অভ্যস্ত ছিলেন সে-বিষয়ে একটা ধারণা নিশ্চয় করা সম্ভব। সাহিত্যের গবেষকের পক্ষে তারও মূল্য আছে। আমরা চর্যাগীতি অর্থাৎ 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়' 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন', 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' প্রভৃতি কয়েকটি প্রাচীন কাব্যের পুথি তুলনা করে দেখাবার চেষ্টা করতে পারি, কেমন ছিল প্রাচীন বাংলা ভাষার বানানরীতি বা বানান লেখার রীতি।

প্রথমত, দেখতে পাচ্ছি যে, উত্তম পুরুষের ক্রিয়াপদ বর্তমান ভবিষ্যৎ ও অতীত তিন কালেই চন্দ্রবিন্দুযুক্ত-ও অর্থাৎ ওঁ। যেমন আছিলোঁ জাইলোঁ, ছাড়িলোঁ, কহোঁ। কখনো-কখনো দেখছি পড়িলাহোঁ, নারিবোঁ, খাইবোঁ/খায়িবোঁ বানান। অবশ্য এইসব শব্দে চন্দ্রবিন্দুহীন বানানও কেউ-কেউ লিখতেন—আইলো, আছিলো, কৈলো।

দ্বিতীয়ত, অনুনাসিকতা দেখা যায় অন্য অনেক ক্ষেত্রেও। অনেক সময় মূল ধাতুতে ওঁ যোগ করা হত—পুছোঁ, চাহোঁ, যাওঁ, কহোঁ ইত্যাদি। মূল ধাতুতে অ + ওঁ যোগ করারও রীতি ছিল—পাইসওঁ, জাণওঁ।

তৃতীয়ত, অনেক সময় শব্দের শেষে ও যোগ করতে হলে তা পরিণত হত ও-কারে। যেমন তাহাকো, একো, কাহাকো ইত্যাদি।

চতুর্থত, ও বহু ক্ষেত্রে হো হয়ে গেছে। এহো, সেহো।

পঞ্চমত, চর্যাপদের পুঁথিতে দেখা যাচ্ছে যে, কয়েকটি অ-কারান্ত তৎসম শব্দ ও-কারান্ত লেখা হয়েছে—উন্মত্তো, শবরো। অতৎসম শব্দেও এমন ঘটেছে—ভান্তো (ভ্রান্ত), রত্তো (রক্ত)।

ষষ্ঠত, শব্দের মধ্যে ও বা ও-কার তেমন দেখা যায় না। কয়েকটি শব্দে আছে বটে, যেমন স্বমোহ,

দুখোলেঁ, সংবোহে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ওগুলোতে স্ব-, দু-, স্বং- এইসব শব্দ যোগ করা হয়েছে মোহ, খোল, বোহ প্রভৃতি শব্দের আগে।

সপ্তমত, বিশেষত চর্যাপদে ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে য়-এর ব্যবহার খুবই কম। কায়া হয়েচে কাআ, হাটুয়া হয়েছে হাটুআ, সেয়ালী হয়েছে সেআলী। এইরকম আরও উদাহরণ হল—দুআর, সিআন, গোঅলী, কোঁঅল (কোমল)। এর অর্থ এই যে, য়-শ্রুতি চর্যাপদে প্রায় নেই। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে অবশ্য কোনো-কোনো ক্ষেত্রে য়-শ্রুতি পাওয়া যায়।

অষ্টমত, বহুক্ষেত্রে শব্দের আদিতে অ ধ্বনিযুক্ত শব্দকে আ লেখা হয়েছে, যেমন পঞ্চ > পাঞ্চ, অচ্ছ > আচ্ছ। আবার কোথাও কোথাও অ-আ দুই-ই পাওয়া যায়—ভান্তি/ভন্তি, কপালী/কাপালী, অচার/আচার।

নবমত, কি চর্যায় কি শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে শব্দের মধ্যে দীর্ঘ ঈ বা দীর্ঘ ঈ-কার বিরল। কয়েকটি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় বটে, তবে সেগুলিকে ব্যতিক্রম বলে মনে করাই ভালো—আনুচীত (অনুচিত), তেজীবারে, ভাঙ্গীল, বত্তীশ।

দশমত, দীর্ঘ ঈ-কার অবশ্য শব্দান্তে পাওয়া যায়, বিশেষত স্ত্রীলিঙ্গ—গোআলী, একসরী, ছিনারী, অভাগী, দেহনী, বাসলী। আরও লক্ষ করি, শব্দের শেষে আ, ই প্রভৃতি স্বরবর্ণ সরাসরি যুক্ত হত—যেমন

নগর বাহিরেঁ ডোম্বী তোহেরি কুড়িআ।
ছোই ছোই জাই সে বাহ্মণ নাড়িআ।।

আরও আছে—বসই, করই, বিগোআ ইত্যাদি।

গ্রন্থপঞ্জি

গোস্বামী, কৃষ্ণপদ—বাংলা ভাষাতত্ত্বের ইতিহাস (২০০১)
ঘোষ, তরুণ—বাংলা ভাষাচর্চা (১৯৯৬)
চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার—বাঙ্গালা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা (১৯৯১)
বসু, দ্বিজেন্দ্রনাথ—বাংলা ভাষার আধুনিক তত্ত্ব ও ইতিকথা (১৯৮০)
ভট্টাচার্য, পরেশচন্দ্র—ভাষাবিদ্যা পরিচয় (১৯৯৩)
ভট্টাচার্য, পার্বতীচরণ—বাংলা ভাষা (১৯৮২)
ভট্টাচার্য, বিজনবিহারী—বাগর্থ (১৯৭৭)
মজুমদার, পরেশচন্দ্র—বাঙলা ভাষা পরিক্রমা, প্রথম খণ্ড (২০০৩)
মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্—বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত (১৯৮৮)
সেন, সুকুমার—ভাষার ইতিবৃত্ত (১৯৯৪)

১৯. বাংলা ভাষার ঐতিহাসিক ব্যাকরণ

১৯.১ বাংলা ভাষার ঐতিহাসিক ব্যাকরণ

মধ্য ভারতীয়-আর্য ভাষা থেকে অপভ্রংশ ও অবহট্‌ঠ হয়ে বাংলা ভাষার সৃষ্টি হয়েছে একথা আগের আলোচনা থেকে নিশ্চয় স্পষ্ট হয়েছে। প্রাচীন বাংলা যেমন একটি নব্য ভারতীয়-আর্য ভাষা তেমনি অন্যান্য কয়েকটি ভাষাও প্রায় একই সময়ে বিবর্তিত হয়ে রূপলাভ করেছে হিন্দি, ওড়িয়া, অসমিয়া প্রভৃতি ভাষার প্রাচীন রূপে। অর্থাৎ বাংলা ওড়িয়া অসমিয়া প্রভৃতি ভাষা একই উৎস থেকে উদ্ভূত হয়েছে। কাজেই কোনো-কোনো ক্ষেত্রে প্রাচীন ওড়িয়ার এবং প্রাচীন অসমিয়ার মিল ছিল। কিন্তু কতকগুলি বিশিষ্ট লক্ষণ বাংলা ভাষাকে অন্যান্য নব্য ভারতীয়-আর্য ভাষা থেকে পৃথক করে দিয়েছে। সেই বিশিষ্ট লক্ষণগুলি হল— ১. অসমাপিকা ক্রিয়ার সৃষ্টিতে -ইয়া, -ইলে, -ইতে যোগ ; ২. **-ইল-ইত যোগে অতীত কাল** এবং **-ইব যোগে ভবিষ্যৎ** কালের ক্রিয়ারূপ ব্যবহার ; **৩. -রা যোগে কর্তৃকারকের বহুবচন** ; **৪. শব্দদ্বৈতের প্রাধান্য** ; **৫. অনুসর্গ হিসাবে দিয়া, ঠাঁই, থাকিয়া, মাঝে** ইত্যাদি শব্দের প্রয়োগ।

বাংলা ভাষার ব্যাকরণের একটা ঐতিহাসিক ধারা আছে। সেই ধারার সূত্রপাত প্রাচীন বাংলা ভাষায়। তবে একথাও সত্য যে, প্রাচীন বাংলা ভাষার ব্যাকরণের বিভিন্ন প্রকরণ—পদ, কারক-বিভক্তি, লিঙ্গ, বচন ইত্যাদিতে সংস্কৃতের, প্রাকৃতের, এবং অবহট্‌ঠের লক্ষণ ও চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যায়। আমরা দেখব প্রাচীন বাংলা থেকে আধুনিক বাংলায় ব্যাকরণ কীভাবে বিবর্তিত হয়েছে।

১৯.২ পদ-প্রকরণ

প্রাচীন কালের বিখ্যাত বৈয়াকরণ পাণিনি যাবতীয় পদকে তিন ভাগে বিভক্ত করেছিলেন। সেই তিনটি ভাগ হল—**সুবন্ত** (সুপ্‌ + অন্ত), **তিঙন্ত** (তিঙ্‌ + অন্ত) ও **নিপাত**। নামপদ বা বিশেষ্য, সর্বনাম ও বিশেষণকে তিনি সুবন্ত পদ বলেছেন ; ক্রিয়াকে বলেছেন তিঙন্ত এবং অন্যান্য গৌণ পদগুলিকে বলা হয়েছে নিপাত। অর্থাৎ অনুসর্গ, সংযোজক, অব্যয় প্রভৃতি নিপাত শ্রেণির মধ্যে পড়ে। এমনকী, ক্রিয়া-বিশেষণকে নিপাত-র দলে ফেলা হয়েছিল। সাধারণভাবে অবশ্য নিপাত বলতে অব্যয়কেই বোঝানো হয়।

১৯.৩ বিশেষ্য, বিশেষণ

পদের আলোচনায় প্রথমেই আসে **'বিশেষ্য'**। বিশেষ্যকে নামশব্দও বলা হয়। বস্তু ভাব গুণ সত্তা বা ক্রিয়াবাচক শব্দকেই নামশব্দ বা বিশেষ্য বলা হয়। লিঙ্গ ও বচনভেদে বিশেষ্যের

রূপ-পরিবর্তন ঘটে। হাড়, আঙ্গুটি (আংটি), ইন্দরা (ইঁদারা), গাঁঠি (গাঁট) প্রভৃতি বস্তুবাচক বিশেষ্য শব্দ ; দোহন, গজ্জন (গর্জন) ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য। প্রাচীন ভারতীয়-আর্য ভাষায় (অর্থাৎ সংস্কৃতে) এবং মধ্যভারতীয়-আর্য ভাষায় অর্থাৎ প্রাকৃতে বিশেষ্যের বচন, লিঙ্গ ও বিভক্তি প্রযুক্ত হত বিশেষণে। বাংলা ভাষায় বিশেষণেরও লিঙ্গ প্রথম দিকে হত, আধুনিক বাংলায় তা কমে এসেছে। বিশেষণের বহুবচনও দুর্লক্ষ্য আধুনিক বাংলায়। 'বন্যেরা বনে সুন্দর শিশুরা মাতৃক্রোড়ে'-র মতো প্রয়োগ আধুনিক বাংলায় কমই দেখা যায়। বিশেষণ বিশেষ্যকে বিশেষিত করে, তার ব্যাপ্তিকে সীমিত করে। 'ফুল' বলতে জগতের সব ফুলকেই বোঝায়। কিন্তু 'লাল ফুল' বলতে কেবল লাল রঙের ফুলকেই বোঝানো হবে। ফলে তার ব্যাপ্তি বা সংখ্যা কমে গেল। 'সুগন্ধ লাল ফুল' বললে ফুল আরও সীমিত হয়ে গেল। বাংলা ভাষায় সর্বনামও বিশেষণ হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে—আমার বই, তোমার বাড়ি। ক্রিয়াপদও বিশেষণ হতে পারে—*গেল বছর তুমি এসেছিলে।*

বিশেষণ হতে পারে তিন রকম। **একপদী, যৌগিক** ও **বহুপদময়**। লাল, ভালো, ছোটো, বড়ো, উঁচু এগুলি একপদী বিশেষ। **বুকভরা মধু, প্রাণঢালা ভালোবাসা** হল যৌগিক বিশেষণ। আবার **মন-খারাপ করা গল্প** বা 'উঁচা উঁচা পর্বত' হল বহুপদময় বা বাক্যময় বিশেষণ। **বিশেষণের তারতম্য** হয়। সংস্কৃতে দুটি বস্তুর বা দুই প্রাণীর মধ্যে একের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ বোঝাতে -তর ও -ঈয়স্ (ঈয়সুন্) প্রত্যয় হয়। দুই-য়ের বেশি ব্যক্তি বস্তু ইত্যাদির মধ্যে তুলনায় -তম বা -ইষ্ঠ প্রত্যয় হয়। বৃহত্তর, ক্ষুদ্রতর ; মহত্তম, উন্নততম। বাংলায় অর্থাৎ খাঁটি বাংলায় প্রায়ই এই নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা যায়। অনেক সময় অনুসর্গ ব্যবহার করে পার্থক্য দেখানো হয়। *'আমার থেকে সে বড়ো'*। প্রাচীন বাংলায় *'ডোম্বীত আগলি নাহি চ্ছিণালী'*।

১৯.৩.১. ক্রিয়াবিশেষণ

ক্রিয়াকে বিশেষিত করে বলেই এই নাম। *জোরে ছুটছে, আস্তে চলো*-এইসব দৃষ্টান্তে দেখা যাচ্ছে যে, *জোরে, আস্তে* এ-দুটি ক্রিয়াবিশেষণ *ছোটা* ও *চলা* ক্রিয়াকে বিশেষিত করছে, বাংলায় ক্রিয়াবিশেষণ বিভক্তিযুক্ত ও বিভক্তিহীন দুই রকমই হতে পারে। *দ্রুত চলছে, তাড়াতাড়ি খাও* বিভক্তিহীন ক্রিয়াবিশেষণের দৃষ্টান্ত। বিশেষণের বিশেষণকেও ব্যাকরণে ক্রিয়াবিশেষণই বলা হয়। বিশেষণের বিশেষণও বিভক্তি চিহ্নহীন হয়—*খুব ভালো, দারুণ ঠান্ডা*। বিভক্তিচিহ্নযুক্ত ক্রিয়াবিশেষণের উদাহরণও আছে—*ধীরে বও, হেঁটে যাও, ছুটে এসো।*

প্রাচীন বাংলায় ক্রিয়াবিশেষণে-এ বা এঁ বিভক্তির প্রয়োগ হত—*'ভবণই গহন গম্ভীর বেঁগে গাহী'*। কখনো-কখনো দেখা গেছে যে, অসমাপিকা ক্রিয়ার সঙ্গে -ই বা -ইয়া যোগ করে ক্রিয়াবিশেষণ করা হয়েছে—*'দিড় করিঅ মহাসুহ পরিমাণ'*। আধুনিক বাংলায় দেখি—*নাচিয়া নাচিয়া চলে* কিংবা *নেচে নেচে চলে* ; *হন্‌হনিয়ে ছোটে।*

১৯.৪ সর্বনাম

নামশব্দ বা বিশেষ্যের পরিবর্ত বলেই এর নাম সর্বনাম। প্রাচীন বাংলায় সর্বনাম প্রধানত ছিল দু-রকম—পুরুষবাচক বা personal pronoun এবং নির্দেশক বা demonstrative pronoun.

লিঙ্গ অনুসারে সর্বনামের রূপভেদ হয় না। 'আমি' বা 'আমরা' বললে স্ত্রীপুরুষ যেকোনো লিঙ্গকেই বোঝাতে পারে।

পুরুষবাচক সর্বনাম

সংস্কৃতে পুরুষবাচক সর্বনাম দুটি—অস্মদ্ (উত্তম পুরুষে) এবং যুষ্মদ্ (মধ্যম পুরুষে)। এদের লিঙ্গভেদ হয় না, এরা বিশেষণ হিসাবেও ব্যবহৃত হয় না। বাংলায় উত্তম পুরুষ বাদে অন্য সব সর্বনামের দুটি রূপ আছে—সাধারণ সর্বনাম ও সম্ভ্রমসূচক সর্বনাম। ক. বাংলায় **উত্তম পুরুষে**, সর্বনামের তিনটি প্রাতিপদিক রূপ (base form বা stem form)—'ম', 'মো', 'আমা'। একসময় 'ম' ও 'মো' একবচনের প্রাতিপদিক ছিল, এবং 'আমা'বহুবচনের প্রাতিপদিক হিসাবে ব্যবহৃত হত। প্রাচীন বাংলায় অন্ত্য পর্বে অবশ্য 'আমা' একবচনেও ব্যবহৃত হতে থাকে।

সংস্কৃত 'অস্মদ্' শব্দরূপ থেকে বাংলায় 'আমি' কীভাবে এল তা এবার দেখা যাক।

'অস্মদ্' শব্দের তৃতীয়া বিভক্তির বহুবচন রূপ—'অস্মাভিঃ' (আমাদের দ্বারা)। অস্মাভিঃ > অম্‌মাভিঃ (অম্মাভিঃ) > অম্‌মাহি > অম্‌মহি (অপভ্রংশ) > অম্‌হে, অম্হে, আম্‌হে (প্রাচীন বাংলায়) এবং আম্‌হি > আমি (আধুনিক বাংলায়)।

আবার 'অস্মদ্' শব্দের তৃতীয়া বিভক্তির একবচনের 'ময়া' (আমার দ্বারা) থেকে 'মুই' এসেছে বাংলায়। কীভাবে এসেছে তা এবার দেখা যাক। ময়া > মএ (প্রাকৃত) > মই (অপভ্রংশ) > **মই** (প্রাচীন বাংলা) > মুঞি (মধ্য বাংলা) > মুই (আধুনিক বাংলা)।

এইভাবে 'অস্মদ্' শব্দের ষষ্ঠীর একবচনের 'মম' (আমার) থেকে বাংলায় 'মো' এসেছে। তবে প্রাচীন ও মধ্য বাংলায় 'মো' থাকলেও আধুনিক বাংলায় 'মো'-র ব্যবহার নেই।

'অস্মদ' শব্দের ষষ্ঠীর বহুবচনের 'অস্মাকম্' (আমাদের) থেকে প্রাকৃত ও অপভ্রংশ হয়ে বাংলায় এসেছে 'আমরা'। বলা বাহুল্য সংস্কৃত থেকে বাংলায় এসে অর্থবদল ঘটেছে।

অনুরূপভাবে **মধ্যম পুরুষে** 'যুষ্মদ্' (তুমি) শব্দ থেকেও বাংলায় কয়েকটি সর্বনাম শব্দ পাওয়া গেছে।

যুষ্মদ্ শব্দের প্রথমার এক বচনের রূপ ত্বম্ (তুমি)। এই ত্বম্ থেকে কীভাবে এল তু, তুই তা দেখা যাক।

> ত্বম্ > তং, তুবং, তুমং (প্রাকৃত) > তুঅং (অপভ্রংশ) > তু, তো (প্রাচীন বাংলা)
> > তোঁ, তো, তুঞি (মধ্য বাংলা) > তু, তুই (আধুনিক বাংলা)

ত্বাম্ (তোমাকে) > তু, তুবং, তুএ, তুমে (প্রাকৃত) > তুঅং, তুএ, তুমে (অপভ্রংশ) > তঁই, তো (প্রাচীন বাংলা) > তোঞে, তোএ, তুঞি (মধ্য বাংলা) > তুহুঁ, তোক্ (অন্ত্য মধ্য বাংলা) > তোকে, তোমাকে (আধুনিক বাংলা)

ত্বয়া (তোমার দ্বারা) > তয়া (পালি) > তই, তে (প্রাকৃত) > তই, তোএ (অপভ্রংশ) > তই, তোএ (প্রাচীন বাংলা) > তুঞি (মধ্য বাংলা) > তুই (আধুনিক বাংলা)

'আপনি'-র ব্যুৎপত্তি কিছুটা বিতর্কিত। তবে মনে হয় এটি একটি আত্মবাচক সর্বনাম (reflexive pronoun)। এবং তার বিবর্তন এইভাবে হওয়া সম্ভব।

আত্মন্ > আত্মা > অপ্পা (অৎপা বা আৎপা—গিরনার লেখতে প্রাপ্ত) > আপ্পা > আপ + ন্ (আপন্) > আপনি (আপন্+ই)

নির্দেশক সর্বনাম

বাংলা ভাষায় পাঁচ রকম নির্দেশক সর্বনাম হতে পারে—ক. সাধারণ নির্দেশক, খ. নিকট নির্দেশক, গ. দূর নির্দেশক, ঘ. সম্বন্ধ নির্দেশক এবং ঙ. অনিশ্চয়সূচক বা অনির্দিষ্ট নির্দেশক।

ক. সাধারণ নির্দেশক (general demonstrative)

সাধারণ নির্দেশক মনুষ্যবাচক সর্বনামের দুটি রূপ—সাধারণ ও সম্ভ্রমসূচক সাধারণ রূপ—সে ; সম্ভ্রমসূচক—তিনি। বহুবচনে তারা ; তাঁরা। অ-মনুষ্যবাচক সাধারণ নির্দেশক সর্বনাম—তা, তাহা ; সেগুলি।

'সে' এসেছে সংস্কৃত সঃ থেকে।

সঃ > সউ > সো > সু > সে।

'তা', 'তাহা'—তস্য > তাস > তাহ > তা, তাহা

খ. নিকট নির্দেশক (near demonstrative)

নিকট নির্দেশক সর্বনামের কয়েকটি প্রাতিপদিক রূপ আছে—এ, ই, এই, এহ। এদের উৎস সম্ভবত এষঃ, এভিঃ, এতৎ ইত্যাদি।

এতৎ > এদং > এঅ > এ

ইদম্ > ইদা > ইআ > ইঅ > ই

এভিঃ > এহি > এই

এষঃ > এসো > এসে > এস > এহ

গ. দূর-নির্দেশক (far demonstrative)

দূর-নির্দেশক সর্বনাম প্রাণীবাচক ও অপ্রাণীবাচক হতে পারে। প্রাণীবাচক আবার দুইরকম—সাধারণ ও সম্ভ্রমবাচক।

সাধারণ—ও, ওই, উহা, উহারা

সম্ভ্রমবাচক—উনি, ওঁরা

অপ্রাণীবচক—উহা, ওই (অই), ওটি, ওটা ইত্যাদি।

ও—অসৌ (সং) > ও (অপভ্রংশ) > ও (বাংলা)

উহা—অবস্য (সং) > ওহ (অপভ্রংশ) > ওহা (মধ্য বাংলা) > ওহ্া > উহা।

এই রূপগুলির সঙ্গে বিভক্তি যোগ করলে পাওয়া যায় অন্য রূপ—ওর, ওকে ; উহাকে, উহার, উহাতে।

ঘ. সম্বন্ধ-নির্দেশক (relative pronoun)

সম্বন্ধ-নির্দেশক সর্বনাম হল যে, যাহা; যিনি ; যাহারা ; যাঁহারা ; যেটি, যেটা ইত্যাদি এদের ব্যুৎপত্তি কীভাবে হল দেখা যাক।

যে—যঃ (সং) ; যকঃ ; যৎ > জো (প্রাকৃত) > জু, জি, জ (অপভ্রংশ) > জে (প্রা.বাং.) > যে

যাহা—যস্য (সং) > যাস > জাহ (প্রা. বাং.) > যাহা

যিনি—যেষাম্ (সং) > জেণ্হং (প্রাকৃত) > যিনি

এগুলির সঙ্গেও নানান বিভক্তি যুক্ত হতে পারে। বিভক্তিযুক্ত রূপ—

যাহাকে, যাকে ; যাহাতে, যাতে ; যাহার, যার।

ঙ. অনির্দিষ্ট নির্দেশক (indefinite pronoun)

কয়েকটি অনির্দিষ্ট নির্দেশক সর্বনামের দৃষ্টান্ত—কি, কে, কেই, কেউ, কিছু, কোন।

এদের ব্যুৎপত্তি এইরকম—

কি—কিম্ (সং) > কিং (প্রাকৃত, অপভ্রংশ) > কি

কে—কঃ (সং) > কো, কে (প্রাকৃত) > কে, কি, কও (অপ.) > কো, কে (প্রা. বাং.) > কে (মধ্য বাং) > কে।

কেই—কঃঅপি (সং) > কোহপি > কোবি, কেবি (প্রাকৃ) > কোই, কেই (প্রা. বাং) > কেই।

কেউ—কয়স্য (বৈদিক) > কেহ (অপ.) > কেহো (প্রা. বাং) > কেহ (মধ্য বাং) > কেউ

কিছু— কিশ্চ (কিঞ্চ) > কিচ্ছ (অপ.) > কিছ, কিছু

কোন—কমণঃ > কবণ (অপ) > কমন (প্রা. বাং) কোন (মধ্যে বাং) > কোন

সর্বনামজাত বিশেষণ ও ক্রিয়াবিশেষণ (Pronominal adjectives & adverbs)

সর্বনামের মূল অংশের সঙ্গে প্রত্যয় যোগ করে যে-বিশেষণ গঠিত হয় তাকে সর্বনামজাত বিশেষণ এবং ওইভাবে যে-ক্রিয়াবিশেষণ গঠিত হয় তাকে সর্বনামজাত ক্রিয়াবিশেষণ বলা হয়। সর্বনামজাত বিশেষণের দৃষ্টান্ত হল—এই, এত, অত, যত, যেমন, তেমন। আর সর্বনামজাত ক্রিয়াবিশেষেণের দৃষ্টান্ত হল—যেথা, যেথায়, এথা, হেথা, হেথায়, সেথা, সেথায়, কোথা, কোথায়।

এবার দেখব কীভাবে এগুলি গঠিত হয়

সর্বনামের মূল বা প্রাতিপদিক রূপ	ক্রিয়াবিশেষণ	বিশেষণ
সে-	সেথা, সেথায় সেখানে	সেই
ও- (-হো)	হোথা, হোথায় ওখানে	ওই, অমন
যে-	যেথা, যেথায় যেখান, যেখানে	যত, যেমন
ক-	কোথা, কোথায়	কত, কেমন
কে-	কই	কোন

১৯.৫ ক্রিয়াপদ

ক্রিয়ার মূল অংশের নাম ধাতু (root)। ধাতুকে ভাঙা যায় না। ধাতু অবিভাজ্য। ধাতুর সঙ্গে বিভক্তি বা প্রত্যয় যুক্ত হলে পাওয়া যায় ক্রিয়াপদ। একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে ধাতু ও ক্রিয়াপদ বোঝানো যেতে পারে। বাংলায় যা একটি ধাতু। ধাতুর চিহ্ন হল √। অর্থাৎ √যা। এর সঙ্গে + আ বিভক্তি যোগ করলে যা + (ও) য়া = 'যাওয়া' ক্রিয়াপদটি পেলাম। তেমনি,

√দেখ্ + আ = দেখা।

বাংলা ভাষায় ধাতু সাধারণত তিন রকমের হয়—ক. সিদ্ধ ধাতু বা মৌলিক ধাতু (primary verb roots) ; খ. সাধিত ধাতু (secondary or derivative roots ; এবং গ. যৌগিক বা সংযোগমূলক ধাতু (compounded roots)।

ক. সিদ্ধ বা মৌলিক ধাতু

যে-ধাতু স্বয়ংসিদ্ধ অর্থাৎ যাকে বিশ্লেষণ করা যায় না, যে-ধাতু নিজেই স্বয়ংসম্পূর্ণ, তাকেই সিদ্ধ বা মৌলিক ধাতু বলা হয়। √খা, √যা, √পড়্, √কর্, √দে ইত্যাদি সিদ্ধ ধাতু। নানাভাবে নানান সূত্র থেকে এই সিদ্ধ ধাতুগুলি এসেছে বাংলায়। প্রধানত সংস্কৃত, প্রাকৃত ও অপভ্রংশ থেকেই বাংলায় সিদ্ধ ধাতু এসেছে। কিছু আরবি-ফারসি ধাতুও পেয়েছি বাংলায়।

১. √আছ্, √কর্, √যা, √হ প্রভৃতি ধাতু সংস্কৃত থেকে প্রাকৃতের মাধ্যমে বাংলায় এসেছে। ২. অনুরূপভাবে কিছু সংস্কৃত ধাতু উপসর্গযুক্ত হয়ে প্রাকৃতের মধ্য দিয়ে বাংলায় এসেছে। যেমন আ + √বিশ্ = √আস্ ; আ + √নী = √আন্ ; উপ + √বিশ্ = √বস্। ৩. কখনো-কখনো সংস্কৃত বিশেষ্য বা বিশেষণ শব্দও ধাতু হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে বাংলায়। যেমন ঘর্ম > √ঘাম্ + আ = ঘামা ; মত্ত > √মাত্ + আ

= মাতা। ৪. তৎসম ধাতুও অনেক সময় সরাসরি ধাতু হিসাবে বাংলায় ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন কীর্তি > √কীর্ত্, গর্জন > √গর্জ্। ৫. আরবি-ফারসি ধাতুর উদাহরণ হল—√কম্ + আ = কমা ; √দাগ্ + আ = দাগা।

খ. সাধিত ধাতু

যেসব ধাতুকে বিশ্লেষণ করা যায় এবং বিশ্লেষণ করে বিভক্তি-প্রত্যয়াদি পাওয়া যায়, তাকেই সাধিত ধাতু বলা হয়। সাধিত ধাতু আবার হতে পারে তিন-চার রকম—১. প্রযোজক, ২. নামধাতু, ৩. ধ্বন্যাত্মক ধাতু। ১. মূল ধাতুর সঙ্গে -আ, -ওয়া প্রভৃতি প্রত্যয় যোগ করে ণিজন্ত বা প্রযোজক ধাতু পাওয়া যায়—√কর্ + আ = √করা ; √খা + আ = √খাওয়া ইত্যাদি ণিজন্ত বা প্রযোজক ধাতুর উদাহরণ। ২. বিশেষ্য বা বিশেষণ শব্দের সঙ্গে -আ প্রত্যয় যোগ করে নামধাতু পাওয়া যায়। পিছল + আ = √পিছলা ; বিষ + আ = √বিষা ; দগ্ধ + আ = √দগ্ধা। ৩. ধ্বন্যাত্মক শব্দের সঙ্গে -আ যোগ করে ধ্বন্যাত্মক ধাতু পাওয়া যায়—ভন্‌ভন্ + আ = √ভন্‌ভনা।

গ. যৌগিক বা সংযোগমূলক ধাতু

সিদ্ধ ধাতুর সঙ্গে বিশেষ্য, বিশেষণ, ধ্বন্যাত্মক শব্দ প্রভৃতি যোগ করে পাওয়া যায় যৌগিক বা সংযোগমূলক ধাতু। দেখা + √পা + আ = দেখা পাওয়া ; ভালো + √কর্ + আ = ভালো করা ; জিজ্ঞাসা + √কর্ + আ = জিজ্ঞাসা করা। এখানে দেখছি দেখা, ভালো, জিজ্ঞাসা এইসব বিশেষ্য ও বিশেষণ শব্দের সঙ্গে -কর্, -পা প্রভৃতি ধাতু সহকারী ধাতু হিসাবে যোগ হয়ে তৈরি করেছে যৌগিক ধাতু।

সংস্কৃতে ক্রিয়ার গঠন

সংস্কৃত ভাষায় ধাতুর সঙ্গে কালবাচক বিভক্তি ও প্রত্যয় যুক্ত হয়ে ক্রিয়াপদ গঠিত হয়। বিভক্তিগুলি এইরকম—

১. লট্ (নির্দেশক বর্তমান, indefinite present)
২. লোট্ (বর্তমান অনুজ্ঞা, imperative)
৩. লঙ্ (সামান্য অতীত, imperfect preterite)
৪. লিট্ (পরোক্ষ অতীত, perfect preterite)
৫. লুঙ্ (সাধারণ অতীত, aorist)
৬. বিধিলিঙ্ (সম্ভাবক, potential)
৭. লৃট্ (নির্দেশক ভবিষ্যৎ, second future)
৮. আশীর্লিঙ্ (আশীর্বাদসূচক, benedictive)
৯. লুট্ (বক্র ভবিষ্যৎ, periphrastic future)

এই বিভক্তিগুলি উত্তম, মধ্যম ও প্রথম পুরুষে বিভক্ত হয়ে প্রতিটি তিন বচন (একবচন, দ্বিবচন, বহুবচন) অনুযায়ী পরস্মৈপদী ও আত্মনেপদী এই দুই ধরনের রূপ নেয়। ফলে

এক-একটি বিভক্তি আঠারোটি আকার লাভ করে। বাংলায় অবশ্য এত সূক্ষ্ম ভাগ নেই। প্রাকৃত ও অপভ্রংশের মধ্য দিয়ে সরলীকরণ অবশ্যই হয়েছে।

১৯.৫.১ নামধাতু (denominative verb)

বক্তব্যের সংক্ষেপণের জন্য অনেকসময় নামপদকে অর্থাৎ বিশেষ্যকে ধাতু হিসাবে ব্যবহার করা হয়। একেই 'নামধাতু' বলে। একসময় কেবল কাব্যেই এর বহুলব্যবহার হত— পবিত্র > পবিত্রিল, বিষ + আ = বিষা, আদেশ + আ = আদেশা > আদেশিল ইত্যাদি। কখনো-কখনো বিশেষণ পদও ধাতু হিসাবে ব্যবহৃত হয়—দগ্ধ + আ > দগ্ধা।

যতদূর দেখা যায়, নামধাতু প্রাচীন বা মধ্য বাংলায় ব্যবহৃত হত না। নামধাতুর ব্যবহার অষ্টাদশ শতকের আগে তেমন দেখা যায়নি।

ক. সংস্কৃত বিশেষ্য শব্দে বাংলা বিভক্তি যোগ করে নামধাতু করার দৃষ্টান্ত প্রচুর। আদেশিব, আদেশিল ; বিষানো ; লতানো ; প্রশংসিব, প্রশংসিল ; নিবেদিল ইত্যাদি এইভাবে নিষ্পন্ন হয়েছে।

খ. অতৎসম শব্দে -আ, -আনো প্রভৃতি প্রত্যয় যোগ করে নামধাতু গঠিত হতে পারে। জুতা + নো (আনো) > জুতানো ; চাবুক + আনো > চাবকানো ; বদল + আনো > বদলানো।

গ. ধ্বন্যাত্মক শব্দ দিয়ে নামধাতু গঠন—ঝন্‌ঝনানো ; পত্‌পতানো ; ভন্‌ভনিয়ে ; তড়বড়ানো।

১৯.৫.২ ক্রিয়ার বিভিন্ন প্রকার

১. অসমাপিকা ও সমাপিকা ক্রিয়া

যে-ক্রিয়াপদ বাক্যের অর্থগত সমাপ্তি ঘটায় তাকে **সমাপিকা ক্রিয়া** বলে। গেল, যায়, খায়, খাইবে ইত্যাদি ক্রিয়ার দ্বারা বাক্যে অর্থের সমাপ্তি ঘটে বলে এগুলি সমাপিকা ক্রিয়ার দৃষ্টান্ত। প্রাচীন বাংলা থেকেই সমাপিকা ক্রিয়া ব্যবহৃত হয়ে আসছে। '*ঘরক আইলী বড়ায়ি*' বাক্যে *আইলী* সমাপিকা ক্রিয়ার দৃষ্টান্ত। **অসমাপিকা ক্রিয়ায়** বাক্যের অর্থ সমাপ্ত হয় না। বাক্য শেষ করতে যেন অন্য ক্রিয়ার জন্য অপেক্ষা করতে হয়। নীচের বাক্যটি দেখব—

'*সে দেব সনে নেহা বাড়াইলে হএ বিষ্ণুপুরে স্থিতি।*' এই বাক্যে দুটি ক্রিয়াপদ— বাড়াইলে, হএ (হয়)। বোঝাই যাচ্ছে যে 'বাড়াইলে' ক্রিয়ায় অর্থ অসম্পূর্ণ থাকছে, সম্পূর্ণ হচ্ছে 'হএ' বা 'হয়' ক্রিয়ার দ্বারা।

অসমাপিকা ক্রিয়ায় কয়েকটি অসমাপিকা প্রত্যয় যুক্ত হয়—ইয়া, ইলে, ইতে। অর্থাৎ খাইয়া, খাইলে, খাইতে। এবং আধুনিক মান্য চলিত বাংলায় যথাক্রমে খেয়ে, খেলে, খেতে।

২. যৌগিক ক্রিয়া (compound verb)

যে-ক্রিয়ার গঠনে একাধিক পদ ব্যবহৃত হয় এবং তা সত্ত্বেও একটিমাত্র ক্রিয়াপদের অর্থ প্রকাশিত হয়, তাকে যৌগিক ক্রিয়া (compound verb) বলে। যে-দুটি ক্রিয়ার যোগে যৌগিক ক্রিয়াটি গঠিত হয় তার একটি অসমাপিকা ও একটি সমাপিকা ক্রিয়া। সমাপিকা ক্রিয়াটির নিজস্ব অর্থ হয় লোপ পায়, নয়তো অস্পষ্ট হয়ে যায়। তবে সমাপিকা ক্রিয়াটির অর্থে প্রায়ই বিশেষ মাত্রা যুক্ত হয়। করে দেখা, খেয়ে ফেলা, বসে পড়া, হামলে পড়া, উঠে পড়া প্রভৃতি যৌগিক ক্রিয়ার দৃষ্টান্ত।

যৌগিক ক্রিয়া গঠনের দৃষ্টান্ত পালি-প্রাকৃতে এবং অপভ্রংশে প্রচুর দেখা যায়। 'উঠি গেল', 'টুটি গেল' এগুলো মধ্য বাংলায় পাই। চর্যায় আছে 'করিআঁ দেই', 'গুণিআ লেহুঁ'।

কয়েকটি সীমিত ক্ষেত্রে দুটি সমাপিকা ক্রিয়া দিয়েও দ্বিপদী ক্রিয়া বা যৌগিক ক্রিয়া গঠিত হতে পারে। যেমন—জানে শোনে, আসে যায়। আবার প্রথম অংশ সমাপিকা, দ্বিতীয় অংশ অসমাপিকা—এমনও হতে পারে। যেমন—খাও গিয়ে, মরো গিয়ে।

৩. ণিজন্ত ক্রিয়া (causative verb)

সংস্কৃত ণিচ্ প্রত্যয়ের যোগে যে-ক্রিয়া গঠিত হয় তাকেই ণিজন্ত ক্রিয়া বলা হয়। একে প্রযোজক ক্রিয়াও বলা হয়। সংস্কৃতে ণিজন্ত ক্রিয়ার সঙ্গে 'অয়' প্রত্যয় যুক্ত হয় এবং আকারান্ত ধাতুতে 'অয়' প্রত্যয়ের পরিবর্তে 'পয়' ব্যবহৃত হয়। দু-একটি উদাহরণ দেখা যাক।

সং. প্রত্যাপয়তি > প্রাকৃ. পতিআবেই > প্রা.বাং. পতিআই > মধ্য বাং. পতিআএ

সং. বন্ধ্যাপয়তি > প্রাকৃ. বন্ধাবেই > প্রা. বাং. বন্ধাবএ > মধ্য বাং. বান্ধায় > আ. বাং বাঁধায়

প্রাচীন বাংলায় কৃ-ধাতু যোগ করে ণিজন্ত যৌগিক ক্রিয়া গঠিত হত। *ডাহ কএলা* (দাহ করল)। এইভাবেই আধুনিক বাংলায় এসেছে দাঁড় করানো। রাঢ় অঞ্চলের উপভাষায় পাই *খাওয়া করানো, যাওয়া করানো*।

৪. অকর্তৃক ক্রিয়া (impersonal verb)

কর্তাহীন ক্রিয়াকে অকর্তৃক ক্রিয়া বলা হয়। শীত করছে, ভয় করছে, ভালো লাগে, ঘুম পায় ইত্যাদি অকর্তৃক ক্রিয়ার দৃষ্টান্ত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এইসব ক্ষেত্রে কর্তা কর্তৃকারকের বিভক্তি পায় না, কর্তা সম্বন্ধ পদের বিভক্তি গ্রহণ করে। অর্থাৎ এইসব উদাহরণে কর্তার রূপ এইরকম—আমার শীত করছে, ওর ভয় করছে, তোমার ভালো লাগে, শিশুর ঘুম পায়।

৫. অসম্পূর্ণ ক্রিয়া (defective verb)

কতকগুলি ধাতুর বা ক্রিয়ার সবগুলি রূপ অর্থাৎ সব কাল (tense) বা ভাব (mood) থাকে না। তাকেই অসম্পূর্ণ ধাতু বা অসম্পূর্ণ ক্রিয়া বলে। সেগুলিকে অন্য

ধাতুর রূপ দিয়ে সম্পূর্ণ করতে হয়। সংস্কৃত √অস্, √দৃশ্, √স্পৃশ্ প্রভৃতি অসম্পূর্ণ ধাতু। √অস্-ধাতুর লৃট্ হয় না, √দৃশ্-ধাতুর লট্ হয় না। বাংলায় √আছ্ (থাকা) ধাতুর ভবিষ্যতের রূপ নেই। √যা-ধাতুও অসম্পূর্ণ।

১৯.৫.৩ ক্রিয়ার কাল (tense)

বাংলা ভাষায় সাধারণভাবে ক্রিয়ার তিনটি কালের কথা আমরা জানি—অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ। এই তিনটি কালের প্রত্যেকটির চারটি উপবিভাগ হতে পারে—সাধারণ, ঘটমান, পুরাঘটিত, নিত্যবৃত্ত। এ হল আধুনিক ব্যাকরণের কথা। কিন্তু বাংলা ভাষার ঐতিহাসিক ব্যাকরণে ক্রিয়ার কাল একটু অন্যরকম। মনে রাখতে হবে, বাংলা ক্রিয়ার কাল এসেছে সংস্কৃত > প্রাকৃত > অপভ্রংশ > প্রাচীন বাংলা এইভাবে।

সংস্কৃতে কাল ছয়টি—

একটি বর্তমান (লট্)

তিনটি অতীত (সম্পন্ন বা লিট্, অসম্পন্ন বা লঙ্, অনির্দিষ্ট বা লুঙ্)

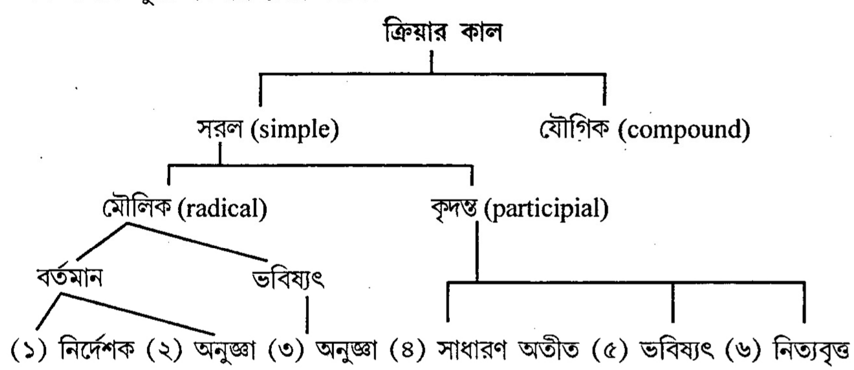
একটি ভবিষ্যৎ (লৃট্)

একটি সম্ভাব্য অতীত (লৃঙ্)

যদিও সাধারণভাবে স্থূল বিচারে সংস্কৃতে তিনটি কালের কথাই বলা হয়—অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ।

প্রাকৃতে এই তিনটি কালই থেকে গেল। অপভ্রংশে অতীত কাল লোপ পেল। শতৃ প্রত্যয়ের প্রয়োগ করে অতীতের অর্থ প্রকাশিত হল। তার মানে কাল হিসাবে রইল বর্তমান ও ভবিষ্যৎ।

প্রাচীন বাংলায় দুটি কাল পাওয়া যায়—অতীত ও বর্তমান। প্রাচীন বাংলায় ভবিষ্যৎ কালটি তৈরি করে নেওয়া হয়েছে। এবারে একটি ছকের সাহায্যে বাংলা ক্রিয়ার কালের ভাগগুলিকে বুঝে নেবার চেষ্টা করব।



এই ছকটি চোখের সামনে থাকলে বাংলা ক্রিয়ার কালের বিভাগ ও উপবিভাগগুলিকে বুঝে নেওয়া সহজ হয়ে যাবে।

বাংলা ক্রিয়ার কালের প্রধান ভাগ দুটি—সরল কাল (simple tense) ও যৌগিক কাল (compound tense)। এবার যৌগিক কালকে সরিয়ে রেখে সরল কালকে বুঝে নেব। অনেকে সরল কাল আর মৌলিক কালকে অভিন্ন মনে করেন। যাই হোক, **সরল কাল** দুই রকম—**মৌলিক** ও **কৃদন্ত**। সরল বা মৌলিক কালের ক্রিয়াপদগুলিতে ধাতুর সঙ্গে সরাসরি প্রত্যয় যোগ করাই যথেষ্ট, অন্য কোনো ধাতুর সাহায্য দরকার হয় না।

১৯.৫.৪ মৌলিক কাল : বর্তমান ও ভবিষ্যৎ

উপরের ছকটি দেখলেই বোঝা যাবে যে, মৌলিক কাল দু-রকম হতে পারে—বর্তমান ও ভবিষ্যৎ। বর্তমানে মৌলিক আবার দুইরকম—নির্দেশক ও অনুজ্ঞা। ভবিষ্যতে হয় কেবল অনুজ্ঞা।

প্রাচীন বাংলায় একবচন ও বহুবচন ছিল, দ্বিবচনের ক্রিয়াপদ ছিল না।

এক. নির্দেশক বর্তমান

উত্তমপুরুষ

একবচন—সংস্কৃত 'স্মি' > প্রাকৃ. ম্‌হি > অপ. মি > প্রা. বাং. মি

এর দৃষ্টান্ত—জাণমি, চলমি, পীবমি ইত্যাদি

বহুবচন—সং. 'ধ্বম্' > হুঁ > হু

প্রাচীন বাংলার দৃষ্টান্ত—জানহুঁ, লেহুঁ, আচ্ছহুঁ, খেলহু।

মধ্যমপুরুষ

একবচন—সং. 'সি' > প্রাকৃ., প্রা. বাং > সি

দৃষ্টান্ত—আছসি, চলসি, পুচ্ছসি।

বহুবচন—সং. 'থস্' > প্রাকৃ., প্রা. বাং. হু।

দৃষ্টান্ত—আছহু, করহু।

প্রথমপুরুষ

একবচন—সং. 'তি' > ই (প্রা.বাং.)

দৃষ্টান্ত—আছই, চলই, ভণই, করই। কখনো-কখনো ই লুপ্ত—অচ্ছ, উহ।

বহুবচন—সং. 'ন্তি' > প্রা.বাং. ন্তি

দৃষ্টান্ত—করন্তি, চাহন্তি, ভণন্তি।

এবারে **মধ্য বাংলায়** কী রূপান্তর হয়েছে দেখা যাক।

মধ্য বাংলায় একবচন-বহুবচনে কোনো তফাত রইল না। মধ্য বাংলায় বর্তমান কাল এইরকম—

উত্তমপুরুষ

তিনটি বিভক্তি প্রচলিত ছিল—

১. সং. 'ম্' (অহম্) > ওঁ, ম, বঁ ইত্যাদি
   করবঁ, করওঁ, করোঁ, হওঁ

২. সং 'য়্' + তি > ইএ
করিএ
৩. সং. 'ত' (নিষ্ঠা) > ই, ঈ
করি, করিএ

প্রথমপুরুষ

সং. 'তি' > ই, এ
দেই, জাগই। আবার বিভক্তি লোপ পেয়ে হয়েছে—জাগ।
কখনো-কখনো বিকরণজাত 'য়' যুক্ত হতে দেখা যায়—তার ফলে হয়েছে ইএ—শুণীএ

মধ্যমপুরুষ

১. সং. 'সি' > সি
চাহসি, করসি, দেসি
২. সং 'থ' > হ, হা
পালাহ, যাহ
৩. সং. 'ত' > অ

আধুনিক বাংলায়

আধুনিক বাংলায় এসে ক্রিয়ায় বচনভেদ সম্পূর্ণ লোপ পেল। একবচন বা বহুবচনে ক্রিয়ার রূপে কোনো হেরফের হয় না।

উত্তমপুরুষ

চলই > চলি, করই > করি

মধ্যমপুরুষ

(সাধারণ) চলহ > চলঅ > চল, চলো
করহ > করঅ > কর, করো
(তুচ্ছার্থে)—
করসি > করিস
(সম্ভ্রমসূচক)
(এ) ন্ — করেন, চলেন

প্রথমপুরুষ

(সাধারণ)এ—যাএ > যায়, চলে,
(সম্ভ্রমসূচক)—এ (ন্)—যান, খান, চলেন

দুই. বর্তমান অনুজ্ঞা

প্রাচীন বাংলায় বর্তমান কালের অনুজ্ঞায় প্রথম পুরুষ ও মধ্যম পুরুষের ক্রিয়ারূপে বিবর্তন লক্ষ করব আমরা।

প্রথমে দেখব **প্রথমপুরুষ—**

সং. -তু থেকে প্রাকৃত ও অপভ্রংশ পেরিয়ে প্রাচীন বাংলায় এল -উ। এবং তা থেকে আধুনিক বাংলায় -উক।

উদাহরণ—'করোতু' (সং) > করউ (প্রা. বাং.) > করুক (আ. বাং.)

'দয়তু' (< দদাতু) > দেউ (প্রা.বাং.) > দেউক (মধ্য বাং) > দিউক, দিক (আ. বাং.)

মধ্যমপুরুষ—

প্রাচীন বাংলায় মধ্যম পুরুষের অনুজ্ঞায় পাঁচটি বিভক্তি ব্যবহৃত হতে দেখা গেছে। এগুলি হল শূন্য বিভক্তি, -হি, -হ, -অ, -হু।

১. শূন্য বিভক্তি—সং বুধ্য > প্রাকৃ. বুজ্ঝ > প্রা.বাং. বুঝ।

২. -হি বিভক্তি—সং. -হি > প্রাকৃ. -হি > প্রা.বাং. -হি (হোহি, জাহি)। মধ্য বাংলায় ও আধুনিক বাংলায় -হি নেই।

৩. -হ বিভক্তি—সং. -থ > প্রাকৃ. -হ > প্রা. বাং. -হ (জাহ, করহ)।

৪. -অ বিভক্তি—সং -ত > প্রাকৃ. -অ > প্রা. বাং. -অ (জানত > জান, করত > কর)।

৫. -হু বিভক্তি—সং. -থস্ > থঃ (লট্ দ্বিবচন) > প্রা. বাং. -হু (জাহু, হোহু)। মধ্য বাংলায় এবং আধুনিক বাংলায় এই -হু একেবারেই লুপ্ত।

সম্ভ্রমার্থে -উন হয় মধ্যমপুরুষের একবচনে ও বহুবচনে।

যাউন > যান, দিউন > দিন।

তিন. ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা

প্রাচীন বাংলায় ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা কেবল মধ্যমপুরুষেই ছিল। সেই মধ্যম পুরুষের অনুজ্ঞার বিভক্তিটি হল -হ। আর এই -হ এসেছে সংস্কৃতের পরস্মৈপদী লৃট্ (ভবিষ্যৎ) মধ্যমপুরুষের -থঃ (করিষ্যথঃ) বা -থ (করিষ্যথ) থেকে। বিবর্তন দেখানো যায় এইভাবে—

সং. করিষ্যথ > প্রা.বাং. করিহ > মধ্য বাং. করিহ > আং বাং. করিও

যাস্যথ > প্রাং. বাং. যাইহ > মধ্য বাং - যাইহ > আ. বাং. যাইও

১৯.৬ কৃদন্ত কাল (participial)

মৌলিক কালের দুটি রূপ—বর্তমান ও ভবিষ্যতের নির্দেশক ও অনুজ্ঞা কেমনভাবে বিবর্তিত হয়েছে তা আমরা দেখলাম উপরে ১৯.৫.৩ পরিচ্ছেদে। এবার দেখব কৃদন্ত কালের বিবর্তনের ধারাটি। ১৯.৪ পরিচ্ছেদে ক্রিয়ার কালের ছকটি দেখলেই বোঝা যাবে যে, কৃদন্ত কালের তিনটি রূপ হতে পারে—সাধারণ অতীত, ভবিষ্যৎ ও নিত্যবৃত্ত। আমরা একে একে এই তিনটি কৃদন্ত কাল দেখব।

এক. কৃদন্ত অতীত কাল

কৃদন্ত অতীত কালের কথা বলার আগে বুঝে নেওয়া দরকার এই কালকে 'কৃদন্ত' কাল কেন বলা হয়। সংস্কৃতের কৃৎপ্রত্যয়-জাত শব্দ থেকে প্রাকৃতের মধ্য দিয়ে এসেছে বলে এই কালকে 'কৃদন্ত' (কৃৎ + অন্ত) কাল বলা হয়।

বাংলার অতীত কাল সংস্কৃত নিষ্ঠা প্রত্যয়জাত 'ত' ও '-ইত' (past participle) দিয়ে গঠিত শব্দ থেকে এসেছে। ক্রিয়া সকর্মক হলে এই প্রত্যয় দুটি কর্মবাচ্যে ব্যবহৃত হত, এবং ক্রিয়া অকর্মক হলে কর্তৃবাচ্যে বা ভাববাচ্যে ব্যবহৃত হত। যেমন, কর্মবাচ্যে—*তেন ইদং পশ্যম্, তেন ইদং কৃতম্;* কতৃবাচ্যে—*স গতঃ, ময়া কৃতম্* ; ভাবাচ্যে—**তেন গতম্**।

বাংলায় কৃদন্ত অতীত কাল দুইভাবে গঠিত হয়—

ক. -ল-প্রত্যয়যুক্ত, এবং খ. -ল-প্রত্যয়হীন।

ক. -ল-প্রত্যয়যুক্ত শব্দই বাংলা অতীত কালের বৈশিষ্ট্য। খাইল, বসিল, দেখিল—এই ল-প্রত্যয়ান্ত অতীতকাল বাংলায় চলে এসেছে সংস্কৃত থেকে। সংস্কৃতে ধাতুর সঙ্গে ক্ত-প্রত্যয় যোগ করে পরে -ইল প্রত্যয় করে পাওয়া গেল ল-প্রত্যয়ান্ত অতীত কাল। বিবর্তনের রূপটি এইরকম—

সং. -ক্ত প্রত্যয় > প্রাকৃ. -ত্ত > অপ. -ইল্ল > ল

কয়েকটি ল-প্রত্যয়ান্ত বাংলা অতীত রূপের উদাহরণ দেখা যাক—

আ-√গম্ + ক্ত > আগত > আগঅ + ইল্ল > আয়িল্ল > আইল

√গম্ + ক্ত > গত + ইল্ল > গমিল্ল > গইলআঁ > গেল

প্রাচীন বাংলায় ক্রিয়ার লিঙ্গের একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, কর্তা-কর্ম স্ত্রীলিঙ্গ হলে ক্রিয়াও স্ত্রীলিঙ্গ হয়ে যেত।

'ঘরক আইলী বড়ায়ি'

'আজি ভুসুকু বাঙ্গালী ভইলী'

খ. **-ল প্রত্যয়হীন অতীতকালও** পাওয়া যায় বহু ক্ষেত্রে। -ল প্রত্যয়যোগে যেমন অনেক ক্ষেত্রে অতীত কাল গঠিত হত, তেমনি -ত এবং -ইত যোগেও অতীতকালের দৃষ্টান্ত কম নয়।

প্রথমে দেখা যাক **-ত প্রত্যয়জাত অতীতকাল**—

পইঠা (প্রবেশ করল), দিঠা (দেখল), গউ (গেল) এই অতীতবাচক শব্দগুলি কীভাবে পাওয়া গেল দেখা যাক—

প্রবিষ্ট > পইট্‌ঠ > পইঠ > পইঠা

দৃষ্ট > দিট্‌ঠ > দিঠ > দিঠা

গত > গঅ > গই, গউ

এবার দেখা যাক **-ইত প্রত্যয়জাত অতীতকাল**—

বাহিউ (বইল, প্রবাহিত হল), বিকসিউ (বিকশিত হল), চলিউ (চলল)

এই অতীতবাচক শব্দগুলির বিবর্তনের ধারা এইরকম—

বাহিত > বাহিও > বাহিউ

বিকশিত > বিকসিঅ > বিকসিউ

চলিত > চলিঅ > চলিউ

দুই. কৃদন্ত ভবিষ্যৎ কাল

কৃদন্ত ভবিষ্যৎ কালের -ইব রূপটি এসেছে সংস্কৃতের তব্য প্রত্যয় থেকে, এইভাবে—তব্য > ইতব্য > ইঅব্ব > ইব্ব > ইব। -ইব প্রত্যয়ের সঙ্গে পুরুষবাচক প্রত্যয় (personal affix) যোগ করে ভবিষ্যৎ কালের ক্রিয়াপদ গঠিত হয়। প্রাচীন বাংলায় অবশ্য ভাব-কর্মবাচ্যে কোনো বিভক্তি যোগ করার দৃষ্টান্ত দেখা যায় না।

প্রাচীন ও মধ্য বাংলার ভবিষ্যৎ ক্রিয়াপদ সম্বন্ধে কয়েকটি ব্যাপার বিশেষভাবে লক্ষ করতে হবে—

১. কখনো-কখনো কর্তৃবাচ্যের মধ্যম পুরুষে '-ইবে' বা -বেঁ ব্যবহৃত হত—'অহেরি জাইবেঁ'।
২. সকর্মক ক্রিয়ায় কর্ম স্ত্রীলিঙ্গ হলে কৃদন্ত ভবিষ্যৎ রূপেরও লিঙ্গবদল ঘটত—'মই দিবি পিরিচ্ছা।'
৩. মধ্য বাংলায় উত্তম পুরুষে '-ও' এবং 'অওঁ' বিভক্তি যোগ করা হত—করিবোঁ, নিবেদিবোঁ ; বধওঁ।
৪. মধ্যম পুরুষে '-এ', '-এঁ' এবং 'ই' বিভক্তির যোগ হত—যাইবে, যাইবেঁ ; করিবেঁ; করিবি।
৫. প্রথম পুরুষে '-এ' ও 'এঁ' বিভক্তি যোগ হত—করিবে, করিবেঁ।

প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক বাংলায় **ভবিষ্যৎ কালের ক্রিয়াপদে** কয়েকটি **স্বার্থিক প্রত্যয়ের** (pleonastic affix) ব্যবহার লক্ষ করি। স্বার্থিক প্রত্যয়ের ব্যবহারে শব্দের অর্থ বদলায় না বলেই এই ধরনের প্রত্যয়কে স্বার্থিক (স্ব + অর্থ + ইক) প্রত্যয় বলা হয়। কয়েকটি স্বার্থিক প্রত্যয় হল—ক, -সিয়া বা -সিয়াঁ, -সে, -গিয়া, -গে। **স্বার্থিক প্রত্যয়ান্ত শব্দের** উদাহরণ—কএলেক, দিউক বা দেউক (= দিক), যাও গিয়া, আন গিয়া, চড়সিয়াঁ (= চড়ো গিয়ে)। এ থেকে আধুনিক বাংলায় এবং উপভাষায় এসেছে—যাওগে, আনোগে, দেখ্‌সে (দেখো এসে) ইত্যাদি শব্দ।

তিন. কৃদন্ত নিত্যবৃত্ত কাল (habitual past)

অধিকাংশ ভাষাতাত্ত্বিকের অনুমান, বাংলায় নিত্যবৃত্ত কালের -ইত প্রত্যয়টি এসেছে সংস্কৃত শতৃ প্রত্যয় থেকে। শতৃ-প্রত্যয়ান্ত শব্দের অন্তে লটে বিভক্তি যোগ হয়ে যেসব রূপ হয় তার

মধ্যে কয়েকটি হল ধাবৎ (running), পতৎ (falling), গচ্ছৎ (going)। শতৃ-প্রত্যয়ান্ত শব্দের আর একটি রূপ ধাবন্ত, গচ্ছন্ত, পতন্ত। প্রাকৃতে শতৃর এই রূপটিই গৃহীত হয়।

-অৎ > -অন্ত > -এন্ত > -এত > -ইত

এই -ইত প্রত্যয়ের সঙ্গে পুরুষবাচক বিভক্তি যোগ করে গঠিত হয়েছে বাংলা নিত্যবৃত্ত অতীতকালের ক্রিয়াপদ। অনেক ক্ষেত্রেই অবশ্য মূল -অন্ত রূপই পাওয়া যায়। চর্যায় আছে এর দৃষ্টান্ত—'মূঢ়া অচ্ছন্তে লোঅ ন পেখই', 'ণিঅ ঘরিণি লই কেলি করন্ত', 'পাঞ্চ কেড়ুয়াল পড়ন্তে মাঙ্গে' ইত্যাদি।

-ইত রূপ মধ্য বাংলায় প্রচুর পাওয়া যায়—

'পূর্ণ ঘট পাতী বড়ায়ি চাহিত (চাইল) মঙ্গলে',

'বিধি না লিখিত (অর্থাৎ লিখল না) তার কপালের ভাতে'।

আধুনিক বাংলায় উত্তম পুরুষে -ইতাম বিভক্তির বহুল প্রয়োগ হয়—জানিতাম, দেখিতাম, করিতাম। আঞ্চলিক ভাষায় আছে -তেম বিভক্তি, যথা জানতেম, করতেম। মধ্যমপুরুষে -ইতে, -তে (তুমি জানিতে, তুমি জানতে)। প্রথম পুরুষে -তো, -ত (জানত, খাইত)। সম্ভ্রমসূচক বিভক্তি -ইতেন, -তেন(জানিতেন, জানতেন ; খাইতেন, খেতেন)।

১৯.৭ যৌগিক কাল (compound tense)

যৌগিক ক্রিয়া ও যৌগিক কাল এক নয়। তবে যৌগিক ক্রিয়া থেকেই যৌগিক কালের সৃষ্টি। 'পড়িয়া আছে', 'ফুটিয়া আছে' এগুলি যৌগিক ক্রিয়ার উদাহরণ। এই দুটি অংশ একসঙ্গে মিলে গিয়ে যখন 'পড়িয়াছে' বা 'ফুটিয়াছে' হয়, তখন সেটাই হয়ে যায় যৌগিক কালের উদাহরণ। যৌগিক ক্রিয়াপদের দুটি অংশ—প্রথম অংশ কৃদন্ত অতীত অথবা শতৃ-প্রত্যয়ান্ত বর্তমান এবং দ্বিতীয় অংশ আছ্ ধাতুর (যা সংস্কৃত অস্ ধাতু থেকে এসেছে) সমাপিকা পদের রূপ। যৌগিক ক্রিয়ার এই দুই অংশকে দুটি উপাদান (element) ধরলে বলা যায় যে, এই দুই অংশ বা উপাদানের মধ্যে একটা ফাঁক বা যতি (juncture) থাকে। প্রাচীন বাংলায় যৌগিক ক্রিয়ার প্রচলন ছিল প্রচুর, ছিল না যৌগিক কাল। মধ্য বাংলায়ই প্রথম যৌগিক কালের প্রয়োগ দেখা যায়। যৌগিক ক্রিয়ার দুটি অংশের ব্যবধান ঘুচে গিয়ে দুটি অংশ এক হয়ে গিয়েই যৌগিক কাল রূপলাভ করে। মধ্য বাংলায় যৌগিক কালের ব্যবহার শুরু হয় বটে, তবে তার উদাহরণ সুপ্রচুর নয়। যৌগিক কাল আধুনিক বাংলার একটি বৈশিষ্ট্য।

ভাষাতাত্ত্বিকদের অনুমান, প্রাচীন বাংলার শেষ দিক থেকে যৌগিক কালের সূত্রপাত হয়। যৌগিক কালের দেখা পাওয়া যায় প্রাচীন মৈথিলীতে, প্রাচীন ওড়িয়াতে এবং প্রাচীন অবধিতেও। এইজন্যই অনুমান করা হয় যে, যৌগিক কাল প্রাচীন বাংলার শেষ পর্বে হয়তো উদ্ভূত হয়েছিল।

বিভিন্ন ক্রিয়ারূপে যৌগিক কালের বিভিন্ন রূপ দেখা গেছে, -ইতে অন্তক ক্রিয়া, -ইয়া অন্তক ক্রিয়া, -ইল অন্তক ক্রিয়া প্রভৃতি যোগে যৌগিক কাল গঠিত হত।

১. প্রথম অংশে -ইতে অন্তক অসমাপিকা ক্রিয়া এবং দ্বিতীয় অংশে আছ্ ধাতুর বর্তমান কালের রূপ মিলে গঠিত যৌগিক ক্রিয়ার ঘটমান বর্তমান। একটি দৃষ্টান্ত হল—চিন্তিতেঁ আছে। আধুনিক বাংলায় উদাহরণ—করিতেছে, খাইতেছে। বাংলাদেশে কর্‌ত্যাছে, দেখ্‌ত্যাছে। এ থেকে করছে, খাচ্ছে, দেখছে ইত্যাদি।

২. প্রথম অংশে -ইতে অন্তক অসমাপিকা ক্রিয়া এবং দ্বিতীয় অংশে আছ্-ধাতুর অতীত রূপ মিলে ঘটমান অতীতের অর্থ প্রকাশ করল—কর্ + ইতে + আছিল = করিতেছিল > করছিল ; দেখ + ইতে + আছিল = দেখিতে আছিল > দেখিতেছিল > দেখছিল।

৩. প্রথম অংশে -ইয়া অন্তক অসমাপিকা ক্রিয়া এবং দ্বিতীয় অংশে আছ্ -ধাতুর বর্তমান কালের রূপ মিলে পুরাঘটিত বর্তমান কালের অর্থ প্রকাশ করল—দেখ্ + ইয়া + আছে > দেখিয়াছে ; মধ্যবাংলায় এর উদাহরণ—ফুটিছে, শুনিআছ।

৪. প্রথম অংশে -ইল অন্তক অসমাপিকা ক্রিয়া এবং দ্বিতীয় অংশে আছ্-ধাতুর অতীত কালের রূপ মিলে প্রকাশ করল পুরাঘটিত অতীত কাল—বহিলছে, ফুটিলছে।

আধুনিক বাংলায় যৌগিক কাল অনেকবেশি সংহত রূপ লাভ করেছে। বিশেষত মান্য বাংলায়ই সংহতি বা সংক্ষেপণ বেশি—শুনিআছে > শুনেছে, করিতেছে > কর্‌তেছে > করছে। আবার কোনো-কোনো যৌগিক ক্রিয়ারূপ কেবল উপভাষাতেই পাওয়া যায়। যেমন প্রথম অংশে ইল -অন্তক যৌগিক কাল ঝাড়খণ্ডি উপভাষায় পাওয়া যায়—গেল্‌ছে (জল্‌কে গেল্‌ছে)।

১৯.৮ লিঙ্গ

প্রাচীন ভারতীয়-আর্য ভাষায়, বিশেষত সংস্কৃতে লিঙ্গভেদ ছিল বিশেষ্যে, বিশেষণে, সর্বনামে। ইদম্ শব্দটির রূপ দেখলেই সর্বনামে লিঙ্গভেদের বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যায়। ইদম্ শব্দের পুংলিঙ্গে প্রথমার একবচনের রূপ 'অয়ম্', স্ত্রীলিঙ্গে 'ইয়ম্' এবং ক্লীবলিঙ্গে 'ইদম্'। পরে সংস্কৃতে অধিকাংশ আ-কারান্ত ও ঈ-কারান্ত শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ বলে গণ্য হল এবং যেসব স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ ব্যঞ্জনান্ত, সেগুলি স্ত্রীপ্রত্যয়যুক্ত হয়ে নতুনভাবে স্ত্রীলিঙ্গের রূপ ধারণ করল। সুকুমার সেন এর কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিয়েছেন, যেমন বাচ্ > বাচা, দিশ্ > দিশা, নিশ্ > নিশা, নাস্ > নাসা। একথাও মনে রাখা দরকার যে, উক্ত দুটি স্ত্রীপ্রত্যয়ের মধ্যে, অর্থাৎ আ-প্রত্যয় ও ঈ-প্রত্যয়ের মধ্যে আ-প্রত্যয়েরই ছিল প্রাধান্য। মধ্য ভারতীয়-আর্য ভাষার স্তরে এসে, অর্থাৎ প্রাকৃতের স্তরে এসে ঈ-প্রত্যয়ের ব্যবহার বেড়ে গেল এবং একই সঙ্গে আ-প্রত্যয়ের ব্যবহার কমতে কমতে প্রায় লোপ পেয়ে গেল। ক্রমে অপভ্রংশ ও অবহট্‌ঠেও ঈ-প্রত্যয়ের প্রাধান্য বজায় রইল। আ-প্রত্যয় দুর্লক্ষ্য হয়ে পড়ল। নব্য ভারতীয় আর্য ভাষায়ও ঈ-প্রত্যয় হয়ে উঠল একমাত্র স্ত্রীপ্রত্যয়। অবহট্‌ঠে পদান্ত আ-কার বহু ক্ষেত্রেই অ-কারে পরিণত হল।

বাংলা ভাষায় স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ গঠনের জন্য তিনটি স্ত্রীপ্রত্যয় আছে—

১. **-নী** বা **-ইনী**, ২. **-আনী**, ৩. **-ঈ (ই)** প্রত্যয়। -নী প্রত্যয়ান্ত শব্দের দৃষ্টান্ত হল 'পত্নী' -ইনী প্রত্যয়ান্ত শব্দ হল 'দুঃখিনী', 'মানিনী'। -আনী একটি সংস্কৃত প্রত্যয়। এই প্রত্যয়ের যোগে গঠিত শব্দ হল 'মাতুলানী', 'মহেন্দ্রাণী', 'ভবানী' ইত্যাদি। স্ত্রীজাতি বোঝাতে ব্যবহৃত হয় -ঈ প্রত্যয় বা -ই প্রত্যয়। যেমন 'বামনী' >'বামনি', 'খুড়ী' > 'খুড়ি', 'কাকী' > 'কাকি'।

শব্দকে স্ত্রীলিঙ্গে পরিণত না করেও স্ত্রীলিঙ্গবাচক অর্থ প্রকাশ করা যায়। তা হল শব্দের আগে স্ত্রীবাচক শব্দের ব্যবহার। যেমন—মাদি শুয়োর, গাই গোরু।

১৯.৯ বচন

সংস্কৃতে একবচন, দ্বিবচন ও বহুবচন এই তিনটি বচন ছিল। প্রাকৃতের যুগে দ্বিবচন লুপ্ত হয়ে যায়। প্রাচীন বাংলায় এবং আদিমধ্য বাংলায় একবচন ও বহুবচনের রূপ ছিল অভিন্ন। আবার আদিমধ্য বাংলায়, বিশেষত 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে' কয়েকটি ক্ষেত্রে দ্বিবচনের রূপ পাওয়া যায়। আধুনিক বাংলায় বচন দুটি—একবচন ও বহুবচন।

বাংলায় একবচনের জন্য কোনো আলাদা বিভক্তি ব্যবহৃত হয় না। কেবল বিশেষ্য শব্দটিই ব্যবহৃত হয়। তবে **একবচনের বিশেষ্য পদকে বহুবচনে রূপান্তরিত করার** কয়েকটি **নিয়ম** আছে।

১. কর্তৃকারকে ষষ্ঠী বিভক্ত্যন্ত -রা বা -এরা যোগে বাংলায় বহুবচন করার নিয়ম আছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে দেখতে পাই 'আহ্মারা', 'তোহ্মারা' প্রভৃতি। এই -রা, -এরা আধুনিক বাংলাতেও বহুলপ্রচলিত—লোকেরা, শ্রমিকেরা, পণ্ডিতেরা, পাখিরা, বধূরা।

২. সংস্কৃত 'কুল' শব্দজাত -গুলা, -গুলি, -গুলিন, -গুলো প্রভৃতি বহুবচনের বিভক্তি যোগের উদাহরণ দেখা যায় মধ্যযুগের বাংলাতেও। ষোড়শ শতকে 'বাণগুলা', 'বামনগুলা' ব্যবহৃত হত। একইভাবে ব্যবহৃত হত 'গুটি' বা 'গোটা' শব্দ—'বাণগোটা লুফি বাঘা চিবাইল দাঁতে'। আধুনিক বংলায় 'গোটা' প্রধানত বিশেষণে অখণ্ড বা সম্পূর্ণ অর্থেই ব্যবহৃত হয়। বহুবচনের অর্থে প্রধানত উপভাষায় এর ব্যবহার দেখা যায়।

৩. আধুনিক বাংলায় প্রাণীবাচক শব্দের পরে বা আগে সকল, সব, যূথ, দল, সমূহ, কুল প্রভৃতি বহুবচনসূচক শব্দ বসে—গজযূথ, পথিকদল, রাক্ষসকুল ইত্যাদি। অপ্রাণীবাচক শব্দের আগে বা পরে ব্যবহৃত হয় পুঞ্জ, রাশি, রাজি ইত্যাদি—বৃক্ষরাজি, নক্ষত্রপুঞ্জ ইত্যাদি। এছাড়া আছে জাল, সমাজ প্রভৃতি বহুবচনবাচক শব্দ। চর্যাপদে আছে 'জোইনিজাল' (অর্থাৎ যোগিনীজাল = যোগিনীরা) ; মধ্যবাংলায় আছে 'রমণীসমাজ'। এগুলির কোনোটি অবিকৃত সংস্কৃত শব্দ (যেমন রাশি, পুঞ্জ, সমূহ, কুল, সকল, যূথ ইত্যাদি), আবার কোনো কোনোটি প্রাকৃত বা অবহট্‌ঠ হয়ে বাংলায় ব্যবহৃত। আবার আরবি বা ফারসি থেকে আগত বহুবচনাত্মক শব্দও আছে। যেমন 'মহল' (মহিলামহল, বন্ধুমহল)।

৪. কর্তৃকারক ভিন্ন অন্য কারকে -দিগ, -দিগকে, -দিগের প্রভৃতি বিভক্তি শব্দকে বহুবচনের অর্থ দেয়—আমাদিগকে, তাহাদিগের। এই -দিগ বা -দিগকে বিভক্তিদুটির উৎস নির্দিষ্টভাবে নির্ণয় করা যায়নি। কেউ বলেন সংস্কৃত 'আদিক' থেকে এসেছে, কেউ বলেন ফারসি 'দিগর' থেকে।

৫. কখনো-কখনো বিশেষ্য, বিশেষণ ও সর্বনামের দ্বিত্ব বা পুনরাবৃত্তি ঘটিয়ে বহুবচনের অর্থ প্রকাশ করা হয়। 'উঁচা উঁচা পাবত', 'জে জে আইলা, তে তে গেলা' ইত্যাদি চর্যাগীতিতে ব্যবহৃত। কখনো কখনো অসমাপিকা ক্রিয়ার দ্বিত্ব করেও বহুবচন করা হয়—'তুলা ধুনি ধুনি'। আধুনিক বাংলায় এই রীতির ব্যাপক প্রচলন হয়। কে কে আসবে? 'গগনে গগনে মেঘ ঘনবরষা', পাকা পাকা কলা।

১৯.১০ কারক-বিভক্তি

বাক্যে ক্রিয়ার সঙ্গে বিশেষ্য বা সর্বনামের সম্পর্ককেই কারক বলা হয়। ক্রিয়া ছাড়া অন্য অন্য পদের পারস্পরিক সম্বন্ধকে কারক বলা হয় না। 'তোমার বইটি পড়লাম' বা 'বিকেলের রোদ ভারি মিষ্টি' এই দুই বাক্যে 'বইয়ের' সঙ্গে 'তোমার'-এর সম্বন্ধ এবং 'বিকেল'-এর সঙ্গে 'রোদ'-এর সম্বন্ধ আছে। কিন্তু তা কারক-সম্বন্ধ নয়। যেহেতু এখানে ক্রিয়ার সঙ্গে সম্বন্ধের কথা বলা হয়নি।

কারক যে-চিহ্ন দিয়ে প্রকাশিত হয়, তাকে বিভক্তি বলা হয়। সংস্কৃতে বিভক্তি আটটি, প্রথমা, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, চতুর্থী, পঞ্চমী, ষষ্ঠী, সপ্তমী ও সম্বোধন। প্রাকৃতে বিভক্তি পাঁচটি, কোনো-কোনো ক্ষেত্রে চারটি। সম্বোধন ক্রমে লোপ পেয়েছে। বাংলায় বিভক্তির সংখ্যা সাত। সম্বন্ধ পদকে দীর্ঘকাল কারক ধরা হয়েছে। বস্তুতপক্ষে সম্বন্ধ পদ কারক নয়, কেননা সম্বন্ধ পদে ক্রিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক বোঝায় না। প্রতিটি কারকের জন্য একটি করে বিভক্তি নির্দিষ্ট আছে। কর্তৃকারকে প্রথমা, কর্মকারকে দ্বিতীয়া, করণ কারকে তৃতীয়া, সম্প্রদান কারকে চতুর্থী, অপাদান কারকে পঞ্চমী, সম্বন্ধ পদে ষষ্ঠী এবং অধিকরণ কারকে সপ্তমী বিভক্তি। বাক্যে কোনো শব্দ যদি বিভক্তিহীন হয় তবে তাকে ভেবে নেওয়া হয় 'শূন্য বিভক্তি'।

প্রাচীন বাংলায় কারক ছয়টি থাকলেও বিভক্তির সংখ্যা মাত্র তিন—কর্তা-কর্মের বিভক্তি, করণ-অধিকরণের বিভক্তি, এবং সম্বন্ধ পদের বিভক্তি। আধুনিক বাংলায় কর্মকারক ও সম্প্রদায় কারকের বিভক্তি একই এবং এর রূপগত পার্থক্যও নেই। তাই কর্ম ও সম্প্রদানের পৃথক প্রয়োগ হয় না।

এবারে সংক্ষেপে প্রত্যেকটি কারকের বিবর্তন দেখব।

কর্তৃকারক

আধুনিক বাংলায় সচরাচর কর্তৃকারকে বিভক্তির চিহ্ন থাকে না, যাকে আমরা 'শূন্য বিভক্তি' বলেছি। সংস্কৃতের -স্ প্রকাশিত হত বিসর্গ দিয়ে (- ঃ)। যেমন সদ্যস্ = সদ্যঃ, মনস্ = মনঃ। পরে বিশেষত অপভ্রংশের যুগে এই বিসর্গ লোপ পায়। প্রাচীন বাংলাতেই বিভক্তিচিহ্নহীন কর্তৃকারক প্রচলিত হয়—

লুই ভণই গুরু পুচ্ছিঅ জাণ (চর্যাগীতি)
কত কোটি চাঁদ কাঁদে হেরি মুখখানি (মুরারি গুপ্ত)

আবার কর্তৃকারকে 'এ' বিভক্তির প্রয়োগ শুধু আধুনিক কালেই নয়, দেখা যায় প্রাচীন ও মধ্য বাংলাতেও।

শুনহ রাজার ঝি।
লোকে না বলিবে কি॥ (চণ্ডীদাস)
না ছাড়ে নান্দের **পোএ**। (শ্রীকৃষ্ণকীর্তন)

মনে করা হয়, সংস্কৃতের করণ-বিভক্তি অর্থাৎ তৃতীয়া বিভক্তির -এন হয়তো কর্তৃকারকের সঙ্গে মিশে গিয়ে -এ হয়েছে। আধুনিক বাংলায়ও কর্তৃকারকে এ বিভক্তির বহুল ব্যবহার, মান্য বাংলায় এবং উপভাষায়—

মায়ে ঝিয়ে এসেছে।
কুমিরে ছাগল খায়।
মশায় খায়।

আধুনিক বাংলায় বিশেষত অনির্দিষ্ট কর্তায় -এ, -তে, -য় এই তিনটি বিভক্তিই দেখা যায়।

গোরুতে ঘাস খায়।
গাধায় মাল বয়।

কর্মকারক

কর্মকারকে প্রাচীন কালে '-ক' ও '-কে' এবং আধুনিক বাংলায় '-কে' ও '-রে' বিভক্তির ব্যবহার দেখা যায়। প্রাচীন ও মধ্য বাংলায় অবশ্য বিভক্তিহীন কর্মকারকের দৃষ্টান্তও আছে—

লুই ভণই গুরু পুচ্ছিঅ জান (চর্যাগীতি)

আধুনিক বাংলায় অনির্দিষ্ট কর্মে বিভক্তিহীনতা দেখা যায়—

ডাক্তার ডাকো।
রাখাল মাঠে গোরু চরায়।

আবার কর্ম নির্দিষ্ট হলে বিভক্তিযুক্ত হয়—

সেন ডাক্তারকে ডাকো।
ড্রাইভারকে টাকা দাও।

'-কে'-র বদলে '-রে' পাওয়া যায় প্রধানত বঙ্গালী উপভাষায়। রাঢ়ীতে 'কে' বেশি ব্যবহৃত। তবে কবিতায়, প্রবাদপ্রবচনে 'রে' বহুলব্যবহৃত।

'আমারে ডাক দিল কে ভিতরপানে'।
'যারে নিজে তুমি ভাসিয়েছিলে...'।

কখনো-কখনো কবিতায় এবং কথ্য ভাষায় '-য়' বিভক্তিও ব্যবহৃত হয়—

'আমায় বোলো না গাহিতে...'।
আমায় কী করতে হবে?

করণকারক

সংস্কৃতে করণ কারকে তৃতীয়া বিভক্তির চিহ্ন ছিল (১)-আ—সাধুনা, মনসা ; (২) -এন—বালকেন। এই -এন বাংলায় এসে -এ হয়েছে। প্রাচীন ও মধ্য বাংলায় -এঁ ছিল—

অপণা মাসেঁ হরিণা বৈরী।

করণ কারকে -তে বিভক্তির প্রয়োগ হয়। এবং সেই প্রয়োগ অনেকসময় অধিকরণের সঙ্গে মিলে যায় এবং বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে—

হাতে মারে

তলোয়ারে কাটে

এগুলি করণ কারকের দৃষ্টান্ত। কিন্তু নীচের দৃষ্টান্ত নিশ্চিতভাবে অধিকরণ কারকের—

সুখেতে কাল কাটে।

চর্যাগীতিতে আছে—

সুখদুঃখেতেঁ নিচিত মরিআই।

সম্প্রদান কারক

প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষার যুগ থেকেই দান অর্থে সম্প্রদান বোঝাত। সম্প্রদানের বিভক্তি চতুর্থী। মধ্য ভারতীয় আর্য ভাষায় অর্থাৎ প্রাকৃত-অপভ্রংশে সম্প্রদান আর সম্বন্ধে তফাত থাকল না। এবং চতুর্থীর বদলে ষষ্ঠী বিভক্তির প্রচলন হল। প্রাকৃত-অপভ্রংশে এবং আধুনিক বাংলায় সম্প্রদান ও কর্মকারকে বিভক্তির পার্থক্য তেমন নেই। উভয় ক্ষেত্রেই -এ, -কে, -রে বিভক্তি ব্যবহৃত হয়। সম্প্রদানের দৃষ্টান্ত—

অন্নহীনে অন্ন দাও।

ভিক্ষুককে খাবার দাও।

যদিও আধুনিক কালে প্রশ্ন উঠেছে, বাংলায় সম্প্রদানকে কারক হিসাবে মান্য করা উচিত কি না। কেননা, ব্যাকরণগতভাবে যদি মনেও করি যে, 'অন্নহীনকে অন্ন দাও' এটা সম্প্রদান কারক, তাহলে অর্থগতভাবে কিংবা ব্যাকরণগতভাবে নীচের বাক্যগুলোকেই-বা সম্প্রদান বলা হবে না কেন—

আমাকে জল দাও।

আমাকে টাকা দাও।

স্বত্বত্যাগ করে দেবার সূত্রটি বাংলায় ক্ষেত্রে অচল। তাই আধুনিক বাংলায় সম্প্রদান কারক নেই বলেই ভাষাতাত্ত্বিকদের অভিমত।

অপাদান কারক

সংস্কৃতে অপাদান কারকের বিভক্তি পঞ্চমী। বৃক্ষাৎ পততি (গাছ থেকে পড়ছে)। কিন্তু বাংলায় অপাদানের কোনো বিভক্তি নেই। কতকগুলি অনুসর্গই বিভক্তির কাজ করে, যেমন হইতে, থেকে, হতে, অপেক্ষা, চাইতে, চেয়ে।

গাছ থেকে ফল পড়ে।
আকাশ থেকে বৃষ্টি পড়ে।

বাংলা ভাষায় অপাদানের বিভক্তি না থাকায় যে অনুসর্গগুলি অপাদানের বিভক্তি হিসাবে কাজ করে, সেগুলি আসলে করণ, সম্বন্ধ ও অধিকরণের বিভক্তি।

প্রাচীন বাংলায় পাওয়া যায় -হু বা -হুঁ—'খেপহুঁ জোইনি লেপ না জাঅ', 'আজহু সপত দিবসে'। আজহু = আজ থেকে, কৃষ্ণহু = কৃষ্ণের থেকে। রঅণহু = রত্ন থেকে। ভাষাতাত্ত্বিকদের মতে এই -হু বা -হুঁ এসেছে সংস্কৃত ভূ ধাতু থেকে।

আরও একটি প্রাচীন বিভক্তি -ত, যার উদাহরণ—'ডোম্বিত আগলি নাহি ছিণালী'। ডোম্বিত অর্থ ডোম্বির থেকে।

সম্বন্ধ পদ

আগেই বলেছি যে, বহুকাল যাবৎ 'সম্বন্ধ'-কে কারক-প্রকরণের মধ্যে ধরা হলেও সম্বন্ধের সঙ্গে ক্রিয়ার সম্পর্ক না থাকায় একে কারক বলা যায় না। সে যাই হোক সম্বন্ধ পদে প্রাচীন ও মধ্য বাংলায় -ক এবং -রে বিভক্তির প্রচলন ছিল—মাথক, হাতক, ঠাকুরক, গৃহস্থক ; তোহোরে ইত্যাদি।

প্রাচীন বাংলায় ষষ্ঠী বিভক্ত্যন্ত পদ বিশেষণ হিসাবে ব্যবহৃত হত এবং সেই বিশেষণটিতে পরের বিশেষ্যপদের লিঙ্গ যোগ হত, যেমন—হাড়েরী মালী।

আধুনিক বাংলায় ষষ্ঠী বিভক্তির ডবল প্রয়োগের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়—সত্যিকারের কথা, যদিও একে অপপ্রয়োগই বলা উচিত।

অধিকরণ

প্রাচীন ও মধ্য বাংলায় অধিকরণ কারকে ব্যবহৃত হত -রে, -তে, -তেঁ, -এত, -ত, -হি, -হিঁ প্রভৃতি বিভক্তি। ঘরহি (ঘরে), গগনত (গগনে), তরুত (তরুতে), গাছত (গাছে)। মধ্য বাংলা থেকেই '-এ' বিভক্তির বহুল প্রয়োগ দেখা যায়। এই -এ বিভক্তি শব্দের পরে যুক্ত হওয়াই স্বাভাবিক হলেও শব্দের আগেও বসত। আগে-পরে দুই জায়গাতেই যুক্ত হবার উদাহরণও আছে—সুখেত, সুখেতে, দুখেতেঁ।

১৯.১১ উপসর্গ ও অনুসর্গ

১৯.১১.১ উপসর্গ (preposition)

সংস্কৃত উপসর্গ

সংস্কৃত ব্যাকরণে কোনো শব্দের অর্থকে সুনির্দিষ্ট বা বিশেষিত করার জন্য অন্য একটি ছোটো শব্দ আগে বসে। একেই বলা হয় উপসর্গ (preposition)। উপসর্গ ব্যবহার করে নতুন অর্থবোধক শব্দও তৈরি হয়। সংস্কৃতে কুড়িটি উপসর্গ আছে—প্র, পরা, অপ, সম্, নি, অনু, অব, নিঃ, দুঃ, অভি, বি, অধি, উৎ (উদ্), পরি, সু, অতি, অপি, প্রতি, আ, উপ। বাংলায় এর প্রত্যেকটি ব্যবহৃত হয়। এইসব উপসর্গ ব্যবহৃত হয়

প্রধানত তৎসম শব্দের আগে। কয়েকটি উদাহরণ দিই—প্রদীপ্ত, প্রগাঢ়, অপসারিত, উজ্জ্বল (উৎ + জ্বল), পরিগণিত, সুকঠিন, নিঃশব্দ, প্রতিবিধান ইত্যাদি।

সংস্কৃত উপসর্গের দ্বারা আধিক্য, উপক্রম, আতিশয্য, বৈপরীত্য, ব্যাপ্তি, প্রকর্ষ, অপকর্ষ ইত্যাদি বোঝায়।

বাংলা উপসর্গ

সংস্কৃতের উপসর্গগুলি বাংলাতেও ব্যবহৃত হয়। আবার বাংলা ভাষায়ও আছে কিছু উপসর্গ যেগুলিকে খাঁটি বাংলা উপসর্গ বলা চলে। সেগুলি হল—অ, অজ, অনা, আ, কু, নি, বি, স, সু, অজ, পাতি, রাম, হা, ভর বা ভরা ইত্যাদি। এইসব উপসর্গ যোগে গঠিত শব্দের উদাহরণ দেখব।

১. অকেজো, অকথা, অবেলা, অচেনা ; ২. অনামুখো, অনাবৃষ্টি, অনাচার ; ৩. অজমূর্খ, অজপাড়াগাঁ ; ৪. আগাছা, আকাঁড়া, আলুনি ; ৫. কুনজর, কুকথা ; ৬. নিখরচা, নিখাগি, নিভাঁজ ; ৭. বিভুঁই, বিমুখ ; ৮. সজোর, সলাজ, সটান ; ৯. সুছাঁদ, সুদিন, সুনজর ; ১০. হাঘরে, হাভাতে, হাপিত্যেশ ; ১১. পাতিহাঁস, পাতিলেবু ; ১২. আড়মোড়া, আড়চোখে; ১৩. ভরদুপুর, ভরসন্ধ্যে ; ১৪. রামদা, রামছাগল।

বিদেশি উপসর্গ

বাংলা ভাষায় কতকগুলি আরবি-ফারসি ও ইংরেজি উপসর্গও প্রচলিত আছে। অবশ্য আরবি উপসর্গগুলি (আম, লা, গর) ফারসির মারফতেই বাংলায় এসেছে বলে ভাষাতাত্ত্বিকগণ এগুলিকেও ফারসি উপসর্গই বলেন।

ফারসি উপসর্গ

আম (আমদরবার, আমজনতা) ; লা (লাচার) ; গর (গরমিল, গরহাজির), খাস (খাসকামরা, খাসমহল) ; কার (কারখানা, কারচুপি), খোশ বা খুশ (খোশখবর, খোশমেজাজ) ; দর (দরদালান, দরকাঁচা) ; বে (বেনাম, বেচাল, বেবন্দোবস্ত) ; বদ (বদরাগি, বদমেজাজ), হর (হরদম, হরবোলা) ; নিম (নিমরাজি)।

ইংরেজি উপসর্গ

সাব (sub.) — সাবইন্‌সপেক্টর, সাবজজ
হাফ (half) — হাফটাইম, হাফহাতা, হাফপ্যান্ট
হেড (head) — হেডবাবু, হেডমাস্টার
ফুল (full) — ফুলবাবু, ফুলহাতা।

১৯.১১.২ অনুসর্গ (postpositions)

সাধারণভাবে বলা যায় উপসর্গ যেমন শব্দের আগে বসে তেমনি অনুসর্গ বসে শব্দের পরে। 'অনু' অর্থ পরে বা পশচাতে। খাঁটি অনুসর্গ প্রাচীন ভারতীয়-আর্য ভাষায় অর্থাৎ

বৈদিকে ও সংস্কৃতের ক্লাসিকাল যুগ পর্যন্ত ছিল না। উপসর্গগুলি বাংলা শব্দের গায়ে লেগে থেকে ব্যবহৃত হয় প্রত্যয়ের মতো। অন্য দিকে, অনুসর্গ তার আগের শব্দের গায়ে লেগে থাকে না, সচরাচর। অনুসর্গ তার পূর্ববর্তী পদের অর্থকে বিশেষিত করে এবং তার ফলে কারকের অর্থ সূচিত হয়। সংস্কৃত ভাষার পরবর্তী পর্ব থেকে অনুসর্গের ব্যবহার শুরু হয়েছিল। কেউ-কেউ মনে করেন যে, এই অনুসর্গ-প্রয়োগ বাংলা ভাষায় অনার্য প্রভাবের ফল হতে পারে, বিশেষত আমরা জানি যে, কোল মুন্ডারি ও দ্রাবিড়ীয় ভাষায় অনুসর্গ খুবই প্রচলিত।

এবারে দেখব অনুসর্গ কীভাবে কারকের অর্থ প্রকাশ করে।

করণকারকে—দ্বারা, দিয়া, দিয়ে, কর্তৃক

নিমিত্তার্থে—তরে, জন্য, লাগিয়া, লেগে

অপাদানে—হইতে, থেকে, থাকিয়া, ঠেঙ্গে

অধিকরণার্থে—কাছে, নিকটে, ডে

এছাড়া মধ্য বাংলায় সম্বন্ধ পদের পরে অনুসর্গের ব্যবহার হত, যেমন কার, কের, কর, যদিও এগুলির প্রয়োগ যত-না অনুসর্গ হিসাবে, তার চেয়ে বেশি বিভক্তির মতো। আধুনিক বাংলায় সম্বন্ধ পদের পরে অনুসর্গ বসে—আমার তরে, তার সঙ্গে, সকলের জন্য শিক্ষা, ইত্যাদি। মধ্যবাংলায় অধিকরণ কারকের অর্থেও যে অনুসর্গের ব্যবহার হত তা উপরে দেখেছি।

বাংলা ভাষার অনুসর্গগুলিকে প্রধান দুটি ভাগে ভাগ করা যায়—ক. নাম-অনুসর্গ; খ. অসমাপিকা অনুসর্গ। নাম অনুসর্গ আবার তিন শ্রেণির—তৎসম, তদ্ভব, বিদেশি। প্রথমে দেখব নাম-অনুসর্গ।

ক. তৎসম নাম-অনুসর্গ

অন্তর, অন্তরে—'তোহোর অন্তরে' (প্রা. বাং.) তার মানে—তোর জন্য।
এর 'আন্তরে' রূপভেদও পাওয়া যায় মধ্য বাংলায়।

অপেক্ষা—'আমাপেক্ষা তাহার খ্যাতি অধিক।

অর্থ, অর্থে (জন্য, নিমিত্ত)—'ধামার্থে চাটিল সাঙ্কম গঢ়ই' (প্রা.বাং.)

কর্তৃক—ভীম কর্তৃক দুর্যোধন নিহত।

কারণ, কারণে (হেতু)—'কংসের কারণে হএ সৃষ্টির বিনাশে' (ম.বাং.)।

গোচর (অভিমুখ)—'যদুনাথ গেলা অদিতি গোচরে' (ম.বাং.)
কথাটা তাঁর গোচরে এল।

চরণ (অভিমুখ-গৌরবে)—'তবে মুঞি নিবেদিনু গুরুর চরণে।'

জন্য (নিমিত্ত)—কিসের জন্য, ভক্তের জন্য।

দিক্, দিশা (অভিমুখ)—'বাট কাঢ়ায়িল বড়ায়ি বৃন্দাবন দিশে' (ম.বাং.)।
'কমণ উপায় করোঁ জাওঁ কোন দিশে' (ম.বাং.)।

দ্বারা (করণার্থে)—আমার দ্বারা এ কাজ হবে না।

নিকট (অভিমুখ)—'সাধুর নিকটে যেই অপরাধ করে' (ম. বাং.)।

নিমিত্ত (জন্য)—কিসের নিমিত্ত আগমন?

বিদ্যমান (অভিমুখ, সমীপ)—'জিজ্ঞাসিল দামোদর নন্দ বিদ্যমান' (ম. বাং.)।

প্রতি (অভিমুখ)—'তবে কেহ্নে রতি প্রতি এত বড় মন' (ম. বাং.)।

মুখ (করণার্থে)—'শিশুমুখে পরবত টালী' (ম. বাং.)।

সকাশ (অমিভুখ)—'রাধিকা সকাশে আসে বনমালী' (ম. বাং.)।

সমীপ (অভিমুখ)—রাজার সমীপে নিবেদন করল।

সহিত (করণার্থে)—'কানুর সহিত করিব পীরিতি' (ম. বাং.)।

মধ্য বাংলায় 'সহিতে'-ও পাওয়া যায়।

সদন (নিকট, সমীপ)—'বিদুর রহিল মাত্র অন্ধের সদন' (ম. বাং.)।

সমভিব্যাহার (সহিত)—পত্নী-ভ্রাতা সমভিব্যাহারে রাম গেলেন বনে।

সঙ্গ (সহিত)—'ডোম্বীএর সঙ্গে জো জোই রত্তো' (প্রা. বাং.)।

আমার সঙ্গে চলো।

খ. তদ্ভব নাম অনুসর্গ

আগ, আগে (সামনে, অভিমুখ)—'রাজার আগে করিব গোহারী' (ম.বাং.)।

'দাঁড়াও আমার আঁখির আগে'।

কাছ, কাছে (সমীপ, অভিমুখ)—তোমার কাছে আমার এই নিবেদন।

কাজ, কাজে (নিমিত্ত)—'কোণে কাজে' (ম.বাং.)

কী কাজে এসেছ?

চেয়ে, চাইতে (অপেক্ষার্থে)—তার চেয়ে এই ভালো।

ছাড়া (ব্যতীত)—আমি ছাড়া তার কে আর আছে?

ঠাঁই, ঠাএ, ঠান, থান (স্থান অর্থে, অভিমুখ)—'বুয়িল ব্রহ্মার ঠাএ' (ম.বাং.) ; 'কেহ্নে হেন মিছা কথা কহে মোর ঠাঁই' (ম.বাং.)

পাছ (পশ্চাৎ)—তার পাছে পাছে ঘুরছে।

পান, পানে (দিকে, অভিমুখ)—'মোর পাণে আল রাধা তেজহ ধামালী' (ম.বাং.) ; 'তুমি খুশি থাকো আমার পানে চেয়ে চেয়ে।'

পাশ, পাশে (অভিমুখ)—আমার পাশে এসে বোসো।

বই (ব্যতীত)—'তোমা বই আর কারে জানি নে'। এর 'বহি' বা 'বহী' রূপভেদ পাই মধ্য বাংলায়—'এ বাট বহী' (এই পথ ছাড়া)।

বাগে (অভিমুখ)—কোন বাগে যাব?

'বাগে' এখন কেবল কাব্যে এবং উপভাষায় পাওয়া যায়।

বিহনে, বিনু (বিনা)—'চুণ বিহণে যেহু তাম্বুল তিতা' (ম.বাং.) ;
'জল বিনু মীন জনু' (ম.বাং.) ; 'তো বিনে উনমত কান' (ম.বাং.)
ভিত, ভিতে (সমীপে)—'চারিভিতে চলিল যতেক দূতগণ' (ম.বাং.)।
লগে (সঙ্গে)—'পাইয়া পরম সুখ গেল সেই লগে' (ম.বাং.)।
হইতে (অপাদানার্থে)—'গোঠে হইতে আসি আহ্মি' (ম.বাং.)।

গ. বিদেশি নাম অনুসর্গ

বিদেশি অনুসর্গ বলতে প্রধানত ফারসি অনুসর্গকেই বোঝায়। বাংলায় মাত্রই চারপাঁচটি ফারসি অনুসর্গ পাওয়া যায়।

বদল, বদলে (পরিবর্তে)—'কৃষ্ণের বদলে আনি দিল বসুদেবে' (ম.বাং.)
বাদে (পরে)—'দেড় প্রহর আছে বেলা আড়াই প্রহর বাদে' (ম.বাং.)।
বরাবর (সমীপে)—'কংস বরাবরে বার্তা জানাইল নির্ভয়' (ম.বাং)।
হুজুর (সমীপে)—'উপনীত হৈল গিয়া রাজার হুজুরে' (ম.বাং) (অর্থাৎ রাজার সামনে)।

ঘ. অসমাপিকা অনুসর্গ

বাংলা ভাষায় কতকগুলি ক্রিয়া অসমাপিকা অনুসর্গ আছে। তার মধ্যে প্রধান কয়েকটির উদাহরণ দেখব।

করি, করিয়া, ক'রে (ক্রিয়াবিশেষণ)—'দিঢ় করিঅ' (প্রা.বাং.) ; ঠিক ক'রে বলো।
গই (অধিকরণে)—'কহি গই পইঠা' (প্রা. বাং.)
চাহিয়া, চাহি, চেয়ে (আপেক্ষিকভাবে)—'শ্রীকৃষ্ণ চাহিয়া কৃষ্ণনাম ধন বড়' (ম.বাং) ;
'জীবন চাহি যৌবন বড়' (ম.বাং.) ;
আমার চেয়ে তুমি বড়ো।
থাকি, থাকিয়া, থেকে (হইতে)—'কংসকে বুলিলে কন্যা আকাশে থাকিআঁ' (ম.বাং.);
'কুথা থেকে আইলেক তুহ্মি' (ম.বাং.) ; নগর থেকে গ্রামে।
দিয়া, দে, দিয়ে (দ্বারা)—'হাথ দিআঁ দেখ বড়াই মোর কলেবরে' (ম.বাং.) ; 'ছুরী দিয়া কাটা' (ম.বাং.);
ধরি, ধরিয়া, ধরে (ব্যাপ্তি)—সাত দিন ধ'রে বৃষ্টি হচ্ছে।
বলিয়া, বলে (জন্য)—তাই বলে তোমাকে কি দেব না?
ভরা, ভরিয়া, ভ'রে—(জুড়ে)—'তুমি যে চেয়ে আছে আকাশ ভ'রে'।
লই, লইয়া, লয়ে—(ব্যাপ্তি)—'বিলসন্তি লইআ সুণ মেহেলী' (প্রা.বাং.)
'মেরু শিখর লই গঅণ পইসই' (প্রা.বাং.) ;
'যমুনার তীরে গোপীজন লঅাঁ, রঙ্গে' (ম.বাং.)
'অল্প লইয়া থাকি তাই মোর যাহা যায় তাহা যায়।'

১৯.১২ বাংলা ভাষায় সংখ্যাশব্দ

সংখ্যাশব্দ প্রধানত দুই রকমের হয়—বিশুদ্ধ সংখ্যাশব্দ (cardinal numbers) এবং ক্রমিক বা পূরণবাচক সংখ্যাশব্দ (ordinal numbers)। ১, ২, ৩, ৪ বা এক, দুই, তিন, চার বিশুদ্ধ সংখ্যাশব্দ এবং প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ইত্যাদি ক্রমিক বা পূরণবাচক সংখ্যাশব্দ। বাংলা সংখ্যাশব্দের বেশির ভাগই তদ্ভব। কয়েকটি মাত্র অনার্য ভাষা থেকে আগত। সংখ্যাশব্দের আরও দুটি সূক্ষ্ম ভাগ আছে—ভাগ্নাংশিক বা fractional এবং গুণিতক বা multiplicational. আড়াই, সওয়া বা সোয়া হল ভাগ্নাংশিক, দুনো (double), তেহাই (ত্রিগুণ) হল গুণিতক সংখ্যাশব্দ।

আর এক দিক থেকেও সংখ্যাশব্দকে দেখা যেতে পারে। বহু ক্রমিক সংখ্যাশব্দ সরাসরি সংস্কৃত থেকে এসেছে। অর্থাৎ বাংলায় অনেকগুলি তৎসম ক্রমিক সংখ্যাশব্দও ব্যবহৃত হয়। যেমন প্রথম, দ্বিতীয়, অষ্টম, দ্বাদশ নবতিতম ইত্যাদি।

নীচে আমরা এক থেকে একশো পর্যন্ত বাংলা সংখ্যাশব্দের ব্যুৎপত্তি দেখব—

এক, ১ — সং. এক > প্রাকৃ. এক্ক > অবহট্‌ঠ এক্কু > প্রা.বাং./মধ্য বাং. এক > আ.বাং. এক

দুই, ২ — সং. দ্বি, দ্বে > প্রাকৃ. দুবে > অবহট্‌ঠ দু, দুই > প্রা.বাং. আ.বাং. দুই

তিন, ৩ — সং. ত্রীণি > প্রাকৃ তিন্নি > প্রা.বাং. তিনা, তিন

চার, ৪ — সং. চত্বারি > অপ. চারি > প্রা. মধ্য বাং. চারি > আ. বাং. চার

পাঁচ, ৫— সং. পঞ্চ > পঞ্চ, পঞ্চচ > প্রা. বাং. পঞ্চ > আ. বাং. পাঁচ

ছয়, ৬ — সং. ষট্ > প্রাকৃ. ছহ, ছ >. অপ. ছঅ, ছ > প্রা.বাং. ছ >. আ.বাং. ছয়

সাত, ৭ — সং. সপ্ত > প্রা.কৃ. সত্ত > অপ. সত্ত > প্রা. মধ্য বাং. সাত > আ.বাং.সাত

আট, ৮ — সং. অষ্ট, অষ্টা > প্রাকৃ. অট্‌ঠ > প্রা.বাং. ম.বাং. অট, অঠ > আ. বাং. আট

নয়, ৯ — সং. নব > প্রাকৃ ণঅ, নো > প্রা.বাং.ন,ণ > আ.বাং. নয়

দশ, ১০ — সং.দশ > প্রাকৃ.দশ, দস > অপ. দস, দহ > প্রা.বাং. দশ, দহ >. আ.বাং. দশ

এগারো, ১১ — সং. একাদশ > প্রাকৃ.এগ্‌গারহ > অপ. এগারঅ > প্রা.ম.বাং. এগার > এগারো

বারো, ১২ — সং. দ্বাদশ > প্রাকৃ. দ্‌বাদস > অপ.প্রা.বাং.বারহ > ম.বাং.বার > আ.বা. বারো

তেরো, ১৩ — সং. ত্রয়োদশ, ত্রেদশ > প্রাকৃ. তেদস, তেরস > অপ. তেরহ > প্রা.মধ্য বাং. তেরহ, তের > আ.বাং.তেরো

চোদ্দো, ১৪ — সং.চতুর্দশ > প্রাকৃ. চউদ্দশ, চোদ্দস > অপ. চউদ্দহ > প্রা.বাং.চউদ্দ > মধ্য বাং চৌদ্দ > আ.বাং. চোদ্দ, চোদ্দো।

পনেরো, ১৫ — সং পঞ্চদশ > প্রাকৃ. পন্নরস, পন্নরহ > অপ. পন্নরহ > অবহট্‌ঠ পন্নরঅ > প্রা. ম. বাং. পনর > আ.বাং. পনেরো

ষোলো, ১৬ — ষোড়শ > প্রাকৃ. সোলস্ > অপ. সোলহ > প্রা. ম.বাং. ষোল > আ. বাং. ষোলো

সতেরো, ১৭ — সং.সপ্তদশ > প্রাকৃ. সত্তরস > অপ. সত্তরহ > প্রা.বাং. সতরঅ > ম. আ. বাং. সতর, সতেরো

আঠারো, ১৮ — সং.অষ্টাদশ > প্রাকৃ. অট্‌ঠারস > অপ. অট্‌ঠারহ > প্রা.ম.বাং. আঠার, > আ. বাং. আঠারো

উনিশ, ১৯ — সং একোনবিংশতি, একোনবিংশ > প্রাকৃ. এগুণবীস > অপ. অউণবীস > প্রা.ম.বাং. উনিস, উনিশ > আ.বাং. উনিশ

কুড়ি, ২০ — অনার্য ভাষা থেকে, সাঁওতাল, কোল প্রভৃতি ভাষায় 'কুড়ি' আছে।

বিশ, ২০ — সং. বিংশতি, বিংশ > প্রাকৃ.বীস > অব. বিশ > বাং. বিশ

একুশ, ২১ — সং. একবিংশতি > প্রাকৃ এক্কুবীশ > অপ. এক্কুইস > প্রা.ম.বাং. একুস, একুশ > আ. বাং. একুশ

বাইশ, ২২ — সং.দ্বাবিংশতি > প্রাকৃ. বাবীস > অপ. বাইস > বাং. বাইশ

তেইশ, ২৩ — সং. ত্রয়োবিংশতি > প্রাকৃ. তেবীস > অপ. তেইস > বাং. তেইশ

চব্বিশ, ২৪ — সং. চতুর্বিংশতি > প্রাকৃ. চউবীস > অপ. চবিস > বাং. চব্বিশ

পঁচিশ, ২৫ — সং. পঞ্চবিংশতি > প্রাকৃ পঞ্চবীস > অপ. পচীস > বাং. পঁচিশ

ছাব্বিশ, ২৬ — সং. ষড়্‌বিংশতি > প্রাকৃ. ছব্বীস > অপ. ছব্বীস > বাং. ছাব্বিশ

সাতাশ, ২৭ — সং. সপ্তবিংশতি > প্রাকৃ. সপ্তবীস > অপ. সত্তাঈস > বাং. সাতাইশ, সাতাশ

আঠাশ, ২৮ — সং. অষ্টাবিংশতি > প্রাকৃ. অট্‌ঠাবীস, অটঠবীস > অপ. অট্‌ঠাইস > বাং. আঠাইশ, আঠাশ

উনত্রিশ, ২৯ — সং. একোনত্রিংশৎ > প্রাকৃ. এগুণতীস, একুনতিস > অপ. উনতীস > বাং. উনতিরিশ, উনত্রিশ

ত্রিশ, তিরিশ, ৩০ — সং. ত্রিংশৎ > প্রাক. তীস > অপ. তীস, তিস > বাং. ত্রিশ, তিরিশ

একত্রিশ, ৩১ — সং. একত্রিংশৎ > প্রাকৃ. একতীস > বাং. একত্রিশ, একতিরিশ

বত্রিশ, ৩২ — সং. দ্বাত্রিংশৎ > প্রাকৃ. বাত্তিস > অপ. বত্তিস > বাং বত্রিশ

তেত্রিশ, ৩৩ — সং. ত্রয়স্ত্রিংশৎ, ত্রিত্রিংশৎ > প্রাকৃ. তেত্তীস > প্রা.বাং. তেত্তিশ > আ.বাং. তেত্রিশ

চৌত্রিশ, ৩৪ — সং. চতুস্ত্রিংশৎ > প্রা.বাং.চৌতীশ > আ.বাং. চৌত্রিশ

পঁয়ত্রিশ, ৩৫ — সং. পঞ্চত্রিংশৎ > প্রাকৃ. পঞ্চতীস > অপ পনতীস > বাং. পঁয়ত্রিশ

ছত্রিশ, ৩৬ — সং.ষট্‌ত্রিংশৎ > প্রাং বাং. ছত্তিস > আঞ্চলিক ছত্তীশ > আ. বাং. ছত্রিশ

সাঁইত্রিশ, ৩৭ — সং. সপ্তত্রিংশৎ > বাং. সাঁইত্রিশ, সাঁইতিরিশ > (পঁয়ত্রিশ-এর সাদৃশ্যে 'সাত্রিশ' না হয়ে হল 'সাঁইত্রিশ')

আটত্রিশ, ৩৮ — সং. অষ্টাত্রিংশৎ > বাং. আটত্রিশ

উনচল্লিশ, ৩৯ — সং. ঊনচত্বারিংশৎ > প্রাকৃ. এগুণচতারীস > অপ. উনচালীস > হিন্দি উনচালিস > বাং. উনচল্লিশ

চল্লিশ, ৪০ — সং. চত্বারিংশৎ > প্রাকৃ. চত্তারীসৎ, চত্তালীসৎ > অপ. চয়ালীস, চালিস > বাং. চল্লিশ

একচল্লিশ, ৪১ — সং. একচত্বারিংশৎ > প্রাকৃ. একচতরীস > অপ.একচালীস > বাং.একচল্লিশ

বিয়াল্লিশ, ৪২ — সং. দ্বিচত্বারিংশৎ, দ্বাচত্বারিংশৎ > প্রাকৃ. দুবাতারীস > অপ. বাতারীস > প্রা. বাং. বাআলীস > আ.বাং. বিয়াল্লিশ, বেয়াল্লিশ

তেতাল্লিশ, ৪৩ — সং. ত্রিচত্বারিংশৎ > প্রা.বাং. তেতালীস > আ. বাং. তেতাল্লিশ

চুয়াল্লিশ, ৪৪ — সং. চতুশ্চত্বারিংশৎ > প্রাকৃ. চউচাআলীস > হি. চৌচালিস > প্রা. বাং. চয়ালিস > আ. বাং. চুয়াল্লিশ

পঁয়তাল্লিশ, ৪৫ — সং. পঞ্চচত্বারিংশৎ > ম.বাং. পাঁচালিস > আ.বাং. পঁয়তাল্লিশ

ছেচল্লিশ, ৪৬ — সং. ষট্‌চত্বারিংশৎ > প্রাকৃ. ছআলীস, ছয়ালীস > প্রা.ম. বাং. ছইচলিশ > আ. বাং. ছেচল্লিশ

সাতচল্লিশ, ৪৭ — সং. সপ্তচত্বারিংশৎ > মধ্য বাং. সাতচুয়ালিস > আ. বাং. সাতচল্লিশ
আটচল্লিশ, ৪৮ — সং. অষ্টচত্বারিংশৎ > বাং. আটচল্লিশ
উনপঞ্চাশ, ৪৯ — সং. ঊনপঞ্চাশৎ > প্রা.ম.বাং. উনঞ্চাশ > আ. বাং. উনপঞ্চাশ
পঞ্চাশ, ৫০ — সং. পঞ্চাশৎ > বাং. পঞ্চাশ

একান্ন, ৫১ — সং. একপঞ্চাশৎ > প্রাকৃ. একবণ্ণাহ > অপ. একঅন্ন > একান্নহ > বাং. একান্ন
বাহান্ন, ৫২ — সং. দ্বিপঞ্চাশৎ, দ্বাপঞ্চাশৎ > প্রাকৃ. বাবন্নাহ > বাঅন্ন > বায়ান্ন > বাং. বাহান্ন
তিপ্পান্ন, ৫৩ — সং. ত্রিপঞ্চাশৎ > প্রা.ম.বাং. তেপন > আ. বাং. তিপান্ন
চুয়ান্ন, ৫৪ — সং. চতুঃপঞ্চাশৎ > প্রাকৃ. অপ. চউপান্ন > প্রা. ম. বাং. চবান > আ. বাং. চুয়ান্ন
পঞ্চান্ন, ৫৫ — সং. পঞ্চপঞ্চাশৎ > প্রাকৃ. পঞ্চপন্নাহ > আঞ্চ. বাং. পাঁচপান্ন; > হি. পাঁচপন > বাং. পঞ্চান্ন
ছাপ্পান্ন, ৫৬ — সং. ষট্‌পঞ্চাশৎ > পালি ছপ্‌পঞ্‌ঞাস্‌ > বাং. ছাপ্পান্ন
সাতান্ন, ৫৭ — সং. সপ্তপঞ্চাশৎ > প্রা. ম. বাং. সাতন > আ. বাং. সাতান্ন
আটান্ন, ৫৮ — সং. অষ্টপঞ্চাশৎ > আঞ্চ. বাং. আটপঞ্চাশ > আ বাং. আটান্ন
উনষাট, ৫৯ — সং. ঊনষষ্টি > প্রাকৃ. এগুণষট্‌ঠি > অপ. উনসট্‌ঠি > বাং. উনষাট
ষাট, ৬০ — সং. ষষ্টি > প্রাকৃ. সট্‌ঠি > অপ. সাট্‌ঠি > প্রা. ম. বাং ষাটি > আ. বাং. ষাট

একষট্টি, ৬১ — সং. একষষ্টি > প্রাকৃ. একসট্‌ঠি > বাং একষট্টি
বাষট্টি, ৬২ — সং. দ্বিষষ্টি, দ্বাষষ্টি > প্রাকৃ. বাস্‌সট্‌ঠি > বাং. বাষট্টি
তেষট্টি, ৬৩ — সং. ত্রিষষ্টি, ত্রয়ঃষষ্টি > বাং. তেষট্টি
চৌষট্টি, ৬৪ — সং. চতুঃষষ্টি > প্রাকৃ. চউসট্‌ঠি > প্রা. বাং. চউসঠি > ম. বাং. চৌষাঠ > আ. বাং. চৌষট্টি
পঁয়ষট্টি, ৬৫ — সং. পঞ্চষষ্টি > বাং. পঁয়ষট্টি
ছেষট্টি, ৬৬ — সং. ষট্‌ষষ্টি > প্রাকৃ. ছসট্‌ঠি > ম. বাং. ছষট্টি > আ. বাং. চৌষট্টি
সাতষট্টি, ৬৭ — সং. সপ্তষষ্টি > বাং. সাতষট্টি
আটষট্টি, ৬৮ — সং. অষ্টষষ্টি, অষ্টাষষ্টি > বাং. আটষট্টি

উনসত্তর, ৬৯ — সং. ঊনসপ্ততি > প্রাকৃ. উনসত্তরি > বাং. উনসত্তর

সত্তর, ৭০ — সং. সপ্ততি > প্রাকৃ. সত্তরি > ম. বাং. সত্তরি > আ. বাং. সত্তর

একাত্তর, ৭১ — সং. একসপ্ততি > প্রাকৃ. একসত্তরি > অপ. একহত্তরি > প্রা. বাং. একহত্তর > আ. বাং. একাত্তর

বাহাত্তর, ৭২ — সং. দ্বিসপ্ততি, দ্বাসপ্ততি > বাং. বাহাত্তর

তিয়াত্তর, ৭৩ — সং. ত্রিসপ্ততি > প্রাকৃ. অপ. তেহাত্তর > প্রা. ম. বাং. তেঅত্তর, তেহত্তৈর > আ. বাং. তিয়াত্তর

চুয়াত্তর, ৭৪ — সং. চতুঃসপ্ততি > প্রাকৃ. চউহত্তর > বাং. চুয়াত্তর

পঁচাত্তর, ৭৫ — সং. পঞ্চসপ্ততি > বাং. পঁচাত্তর

ছিয়াত্তর, ৭৬ — সং. ষট্‌সপ্ততি > প্রাকৃ. ছেহত্তর > বাং. ছিয়াত্তর

সাতাত্তর, ৭৭ — সং. সপ্তসপ্ততি > প্রাকৃ. সত্তসত্তরি > বাং. সাতাত্তর

আটাত্তর, ৭৮ — সং. অষ্টাসপ্ততি > প্রাকৃ. অট্‌ঠসত্তরি > বাং. আটাত্তর

উনআশি, ৭৯ — সং. ঊনঅশীতি, একোনঅশীতি > প্রাকৃ. এগুণঅশীই > অব. উনআসি > বাং. উনআশি

আশি, ৮০ — সং. অশীতি > প্রাকৃ. অপ. অসীই > প্রা. বাং. অসি > আ. বাং. আশি

একাশি, ৮১ — সং. একাশীতি > বাং. একাশি

বিরাশি, ৮২ — সং. দ্বিঅশীতি > প্রাকৃ. বিআসি > বাং. বিরাশি

তিরাশি, ৮৩ — সং. ত্রিঅশীতি > তিআসি > বাং. তিরাশি

চুরাশি, ৮৪ — সং. চতুরশীতি (চতুর্‌অশীতি) > চৌআশি > চুরাশি

পঁচাশি, ৮৫ — সং. পঞ্চাশীতি > পঞ্চচাসি > বাং. পঁচাশি

ছিয়াশি, ৮৬ — সং. ষট্‌অশীতি > ছেআসি, ছয়াসি > বাং. ছিয়াশি

সাতাশি, ৮৭ — সং. সপ্তাশীতি > বাং. সাতাশি

অষ্টাশি, ৮৮ — সং. অষ্টাশীতি > বাং. অষ্টআশি, অষ্টাশি

উননব্বই, ৮৯ — সং. ঊননবতি > প্রাকৃ. ঊননঅই > অপ. প্রা.বাং. উননই > আ.বাং. উননব্বই

নব্বই, ৯০ — সং. নবতি > প্রাকৃ. ণউই > প্রা.বাং. ণই > আ. বাং. নব্বই

একানব্বই, ৯১ — সং. একনবতি > বাং. একানব্বই

বিরানব্বই, ৯২ — সং. দ্বিনবতি > বাং. বিরানব্বই

তিরানব্বই, ৯৩ — সং. ত্রিনবতি > তিণউই > বাং. তিরানব্বই

চুরানব্বই, ৯৪ — সং. চতুর্নবতি > চউরাণউই > চউরানব্বই > চুরানব্বই
পঁচানব্বই, ৯৫ — সং. পঞ্চনবতি > প্রা. ম. বাং. পচানই > আ.বাং. পঁচানব্বই
ছিয়ানব্বই, ৯৬ — সং. ষট্নবতি > ছেনবতি > ছিয়ানব্বই
সাতানব্বই, ৯৭ — সং. সপ্তনবতি > সত্তনউই > বাং. সাতানব্বই
আটানব্বই, ৯৮ — সং. অষ্টানবতি > অট্‌ঠানউই > বাং. আটানব্বই
নিরানব্বই, ৯৯ — সং. নবনবতি > প্রা. ম. বাং. নিরানই > আ. বাং. নিরানব্বই
একশো, শত, ১০০ — সং. শতম্ > প্রাকৃ. সঅ > সয় > আ. বাং. শ, শো

১৯.১২.১ ভগ্নাংশ সংখ্যা

পোয়া, পো,	$\frac{১}{৪}$ —	সং./প্রাচীন ভা. আ. পাদ > প্রাকৃ. পাব, পাঅ > পো, পোয়া, এক পোয়া, তিন পোয়া কিংবা এক পো, তিন পো
তেহাই,	$\frac{১}{৩}$ —	সং. ত্রিভাগিক > প্রাকৃ. তিহাইঅ > বাং. তেহাই
আধ,	$\frac{১}{২}$ —	সং. অর্ধ > প্রা. অদ্ধ, অধ > প্রা. বাং. আধ
সওয়া,	$১\frac{১}{৪}$ —	সং. সপাদ > প্রাকৃ. সবাঅ > সআঅ > বাং. সওয়া, সোয়া
দেড়,	$১\frac{১}{২}$ —	সং. দ্বিঅর্ধ > প্রাক. দিঅড্‌ঢ > দিঅঢ় > বাং. দেড়, রাঢ়ীতে ডেঢ় (মুর্ধন্যীভবন)।
আড়াই	$২\frac{১}{২}$	— সং. অর্ধতৃতীয় (অর্থাৎ আধ-কম তিন > অর্ধত্রিক > অড্‌ঢতীয় > অড্‌ঢঈয় > বাং. আড়াই।
পৌনে	—	সং. পাদোন (পাদ + ঊন) > প্রা. পাঊন > পউন > পৌনে

১৯.১২.২ পূরণবাচক বা ক্রমিক সংখ্যা

বাংলায় ক্রমিক সংখ্যা (ordinal numbers) সাধারণভাবে দু-রকম—তৎসম ও তদ্ভব ক্রমিক সংখ্যা। প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম, নবম, দশম, একাদশ, দ্বাদশ এগুলি তৎসম ক্রমিক সংখ্যা। তদ্ভব সংখ্যা হল পয়লা, দোসরা তেসরা, চৌঠা ইত্যাদি। এখন তদ্ভব সংখ্যাগুলি মাসের তারিখ নির্দেশ করতেই কেবল ব্যবহার করা হয়।

পাশাপাশি দেখা যাক তৎসম ও তদ্ভব ক্রমিক সংখ্যা। তবে মনে রাখা দরকার যে, বত্রিশের পরে তদ্ভব ক্রমিক সংখ্যার চলন নেই, সম্ভবত বাংলা মাস ৩২ দিনের পর্যন্ত হয়, তার বেশি হয় না সেই কারণে।

তৎসম		**তদ্ভব**
প্রথম	—	পয়লা
দ্বিতীয়	—	দোসরা
তৃতীয়	—	তেসরা
চতুর্থ	—	চৌঠা
পঞ্চম	—	পাঁচই
ষষ্ঠ	—	ছউই
সপ্তম	—	সাতই, সাতুই
অষ্টম	—	আটই, আটুই
নবম	—	নউই
দশম	—	দশই, দশুই
একাদশ	—	এগারোই
দ্বাদশ	—	বারোই
ত্রয়োদশ	—	তেরোই
চতুর্দশ	—	চোদ্দোই
পঞ্চদশ	—	পনেরোই
ষোড়শ	—	ষোলোই
সপ্তদশ	—	সতেরোই
অষ্টাদশ	—	আঠারোই
ঊনবিংশ	—	উনিশে
বিংশ	—	বিশে
একবিংশ	—	একুশে
দ্বাবিংশ	—	বাইশে
ত্রয়োবিংশ	—	তেইশে
চতুর্বিংশ	—	চব্বিশে
পঞ্চবিংশ	—	পঁচিশে
ষড়্‌বিংশ	—	ছাব্বিশে

সপ্তবিংশ	—	সাতাশে
অষ্টাবিংশ	—	আঠাশে, আটাশে
ঊনত্রিংশ	—	উনত্রিশে, উনতিরিশে
ত্রিংশ	—	ত্রিশে, তিরিশে
একত্রিংশ	—	একত্রিশে, একতিরিশে
দ্বাত্রিংশ	—	বত্রিশে

এবারে কয়েকটি তদ্ভব ক্রমিক সংখ্যার ব্যুৎপত্তি দেখা যাক।

পয়লা — পহইল্ল > পইল, পহেলা > পয়লা

দোসরা — দ্বি-সর + আ = দ্বিসরা > দুরিস > দুরস > দুসর > দোসরা

তেসরা — ত্রি + সরা > তিসরা > তেসরা

চৌঠা — চতুর্থ > চউট্ঠ > চউট > চৌঠা

পাঁচই — পঞ্চমিক > পঞ্চবিক > পাঁচবিঅ > পাঁচঈ > পাঁচই

এরই সাদৃশ্যে ছউই, সাতই, আটই, নউই, দশই ইত্যাদি।

উনিশ + ইয়া > উনিশিয়া > উনিশে

বিশ + ইয়া > বিশিয়া > বিশে ইত্যাদি।

গ্রন্থপঞ্জি

কাজী সিরাজ—আধুনিক ভাষাবিজ্ঞান, ১৯৯৭

গোস্বামী, কৃষ্ণপদ—বাংলা ভাষাতত্ত্বের ইতিহাস, ২০০১

চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার—ভাষাপ্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ, ১৯৮৮

চট্টোপাধ্যায়, হীরেন—ভাষাতত্ত্ব ও বাংলা ভাষার ইতিহাস ১৯৯৩

বসু, দ্বিজেন্দ্রনাথ—বাংলা ভাষার আধুনিক তত্ত্ব ও ইতিকথা, ১৯৮০

ভট্টাচার্য, পরেশচন্দ্র—ভাষাবিদ্যা পরিচয়, ১৯৯৩

ভট্টাচার্য, পার্বতীচরণ—বাংলা ভাষা, ১৯৮২

মজুমদার, পরেশচন্দ্র—বাঙলা ভাষা পরিক্রমা, প্রথম খণ্ড, ২০০৩

শহীদুল্লাহ্, মুহম্মদ—বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত, ১৯৯৮

সেন, সুকুমার—ভাষার ইতিবৃত্ত, ১৯৯৪

Majumdar, Atindra—Bengali Language : Historical Grammar, Part II, 1973

২০. আদিমধ্য বাংলা ভাষা

২০.১ আদিমধ্য যুগের বাংলা সাহিত্য ও ভাষা

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে মধ্য যুগকে দুটি পর্বে বিভক্ত করা হয়—আদিমধ্য ও অন্ত্যমধ্য পর্ব। সাধারণভাবে আদিমধ্য স্তর ধরা হয় ১৩৫০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৫০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। অন্ত্য স্তর ১৫০০ থেকে ১৭৬০ পর্যন্ত। সকলেই যে এই কালবিভাগ মেনে নেন তা নয়। আদিমধ্য যুগের সাহিত্যের একমাত্র নিদর্শন বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন'। মালাধর বসুর 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' যথার্থই আদিমধ্য স্তরের কাব্য কি না সে-বিষয়ে কেউই নিঃসংশয় নন। ক্রমাগত হস্তাবলেপের ফলে ওই কাব্যের প্রাচীনত্ব ঢেকে গেছে। তার বয়স সম্বন্ধে জোর দিয়ে কিছুই বলা যায় না। বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এর ভাষা বিশ্লেষণ করে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'বাঙ্গালা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা' গ্রন্থে বলেছেন—'এর ভাষা ১৪০০ বা ১৪৫০ খ্রিস্টাব্দের এ ধারে কিছুতেই হতে পারে না'। সুকুমার সেন অবশ্য মনে করেন 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' সপ্তদশ শতকের রচনা। আবার দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু সুনীতিকুমারের মতোই মনে করেন যে, 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' ১৩৫০ থেকে ১৫০০ সালের মধ্যে রচিত হয়েছিল।

২০.২ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন—পুথির আবিষ্কার

অনেক দিন পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের সূচনাবিন্দু ধরা হত কৃত্তিবাসের রামায়ণ থেকে, কেননা চর্যাগীতি এবং 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র অস্তিত্ব আমাদের জানাই ছিল না। ১৮৭৭ সালে রমেশচন্দ্র দত্তের The Literature of Bengal যখন প্রকাশিত হয়, তখন সেকথা জানা সম্ভব ছিল না। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী যেমন চর্যাগীতির পুথি উদ্ধার করেন ১৯০৭ সালে, তেমনি ১৯১৬ সালে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র পুথি উদ্ধার করেন বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ। ১৯১৬ সালে, বাংলা ১২২৩ সনে বসন্তরঞ্জন বাঁকুড়া জেলার কাকিল্যাঁ গ্রামের জনৈক দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের গোয়ালঘর থেকে যে-পুথিটি উদ্ধার করেন, পরে তাকেই বলা হয় 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'। পুথিটি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। কেউ-কেউ 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' নামটি নিয়ে আপত্তি তুলেছেন এবং এই প্রসঙ্গে 'শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ' নামটির কথাও কেউ-কেউ বলেছেন। এমনও অনুমান করা হয়েছে যে, পুথিটি বিষ্ণুপুরের রাজবংশের সম্পত্তি ছিল। এতাবৎ অন্য সাক্ষ্যপ্রমাণ তেমন জোরালো না হওয়ায় 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' নামটিই সাধারণভাবে গৃহীত হয়েছে।

'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র যে-পুথিটি আবিষ্কৃত হয়েছে তা থেকে তার বয়স অনুমান করা হয়েছে। পুথিটির লিপির ছাঁদ ও ভাষা বিশ্লেষণ ক'রে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় পুথির লেখনকাল চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতক বলে সিদ্ধান্ত করেছেন। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এই কাব্যের কবিকে জয়দেবের পূর্ববর্তী বলেছেন। রাধাগোবিন্দ বসাকের মতে পুথিটি ষোড়শ শতকের। সুকুমার সেন বলেছেন যে, পুথিটিতে তিনরকমের লিপির ছাঁদ দেখা যায়। তাই পুথির ছাঁদ দেখে প্রাচীনতা অনুমান করা ঠিক নয়। সুনীতিকুমারের সিদ্ধান্তের কথা আগেই বলেছি। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্-র মত সুনীতিকুমারেরই অনুরূপ।

এখানে অন্য একটি কথাও আছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কবির নাম ও পরিচয় নিয়েও আছে কিছু প্রশ্ন। বসন্তরঞ্জন রায় কবির নাম দিয়েছেন 'বড়ু চণ্ডীদাস'। কিন্তু পুথিতে 'বড়ু চণ্ডীদাস' ছাড়াও 'আনন্ত বড়ু চণ্ডীদাস' এবং শুধুই 'চণ্ডীদাস' নাম পাওয়া যায়। তাহলে 'বড়ু চণ্ডীদাস' নামটিকেই নেওয়া হল কেন? পুথিতে সবচেয়ে বেশি পাওয়া গেছে 'বড়ু চণ্ডীদাস' ভণিতা। আর 'আনন্ত' নিশ্চয় 'অনন্ত'-রই রূপভেদ। এই অনন্ত কোনো লিপিকর হয়ে থাকবেন। কাজেই রচয়িতার নাম চণ্ডীদাস তো বটেই, বড়ু চণ্ডীদাস হওয়া খুবই সম্ভব।

২০.৩ 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'—কাব্যকৃতি

সংস্কৃত-প্রভাবিত বাংলা কবিতার প্রথম নিদর্শন 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'। রাধাকৃষ্ণের প্রেম এই কাব্যের মূল নির্ভর। কাব্যের গঠন অনুযায়ী একে আখ্যানকাব্য বলে মনে করা হয়। তেরোটি 'খণ্ডে' বিভক্ত এই কাব্য। নাটকের উপাদানেরও অভাব নেই। কাব্যময়তা ও নাটকীয়তা এই দুইয়ের আশ্চর্য সমাহার ঘটেছে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যে। বাংলা ভাষার আদিমধ্য স্তরের কাব্য, তাই বাংলা ভাষার আদি স্তরের রূপ ছত্রে ছত্রে ফুটে উঠেছে। আবার সংস্কৃতের প্রভাবও দুর্লক্ষ্য নয়। অনুভূতির গভীরতা আর ঈশ্বরভক্তির আন্তরিকতা ও প্রগাঢ়তা মিলে এই কাব্যটিকে যেভাবে সুষমামণ্ডিত করেছে, তা সত্যিই বিস্ময়কর। বিশেষত বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রথম পর্বের কাব্যকৃতি হিসাবে এমন পরিণত কাব্য কবির অসামান্য কবিত্বগুণের পরিচয় বহন করে। অশ্লীলতার কিছু অভিযোগ এই কাব্য সম্বন্ধে অবশ্যই উপস্থিত করা যায়, বস্তুতপক্ষে তা করাও হয়েছে। কিন্তু কাব্যকাহিনির পরিকল্পনাটি বুঝে নিলে বরং ওই অশ্লীলতাকে অসহ বা বর্জ্য বলে মনে করা যায় না।

যেমন প্রথম দিকে, কৃষ্ণ যেখানে কেবলই রাধার মন পেতে চাইছে, তেমনই পরে, যখন রাধার মন ক্রমশ উন্মোচিত হচ্ছে, যখন রাধা কৃষ্ণের সঙ্গলাভে উৎসুক ও উন্মুখ, সেখানে বড়ু চণ্ডীদাস দিয়েছেন তাঁর কবিত্বশক্তির পরিচয়, দেখিয়েছেন প্রেমরস সৃষ্টিতে কত নিপুণ তিনি। যে স্থূলতার কথা ওঠে, যে অশ্লীলতার অভিযোগ উচ্চারিত হয়, তা নিতান্তই তুচ্ছ হয়ে যায়, অর্থহীন হয়ে যায় বাংলা কবিতার আদি পর্বের এই কাব্যে কবির কল্পনাশক্তির মৌলিকতার কথা ভেবে দেখলে।

'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যের লিরিকগুণ এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-কে কেউ-কেউ 'নাটগীত' বলেছেন। এই নাটগীতের 'নাট' কথাটি কবি নিজেই একাধিকবার ব্যবহার করেছেন। এই নাটগীতের অবলম্বন হল আখ্যান, কথোপকথন আর সংগীত। সংগীতময়তা আছে সমগ্র কাব্যেই, যদিও শেষের দিকে বাণখণ্ড, বংশীখণ্ড ও রাধাবিরহ এই তিনটি খণ্ডে কাব্যের লিরিকগুণ আগেকার খণ্ডগুলির চাইতে অনেক বেশি স্পষ্ট।

যেসব গুণ বা বৈশিষ্ট্যের জন্য 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যটি অদ্যাবধি স্মরণযোগ্য হয়ে আছে, এবং নিশ্চিতভাবে আরও বহুকাল বাঙালি পাঠকের মনকে অধিকার করে থাকবে, তা হল রাধাকৃষ্ণ-কাহিনির লৌকিক আবেদন, আবেগের তীব্রতা এবং এর লিরিকগুণ। এই কাব্যের রাধাকৃষ্ণ কাহিনির সঙ্গে ভাগবত বা পুরাণের কাহিনির কোনো মিল খুঁজে পাওয়া যাবে না। কেননা এই কাব্যের রাধা-কৃষ্ণ চিরপরিচিত মানবী-মানব, তাদের কোনোভাবেই দেবত্বে পর্যবসিত করা হয়নি। দুঃখ-বেদনা-ছলনা-প্রেম-বিরহ নিয়ে তারা নিতান্তই সমাজভুক্ত মানুষ, বাঙালির চিরপরিচিত যুগল।

এই কাব্যের ভাষা আর ছন্দরচনার নৈপুণ্য একে মধ্যযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কাব্য হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে ('শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র ভাষার পর্যালোচনা আমরা একটু পরেই করব)।

২০.৪ 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যের ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এর ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য বলতে আমরা বুঝব আদিমধ্য স্তরের বাংলা ভাষার ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য। কেননা আগেই আমরা বলেছি, অন্য যে-পুথিটিকে আদিমধ্য স্তরের বলে কেউ-কেউ দাবি করেছেন—মালাধর বসুর 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়'—তার পুথিতে এত লিপিকরের হাত পড়েছে এবং তা এতই পরিবর্তিত ও 'পরিমার্জিত' হয়েছে যে তার প্রাচীনতা সন্দেহাতীত নয়।

২০.৪.১ আদিমধ্য বাংলা ভাষার ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

ক. স্বরধ্বনি

১. শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে অ-কারান্ত শব্দের অ-উচ্চারণই সাধারণভাবে লক্ষ করা যায়। তবে আদ্য অ-কার প্রায়ই বিবৃত (open) উচ্চারিত হত। তার ফলে বানানে আ এসে গেছে। যেমন অভিলাষ > আভিলাষ, অতিশয় > আতিশয়, অঝর > আঝর, অকারণ > আকারণ ইত্যাদি।

২. আ-কারের পরবর্তী ই-ধ্বনি বা উ-ধ্বনির ক্ষীণতা লক্ষণীয়। তাকে দেখানো যায় এইভাবে—

বড়াই > বড়া^{ই}
আউলাইল > আ^{উ}লাইল

কেউ-কেউ এই ক্ষীণতাপ্রাপ্তি স্বীকার করেন না। তবে চোদ্দো অক্ষরের ছন্দমাত্রার স্বার্থে অনেক সময়েই এই ক্ষীণতা এসে পড়াই স্বাভাবিক মনে হয়। তাছাড়া পার্বতীচরণ ভট্টাচার্য দেখিয়েছেন যে, বড়াই-এর আই এবং আউলাইল-র আউ দ্বিস্বর (diphthong)। তাই এদের উচ্চারণ যথাক্রমে ছিল আই্ বা আ[ই] এবং আউ্ বা আ[উ]।

৩. হ্রস্ব-ই/দীর্ঘ-ঈ এবং হ্রস্ব-উ/দীর্ঘ-ঊ-এর পার্থক্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রক্ষিত হয়নি। বানানে হ্রস্ব-দীর্ঘ নির্বিশেষে ব্যবহৃত হয়েছে—উড়ী/উড়ি, দূতি/দূতী, উজল/ঊজল।

৪. আদিমধ্য বাংলায় ঋ-ধ্বনি সংস্কৃতের মতো স্বরধ্বনি ছিল না, ছিল ব্যঞ্জনের মতো। ঋ উচ্চারিত হতে রি-র মতো। কৃপাণকে লেখা হয়েছে কিরিপান।

খ. ব্যঞ্জনধ্বনি

১. আদিমধ্য স্তরে অন্তঃস্থ-য ও বর্গীয়-জ নির্বিচারে ব্যবহৃত হয়েছে। বিশেষত আদ্য য নিশ্চয় জ উচ্চারিত হত। বানানে য/জ দুই-ই পাওয়া যায়—জখন/যখন, জত/যত।

২. পরেশচন্দ্র মজুমদারের মতে ণ/ন-এরও তেমন পার্থক্য সম্ভবত ছিল না। তাই বানানে দুই-ই পাওয়া যায়—বাণী, পরাণী যেমন আছে, তেমনি আছে পাণী (যমুনার পাণী)। নাল যেমন আছে, তেমনি আছে ণাল।

৩. শব্দের মধ্যে ও শেষে মহাপ্রাণতা যথেষ্টই ছিল—আহ্মি, কাহ্নাই। দু-একটি ক্ষেত্রে আদ্য মহাপ্রাণতাও ছিল—খস্তুরী (কস্তুরী)। মহাপ্রাণতার লোপও দুর্লক্ষ্য নয়—যেহ্ন > যেন, সাধ > সাদ, মূঢ় > মূড়।

গ. স্বরসংকোচ ও স্বরসন্নিধান

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষায় যে স্বরসংকোচ (vowel contraction) এবং স্বরসন্নিধান (vowels in contact) পাওয়া যায় তার কিছু দৃষ্টান্ত আমরা দেখে নেব অধ্যাপক পরেশচন্দ্র মজুমদারের অনুসরণে।

অই, আই, অউ, আউ এই diphthongs বা দ্বিস্বরগুলি কখনো-কখনো সংকুচিত হয়ে একক স্বরে পরিণত হয়েছে—

অই > অ, আই > আ, অউ > উ, আউ > আ।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে সংযুক্ত স্বরধ্বনি কখনো-কখনো পৃথক স্বর হিসাবে পাশাপাশি উচ্চারিত হয়েছে। তার উদাহরণ—

নির্মল কমল বঅনে (অও)
শক্রের ধেনু যেহ্ন উয়িল আকাশে (উই)
যশোদার পোঅ আহ্মে হাথ ধরী বাঁশী (ওঅ)

২০.৪.২ রূপতত্ত্ব

এক. প্রাচীন বাংলার কয়েকটি বিভক্তি আদিমধ্য যুগের বাংলাতেও ব্যবহৃত হত। অ-কারান্ত শব্দে কর্মকারকে 'এ' বিভক্তি, অ-কারান্ত বিধেয়-বিশেষণে 'এ' বিভক্তি, করণ কারকে 'এ' বিভক্তি লক্ষ করা যায়। কখনো-কখনো 'এঁ' বিভক্তি দেখা যায়—'স্তুতীএঁ তুষিল হরি জলের ভিতর'। অনুরূপ ক্ষেত্রে শূন্যবিভক্তিরও ব্যবহার হত—'প্রাণে মারিবোঁ কংসাসুর মোএঁ'। তির্যক বিভক্তির দৃষ্টান্ত—'দেহ মোরে সরস বচনে', 'তোর পরসাদেঁ ঘর জাওঁ একবার', 'মীনরূপ ধরী জলে বেদ উদ্ধারিলেঁ' ইত্যাদি।

দুই. বিশেষ্য বা নামপদের **একবচন ও বহুবচনের তফাত** আদি মধ্য স্তরে তেমন দেখা যায় না। সাধারণত বহুবচনের দ্যোতনা বোঝাতে **সমষ্টিবাচক শব্দ যোগ** করা হত, যেমন—'সবে কহিব আইহনের মাএ', 'ব্রহ্মা সব দেব লআঁ গেলান্তি সাগরে' ইত্যাদি। কখনো-কখনো সংখ্যাশব্দ দিয়ে বহুবচন করা হত। যেমন, 'পাঞ্চ আবথা', 'বত্তীস দান'। পরবর্তী কালে যে -রা বিভক্তির প্রচলন হয়, তার সূত্রপাত শ্রীকৃষ্ণকীর্তনেই—'আহ্মারা মরিব শুনিলেঁ কাঁশে', 'আজি হৈতে আহ্মারা হৈলাহোঁ একমতী'।

তিন. **লিঙ্গভেদ** শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে কিছু ক্ষেত্রে দেখা গেছে—'তার পিসী নিয়োজিলী', 'বড়ায়ি চলিলী আনপথে'। তবে লিঙ্গের তফাত সব ক্ষেত্রে করা হয়নি। 'বড়ায়ি চলি ভৈল রাধিকার থানে'।

চার. **ক্রিয়াপদ** সম্বন্ধে কয়েকটি কথা। প্রথমত, উত্তমপুরুষে -অওঁ, -ওঁ, -ও ; মধ্যমপুরুষে -অ, -সি, -হ, -হা, -ঈ; প্রথম পুরুষে -ই, -ঈ, -ইএ ইত্যাদি বিভক্তি ব্যবহৃত হত। উদাহরণ হিসাবে কয়েকটি বাক্য বা বাক্যাংশ দেখব—'আহ্মে করিবাক পারী', 'ধরিবার না পারোঁ', 'কিসের কারণে তোঁ এবে করসি বল'। দ্বিতীয়ত, ধাতুর সঙ্গে -ই, -ইআঁ, -ক, -ইতেঁ, -ইলে প্রভৃতি যোগ ক'রে অসমাপিকা ক্রিয়া গঠিত হত—'মৌন করিআঁ দুহেঁ থাকি একপাশে'। তৃতীয়ত, অতীত কালে -ল, -লো, লোঁ ইত্যাদি ব্যবহৃত হত—'মেদনী ধরিল আহ্মে দশনের আগে'।

পাঁচ. **পদক্রমে** কোনো-কোনো ক্ষেত্রে বিপর্যাস দেখতে পাই। নিষেধসূচক 'না' অব্যয় ক্রিয়ার আগে বসত—না আইসে। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ লক্ষ করেছেন যে, এই বৈশিষ্ট্যটি এখনও অসমিয়া ও চট্টগ্রামের উপভাষার রক্ষিত আছে।

ছয়. **শব্দভাণ্ডার** সম্পর্কে দু-একটি কথা মনে রাখতে হবে। এই সময় থেকেই বিদেশি শব্দ বাংলায় আসতে থাকে। বিশেষত আরবি-ফারসি শব্দই এই পর্বে এসেছে। আমরা কয়েকটির উল্লেখ করতে পারি—নালিশ (ফারসি), জাহাজ (ফারসি), জামিন (আরবি) ইত্যাদি। তবে লক্ষণীয় যে, আরবি শব্দও এসেছে ফারসির মারফত।

গ্রন্থপঞ্জি

গোস্বামী, কৃষ্ণপদ—বাংলা ভাষাতত্ত্বের ইতিহাস, ২০০১
চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার—বাঙ্গালা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা, ১৩৯৮
বসু, দ্বিজেন্দ্রনাথ—বাংলা ভাষার আধুনিক তত্ত্ব ও ইতিকথা, ১৯৮০
ভট্টাচার্য, পরেশচন্দ্র—ভাষাবিদ্যা পরিচয়, ১৯৯৩
ভট্টাচার্য পার্বতীচরণ—বাংলা ভাষা, ১৯৮২
মজুমদার, পরেশচন্দ্র—বাঙলা ভাষা পরিক্রমা, প্রথম খণ্ড, ২০০৩; দ্বিতীয় খণ্ড, ২০০৪
শহীদুল্লাহ্, মুহম্মদ—বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত, ১৯৯৮
Chatterji, Suniti Kumar—The Origin and Development of the Bengali Language, Vols I & II, 1985
Mojumdar, Atindra—Bengali Language : Historical Grammar, Part II, 1973

২১. অন্ত্যমধ্য বাংলা ভাষা

২১.১ অন্ত্যমধ্য যুগের বাংলা ভাষা ও সাহিত্য

আমরা আদি বা অন্ত্য মধ্য স্তরের বাংলা ভাষার ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য আলোচনা করি ওই স্তরের সাহিত্যকৃতির উপর নির্ভর ক'রে। আগের অধ্যায়ে দেখেছি যে, আদিমধ্য বাংলার কালপর্ব দশম থেকে ষোড়শ শতকের সূচনাকাল পর্যন্ত এবং তার পরই শুরু অন্ত্যমধ্য যুগ, যার কালপর্ব ১৫০০ থেকে ১৮০০ পর্যন্ত। মোটামুটিভাবে এইরকমই ধরা হলেও, কারও কারও মতে ১৭৫০-১৮০০ সময়টাকে সন্ধিপর্ব বলে বিবেচনা করা উচিত। অন্ত্যমধ্য স্তর বাংলাভাষা ও সাহিত্যের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পর্ব। এই সময়ের প্রধান সাহিত্যকৃতি হল বৈষ্ণব পদাবলি, মঙ্গলকাব্য, পুরাণাশ্রয়ী কাব্য, নাথ কাব্য, শাক্তগীতি, রাজসভার কাব্য ইত্যাদি।

চৈতন্যদেবের জন্ম হয় ১৪৮৬ খ্রিস্টাব্দে, তাঁর তিরোধান ১৫৩৪ খ্রিস্টাব্দে। তাঁকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল এক সুবিপুল ও সুমহান কাব্যধারা—বৈষ্ণব কবিতা। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, বৈষ্ণব কবিতা 'বসন্ত কালের অপর্যাপ্ত পুষ্পমঞ্জরীর মতো। যেমন তাহার ভাবের সৌরভ, তেমনি তাহার গঠনের সৌন্দর্য'। পদাবলির চণ্ডীদাসের কাব্য পড়ে মুগ্ধ হয়েছিলেন শ্রীচৈতন্য। বৈষ্ণব কবিতার শ্রেষ্ঠ কবি তিনিই। এ ছাড়া চৈতন্যের সমসাময়িক ও ঈষৎ পরবর্তী কালের কয়েকজন কবি বৈষ্ণব কবিতার ধারাকে পুষ্ট করেছেন। এঁদের মধ্যে আছেন বৃন্দাবনদাস, লোচনদাস, কৃষ্ণদাস কবিরাজ ও জয়ানন্দ মিশ্র।

অন্ত্যমধ্য যুগে বিশেষ বিকাশ লাভ করে মঙ্গলকাব্য যার প্রধান তিনটি ধারা হল মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল ও ধর্মমঙ্গল, যদিও অন্য দুটির তুলনায় তৃতীয়টির ন্যূনতা নিঃসন্দেহ। বিজয়গুপ্ত, কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ ও নারায়ণদেব মনসামঙ্গলের শ্রেষ্ঠ কবি। তেমনি চণ্ডীমঙ্গলের শ্রেষ্ঠ কবিরা হলেন দ্বিজ মাধব, কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম ও মানিক দত্ত। ধর্মমঙ্গলের প্রধান কবিরা হলেন মাণিকরাম গঙ্গোপাধ্যায়, ঘনরাম চক্রবর্তী, রূপরাম চক্রবর্তী ও রামাই পণ্ডিত। পঞ্চদশ-ষোড়শ থেকে সপ্তদশ শতকের মধ্যে কতকগুলি পুরাণাশ্রয়ী কাব্য রচিত হয়েছিল। এগুলিকে অনুবাদকাব্য ততটা বলা যায় না। বরং বলা যায় রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবত অবলম্বনে রচিত নতুন কাব্যের নির্মাণ। কৃত্তিবাস ওঝার রামায়ণ পাঁচালি, কাশীরাম দাশের মহাভারত এই পর্বের শ্রেষ্ঠ রচনা। নাথপন্থা গড়ে উঠেছিল অষ্টম-নবম শতকেই। তবে তার বিকাশকাল অনেক পরবর্তী। হঠযোগকে আশ্রয় করে গড়ে উঠেছিল নাথপন্থা, আর নাথপন্থাকে আশ্রয় করে রচিত হয়েছিল নাথকাব্য, যার প্রধান দুটি হল 'গোরক্ষবিজয়' ও 'গোপীচন্দ্রের গান' বা 'ময়নামতীর গান'।

অন্ত্যমধ্য স্তরের আর যে বিশিষ্ট কাব্যধারার কথা বলতে হবে তা হল শাক্তগীতি। শাক্তগীতির প্রধান দুই কবি রামপ্রসাদ সেন ও কমলাকান্ত ভট্টাচার্য। রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রকে সন্ধিযুগের কবি বলে মনে করা হয়। মধ্যযুগের কবিতার একটা বড়ো বৈশিষ্ট্য ধর্মাত্মকতা। কবিতার ভিতরে ধর্ম, বহিরঙ্গেও ধর্ম। কিন্তু সেই যুগেও ভারতচন্দ্রের কাব্যে ধর্ম বা দেবমাহাত্ম্য তেমনভাবে ছায়াপাত করেনি। বরং তাঁর কাব্যে মানবতারই প্রাধান্য দেখা গেছে।

২১.২ অন্ত্যমধ্য স্তরের ভাষার বৈশিষ্ট্য

অন্ত্যমধ্য স্তরে বাংলা ভাষার স্বরূপ সম্বন্ধে যে-কথাটি বিশেষভাবে মনে রাখা প্রয়োজন তা এই যে, এই স্তরের ভাষা একরৈখিক নয়। অর্থাৎ বৈষ্ণব পদাবলির ভাষা, মঙ্গলকাব্যের ভাষা, কৃত্তিবাস-কাশীরামের ভাষা এবং শাক্তগীতির ভাষাকে একই লক্ষণ দিয়ে চিহ্নিত করা যায় না। চণ্ডীদাস তাঁর পদাবলিতে যে ভাষা ব্যবহার করেছিলেন তাতে বিদ্যাপতির ব্রজবুলির প্রভাব যে ছিল না তা নয়। তবে চণ্ডীদাসের ভাষাতেই প্রথম খাঁটি বাংলা ভাষার প্রাথমিক রূপ ধরা পড়ে। অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসু যে চণ্ডীদাসকে ‘কবিভাষার জনক’ বলেছেন তা এই কারণেই। আবার অন্য দিকে বৈষ্ণব কবিতায় তৎসম শব্দের বহুলব্যবহারও লক্ষ করতে হবে। আদিমধ্য স্তরে অনুনাসিকতার প্রচুরতা, শব্দশেষের অকারণ মহাপ্রাণতা, আদ্য অ-ধ্বনির দীর্ঘতা দেখা গেছে। অন্ত্যমধ্য স্তরে সেই বৈশিষ্ট্য আর তেমন দেখা যায়নি। কোনো-কোনো মঙ্গলকাব্যে আঞ্চলিক ভাষার প্রয়োগও (যেমন দ্বিজ মাধবের কাব্যে) দেখা গেছে। আবার আমরা পূর্বী ও পশ্চিমা উপভাষার মিশেলও দেখতে পাই।

একথা অস্বীকার করা যায় না যে, অন্ত্যমধ্য স্তরের সব কাব্য একই ভাষালক্ষণ দ্বারা চিহ্নিত নয়। বৈষ্ণব কবিতার ভাষা আর মনসামঙ্গলের ভাষা কিংবা চণ্ডীমঙ্গলের ভাষায় ভিন্নতা বিশেষ লক্ষণীয়। আবার মনসামঙ্গলের ভাষার সঙ্গে কৃত্তিবাস-কাশীরাম দাসের ভাষার সর্বৈব সাযুজ্য নেই। তবু যখন আমরা অন্ত্যমধ্য স্তরের ভাষার বৈশিষ্ট্য বা লক্ষণের কথা বলি, তখন ‘সাধারণ’ কতকগুলি বৈশিষ্ট্য বা লক্ষণের কথাই বলি।

২১.২.১ অন্ত্যমধ্য বাংলার ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

১. অন্ত্যমধ্য বাংলায় অপিনিহিতির বহু দৃষ্টান্ত দেখা যায়। এর সূত্রপাত আদিমধ্য স্তরে হলেও তা ছিল অপ্রচুর। এই পর্বে অপিনিহিতি বহুল পরিমাণে দেখা গেল। প্রায়ই পদমধ্যস্থ ই ও উ ধ্বনির স্থানপরিবর্তন লক্ষণীয়। বিশেষত সেগুলি চলে এল পূর্ববর্তী সিলেবলে। এছাড়া দেখা গেল ধ্বনির বিপর্যাস, অভিশ্রুতি প্রভৃতিও। আজি > আইজ, হইয়া > হয়্যা, লইয়া > লয়্যা, আলু > আউল, হসি > হইস, জাকু, > জাউক, যাউক, চালু > চাউল ইত্যাদি দৃষ্টান্ত লক্ষণীয়।

২. অন্ত্যমধ্য বাংলায় কোনো-কোনো ক্ষেত্রে আদ্য অ আ-তে পরিণতি লাভ করেছে (অ > আ)—অপার > আপার, অতি > আতি, হতাস > হাতাস, অবশ্য > আবশ্য।

৩. পদান্ত নিহিত অ আধুনিক বাংলায় ও-তে পরিণত হয়। এই প্রবণতার সূত্রপাত হয়েছে অন্ত্যমধ্য স্তরে। 'মাতামহো' একটি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত। অধ্যাপক পরেশচন্দ্র মজুমদার লক্ষ করেছেন যে, অষ্টাদশ শতকের পুথিকারগণের বানানে অনেক সময়েই পদান্ত অ-কারকে ও-কার লেখা হয়েছে। তার দৃষ্টান্ত—কেনো (কেন), গেলো (গেল), পেতো (পেত), কয়ো (কহিও) ইত্যাদি।

৪. অন্ত্যস্বরের লোপ (apocope) অন্ত্যমধ্য বাংলায় আর একটি লক্ষণ। স্বরান্ত শব্দ অনেক সময় ব্যঞ্জনান্ত উচ্চারিত হত এবং পুথিতেও হসন্তযুক্ত বানান পাওয়া যায়—ভাত্, তখন্, ধ্যান্, দাস্ বট্ (বটগাছ)।

৫. অন্ত্যমধ্য স্তরে অ্যা-ধ্বনির আর্বিভাব একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। দ্যায়, বান্যা, স্যান (সেন), য্যান (যেন)।

৬. অনেক সময় দুই বা ততোধিক সিলেবলের শব্দে আদ্য স্বরে বা প্রথম সিলেবলে শ্বাসাঘাতের ফলে পরবর্তী সিলেবলের বা মধ্যস্বরের লোপ ঘটেছে—গামোছা > গাম্ছা, ভাবনা > ভাব্না।

৭. আদিমধ্য স্তরের মতো অন্ত্যমধ্য স্তরেও দেখা গেছে স্বতোনাসিক্যীভবন ও স্বতোমূর্ধন্যীভবন।

৮. অন্ত্যমধ্য বাংলায় ন থেকে ল (ন > ল) এবং ল থেকে ন (ল > ন) কখনো-কখনো দেখা গেছে। তার দৃষ্টান্ত—লেহ > নেহ, নুনী > লুনী।

২১.২.২ রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

ক. ক্রিয়াপদ

১. ক্রিয়াপদের ক্ষেত্রে -ইল, -ইব প্রত্যয়ের ব্যবহার শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে দেখা গেলেও অন্ত্যমধ্য বাংলায় এগুলির কর্তৃবাচ্যে প্রয়োগ হতে লাগল। উদাহরণ—

অব মথুরাপুর মাধব গেল।
তোমার বদলে আমি করিব প্রসার।

২. উত্তমপুরুষে -ম, -ও, -হুঁ ; মধ্যমপুরুষে -সি, -হ ইত্যাদি এবং প্রথম পুরুষে -এ, -ইএ, -অন্তি -অন্ত প্রভৃতি পাওয়া যায়। দৃষ্টান্ত—

কহম তোমারে
মুঞি করম নিবেদন
চরণে ধরহুঁ
কহিএ সকল কথা সুনহ গোপাল

৩. নিত্যবৃত্ত অতীত কালের প্রত্যয় -ইত। তার সঙ্গে পুরুষবাচক বিভক্তি যুক্ত হয়ে

দাঁড়ায় -ত, -তুঁ, -তাম, -তে, -তা, -তেন, -তাঙ। কখনো-কখনো -তে > -থে, -তাঙ > -থাঙ, তুঁ > থুঁ হত।

দৃষ্টান্ত—

পরাণে পরাণ দিয়া রাখিতুঁ বান্ধিয়া।
আমি যদি থাকিতাঙ
তুমি ত পুত্রের অধিক করিথে গৌরব।
পুষ্প জোগাইতা নিত্য হরের গোচর।

৪. অন্ত্যমধ্য বাংলায় যৌগিক ক্রিয়ার প্রয়োগ লক্ষণীয়—গমন করিল, ধেনু কৈল লুকি, লজ্জা নাহি বাস, কহিবারে ভয় বাসি।

৫. ণিজন্ত ক্রিয়ার ব্যবহারও ছিল এই পর্বে—খাবাইমু, খাওয়াইবে, দেওয়াইল।

৬. নামধাতুর ব্যবহারও প্রচুর হত—ক্রোধ শান্তাইল, নিমন্ত্রিয়া, আমি দুসিব কাহারে।

খ. বচন

বহুবচনের বিভক্তি হিসাবে -রা শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে ব্যবহৃত হত কেবল পুরুষবাচক সর্বনামে। অন্ত্যমধ্য স্তরে বচনবিভক্তির প্রসার ও বৈচিত্র্য ঘটে। প্রাণীবাচক বিশেষ্য শব্দেও -রা প্রযুক্ত হতে লাগল এবার।

বাপেরা, যুবতীরা, কুমারেরা, সেনারা, বাণ্যারা, কন্যারা

এছাড়া -গুলা, -গুলি, -দিগ, -দিগে (-দিগকে) -দিগের, -দের এই বিভক্তিগুলিরও দেখা পাওয়া যেতে লাগল সপ্তদশ শতক থেকে।

তোমাদিগ, মেয়েগুলা, বিকট দশনগুলা, তাহাদিগে আন

গ. সর্বনাম

১. উত্তম পুরুষ সর্বনামের রূপ হিসাবে পাওয়া যায় মু/মুঁ, মো, মুঞি, মুঞিঁ, মোহি, আহ্মি, আমি, মোহে, মোক, মোহকে, আমাক, মোহর, আমা, আমাদের ইত্যাদি।

২. মধ্যম পুরুষ সর্বনামের রূপ—তুঁ, তুই, তুঞি, তোহে, তোহি, তুহ্মি, তুম ; তোএ, তোক, তোহ্মা, তোহার, তোহ্মার ইত্যাদি। তুহ্মি বা তুম-র সঙ্গে কোথাও কোথাও তুমি-ও পাওয়া যায়।

৩. প্রশ্নসূচক সর্বনামের রূপ—কেহ, কেহো, কেও, কিহ, কেনা, কাঁহ, কাহো, কাহাঁতে ইত্যাদির ব্যবহার পাওয়া যায়।

ঘ. শব্দভাণ্ডার

১. আদিমধ্য স্তর থেকেই বাংলায় আরবি-ফারসি শব্দ আসতে শুরু করে। অন্ত্যমধ্য স্তরে এই প্রবণতা বেড়ে যায়। এবং তার উপর তুর্কি, পোর্তুগিজ শব্দেরও অনুপ্রবেশ ঘটতে থাকে। **আরবি-ফারসি** শব্দের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—বরাবর, ফরমান, কামান, বেয়াদপি, বেআক্কেল, পর্দা, জাহাজ, বাজার, কেতাব, আইন, কেচ্ছা, তাজ্জব;

তুর্কি শব্দের মধ্যে আছে—কাঁচি, উজবুক, বোঁচকা ; **পোর্তুগিজ শব্দ**—তামাকু, আনারস, আতা, পেয়ারা, পিপা, আলমারি ইত্যাদি।

২. বিদ্যাপতির উদ্ভাবিত **ব্রজবুলির প্রভাব** শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে ততটা গভীর নয় বটে, তবে পরে ষোড়শ থেকে অষ্টাদশ শতকে ব্রজবুলির প্রভাব দেখা যায় বিশেষভাবে। নিকসয়ে, হেরই, না পারয়ে, বেঢ়ল (বেড়িল), বরিখ, তুয়া ইত্যাদি শব্দ বিশেষত বৈষ্ণব পদাবলিতে বারবার ব্যবহৃত হয়েছে।

৩. অধ্যাপক পরেশচন্দ্র মজুমদার দেখিয়েছেন যে অন্ত্যমধ্য স্তরে 'অনেক **প্রাচীন তদ্ভব শব্দ অপ্রচলিত হয়ে** পড়ে'। তার জায়গায় আসে সংস্কৃত শব্দের সমবায়ে গঠিত নতুন নতুন **যৌগিক ক্রিয়া** এবং **নতুন নতুন ধাতু**। যেমন লখ্ (দেখা), শুত (শোয়া), গোঁয়া, গোঁয়ানো (কাটানো) ইত্যাদি।

২১.৩ মধ্য বাংলায় বৈদেশিক প্রভাব

মধ্যস্তরের বাংলা ভাষায় আরবি-ফারসি ও পোর্তুগিজ প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষ করা যায়। সেই প্রভাব নিয়ে বিশদ আলোচনা করেছেন ভাষাচার্য সুনীতিকুমার তাঁর ODBL (The Origin and Development of the Bengali Language) গ্রন্থে। তাঁর আলোচনায় ধ্বনিতত্ত্ব ও রূপতত্ত্ব দুই ক্ষেত্রেই এই বৈদেশিক প্রভাব স্থান পেয়েছে। এছাড়া এ নিয়ে লিখেছেন মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ তাঁর 'বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত' গ্রন্থে।

খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ শতকের সূচনাকাল থেকেই বাংলা তুর্কি অধিকারে আসে। মুসলমানগণ সমগ্র বাংলায় তাদের অধিকার প্রসারিত করে প্রায় একশো বছর ধরে। আকবরের সময় বাংলা মোগল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। সেইসময় সরকারি ভাষা ছিল ফারসি। বাংলা ভাষায় ফারসি প্রভাবের সূত্রপাত হয় ত্রয়োদশ শতকেই। ক্রমে সেই প্রভাব ব্যাপক ও গভীর হতে থাকে। এই মুসলমান প্রভাব ছিল দীর্ঘ ৬০০ বছর ধরে, উনিশ শতকে ইংরেজি ভাষার প্রতিষ্ঠার আগে পর্যন্ত। বাংলায় এর ফলে দু-হাজারের মতো ফারসি শব্দ এবং ফারসির মাধ্যমে আরবি ও তুর্কি শব্দ এসেছে। বাংলা ব্যাকরণেও ফারসির প্রভাব লক্ষ করা যায়।

আরবি-ফারসি-তুর্কি শব্দ

এক. ফারসি তদ্ধিত প্রত্যয় :-

-দার, -দারি (দোকানদার, দোকানদারি, তহশিলদার, পোতদার > পোদ্দার) ; -খোর (গুলিখোর, চশমখোর) ; -বাজ (ফন্দিবাজ, ধোঁখাবাজ > ধোঁকাবাজ) ; -গিরি (বাবুগিরি, কেরানিগিরি) ; -আন, -ওয়ান (দরওয়ান) দারোয়ান, গাড়িওয়ান > গাড়োয়ান) ; -খানা (মুদিখানা, শুঁড়িখানা, কবুতরখানা) ; -দান, -দানি (আতরদান, শামাদান, পিকদানি) ইত্যাদি।

দুই. আরবি-ফারসি উপসর্গ :-

গর- (গরহাজির, গরমিল) ; দর- (দরদালান, দরপত্তনি) ; না- (নাবালিগ > নাবালক, নালায়েক) ; বদ্- (বদ্‌মেজাজ) ; বে- (বেআইনি, বেমক্কা < বেমৌকা, বেচাল) ; হর- (হরদম, হররোজ, হরবোলা) ইত্যাদি।

তিন. যুদ্ধবিগ্রহ, জমিজমা ইত্যাদি বিষয়ক শব্দ :-

জখম, খেতাব, খাজনা, তালুক, তির, ফৌজ, তোপ, তখ্‌ত্, জমিদার (< জমিন্‌দার), রায়ত, বাহাদুর (< বহাদুর), রসদ, সুদ, নবাব, বেগম, সেপাই।

চার. আইন-আদালত বিষয়ক শব্দ :-

জরিমানা (< জুরমানা), জেরা, নালিশ, আসামি, তামাদি, কানুন, আদালত, সালিশ, ফরিয়াদি, জবানবন্দি, কয়েদ, কয়েদখানা, পেয়াদা, নাজির, হাকিম, দারোগা, রায়, ফয়সালা, উকিল, মেয়াদ (< মিয়াদ), মোকদ্দমা।

পাঁচ. শিক্ষা বিষয়ক শব্দ :- দোয়াত, কলম, তরজমা, মক্তব, হরফ, কাগজ, খাতা, মাদ্রাসা কেতাব ইত্যাদি।

ছয়. ধর্মবিষয়ক শব্দ :-

নমাজ, খোদা, হজ, কোরবানি, দরবেশ, মোল্লা (< মউলা), মৌলবি (< মৌলভি), রোজা, হারাম, জাহান্নাম (< জহান্নাম), জবাই ইত্যাদি।

সাত. জাতি, পেশা, ব্যাবসা, ইত্যাদি বিষয়ক শব্দ :

ইহুদি, হিন্দু, ফিরিঙ্গি, দরজি, কারিগর, জাদুকর (< জাদুগর), ভিস্তি, কশাই, নফর, খেদমতগার, সহিস, পেস্তা, মিছ্‌রি, আতর, গোলাপ (< গুলাব), কোরমা, পোলাও, চশমা, বাদাম (< বদাম), হালুয়া, বাগ, বাগান, রুমাল, খানশামা মখ্‌মল ইত্যাদি।

আট. অন্যান্য

আওয়াজ, ওজন, পেশা, মজবুত, বগল, গরম, নরম, আফশোস, পছন্দ (< পসন্দ্), হজম, দরকার, সাদা, সবুজ, খবর, কোমর, হাওয়া ইত্যাদি।

পোর্তুগিজ ও ওলন্দাজ শব্দ

পোর্তুগিজরা ভারতে এসে এদেশের সঙ্গে বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপন করে এবং সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হয়। সে-উদ্যোগ ব্যর্থ হলেও সুদীর্ঘকাল ধরে ভারত ও পোর্তুগালের মধ্যে আদানপ্রদান চলেছে। ১৫২৮-৩০ সাল নাগাদ বাংলার সঙ্গেও পোর্তুগিজরা বাণিজ্যসম্পর্ক স্থাপন করে। বাংলার চট্টগ্রামে তাদের একটি উপনিবেশও ছিল, হুগলিতে ছিল বাণিজ্যকেন্দ্র। ওলন্দাজরাও ভারতে এবং বাংলায় বাণিজ্য করতে সচেষ্ট ছিল। এই কারণে বাংলা ভাষায় ষোড়শ শতক থেকে বেশকিছু পোর্তুগিজ ও ওলন্দাজ শব্দ ঢুকে পড়েছে। আমরা এখানে কতকগুলি পোর্তুগিজ ও ওলন্দাজ শব্দ উল্লেখ করছি যেগুলি বাংলা ভাষায় গৃহীত হয়েছে।

এক. পোর্তুগিজ শব্দ :-

আনারস, আলকাতরা, আলপিন, গামলা, গুদাম, জানলা, নিলাম, পেরেক, ফিতা/ফিতে, বালতি, মাস্তুল, মিস্ত্রি, আলমারি, কামরা, গারদ, চাবি, কপি (সবজি), পেঁপে, পিপা/পিপে, বাতাম, বারান্দা ইত্যাদি।

দুই. ওলন্দাজ শব্দ

মূলত তাস খেলার শব্দই এসেছে ওলন্দাজ ভাষা থেকে—হরতন, রুইতন, ইশকাবন, তুরুপ ; এছাড়া ইস্ক্রুপ।

ইংরেজি ও ফরাসি শব্দ

ইংরেজদের ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ভারতে আসে সপ্তদশ শতকে। ফরাসি কোম্পানি আসে কিছু পরে। অষ্টাদশ শতক থেকে ব্রিটিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি বাংলায় ক্ষমতাসীন হয় এবং স্বভাবতই বাংলা ভাষায় এই সময় থেকে অনুপ্রবেশ করতে থাকে বেশকিছু ইংরেজি শব্দ। কেবল মনে রাখতে হবে যে, অধিকাংশ ইংরেজি শব্দের উচ্চারণে কিছুটা রদবদল করে গ্রহণ করা হয় বাংলায়। সেইসব শব্দের মধ্যে আছে—বাক্স, লণ্ঠন (lantern), লম্ফ (lamp), পুলিশ, ইসকুল, টেবিল, গেলাস, লাট (lord), পোস্টাপিস, টব (tub), বুরুশ (brush), হাসপাতাল, টিকিট, নম্বর, জাঁদরেল (general), বিস্কুট, গার্জেন (guardian) ইত্যাদি।

ফরাসি শব্দ অন্ত্যমধ্য স্তরের শেষে আসতে শুরু করে। তবে তুলনায় ফরাসি শব্দ কমই এসেছে বাংলায়—কার্তুজ (cartouche), কুপন, ফরাসি (Français), ওলন্দাজ (Hollandais) ইত্যাদি।

গ্রন্থপঞ্জি

গোস্বামী, কৃষ্ণপদ—বাংলা ভাষাতত্ত্বের ইতিহাস, ২০০১

চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার—বাঙ্গালা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা, ১৯৯১

বসু, দ্বিজেন্দ্রনাথ—বাংলা ভাষার আধুনিক তত্ত্ব ও ইতিকথা, ১৯৮০

ভট্টাচার্য, পরেশচন্দ্র—ভাষাবিদ্যা পরিচয়, ১৯৯৩

ভট্টাচার্য, পার্বতীচরণ—বাংলা ভাষা, ১৯৮২

মজুমদার, পরেশচন্দ্র—বাঙলা ভাষা পরিক্রমা, প্রথম খণ্ড, ২০০৩, দ্বিতীয় খণ্ড, ২০০৪

শহীদুল্লাহ্, মুহম্মদ—বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত, ১৯৯৮

সেন, সুকুমার—ভাষার ইতিবৃত্ত, ১৯৯৪

Chatterji, Suniti Kumar—The Origin and Development of the Bengali Language, Vols. I, II, 1985

Mojumdar, Atindra—Bengali Language : Historical Grammar, Part II, 1973

তৃতীয় পর্ব

২২. আধুনিক বাংলা ভাষা

২২.১ মধ্য বাংলা থেকে আধুনিক বাংলায় রূপান্তর

অনেকে ভারতচন্দ্রকে মধ্যযুগের শেষ কবি বলে মনে করেন। ভারতচন্দ্রের জীবনাবসান হয় ১৭৬০ সালে। এই বছরটি তাঁদের মতে মধ্য বাংলার সমাপ্তি সূচিত করছে। তবে অনেকেই ভারতচন্দ্রকে সন্ধিক্ষণের কবি বলে মনে করেন। তাঁদের মতে ভারতচন্দ্র অন্ত্যমধ্য ও আধুনিক বাংলার সন্ধিকালের কবি। যাই হোক, এই কথাটা অবিতর্কিত যে, অষ্টাদশ শতকের শেষপর্ব থেকেই বাংলা ভাষার আধুনিক কালের শুরু, যদিও এসব ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্টভাবে কোনো একটি বছরকে দিয়ে সীমারেখা টানার ব্যাপারটা সর্ববাদীসম্মত নয়।

বাংলা ভাষা পরিবর্তিত হতে হতে আধুনিক বাংলায় রূপলাভ করেছে। অন্ত্যমধ্য স্তরের ভাষায় যে লক্ষণগুলি আমরা দেখেছি, আধুনিক বাংলায় এসে তার কতকগুলি বাতিল হয়ে গেছে, কোনো-কোনোটা সরল হয়েছে, আবার কোনো-কোনোটা অপরিবর্তিতই থেকে গেছে। উচ্চারণে বড়ো রকমের পরিবর্তন ঘটেছে, রূপতত্ত্ব ও শব্দতত্ত্বেও পরিবর্তন নিতান্ত কম হয়নি। আধুনিক বাংলায় এসে সবচেয়ে বড়ো যে বিষয়টি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, তা এই যে, বাংলায় গদ্যরীতি ছিলই না, তা তৈরি হয়েছে। অষ্টাদশ শতক থেকে কীভাবে গদ্যের উদ্ভব ও নির্মিতি হল তা একটি অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক বিষয়। গদ্যের উদ্ভবের প্রসঙ্গে এই কথাটি মনে রাখা দরকার যে, প্রধানত চিঠিপত্র, দলিল, জমির স্বত্বপত্র প্রভৃতিতেই বাংলা গদ্যের সূত্রপাত। আর সে-সূত্রপাত অষ্টাদশ শতকেই। উনিশ শতকের গোড়ায় গদ্য ক্রমশ রূপলাভ করতে থাকে।

২২.২ আধুনিক বাংলা ভাষার ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

আধুনিক বাংলা ভাষার ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনায় তিনটি ধারা লক্ষ করব আমরা—**ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য** বা **লক্ষণ, রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য** ও **বাক্যরীতিগত বৈশিষ্ট্য**।

গদ্যের উদ্ভব

আধুনিক বাংলা ভাষার প্রসঙ্গে দুটি কথা প্রথমেই বলে নিতে হবে। প্রথমত, মধ্যস্তরের শেষ দিকে দলিলপত্র, চিঠিপত্র ইত্যাদিতে বাংলা গদ্যের যে বীজ ছিল তার স্ফুরণ হয় অষ্টাদশ শতকের শেষ দিকে এবং ১৮০০ সালে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের প্রতিষ্ঠার পর গদ্য ধীরে ধীরে রূপলাভ করতে থাকে। দ্বিতীয়ত, মধ্যস্তরের অন্তিম পর্ব পর্যন্ত কথ্য ও

লেখ্য ভাষারূপের মিশ্রণ দেখা গেছে। আধুনিক বাংলায় এসে লেখ্য ও কথ্য ভাষা পৃথক হয়ে গেল। আর সেই সঙ্গে দুটি ভাষারূপও গড়ে উঠল—সাধু ভাষা ও চলিত ভাষা। চলিত ভাষা প্রধানত কথ্য ভাষাকে আশ্রয় করেই গড়ে উঠেছে। বলতে গেলে চলিত ভাষা কথ্য বা মৌখিক ভাষারই পরিশীলিত রূপ।

ক. ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

এক. মধ্য বাংলায় অপিনিহিতি বা ধ্বনিবিপর্যয়ের ফলে ই বা উ পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনের আগে উচ্চারিত হত কোনো-কোনো ক্ষেত্রে। যেমন

করিয়া > কইর‍্যা
মাখিয়া > মাইখ্যা

আধুনিক বাংলায় মান্য চলিতে অভিশ্রুতির ফলে আর এক বার ধ্বনিপরিবর্তন হল—

করিয়া > কইর‍্যা > ক'রে
মাখিয়া > মাইখ্যা > মেখে

দুই. স্বরধ্বনির ক্ষেত্রে স্বরের উচ্চতাসাম্য (vowel height assimilation) বা যাকে অনেকে স্বরসংগতি বলেন তাই ঘটল আধুনিক বাংলায়। পাশাপাশি দুটি অসম উচ্চতাবিশিষ্ট স্বরধ্বনি থাকলে একটি যদি অন্যটির কাছাকাছি চলে আসে, তবে তাকেই বলা হবে স্বরের উচ্চতাসাম্য বা স্বরসংগতি। এই নিয়মে আধুনিক বাংলায় এইভাবে ধ্বনিপরিবর্তন হল—

শিয়াল > শেয়াল ; মুলা > মুলো ;
টুকরা > টুকরো ; কৃপণ > কেপ্পন ;
জ্যাঠা > জেঠি ; প্যাঁচা > পেঁচি ;
পূজা > পুজো ; ভিক্ষা > ভিক্ষে।

লক্ষণীয় যে, স্বরসংগতির ফলে শব্দের যে নতুন রূপ পাওয়া গেল তা প্রধানত চলিত বাংলাতেই ব্যবহৃত হল।

তিন. সমীভবনও আধুনিক বাংলার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। পাশাপাশি দুটি অসম ব্যঞ্জনধ্বনির মধ্যে কখনো পরেরটির প্রভাবে প্রথমটি বদলে যায়, আবার কখনো প্রথমটির প্রভাবে দ্বিতীয়টি বদলে যায়, কখনো-বা দুটি ভিন্ন ধরনের ব্যঞ্জন একজাতীয় ব্যঞ্জনে রূপান্তরিত হয়। এখানে নানা ধরনের সমীভবনের উদাহরণ দেখব—

পূর্ণিমা > পুন্নিমা > পুন্নিমে
শিরনি > শিন্নি
দূর্বা > দুব্বো
কর্ম > কম্ম
গল্প > গপ্প, গপ্‌পো

কুৎসা > কুচ্ছো
মহোৎসব > মোচ্ছব
পূর্ব > পুব

এখানেও মনে রাখব যে, এসব পরিবর্তিত শব্দ মুখের ভাষায় এবং চলিত ভাষায় ব্যবহৃত হল প্রচুর পরিমাণে।

চার. সংস্কৃতাগত শব্দে ক্, ম্, ঙ্ প্রভৃতি নাসিক্যধ্বনি আধুনিক বাংলায় এসে অনুনাসিক হয়েছে।

অন্ধকার > আঁধার
গঞ্জিকা > গাঁজা
পঙ্‌ক্তি > পাঁতি

এই প্রসঙ্গে আরও বলতে হবে স্বতোনাসিক্যীভবনের (spontaneous nasalization) কথা। মূলে নাসিক্যব্যঞ্জন না-থাকা সত্ত্বেও বিবর্তিত তদ্ভব রূপে অনুনাসিকতা যদি ঘটে, তবে তাকেই বলা হবে স্বতোনাসিক্যীভবন।

পেচক > প্যাঁচা
উচ্চ > উঁচু

পাঁচ. আধুনিক বাংলায় কোনো-কোনো ক্ষেত্রে স্বরসংক্ষেপ ঘটতেও দেখা যায়।

চৌদ্দ > চোদ্দ
হইল > হল
ডাকাইত > ডাকাত

এগুলিকে স্বরধ্বনিলোপের দৃষ্টান্তও বলা যায়।

ব্যঞ্জনলোপও ঘটে—

কার্পাস > কাপাস
স্ফূর্তি > ফুর্তি

খ. রূপতাত্ত্বিক ও বাক্যরীতিগত বৈশিষ্ট্য

এক. কোনো-কোনো ক্ষেত্রে আ-কারান্ত ণিজন্ত ধাতু অ-ণিজন্ত ধাতুতে পরিণত হয়েছে—

√খেল্ + আ = খেলা > খেলে, খেলল
√ফেল্ + আ = ফেলা > ফেলে, ফেলছে
√পৌঁছ্ + আ = পৌঁছা > পৌঁছোয়, পৌঁছোল

দুই. যৌগিক ক্রিয়ার ব্যাপক প্রয়োগ দেখা গেল আধুনিক বাংলায়, মৌখিক ও সাধু উভয় রীতিতেই ব্যবহৃত হল তা। লক্ষ করার বিষয় যে, সাধুভাষায় একটি বিশেষ্য পদের সঙ্গে ‘করা’ ক্রিয়া যুক্ত করে অজস্র ক্রিয়াপদ গঠিত হতে লাগল।

তিন. সুকুমার সেন দেখিয়েছেন যে, ফারসি 'ব' থেকে সৃষ্ট 'ও' সংযোজক অব্যয়টি আধুনিক যুগেরই লক্ষণ। আগে ও-র ব্যবহার ছিল সাকল্যবাচক অনুসর্গের মতো inclusive enclitic হিসাবে। দু-রকম ও-র তফাত দেখানো যায়—

সংযোজক 'ও'—রাম ও যদু যাবে।

সাকল্যবাচক অনুসর্গ 'ও'—রামও যাবে, যদুও যাবে।

চার. মধ্য বাংলায় অনেক ক্ষেত্রে সমাপিকা ক্রিয়ার আগে বসত নঞর্থক 'না'। আধুনিক বাংলায় 'না' বসে ক্রিয়ার পরে—

মধ্য বাংলায়—না খেলিঅ ; না জাইহ

আধুনিক বাংলায়—খেলিয়ো না, খেলো না ; যাইয়ো না

পাঁচ. অসমাপিকা ক্রিয়া ব্যবহার করে একাধিক সরল বাক্যকে একটি যৌগিক বা মিশ্র বাক্যে পরিণত করার প্রবণতা আধুনিক বাংলারই বৈশিষ্ট্য।

ছয়. ক্রিয়াপদকে উহ্য বা অনুক্ত রাখা আধুনিক বাংলার বৈশিষ্ট্য। এই অনুক্ততা (ellipsis) দুই রকমের—ক্রিয়াপদ সম্পূর্ণ উহ্য বা অদৃশ্য হতে পারে ; আবার একই ক্রিয়াপদ দুইবারের বদলে একবার ব্যবহার করে একটি ক্রিয়াকে উহ্য রাখা যেতে পারে।

'দীর্ঘকাল পরে আবার সাম্রাজ্য রচনা। এবারেও পাটলিপুত্র থেকে। এবারেও আরেকজন চন্দ্রগুপ্তের দ্বারা।' (অন্নদাশঙ্কর রায়, দেখা)

এই বাক্যে আপাতদর্শনে ক্রিয়াপদ নেই। আসলে এসব ক্ষেত্রে ক্রিয়াপদকে উহ্য রাখা হয় রীতিগত (stylistic) সৌকর্যের কারণে।

আবার নীচের উদাহরণে উহ্যতা অন্যরকম—

মা চলল রান্নাঘরে, বাবা বাজারে।

এখানে 'চলল' ক্রিয়াপদটিকে দ্বিতীয়বারে উহ্য রাখা হল।

সাত. শব্দভাণ্ডারেও পরিবর্তন হয়েছে। একসময় আগন্তুক বিদেশি শব্দ বলতে আরবি-ফারসিই বোঝাত। সেসব তো আসছেই কিন্তু আধুনিক বাংলায় অর্থাৎ অষ্টাদশ শতকের শেষ পর্ব থেকে প্রচুর ইয়োরোপীয় ভাষার শব্দ আসতে থাকে। ইংরেজিরই যদিও প্রাধান্য দেখা গেল, তবে পোর্তুগিজ, ওলন্দাজ ও ফরাসি শব্দও এসেছে বাংলায়। (এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা থাকবে **'বাংলা শব্দভাণ্ডার'** অধ্যায়ে)

২২.৩ বাংলা ভাষার বিবর্তন ও রূপান্তরে সরলীকরণের (simplification) প্রবণতা

উপরে আধুনিক বাংলা ভাষার যে-ভাষাতাত্ত্বিক লক্ষণের কথা বলা হয়েছে সেগুলির মধ্যে একটা স্পষ্ট সরলীকরণের প্রবণতা দেখা যায়। ধ্বনির সংক্ষেপণ, ধ্বনির সরলতা, বর্ণসংক্ষেপ ইত্যাদির মধ্যে সরলতাই প্রকট হয়ে ওঠে। অল্প আয়াসে যা উচ্চারণ করা যায় তার দিকেই একটা প্রবণতা লক্ষ করা যায়। মনে রাখতে হবে এই সরলতার প্রবণতা

একসময় দেখা গিয়েছিল যখন সংস্কৃত শব্দ প্রাকৃতে ও পালিতে রূপান্তরিত হচ্ছিল। সেই প্রবণতা আধুনিক বাংলায়ও দেখতে পাই। ধ্বনিপরিবর্তনের যেসব প্রকরণ আছে তার অনেকগুলিই কোনো-না-কোনো ভাবে সরলতার দিকেই যাত্রা যেন—সমীভবন (assimilation), স্বরসংগতি বা স্বরের উচ্চতাসাম্য (vowel harmony বা vowel height assimilation), স্বরভক্তি বা মধ্যস্বরাগম (vowel insertion), প্রভৃতির মধ্যেও সেই সরলতাই প্রকট। উদাহরণগুলি দেখলেই বিষয়টি স্পষ্ট হবে—

শেফালিকা > শিউলি ; কর্ম > কম্ম > কাম ; প্রবাস > পরবাস; যত্ন > যতন; রত্ন > রতন ; স্পর্শ > পরশ ; দূর্বা > দুব্বো ; পূর্ব > পুব ইত্যাদি।

২২.৪ সংশ্লেষাত্মক থেকে বিশ্লেষাত্মক ভাষায় বাংলার রূপান্তর

রূপতত্ত্বের পার্থক্যের নিরিখে পৃথিবীর সমস্ত ভাষাকে দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়—সংশ্লেষাত্মক (synthetic) এবং বিশ্লেষাত্মক (analytic)। সংশ্লেষাত্মক ভাষায় bound morph বা বদ্ধ-রূপ/রূপমূল প্রচুর ব্যবহৃত হয়। অন্য দিকে, বিশ্লেষাত্মক ভাষায় খুব কম বদ্ধ রূপ ব্যবহৃত হয়। সংশ্লেষাত্মক ভাষায় শব্দের সঙ্গে বিভক্তিযোগ হবেই। সংশ্লেষাত্মক ভাষায় এক-একটি পদে নানান ব্যাকরণগত রূপ যোজিত থাকে। তাই প্রত্যেকটি পদ একাধিক ব্যাকরণগত রূপ ধারণ করে এবং সেগুলি আসে বিভক্তির আকারে। উদাহরণ স্বরূপ সংস্কৃতের কথা বলা যেতে পারে। সংস্কৃতের প্রতিটি পদ নানা অর্থ বহন করে, আর প্রতি অর্থই একাধিক বিভক্তি বহন করে। এর ফলে সংস্কৃতে পদক্রমের কোনো ধরাবাঁধা নিয়ম নেই। *'বালকঃ চন্দ্রং পশ্যতি'* এই বাক্যকে *চন্দ্রং পশ্যতি বালকঃ* বা *পশ্যতি চন্দ্রং বালকঃ* বলাই যায়। সংস্কৃতে 'পশ্যতি' বললেই বোঝা যাবে যে, কেউ একজন দেখছে। 'পশ্যতঃ' বললে বোঝা যাবে দুজন দেখছে। বাংলায় 'দেখছে' বললে একজন বা বহুজনের দেখা বোঝাতে পারে। সংস্কৃতে 'নৃত্যাবঃ' বললে বোঝানো হবে যে 'আমরা দুজন নাচি'। এত কথা একটিমাত্র বাংলা শব্দে বোঝানো যায় না। এইজন্য বলা হয় যে, বাংলা একটি বিশ্লেষাত্মক ভাষায় পরিণত হয়েছে। তবে এই প্রসঙ্গে একথাও বলা দরকার যে, পুরোপুরি বিশ্লেষাত্মক নয় বাংলা। বাংলায় কিছু সংশ্লেষাত্মক বৈশিষ্ট্যও আছে।

গ্রন্থপঞ্জি

চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার—বাঙ্গালা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা, ১৯৯১

বসু, দ্বিজেন্দ্রনাথ—বাংলা ভাষার আধুনিক তত্ত্ব ও ইতিকথা, ১৯৮০

ভট্টাচার্য, পরেশচন্দ্র—ভাষাবিদ্যা পরিচয়, ১৯৯৩

ভট্টাচার্য, সুভাষ—বাঙালির ভাষা, ২০০০

শহীদুল্লাহ্, মুহম্মদ—বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত, ১৯৯৮

Chatterji, Suniti Kumar—The Origin and Development of the Bengali Language, Vols I, II, 1985

২৩. বাংলা ভাষার বর্ণনামূলক ব্যাকরণ—ধ্বনিতত্ত্ব

২৩.১ বর্ণনামূলক ব্যাকরণ কাকে বলে?

ভাষাতত্ত্বে দু-রকম ব্যাকরণ হতে পারে—ঐতিহাসিক ব্যাকরণ। অর্থাৎ কোনো একটি ভাষার ব্যাকরণ কীভাবে বিবর্তিত হয়েছে তার ব্যাখ্যা। এই বইয়ের ঊনবিংশ অধ্যায়ে আমরা বাংলা ভাষার ঐতিহাসিক ব্যাকরণ বর্ণনা করেছি। তাতে দেখেছি প্রাচীন বাংলা থেকে মধ্য বাংলা হয়ে আধুনিক বাংলায় লিঙ্গ, বচন, পদপ্রকরণ, কারক-বিভক্তি ইত্যাদি কীভাবে বদলে গেছে।

আর একরকম ব্যাকরণ হল বর্ণনামূলক ব্যাকরণ। ভাষাবিজ্ঞানে ঐতিহাসিক বা বিবর্তনমূলক ব্যাকরণ যেমন আছে, তেমনি আছে কোনো একটি ভাষার এই মুহূর্তের অবস্থা। ধরা যাক বাংলা ভাষার কথাই। বাংলা ভাষার বর্তমান ব্যাকরণগত অবস্থাই বর্ণনামূলক বা descriptive grammar, যার অন্য নাম synchronic বা এককালিক ব্যাকরণ।

এই অধ্যায়ে বাংলা ভাষার বর্ণনামূলক ব্যাকরণের প্রসঙ্গে আমরা বাংলা ভাষার তিনটি বিভাগ নিয়ে আলোচনা করব—**ধ্বনিতত্ত্ব ; রূপতত্ত্ব ; বাক্যরীতি**।

২৩.২ বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব

ভাষার আলোচনায়, phonetics আর phonology এই দুটিকে আলাদা করা হয়। কাকে বলে phonetics? আর কীইবা phonology? সাম্প্রতিককালে বিশেষজ্ঞগণ বাংলায় ধ্বনিতত্ত্ব ও ধ্বনিবিজ্ঞান এইদুটি প্রত্যয়কে আলাদা করে বিচার করেছেন। Phonologyকে বলা হয় ধ্বনিতত্ত্ব, phonetics হল ধ্বনিবিজ্ঞান। কোনো একটি ভাষার ধ্বনিপরিচয়, ধ্বনির সংস্থান, ধ্বনিতে ধ্বনিতে সংযোগ, ধ্বনির পরিবর্তন—এগুলিকে বলা হল সেই ভাষার phonology,. যেমন Bengali phonology অর্থাৎ বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব। আবার ভাষানিরপেক্ষভাবে ধ্বনির বিশ্লেষণ, বাগ্‌ধ্বনির চরিত্র, ধ্বনিমূলের প্রকৃতি ইত্যাদির আলোচনাই হল phonetics বা ধ্বনিবিজ্ঞান। অর্থাৎ ধ্বনিবিজ্ঞান সাধারণভাবে ধ্বনির আলোচনা, ধ্বনিতত্ত্ব হল বিশেষ একটা ভাষার ধ্বনির আলোচনা। ধ্বনিতত্ত্ব ও ধ্বনিবিজ্ঞানের এই পার্থক্য সকলেই যে মেনে নিয়েছেন তা নয়। তবে এই পার্থক্যই উপস্থিত সুবিধাজনক বলে মনে হয়।

২৩.২.১ বাংলা স্বরধ্বনি

প্রথমেই বলে নেওয়া দরকার যে, বর্ণ আর ধ্বনি সমার্থক নয়। ধ্বনি বা বাগ্‌ধ্বনি মুখে উচ্চারিত হয় এবং তা শোনা যায় কানে। ধ্বনি স্বভাবতই দৃশ্যমান নয়। ধ্বনি লেখায় প্রকাশিত হয় বর্ণের দ্বারা। অর্থাৎ বর্ণ হল ধ্বনির লিখিত রূপ। স্বরবর্ণ হল স্বরধ্বনির লিখিত রূপ।

স্বরধ্বনি হল সেই বাগ্‌ধ্বনি যা কণ্ঠ ও মুখবিবর থেকে বিনা বাধায় বেরিয়ে আসে। স্বরধ্বনির উচ্চারণে অন্য কোনো ধ্বনির সাহায্য লাগে না। **বাংলা ভাষায় সাতটি স্বরধ্বনি** আছে—ই, উ, এ, ও, অ্যা, অ, আ। এই ক্রমটি দেখে পাঠকের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে, কেন স্বরধ্বনিগুলিকে এভাবে সাজানো হল? কেন অ, আ, ই এইভাবে পরিচিত ও প্রচলিত ক্রম অনুসারে সাজানো হল না? দ্বিতীয়ত, অ্যা এল কোথা থেকে? আমাদের স্বরবর্ণের তালিকায় তো ওটা নেই। প্রকৃতপক্ষে এখানে আমরা তালিকা দিয়েছি স্বরধ্বনির, স্বরবর্ণের নয়। স্বরধ্বনির কথা যখন বলব তখন একটা বিশেষ ক্রম অনুসারে বলব। বলব উচ্চারণের প্রক্রিয়া অনুসারে—ঊর্ধ্ব, নিম্ন, মধ্য, সম্মুখ ও পশ্চাৎ এইভাবে। স্বরধ্বনির উচ্চারণে জিভের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। এই তালিকার ক্রমটা করা হয়েছে জিভের কথা মনে রেখে। স্বরধ্বনি উচ্চারণের সময় জিভ উপরে থাকলে বলব ঊর্ধ্ব স্বরধ্বনি, নীচে থাকলে নিম্ন স্বরধ্বনি, জিভ সামনে এগিয়ে এলে সম্মুখ স্বরধ্বনি, পিছিয়ে গেলে পশ্চাৎ স্বরধ্বনি। এবারে দেখা যাক সেই ক্রম অনুসারে তালিকা—

ঊর্ধ্ব-সম্মুখ স্বরধ্বনি	—	ই
ঊর্ধ্ব-পশ্চাৎ স্বরধ্বনি	—	উ
ঊর্ধ্ব-মধ্য সম্মুখ স্বরধ্বনি	—	এ
ঊর্ধ্ব-মধ্য পশ্চাৎ স্বরধ্বনি	—	ও
নিম্ন-মধ্য সম্মুখ স্বরধ্বনি	—	অ্যা
নিম্ন-মধ্য পশ্চাৎ স্বরধ্বনি	—	অ
নিম্ন কেন্দ্রীয় স্বরধ্বনি	—	আ

খুব সহজে বোঝাবার জন্য একটা ছক বা নক্‌শা এঁকে স্বরধ্বনির উচ্চারণ প্রক্রিয়াকে দেখানো হয়—

ই　　　　　　　　উ
　এ　　　　　　ও
　　অ্যা　　　অ
　　　　আ

ই এ অ্যা সামনের দিকে আছে। এরা সম্মুখ স্বরধ্বনি। উ ও অ পশ্চাৎ স্বরধ্বনি। ই উ ঊর্ধ্ব স্বরধ্বনি। এ ও ঊর্ধ্বমধ্য। অ্যা অ নিম্নমধ্য। আ নিম্নকেন্দ্রীয়।

২৩.২.২ বাংলা স্বরধ্বনির উচ্চারণস্থান ও উচ্চারণের প্রক্রিয়া

স্বরধ্বনিগুলি মুখবিবরের বিভিন্ন স্থান (places of articulation) থেকে উচ্চারিত হয়। উচ্চারণস্থানগুলি হল—ঠোঁট ও জিভ। ঠোঁট কতটা খোলা এবং কতটা বন্ধ তার উপর নির্ভর করে স্বরধ্বনির উচ্চারণ। আবার জিভের সম্মুখ-পশ্চাৎ গতির উপরও উচ্চারণ নির্ভর করে।

১. **ঠোঁটের উন্মুক্ততা** (openness) অনুযায়ী স্বরধ্বনির চারটি শ্রেণি—বিবৃত (open), অর্ধবিবৃত (half-open), সংবৃত (close), অর্ধসংবৃত (half-close)। এবার এদের উদাহরণ দেখানো যাক। 'আ' একটি বিবৃত বা উন্মুক্ত স্বরধ্বনি ; 'অ' এবং 'অ্যা' এই দুটি অর্ধবিবৃত স্বরধ্বনি ; 'ই' এবং 'উ' সংবৃত স্বরধ্বনি ; 'এ' এবং 'ও' অর্ধসংবৃত স্বরধ্বনি।

২. এবারে বলব **জিভের সামনে-পিছনে যাওয়া-আসা** অনুযায়ী স্বরধ্বনির শ্রেণির কথা। এই দিক থেকে তিন শ্রেণির স্বরধ্বনি হতে পারে—সম্মুখ (front), পশ্চাৎ (back) এবং কেন্দ্রীয় (central)।

৩. বাংলা স্বরধ্বনির উচ্চারণ **ঠোঁটের আকৃতির** উপরও নির্ভর করে। কোনো স্বরধ্বনি উচ্চারণ করার সময় ঠোঁট গোল হয়, আবার কোনোটা উচ্চারণের সময় ঠোঁট ছড়িয়ে যায়। সেইজন্য দুইরকম স্বরধ্বনির কথা বলা হয়—১. বর্তুলাকার বা কুঞ্চিত (round) ; (২) প্রসারিত বা প্রসৃত (spread)। উ, অ, ও এই তিনটি বর্তুলাকার বা কুঞ্চিত (round) স্বরধ্বনি। অন্য দিকে, ই, এ, অ্যা এই তিনটি প্রসৃত (spread) স্বরধ্বনি।

২৩.২.৩ নিহিত স্বরধ্বনি (inherent vowel)

বাংলা ভাষার ব্যঞ্জনবর্ণগুলি উচ্চারণ করার সময় একটা অ-কার বা অ-ধ্বনি যোগ করে উচ্চারণ করতে হয়। অর্থাৎ যেন প্রত্যেক ব্যঞ্জনের সঙ্গে একটা লুকানো অ-ধ্বনি আছে—ক, খ, গ বলতে হলে K(অ), Kh(অ), g(অ) এইভাবে। অথচ ব্যঞ্জনকে দেখানো হয় এইভাবে—ক্ খ্ গ্। এই যে উচ্চারণসহায়ক অ স্বরধ্বনি, একেই বলা হয় **নিহিত স্বর** বা **নিহিত স্বরধ্বনি**। নিহিত বলা হয় এই কারণে যে, এটি অদৃশ্য, যা বানানে নেই অথচ উচ্চারণে আছে। বাংলায় কোনো শব্দের বর্ণ বিশ্লেষণ করতে গেলে এই নিহিত স্বরটি দেখাতে হয়। যেমন—

কলম = ক্ + অ + ল্ + অ + ম্ + অ

কিন্তু যখন এই 'কলম' শব্দের ধ্বনি বিশ্লেষণ করি, তখন উচ্চারিত ধ্বনি দেখাতে হয়—

কলম = ক্ + অ + ল্ + ও + ম্

এক্ষেত্রে নিহিত স্বরধ্বনি অ এবং ও।

বাংলা ভাষার বহু শব্দের উচ্চারণে নিহিত স্বর কোথাও থাকে, কোথাও থাকে না। সচরাচর শব্দের শেষের নিহিত স্বর লোপ পায়। জল, কলম, পথিক প্রভৃতি শব্দের উচ্চারণ দেখলেই তা বোঝা যায়—

জল = জ্ + অ + ল্
কলম = ক্ + অ + ল্ + ও + ম্
পথিক = প্ + ও + থ্ + ই + ক্

২৩.২.৪ বাংলায় কি স্বরধ্বনি দীর্ঘ হয়?

বাংলা উচ্চারণের স্বাভাবিক নিয়মে স্বরধ্বনির দীর্ঘ উচ্চারণ হয় না। দীর্ঘ স্বর বানানে আছে, অর্থাৎ বর্ণমালায় আছে, কিন্তু উচ্চারণে নেই। নীচের উদাহরণ দেখা যাক—

নদী = নো + দি
সতী = শো + তি
যদি = জো + দি
পতি = পো + তি

দেখা গেল যে, নদী-র -দী আর যদি-র -দি একইভাবে উচ্চারিত হয়। আবার সতী-র -তী আর পতি-র -তি একই ভাবে উচ্চারিত, অর্থাৎ হ্রস্ব উচ্চারিত হয়। তার মানে, আমরা বাংলা ভাষার উচ্চারণে হ্রস্ব-দীর্ঘ ভেদ করি না। **এটাই বাংলা ভাষার রীতি।**

এই কথাটা সাধারণভাবে নির্ভুল বটে, তবে ধ্বনিতাত্ত্বিকরা দেখিয়েছেন যে, বিশেষ ক্ষেত্রে বাংলাতেও হ্রস্বধ্বনির দীর্ঘ উচ্চারণ হয়। তাঁরা বলেন যে, একাক্ষরী শব্দে অর্থাৎ যে শব্দে একটি মাত্র অক্ষর বা দল বা সিলেবল, তার স্বরধ্বনি দীর্ঘ হয়। একথা যে সত্য তা স্পেক্টোগ্রাম যন্ত্রে স্পষ্ট ধরা পড়ে। একটি-দুটি উদাহরণ দিয়ে বিষয়টাকে বোঝাতে চেষ্টা করব।

আম, মা, দা, দান, সব, মন—এর প্রত্যেকটি একাক্ষরী শব্দ ; অর্থাৎ প্রতিটিই এক সিলেবলের শব্দ।

আম্, মা, দা, দান্, সব্, মোন্ এইভাবে এগুলি উচ্চারিত হয়। এবং আম শব্দের 'আ', মা শব্দের 'আ', দা শব্দের 'আ', দান শব্দে আ, সব শব্দের অ, মন শব্দের ও দীর্ঘ।

'আম'-এর আ দীর্ঘ, কিন্তু 'আমার' শব্দের আ দীর্ঘ নয় ; 'সব' শব্দের অ (শ্ + অ) দীর্ঘ, কিন্তু 'সবার' শব্দের অ (শ্ + অ + ব্ + আ + র্) দীর্ঘ নয়।

এইভাবে ধ্বনিতত্ত্বে দেখানো হয় যে, এক সিলেবলযুক্ত শব্দের স্বরধ্বনি দীর্ঘ উচ্চারিত হয়। কিন্তু একে স্বরধ্বনির দীর্ঘতা বলা যায় না। ক্ষেত্রবিশেষে অ আ ই উ—সবই দীর্ঘ হতে পারে।

আম-এর আ দীর্ঘ
আতা-র আ দীর্ঘ নয়
ইদ-এর ই দীর্ঘ
ইলিশ-এর ই দীর্ঘ নয়।

কাজেই আমাদের প্রথম বক্তব্যটি নির্ভুল। বাংলা ভাষায় স্বরধ্বনির সাধারণভাবে দীর্ঘ উচ্চারণ নেই।

২৩.২.৫ অনুনাসিক স্বরধ্বনি

বাংলা ভাষায় যে সাতটি স্বরধ্বনির কথা বলা হয়েছে, সেগুলি হল মৌখিক স্বরধ্বনি বা oral vowels. সেই স্বরধ্বনিগুলির প্রত্যেকটিই অনুনাসিক হতে পারে। তখন সেগুলিকে nasal vowel বলা হবে। সেগুলি হল যথাক্রমে ইঁ উঁ এঁ ওঁ অ্যাঁ অঁ আঁ। মৌখিক স্বরধ্বনির উচ্চারণে ফুসফুস থেকে শ্বাসবায়ু মুখ দিয়ে নির্গত হয়। অর্থাৎ ওই স্বরধ্বনিগুলির উচ্চারণে প্রাধান ভূমিকা মুখের। অন্য দিকে, অনুনাসিক স্বরধ্বনি উচ্চারণের সময় শ্বাসবায়ু নাসাপথে নির্গত হয়। অনুনাসিক স্বরধ্বনি উচ্চারণে মুখের ভূমিকা নেই, এমন নয়, তবে **নাসিকার ভূমিকাই প্রধান**। মুহম্মদ আবদুল হাই বলছেন—combined resonance of nose and mouth অর্থাৎ নাক ও মুখের যৌথ অনুরণন।

প্রত্যেকটি অনুনাসিক স্বরধ্বনির দৃষ্টান্ত দেখা যাক—

ইঁ — ইঁচড়, ইঁদুর, ইঁদারা
উঁ — উঁচু, উঁকি, উঁচকপালি
এঁ — এঁচড়, এঁকে বেঁকে, এঁড়ে, এঁদো
ওঁ — ওঁচা, ওঁত, ওঁরা
অ্যাঁ — অ্যাঁ?
অঁ — গঁদ (গ্ + অঁ + দ্), পঁয়ত্রিশ (প্ + অঁ....)
আঁ — আঁকশি, আঁকা

এইসব উদাহরণে বেশির ভাগ অনুনাসিক স্বরধ্বনি আছে শব্দের গোড়ায়। শব্দের মধ্যে বা শেষেও থাকতে পারে অনুনাসিক স্বরধ্বনি। কেবল গঁদ ও পঁয়ত্রিশ এ-দুটোতে অনুনাসিক স্বর আছে শব্দের মধ্যে—প্রথম ব্যঞ্জনের পরে। শব্দের মধ্যবর্তী অনুনাসিক স্বরের আরও দৃষ্টান্ত—পাঁক, ক্যাঁৎ ক্যাঁৎ, ট্যাঁড়া, ব্যাঁকা, গ্যাঁজা, ছুঁচ ইত্যাদি। শব্দের শেষেও থাকতে পারে অনুনাসিক স্বরধ্বনি—রাজ্ঞী (রাগ্‌গিঁ), আজ্ঞে (আগ্‌গেঁ)।

২৩.২.৬ একক স্বর ও যুক্ত স্বর

একক স্বরধ্বনি বলতে বোঝায় এককভাবে উচ্চারিত স্বরধ্বনি। অন্য দিকে, যুক্তস্বর অর্থ একই সঙ্গে উচ্চারিত দুটি বা তিনটি স্বরধ্বনির গুচ্ছ। একক স্বরধ্বনির তিনটি অবস্থান—শব্দের আদিতে, মধ্যে ও শেষে। উদাহরণ দেখা যাক—

শব্দের আদিতে	মধ্যে	শেষে
ই—ইলিশ	কিন্তু	বাঁশি
উ—উট	বুক	তবু

এ—এবার	বেশ	তবে
ও—ওকি, ওই	কই, ঘটি	বড়ো
অ্যা—একা	ব্যাটা	×
অ—অত	নত	×
আ—আম	মা, নাম	শসা

মান্য চলিত বাংলায় শব্দের শেষে অ্যা এবং অ ধ্বনি পাওয়া যায় না। অকারান্ত শব্দ শেষে, ও-ধ্বনিতে পরিণত হয়—

নত = ন-তো যত = জ-তো ভক্ত = ভক্-তো

যুক্তস্বর দুই বা তিন বা চার স্বরধ্বনির হতে পারে। এগুলিকে যৌগিক স্বর বা যুগ্ম স্বরধ্বনি বলা হয়। যুগস্বরের বিষয়টি নিয়ে দ্বিস্বরধ্বনির আলোচনার সময় আরও বলা হবে।

২৩.২.৭ অর্ধস্বর

যে স্বরধ্বনি ক্ষীণভাবে এবং অসমাপ্ত বা অসম্পূর্ণ উচ্চারিত হয়, তাকেই অর্ধস্বর বলা হয়। এ হল অর্ধস্বরের সহজ ব্যাখ্যা। ধ্বনিতত্ত্বে এর ব্যাখ্যা অন্যরকম। ধ্বনিতত্ত্বে বলা হয় যে, একটি পূর্ণ স্বরধ্বনির পরে যে অনাক্ষারিক বা অ-সিলেবীয় (non-syllabic) ধ্বনি পাওয়া যায় তাকেই semi-vowel বা **অর্ধস্বর** বলা হয়। তার মানে অর্ধস্বর দিয়ে কখনো সিলেবল বা অক্ষর বা দল তৈরি হতে পারে না। কয়েকটি উদাহরণ দেখব—

যাও (জাও্), খাই (খাই্), দেয় (দ্যায়্), হায় (হায়্)—এগুলি অর্ধস্বরের দৃষ্টান্ত। লক্ষ করতে হবে যে, প্রতি শব্দে ও্, ই্, য়্, য়্ এই ধ্বনিগুলি অসম্পূর্ণ উচ্চারিত। শব্দের গোড়ায় পূর্ণস্বর ও শেষে অর্ধস্বর দেখলে বিষয়টা স্পষ্ট হবে—

ক. ওকি (ও + কি)	খ. কও (ক + ও্)
ক. ইলিশ (ই + লিশ্)	খ. পাই (পা + ই্)
ক. এলেম (এ + লেম্)	খ. আয় (আ + য়্ অর্থাৎ আ + এ্)

ক-এর ও আর খ-এর ও আলাদা, খ-এর ও অসম্পূর্ণ উচ্চারিত—ও্। ঠিক তেমনি ক-এর ই পূর্ণ স্বর, খ-এর ই অর্ধস্বর—ই্ ; ক-এর এ পূর্ণ স্বর, খ-এর এ অর্ধস্বর—য়্ (এ্-কে য়্ লেখা হয়)।

২৩.২.৮ বাংলা দ্বিস্বরধ্বনি (diphthongs)

দ্বিস্বরকে যৌগিক স্বরও বলা হয়। কিন্তু কাকে বলে দ্বিস্বর বা যৌগিক স্বর? একটি পূর্ণস্বর ও একটি অর্ধস্বর একসঙ্গে উচ্চারিত হলে তা-ই হবে দ্বিস্বর বা যৌগিক স্বর। পূর্ণস্বর দিয়ে সিলেবল বা দল তৈরি হয়, কিন্তু অর্ধস্বর দিয়ে হয় না। তাই অর্ধস্বরকে বলা হয় অ-দলীয় বা অনাক্ষরিক বা অসিলেবলীয়। ইই্ (দিই), আই্ (খাই), ওই্ (সই, মই), এগুলিই দ্বিস্বরধ্বনির উদাহরণ। প্রথম স্বরটি পূর্ণ, দ্বিতীয়টি অর্ধ।

এখন প্রশ্ন হল, বাংলায় কতগুলি দ্বিস্বরধ্বনি বা diphthong আছে। এই বিষয়টি কিছুটা বিতর্কিত। সুনীতিকুমারের মতে বাংলায় পঁচিশটি দ্বিস্বর পাওয়া যায়। মুহম্মদ আবদুল হাই লিখেছেন যে, বাংলা ভাষায় ধ্বনিগত দিক থেকে নিয়মিত ও অনিয়মিত মিলিয়ে মোট একত্রিশটি যৌগিক স্বর পাওয়া যায়। কিন্তু এদুটি বক্তব্য আমাদের সঠিক বলে মনে হয় না। সুনীতিকুমার তাঁর তালিকায় এমন কতকগুলি দ্বিস্বরধ্বনি রেখেছেন যেগুলি দেড়খানির বদলে দুটি পূর্ণ স্বরধ্বনির দৃষ্টান্ত। যেমন ইয়া [ia], এয়া [ea], উয়ো [uo] ইত্যাদি। অন্য দিকে মুহম্মদ আবদুল হাইও এমন কতকগুলি ধ্বনিকে দ্বিস্বরধ্বনি বলেছেন, যেগুলি আদৌ দ্বিস্বর নয় বা আদৌ মান্য চলিত ভাষায় পাওয়া যায় না। কয়েকটি নিতান্তই ঔপভাষিক। পবিত্র সরকার বলেছেন যে, বাংলায় পঁচিশ নয়, একত্রিশ নয়, দ্বিস্বরধ্বনি আছে সতেরোটি। সেই সতেরোটি হল—

১. ইই্ (দিই, নিই)
২. ইউ্ (পিউ, মিউ)
৩. উই্ (শুই, রুই, ধুই)
৪. এই্ (এই, সেই, নেই)
৫. এউ্ (ভেউ ভেউ, কেউ)
৬. ওই্ (পই পই, কই, মই, দই)
৭. ওউ্ (বউ, মউ)
৮. ওয়্ (শোয়, ধোয়)
৯. ওও্ (শোও, ধোও)
১০. আই্ (যাই, খাই)
১১. আউ্ (হাউ মাউ, দাউ দাউ)
১২. অ্যাও্ (শ্যাওলা, ম্যাও)
১৩. অ্যায়্ (দেয়, নেয়)
১৪. আয়্ (যায়, খায়)
১৫. আও্ (যাও, দাও, খাও)
১৬. অয়্ (ভয়, সয়, নয়)
১৭. অও্ (নও, হও, চওড়া)

পবিত্র সরকারের এই তালিকার সঙ্গে আর একটি দ্বিস্বর যোগ করা যায়—অ্যাই্। এটিকে পবিত্র বাতিল করেছেন মান্য বাংলায় পাওয়া যায় না এই যুক্তিতে। কিন্তু যদি বলি—

অ্যাই ছেলে, কোথাও যাওয়া হচ্ছে?

তাহলে এই 'অ্যাই' স্পষ্টতই একটি দ্বিস্বর যা মান্য বাংলাতেও পাওয়া যায়। কাজেই আমাদের মতে আদর্শ কথ্য বা মান্য **চলিত বাংলায় দ্বিস্বরধ্বনির সংখ্যা আঠারো।**

ত্রিস্বর ও চতুঃস্বর

বাংলায় কতকগুলি শব্দে ত্রিস্বর (triphthong) ও চতুঃস্বর (tetraphthong) পাওয়া যায়।

এই্য়ো (হেঁইয়ো), আও্য়া (যাওয়া), অও্য়া (কওয়া), আই্য়ো (বাইয়ো, খাইয়ো), আই্য়ে (খাইয়ে), অউই্ (নউই) এগুলি ত্রিস্বর এবং আও্য়াও্ (খাওয়াও), আও্য়াই্ (খাওয়াই), আই্য়েই্ (খাইয়েই), ওই্য়েও্ (সইয়েও) এগুলি চতুঃস্বরের দৃষ্টান্ত।

২৩.৩ বাংলা ব্যঞ্জনধ্বনি

ব্যঞ্জনধ্বনি-র সংজ্ঞার্থ হিসাবে যা সচরাচর বলা হয়, তা কিছুটা অস্পষ্ট। সাধারণত বলা হয় যে, যে-ধ্বনি স্বরধ্বনির সাহায্য ব্যতিরেকে উচ্চারিত হতে পারে না, তা-ই ব্যঞ্জনধ্বনি। এই কথাটা সম্পূর্ণ ঠিক নয়। সমস্ত ব্যঞ্জনধ্বনি সম্পর্কেই একথা বলা যায় না। যখন কাউকে চুপ করানোর জন্য বলা হয়—শ্, তখন তা স্বরধ্বনির সাহায্য ছাড়াই উচ্চারিত হয়। যখন বলা হয় ক্লেশ (ক্ + ল্ + এ + শ্), তখন ক্ ও শ্ উচ্চারণে কোনো স্বরধ্বনির সাহায্য নেওয়া হচ্ছে না। **ফুসফুস থেকে শ্বাসবায়ু বেরিয়ে আসার সময় গলনালি, মুখবিবর বা ঠোঁটে বাধা পেলে যে-ধ্বনির সৃষ্টি হয়, তা-ই ব্যঞ্জনধ্বনি।**

২৩.৩.১ বাংলা ব্যঞ্জনধ্বনির সংখ্যা

বাংলা বর্ণমালায় পঁয়ত্রিশটি ব্যঞ্জনবর্ণ আছে। কিন্তু ততগুলি ব্যঞ্জনধ্বনি বাংলা ভাষায় নেই। ঠিক যেমন, বর্ণমালায় স্বরবর্ণ যতগুলি আছে, স্বরধ্বনি ততগুলি নেই, ঠিক তেমনি বাংলায় ব্যঞ্জনধ্বনি ত্রিশটি। যে-পাঁচটি ব্যঞ্জনবর্ণকে বাদ দিয়ে ত্রিশটি ধ্বনির কথা বললাম, সেগুলি কোন্‌গুলি?

বাংলায় ব্যঞ্জনবর্ণ এইগুলি—

ক খ গ ঘ ঙ
চ ছ জ ঝ ঞ
ট ঠ ড ঢ ণ
ত থ দ ধ ন
প ফ ব ভ ম
য র ল
শ ষ স হ
ড় ঢ় য়

ং, ঃ এবং ঁ -কে ব্যঞ্জনবর্ণের মধ্যে রাখা হলেও এগুলি বর্ণ নয়, চিহ্নমাত্র। তাই আমাদের তালিকায় এরা থাকবে না। এখন দেখা যাক, কেন পঁয়ত্রিশটি বর্ণের জায়গায় ত্রিশ ধ্বনি বলেছি। ঞ, ণ, য, ষ এদের পৃথক উচ্চারণ নেই। ঞ দন্ত্য-নয়ের মতো উচ্চারিত হয়,

ণ-ও তাই। অন্তঃস্থ-য জ-য়ের মতো উচ্চারিত হয়, ষ তালব্য-শয়ের মতো উচ্চারিত হয়। এবং য়-কে একটি অর্ধস্বর ধরা হয়।

২৩.৩.২. উচ্চারণস্থান অনুযায়ী ব্যঞ্জনধ্বনি

আমরা বলেছি, বাংলায় ত্রিশটি ব্যঞ্জনধ্বনি আছে। এখন দেখা যাক, উচ্চারণস্থান (place of articulation) অনুযায়ী সেই ব্যঞ্জনধ্বনিগুলিকে কীভাবে ভাগ করা যায়। ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণে মুখের যে অংশগুলির প্রধান ভূমিকা সেগুলি হল—ওষ্ঠ, দন্ত্য, দন্তমূল, মূর্ধা, তালু, কণ্ঠ ও কণ্ঠনালি। এই হিসাবে ব্যঞ্জনধ্বনিগুলিকে যে-সাতটি ভাগে ভাগ করা হয় তা হল—ওষ্ঠ্য, দন্ত্য, দন্তমূলীয়, মূর্ধন্য, তালব্য, কণ্ঠ্য কণ্ঠনালীয়।

১. ওষ্ঠ্য ব্যঞ্জন—প্ ফ্ ব্ ভ্ ম্। এই পাঁচটি ওষ্ঠ্য ব্যঞ্জন। এর প্রত্যেকটি উচ্চারণে ঠোঁট প্রথমে বন্ধ করে পরে ঠোঁট খুলে বাতাস ছেড়ে দিতে হয়। এভাবে দুই ঠোঁট রুদ্ধ করে ধ্বনিপরিবাহী বায়ুর নির্গমনে বাধা সৃষ্টি করার ফলে উদগত হয় বলেই এগুলি ওষ্ঠ্য ধ্বনি (labial sounds)।

২. দন্ত্য ব্যঞ্জন—ত্ থ্ দ্ ধ্ এই চারটিকে বলা হয় দন্ত্য ব্যঞ্জন (dental sounds)। দাঁতের উপরপাটির পিছনে জিভের আগা স্পর্শ করে এই ধ্বনি পাওয়া যায়।

৩. দন্তমূলীয় ব্যঞ্জন—স্, ন্, র্, ল্ এই চারটিকে দন্তমূলীয় ব্যঞ্জন বলা হয়। দাঁতের গোড়ার পিছনদিকে যে নরম মাংসপিণ্ড বা মাড়ি আছে তাতে জিভের আগা স্পর্শ করলে এই ধ্বনি উৎপন্ন হয়। তাই একে দন্তমূলীয় ধ্বনি (alveolar sounds) বলা হয়।

৪. মূর্ধন্য ব্যঞ্জন—ট্ ঠ্ ড্ ঢ্ ড়্ ঢ়্ এই ছয়টি এই ভাগের ব্যঞ্জন। এই ধ্বনির উচ্চারণে জিভের আগা উলটে নিয়ে বা প্রতিবেষ্টিত করে দাঁতের গোড়া স্পর্শ করা হয়। এগুলিকে প্রতিবেষ্টিত ব্যঞ্জনও (retroflex sounds) বলা হয়।

৫. তালব্য ব্যঞ্জন—চ্ ছ্ জ্ ঝ্ শ্ এই পাঁচটি ধ্বনির উচ্চারণে তালুর সামনের অংশে জিভের প্রসারিত আগা স্পর্শ করা হয়। তালু থেকে উৎপন্ন বলে এরা তালব্য ব্যঞ্জন (palatal sounds)।

৬. কণ্ঠ্য ব্যঞ্জন—ক্ খ্ গ্ ঘ্ ঙ্ এই পাঁচটি ধ্বনির উচ্চারণে জিভের পিছনদিক বা ভিতরের অংশ উঁচু হয়ে তালুর পিছনের নরম অংশ (soft palate) স্পর্শ করে। এগুলি কণ্ঠ্য ব্যঞ্জন (velars)।

৭. কণ্ঠনালীয় ব্যঞ্জন—হ্ একটি কণ্ঠনালীয় ব্যঞ্জন। এর উচ্চারণে কণ্ঠনালির ভিতরে স্বরযন্ত্র বা larynx-এর মধ্যে ধ্বনিপরিবাহী বায়ু বাধা পেয়ে বেরিয়ে আসে। ইংরেজিতে একে gutteral sound বলা হয়।

২৩.৩.২.১ সূক্ষ্মতর শ্রেণিবিভাগ

উপরে উচ্চারণস্থান অনুযায়ী সাতটি ভাগ বা শ্রেণির কথা বলা হলেও সূক্ষ্ম বিচারে আরও দুটি-তিনটি ভাগের কথা বলা যায়।

১. **দন্তৌষ্ঠ্য ব্যঞ্জন** (denti-labials)

যে-ধ্বনির উচ্চারণে দাঁত ও নীচের ঠোঁটের সংযোগ ঘটে তাকেই দন্তৌষ্ঠ্য ব্যঞ্জন বলে। মান্য চলিত বাংলায় এই ধ্বনি না থাকলেও উপভাষায় আছে। ইংরেজি full এর f বা ফ় একটি দন্তৌষ্ঠ্য ধ্বনি।

২. **তালুদন্তমূলীয় ব্যঞ্জন** (palato-alveolar)

জিভের ফলক বা প্রশস্ত অংশ (blade) যখন কঠিন তালু বা hard palate কে অগ্রতালু এবং দন্তমূল দুই-ই স্পর্শ করে, তখন যে-ধ্বনি উৎপন্ন হয়, তা-ই তালুদন্তমূলীয় ধ্বনি। তবে এই ধ্বনিটিও উপভাষায় পাওয়া যায়, ইংরেজিতে পাওয়া যায়। মান্য বাংলায় নেই। কোনো-কোনো বিশেষজ্ঞ চ্ ছ্ জ্ ঝ্ শ্ এগুলিকেই তালুদন্তমূলীয় বলেছেন। এই বর্ণনা ভুল বলেই মনে হয়।

৩. এছাড়া **প্রশস্ত দন্তমূলীয়** এবং **পশ্চাৎ দন্তমূলীয়** এই দুই ভাগে দন্তমূলীয় ধ্বনিকে ভাগ করেন কোনো-কোনো ধ্বনিতাত্ত্বিক।

২৩.৩.৩ উচ্চারণের প্রকৃতি অনুযায়ী ব্যঞ্জনধ্বনির শ্রেণিবিভাগ

ব্যঞ্জনধ্বনির উৎপাদনে উচ্চারণের প্রকৃতিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং সেই প্রকৃতি অনুসারে ব্যঞ্জনধ্বনিগুলিকে কতকগুলি ভাগে ভাগও করা হয়। সেগুলি হল ১. ঘোষ ও অঘোষ; ২. স্পর্শ ধ্বনি বা স্পৃষ্ট ধ্বনি ; ৩. অল্পপ্রাণ ও মহাপ্রাণ ; ৪. উষ্ম ধ্বনি ; ৫. ঘৃষ্ট ধ্বনি; ৬. রণিত ধ্বনি ; ৭. নাসিক্য ধ্বনি ; ৮. পার্শ্বিক ধ্বনি ; ৯. তাড়িত ধ্বনি ; ১০. প্রলম্বিত।

১. **ঘোষ ও অঘোষ ধ্বনি**

শ্বাসনালির পিছনে যে-দুটি স্বরতন্ত্রী (vocal cords) আছে, তার ভিতর দিয়ে বায়ু গেলে কখনো-কখনো একটা কম্পনের সৃষ্টি হয়, এবং তার ফলে উৎপন্ন হয় একটা অনুরণন। তাকেই বলা হয় ঘোষতা বা voice. যে ধ্বনির উচ্চারণে এই অনুরণন থাকে তাকে **ঘোষ ধ্বনি** (voiced consonant) বলা হয়। ধ্বনিতাত্ত্বিকগণ পূর্ণ ঘোষ এবং আংশিক ঘোষ (half-voiced) বা ঘোষবৎ ধ্বনিকে পৃথক করেন। বাংলায় ঙ্ ন্ ম্ ল্ এগুলি **সঘোষ বা পূর্ণ ঘোষ ধ্বনি**। গ্ ঘ্ জ্ ঝ্ ড্ ঢ্ দ্ ধ্ ব্ ভ্ র্ ড়্ ঢ়্ হ্—এই চোদ্দোটিকে ঘোষবৎ বা আংশিক ঘোষ ধ্বনি বলা যায়। অন্য দিকে, ক্ খ্ চ্ ছ্ ট্ ঠ্ ত্ থ্ প্ ফ্—এই দশটি ধ্বনির উচ্চারণে স্বরতন্ত্রীতে কোনো অনুরণন বা কম্পনের সৃষ্টি হয় না। তাই এগুলিকে **অঘোষ** (voiceless বা unvoiced) ব্যঞ্জন বলা হয়।

একসময় ‘ধ্বনির গাম্ভীর্য’-কে ঘোষতা বলা হত। এবং বলা হত যে, বর্গের প্রথম ও তৃতীয় বর্ণ অঘোষ, তৃতীয় পঞ্চম বর্ণ ঘোষ। একথা এখনও কোনো-কোনো

পুস্তকে বলা হয়ে থাকে। এই বক্তব্যকে আধুনিক ধ্বনিতাত্ত্বিকগণ ভ্রান্ত বলে খারিজ করেছেন।

২. স্পর্শ ধ্বনি বা স্পৃষ্ট ধ্বনি (plosives, stops, occlusives)

কোনো-কোনো ধ্বনি উচ্চারণের সময় উচ্চারণস্থানে শ্বাসবায়ুর বেরিয়ে আসার পথ প্রথমে সম্পূর্ণ রুদ্ধ হয়ে যায় এবং তারপরে বায়ু-অবরোধকারী দুটি বাক্-প্রত্যঙ্গ ফাঁক হয়ে যায়, ফলে বায়ু সজোরে বেরিয়ে আসে। এভাবে উৎপন্ন ধ্বনির নাম স্পর্শধ্বনি বা স্পৃষ্ট ধ্বনি। স্পর্শধ্বনির সংখ্যা নিয়ে বিতর্ক আছে। পবিত্র সরকারের মতে ক্ থেকে ঙ্ পর্যন্ত পাঁচটি, ট্ ঠ্ ড্ ঢ্ এই চারটি, ত্ থ্ দ্ ধ্ ন্ এই পাঁচটি এবং প্ ফ্ ব্ ভ্ ম্ এই পাঁচটি নিয়ে মোট **উনিশটি বাংলা ভাষার স্পর্শধ্বনি**। তিনি চ্ ছ্ জ্ ঝ্ এই চারটিকে স্পর্শধ্বনি বলতে চান না। অন্যদিকে, মুহম্মদ আবদুল হাই মনে করেন যে, চ-বর্গের ওই চারটি ধ্বনি যত-না ঘৃষ্ট, তার চেয়ে বেশি স্পৃষ্ট। প্রকৃতপক্ষে, চ্ ছ্ জ্ ঝ্ স্পৃষ্ট উচ্চারিত হয় কোনো-কোনো উপভাষায়। মান্য চলিতে এরা ঘৃষ্ট, স্পৃষ্ট নয়।

৩. অল্পপ্রাণ, মহাপ্রাণ (unaspirated, aspirated)

যে-ধ্বনির উচ্চারণের সময় শ্বাসবায়ু জোরে ছাড়া হয় না সে-ধ্বনি **অল্পপ্রাণ**। 'প্রাণ' হল শ্বাসবায়ু। মুহম্মদ আবদুল হাই বলেছেন যে, শ্বাসবায়ুর 'চাপের স্বল্পতা' থাকলে অল্পপ্রাণ ধ্বনি উৎপন্ন হয়। অন্য দিকে 'শ্বাসবায়ুর চাপের আধিক্য' থাকলে মহাপ্রাণ ধ্বনি উৎপন্ন হয়। **মহাপ্রাণ ধ্বনির** উচ্চারণে বায়ুর একটুখানি বাড়তি ঝলক দ্রুত বেরিয়ে আসে। মহাপ্রাণ ধ্বনির উচ্চারণে হ্-ধ্বনি মিশে থাকে। নীচে অল্পপ্রাণ ও মহাপ্রাণ ধ্বনিগুলির তালিকা দেওয়া হল—

অল্পপ্রাণ		**মহাপ্রাণ**
ক্	—	খ্
গ্	—	ঘ্
চ্	—	ছ্
জ্	—	ঝ্
ট্	—	ঠ্
ড্	—	ঢ্
ত্	—	থ্
দ্	—	ধ্
প্	—	ফ্
ব্	—	ভ্

৪. উষ্ম ধ্বনি (fricatives)

ফুসফুস থেকে আসা বায়ুর নির্গমনপথ কখনো-কখনো সংকীর্ণ হয়ে গেলে একটা শিস্‌জাতীয় ধ্বনি উৎপন্ন হয়। একেই বলা হয় উষ্ম ধ্বনি। মান্য কথ্য ভাষায় শ্‌ স্‌ হ্‌ এই তিনটিই প্রকৃত উষ্ম ব্যঞ্জনধ্বনি। একসময় এই ধরনের ধ্বনিকে বলা হত sibilant বা spirant, তবে বর্তমানে fricative পরিভাষাই অধিকতর প্রচলিত হয়েছে।

৫. ঘৃষ্ট ধ্বনি (affricates)

যে-ধ্বনির উচ্চারণে মুখবিবরে প্রথমে বায়ুপথ সম্পূর্ণ রুদ্ধ হয়ে যায়, তারপরে তা কিছুটা উন্মুক্ত হয়ে গেলে একটা ঘর্ষণজনিত ধ্বনি উৎপন্ন হয় তাকেই বলে **ঘৃষ্ট ধ্বনি**। মান্য কথ্য বাংলায় চ্‌ ছ্‌ জ্‌ ঝ্‌ এই চারটি ঘৃষ্ট ব্যঞ্জন। এদের উচ্চারণস্থান তালু। উচ্চারণস্থানের বিচারে এরা তালব্য ব্যঞ্জন। কোনো-কোনো বাংলাদেশি উপভাষায় এগুলি শিস্‌ধ্বনির মতো উচ্চারিত হয়। মাছ-এর উচ্চারণ/mas/। কিন্তু মান্য কথ্য বাংলায় এগুলি অবশ্যই ঘৃষ্ট ধ্বনি।

৬. রণিত ধ্বনি, কম্পনজাত ধ্বনি (trilled sounds)

জিভের আগা দন্তমূলকে স্পর্শ করে একটা কম্পন সৃষ্টি করলে যে-ধ্বনি পাওয়া যায় তাকে **রণিত বা কম্পনজাত ধ্বনি** বলা হয়। কেউ-কেউ ইংরেজিতে rolled consonants বলেন। আমাদের মান্য ভাষায় একমাত্র র্‌-ই রণিত ধ্বনি।

৭. পার্শ্বিক ধ্বনি (laterals)

পার্শ্বিক ধ্বনির উচ্চারণে জিহ্বার সামনের অংশ উপরদিকে ভাঁজ হয়ে দন্তমূলকে স্পর্শ করে এবং সেই অবস্থায় শ্বাসবায়ু জিহ্বার সম্মুখ ভাগের দুই পাশ দিয়ে বেরিয়ে আসে। দুই পাশ দিয়ে বায়ু বেরোয় বলে এই ধ্বনিকে **পার্শ্বিক ধ্বনি** বা lateral sound বলা হয়। বাংলায় একটিই পার্শ্বিক ধ্বনি আছে—ল্‌। একে কেউ-কেউ liquid sound বা **তরল ধ্বনিও** বলেন।

৮. তাড়িত ব্যঞ্জন (flapped sound)

বাংলায় ড়্‌ ও ঢ়্‌ এই ধ্বনিদুটি **তাড়িত ব্যঞ্জনের** দৃষ্টান্ত। জিভের ডগা প্রতিবেষ্টিত হয়ে অর্থাৎ কিছুটা উলটে গিয়ে উপরপাটি দাঁতের গোড়ায় মুহূর্তের জন্য তাড়ন বা আঘাত করে। ড্‌ ও ঢ্‌ উচ্চারণের সময়ও জিভের ডগা উলটে গিয়ে উপরপাটির দাঁতের গোড়া স্পর্শ করে। কিন্তু তফাত ওই যে, ড্‌ বা ঢ্‌ উচ্চারণে জিভ ওই অবস্থায় কিছুক্ষণ থাকে। অন্য দিকে, ড়্‌ ও ঢ়্‌ উচ্চারণের সময় জিভের ডগা উপপাটি দাঁতের গোড়া স্পর্শ করেই দ্রুত নেমে আসে। এইজন্যই একটা তাড়নের সৃষ্টি হয়।

৯. নাসিক্য ব্যঞ্জন (nasals)

নাসিক্য ব্যঞ্জনে নাকের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণের সময় স্পর্শধ্বনির মতোই দুটি উচ্চারক বা বাক্প্রত্যঙ্গের **পূর্ণ অবরোধ** (complete closure) ঘটে। শ্বাসবায়ু উচ্চারণস্থানে বাধা পেয়ে গতিপথ বদল করে নাসাপথ দিয়ে বেরিয়ে যায়। শ্বাসবায়ু মুখবিবরের অবরুদ্ধ পথ দিয়ে না বেরিয়ে নাসাপথে বেরোয়। মান্য কথ্য ভাষায় ঙ্ ন্ ম্ এই তিনটিই কেবল **নাসিক্য ব্যঞ্জন** ধ্বনি।

১০. প্রলম্বিত ধ্বনি (continuant)

যে ধ্বনিকে টেনে উচ্চারণ করা যায় অর্থাৎ যে ধ্বনির উচ্চারণকে প্রলম্বিত করা যায় তাকেই **প্রলম্বিত ধ্বনি** বলে। সাধারণত স্বরধ্বনিগুলিকেই প্রলম্বিত বলা হলেও কয়েকটি ব্যঞ্জনধ্বনিকেও উচ্চারণে প্রলম্বিত করা যায়। তিনটি নাসিক্য ব্যঞ্জন—ঙ্ ন্ ম্ প্রলম্বিত ব্যঞ্জন। একইভাবে র্ ল্ শ্ এই তিনটিকেও প্রলম্বিত করা সম্ভব।

২৩.৪ একক ব্যঞ্জন

কোনো ব্যঞ্জন এককভাবে অর্থাৎ অন্য ব্যঞ্জনের সঙ্গে যুক্ত না হয়ে উচ্চারিত হলে তাকে একক ব্যঞ্জন বলা হয়। বাংলা ভাষার যে ত্রিশটি ব্যঞ্জনের কথা বলা হয়েছে সেগুলির প্রত্যেকটিই এক-একটি **একক ব্যঞ্জন**। এই একক ব্যঞ্জনগুলি শব্দে তিনটি অবস্থানে থাকতে পারে—**শব্দের আদিতে, মধ্যে ও শেষে**। কতকগুলি ব্যঞ্জনকে উদাহরণ হিসাবে নিয়ে দেখা যেতে পারে তিনটি অবস্থান।

ব্যঞ্জনধ্বনি	শব্দের আদিতে	শব্দের মধ্যে	শব্দের শেষে
ক্ —	কত	বাকল	নাক
গ্ —	গম	নগর	রাগ
ত্ —	তিমি	ইতর	সাত
প্ —	পুব	বপন	সাপ
ব্ —	বালক	নবীন	সব
শ্ —	শহর	আসন (আশোন্)	বাঁশ

এখানে কয়েকটি কথা মনে রাখতে হবে। প্রথমত, ঙ্, ড়্, ঢ়্ এই তিনটি ধ্বনি কখনো শব্দের আদিতে অর্থাৎ গোড়ায় থাকতে পারে না। ঢ় দু-একটি শব্দের বানানে শেষে থাকলেও ঢ়্ ধ্বনি শব্দের শেষে অল্পপ্রাণ ড়্ উচ্চারিত হয়। 'আষাঢ়' উচ্চারণ আ-শা-ড়্। কাজেই আমরা বলব যে, ঢ়্ ধ্বনি শব্দের শেষে থাকে না।

২৩.৫ যুক্ত ব্যঞ্জন

দুই বা তার বেশি ব্যঞ্জনধ্বনি যদি এমনভাবে পরপর উচ্চারিত হয় যে, তার মধ্যে কোনো স্বরধ্বনি প্রবিষ্ট হবে না, তবে তাকেই বলা হবে সংযুক্ত (বা যুক্ত-) ব্যঞ্জনধ্বনি। ক্র, প্র,

ঘ্র, প্ল ইত্যাদি যুক্তবর্ণে যুক্তব্যঞ্জনধ্বনি আছে। এগুলির মধ্যে কোনো স্বরধ্বনি নেই। এইভাবে সংযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণ দিয়ে যুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনি প্রকাশিত হতে পারে। সংযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণকে conjunct letter বলা হয়। বাংলায় দুটি, তিনটি, চারটি পর্যন্ত ব্যঞ্জনধ্বনি সংযুক্ত হতে পারে।

দুই ব্যঞ্জন বা দ্বিব্যঞ্জন—

মস্ত — স্ + ত্ বিক্রয় (ক্ + র্)

তিন ব্যঞ্জন বা ত্রিব্যঞ্জন—

স্ত্রী — স্ + ত্ + র্ চন্দ্র — ন্ + দ্ + র্

চার ব্যঞ্জন বা চতুর্ব্যঞ্জন—

সংস্কৃত — ঙ্ + স্ + ক্ + র্ (এখানে মনে রাখতে হবে যে, ঋ সংস্কৃতে স্বরধ্বনি হলেও বাংলায় ব্যঞ্জনের মতো (র্ + ই) উচ্চারিত হয়)।

এখানে এই কথাটি বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে যে, সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনি যুক্তবর্ণ ছাড়াও প্রকাশিত হতে পারে—*উলটো, ফোসকা, আনচান, দরকার* এই শব্দগুলির বানানে যুক্তবর্ণ নেই। তবু এগুলোতে সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনি আছে—

উলটো — উ + (ল্ + ট্) ও

ফোসকা — ফ্ + ও + (শ্ + ক্) + আ

আনচান — আ + (ন্ + চ্) + আ + ন্

দরকার — দ্ + অ + (র্ + ক্) + আ + র্

উপরের চারটি শব্দের ধ্বনিবিশ্লেষণে বন্ধনীর মধ্যে পরপর দুটি ব্যঞ্জনধ্বনি আছে। এগুলি সংযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণ না হয়েও সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনি। এগুলিকে পবিত্র সরকারের অনুসরণে **শ্রুতি-যুক্তব্যঞ্জন** বলতে পারি (ear clusters)। তাহলে বলতে পারা যায় যে, বাংলা ভাষায় যুক্তব্যঞ্জন দু-রকম—১. পাশাপাশি একের বেশি ব্যঞ্জন যাতে যুক্তাক্ষর নেই (যেমন 'আনতে'-র ন্ + ত্) ; ২. যুক্তাক্ষর দিয়ে প্রকাশিত যুক্তব্যঞ্জন (যেমন 'যুক্ত'-র ক্ + ত্)।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা দরকার যে, এমন কিছু যুক্তব্যঞ্জনযুক্ত শব্দ আছে যেগুলি একসময় যুক্তাক্ষরে লেখা হত, এখন যুক্তাক্ষর ভেঙে লেখা হয়—উলটো, পালটা, দরজি, হালকা, সরষে, চ্যাপটা ইত্যাদি।

২৩.৫.১ বাংলা যুক্তব্যঞ্জনের সংখ্যা ও তালিকা

যুক্ত ধ্বনি বাংলা শব্দের আদিতে ও মধ্যেই কেবল থাকতে পারে। শব্দান্তে যুক্তব্যঞ্জন থাকে না। যেসব শব্দের শেষে যুক্তব্যঞ্জন পাওয়া যায় সে-সবই বিদেশি বা প্রতিবেশী ভাষায় শব্দ।

শব্দের গোড়ায় যুক্তব্যঞ্জন

১. দুই ব্যঞ্জনের যোগ (অর্থাৎ cc)

ক্র্ (ক্রম)	প্র (প্রাণ)	স্ত্ (স্তব)	ক্ল্ (ক্লান্তি)
গ্র্ (গ্রাম)	ব্র্ (ব্রততী)	স্ন্ (স্নান)	গ্ল্ (গ্লানি)
ট্র্ (ট্রাম)	ভ্র্ (ভ্রম)	হ্ল্ (হ্লাদিনী)	স্থ্ (স্থান)
ড্র্ (ড্রাম)	ম্র্ (মৃত্যু)*	স্খ্ (স্খলন)	স্ল্ (শ্লীলতা)*
ত্র্ (ত্রাণ)	শ্র্ (শ্রান্তি)		

এই তালিকা সম্পূর্ণ নয়। এখানে দুটি শব্দের পাশে * চিহ্ন দেওয়া আছে। লক্ষ করতে হবে যে, 'মৃত্যু' শব্দের বানানে আছে ঋ-কার, অথচ যুক্তব্যঞ্জনে দেখানো হয়েছে র-ফলা। পাঠকের ঈষৎ ধন্দ লাগতে পারে। সেই ধন্দের নিরসনে বলতে চাই যে, মৃত্যু-র ঋ-কারযুক্ত মৃ বাংলায় ম্রি উচ্চারিত হয়, ব্যঞ্জনতুল্য এই উচ্চারণ। দ্বিতীয় শব্দটি শ্লীলতা। এখানে বানানে তালব্য-শ থাকলেও মান্য কথ্য বাংলায় শব্দটির উচ্চারণ স্লিল্, শ্লিল্ নয়। তাই যুক্তব্যঞ্জন হল স্ল্।

লক্ষণীয় যে, বাংলায় শব্দের গোড়ায় **সমস্থানজাত** বা **সামাঙ্গিক** (homorganic) যুক্তব্যঞ্জন অর্থাৎ একই ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব হয় না। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে কোনো-কোনো শব্দের উচ্চারণে এই ধরনের দ্বিত্ব শোনা যায় না এমন নয়। *য্যাঃ, বাজে কথা বোলো না। ন্নাঃ, এ হতেই পারে না।* এই য্য্ বা ন্ন্-তে দ্বিত্ব থাকলেও এটা স্বাভাবিক নয়, সাধারণ নিয়মের মধ্যে পড়ে না।

২. শব্দের গোড়ায় তিনব্যঞ্জনের যোগ

বাংলায় কেবল তিন-চারটি ক্ষেত্রে তিন ব্যঞ্জনের যোগ শব্দের গোড়ায় থাকতে পারে (ccc)। অবশ্য বিদেশি ভাষার শব্দই বেশি।

স্প্র্ (স্ + প্ + র্) = স্পৃহা, স্পৃহনীয়, স্প্রিং

স্ট্র্ (স্ + ট্ + র্) = স্ট্রং, স্ট্রাইক, স্ট্রে

স্ত্র্ (স্ + ত্ + র্) = স্ত্রী, স্ত্রৈণ

স্ক্র্ (স্ + ক্ + র্) = স্ক্রু

শব্দের গোড়ায় **সমস্থানজাত** বা **সামাঙ্গিক যুক্তব্যঞ্জন** থাকতে পারে না বলেছি। তবে শব্দের মধ্যে থাকতেই পারে। তার দৃষ্টান্ত—বল্লম, দুদ্দাড়, বড্ড, নিত্য, সত্য, বিদ্বান (দ্ + দ্)। শব্দের শেষে যুক্তব্যঞ্জন বাংলায় নেই বললেই চলে—বানানে থাকলেও তা ব্যঞ্জনান্ত উচ্চারিত হয় না। বিদেশি বা প্রতিবেশী ভাষার শব্দেই কেবল তা থাকতে পারে—বন্ধ (ন্ + ধ্), ব্যান্ড (ন্ + ড্), হার্ট (র্ + ট্), মার্চ (র্ + চ্)। দুটি মহাপ্রাণ ধ্বনি বাংলায় পাশাপাশি উচ্চারিত হয় না। একটি অল্পপ্রাণ হয়ে যায়। নচ্ছার (চ্ + ছ্), আঢ্য (ড্ + ঢ্), বাধ্য (দ্ + ধ্)।

২৩.৫.২ যুক্তব্যঞ্জন ও সিলেবল

যুক্তব্যঞ্জন সচরাচর থাকে একের বেশি সিলেবল বা দল নিয়ে গঠিত শব্দে। যুক্তব্যঞ্জনটি প্রথম সিলেবলে থাকতে পারে—*প্রথা, শ্রমিক, ধৃতি* ইত্যাদি শব্দে যুক্তব্যঞ্জনটি প্রথম দল বা সিলেবলে থাকছে—

প্রথা — প্রো (প্ + র্ + ও) + থা (থ্ + আ)
শ্রমিক — স্রো (স্ + র্ + ও) + মিক্ (ম্ + ই + ক্)
ধৃতি — ধ্রি (ধ্ + র্ + ই) + তি (ত্ + ই)

আমরা বলেছি যে, 'সচরাচর' যুক্তব্যঞ্জন থাকে একাধিক দল বা সিলেবল নিয়ে তৈরি শব্দে। যুক্তব্যঞ্জন এক সিলেবলের বিদেশি শব্দে থাকতে পারে—স্প্রিং, প্যান্ট, ব্যাংক, মার্চ।

স্প্রি — স্ + প্ + র্ + ই্ + ঙ্
প্যান্ট — প্ + অ্যা + ন্ + ট্
ব্যাংক — ব্ + অ্যা + ঙ্ + ক্
মার্চ — ম্ + আ + র্ + চ্

তবে যুক্তব্যঞ্জনের দুটি ব্যঞ্জন একই সিলেবলে না থাকতেও পারে। কয়েকটি শব্দ নিয়ে দেখা যাক—যুক্ত, ব্যঞ্জন, ভিত্তি, উচ্চারণ।

যুক্ত — জুক্ + তো
ব্যঞ্জন — ব্যান্ + জোন্
ভিত্তি — ভিৎ + তি
উচ্চারণ — উচ্ + চা + রোন্

গ্রন্থপঞ্জি

পাল, পলাশ বরন — ধ্বনিমালা বর্ণমালা, ২০০১
বসু, দ্বিজেন্দ্রনাথ—বাংলা ভাষার আধুনিক তত্ত্ব ও ইতিকথা, ১৯৮০
ভট্টাচার্য, সুভাষ—বাঙালির ভাষা, ২০০০
শ', রামেশ্বর—সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা, ১৯৮৪
সরকার, পবিত্র—বাংলা ব্যাকরণ প্রসঙ্গ, ২০০৬
হাই, মুহম্মদ আবদুল—ধ্বনিবিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব, রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, ১৯৯৪

২৪. বাংলা ভাষার বর্ণনামূলক ব্যাকরণ—
সিলেবল ও শ্বাসাঘাত

২৪.১ সিলেবল বা দল কাকে বলে?

প্রতিটি শব্দ গঠিত হয় এক বা একাধিক বাগ্‌ধ্বনি নিয়ে। প্রতিটি শব্দ উচ্চারণ করার সময় আমরা শব্দটিকে কতকগুলি ভাগে ভেঙে ভেঙে উচ্চারণ করি। সেই ভাঙাটা সবসময় সচেতনভাবে ঘটে না। ভাঙার ফলে যে-ভাগগুলি হয়, তার প্রত্যেকটি এক-একটি সিলেবল। ধ্বনিতত্ত্বে বলা হয় যে, সিলেবল হল সেই ভাষিক একক (linguistic unit) যা আমাদের **নিশ্বাসের স্বল্পতম প্রয়াসে উচ্চারিত** হয়। এই কথাটি যত সহজে বলা হল, সিলেবল কিন্তু বাস্তবে তত সহজ ব্যাপার নয়। সিলেবল-ভাগ এবং সিলেবল-শনাক্তকরণ বিষয়ে ধ্বনিতাত্ত্বিকদের মধ্যে মতানৈক্য বিশেষভাবে লক্ষ করা যায়। বিখ্যাত দুই ধ্বনিতাত্ত্বিক ব্রস্‌নাহান ও মামবার্গ (Brosnahan & Malmberg) বলেছেন—

> 'The syllable ... is by no means a simple concept. Within the one language a child can usually count on its fingers the number of syllables in a sequence, but no phonetician has succeeded so far in giving an exhaustive and adequate description of what the syllable is...' (L.F. Brosnahan & B. Malmberg, **Introduction to Phonetics,** 1970. দ্র. John Laver, Principles of Phonetics, 2000, p.113.)

দুটি সিদ্ধান্ত এ থেকে করা যায়—এক. **সিলেবলকে এক-এক ভাষায় এক-এক রকমভাবে দেখতে হয়** ; দুই, **সিলেবল নিয়ে ধ্বনিতাত্ত্বিকরাই বিভ্রান্ত**।

জটিলতা এড়িয়ে আমরা সিলেবল সম্বন্ধে কয়েকটা সহজ কথা বলে নেব।

প্রথমত, ইংরেজি সিলেবলকে বাংলায় কেউ বলেন অক্ষর, কেউ বলেন দল। দুটিরই কিছু অসুবিধা আছে। অক্ষর বললে বর্ণও বোঝাতে পারে। আবার কবিতায় ছন্দের আলোচনায় যে-দল কথাটির ব্যবহার হয়, তার অর্থ ঈষৎ ভিন্ন। তবু সিলেবলের পারিভাষিক শব্দ হিসাবে **'দল'** বা **'সিলেবল'** যেকোনোটিই ব্যবহারযোগ্য।

দ্বিতীয়ত, সহজবোধ্য সংজ্ঞার্থ হিসাবে আমরা বলতে পারি, সিলেবল বা দল হল **'বাগ্‌যন্ত্রগুলির একবারের চেষ্টায় উচ্চারিত স্বরধ্বনিকেন্দ্রিক ভাষাখণ্ড'** (পবিত্র সরকার)। এ থেকে সিলেবলের গঠন সম্পর্কে আমরা একটা ধারণা পাচ্ছি। **একটিমাত্র ধ্বনি নিয়েও সিলেবল হতে পারে**। 'আমি' শব্দের 'আ' একটি সিলেবল। 'এবার' শব্দের 'এ' একটি সিলেবল। দুটিই একটিমাত্র স্বরধ্বনি নিয়ে তৈরি।

তৃতীয়ত, সিলেবলে একটি **অন্তত স্বরধ্বনি থাকতেই হবে**। স্বরধ্বনি ছাড়া সিলেবল হয় না। মুহম্মদ আবদুল হাই বলেছেন, সিলেবলে স্বরধ্বনি বা **'স্বরধ্বনি সমন্বিত ব্যঞ্জনধ্বনি'** থাকতেই হবে। 'মাথা' শব্দে দুটি সিলেবল—মা + থা। দুটিই ব্যঞ্জন ও স্বরধ্বনির সমবায়ে গঠিত—মা (ম্ + আ) + থা (থ্ + আ)। একটি সিলেবলে একটির বেশি স্বরধ্বনি থাকতে পারে না, একটির বেশি **স্বরবর্ণ** থাকতেই পারে, থাকতে পারে না একটির বেশি **স্বরধ্বনি**।

boot শব্দের উচ্চারণ /bu:t/। এখানে স্বরবর্ণ দুটি থাকলেও স্বরধ্বনি একটিই—long u.

২৪.২ একাধিক সিলেবলযুক্ত শব্দ

বাংলা শব্দ এক সিলেবলের হতে পারে, একাধিক সিলেবলেরও হতে পারে। দুই, তিন, চার সিলেবলের শব্দ বাংলায় প্রায়ই ব্যবহৃত হয়। দীর্ঘ সমাসবদ্ধ শব্দে ছাড়া ছয় বা তার বেশি সিলেবল দেখা যায় না। আমরা একাধিক সিলেবলের কিছু শব্দ দেখব উদাহরণ হিসাবে।

ক. দুই সিলেবলের শব্দ

বেশি, নদী, বাধা, সত্য, গণ্য, নব, নব্য, হাতি, মৃগ—

বে + শি, নো + দি, বা + ধা, শোৎ + তো, গোন্ + নো, ন + বো, নোব্ + বো, হা + তি, ম্রি + গো

খ. তিন সিলেবলের শব্দ

মশারি, শ্রাবণী, উর্মিলা, নবীনা, প্রেয়সী, পৃথিবী, সমধিক—

ম + শা + রি, স্রা + বো + নি, উর্ + মি + লা, নো + বি + না, প্রে + য়ো + শি, প্রি + থি + বি, শ + মো + ধিক্

গ. চার সিলেবলের শব্দ

রমনীয়, মহানগর, ব্যঞ্জনধ্বনি, অপার্থিব, কলুষিত—

র + মো + নি + য়ো, ম + হা + ন + গোর্, ব্যান্ + জোন্ + ধো + নি, অ+ পার্ + থি + বো, কো + লু + শি + তো

ঘ. পাঁচ সিলেবলের শব্দ

গ্রহণীয়তা, উপযোগিতা, ধ্বনিবিজ্ঞানী, ভারতীয়তা—

গ্রো + হো + নি + য়ো + তা, উ + পো + জো + গি + তা,
ধো + নি + বিগ্ + গ্যাঁ + নি, ভা + রো + তি + য়ো + তা

ঙ. ছয় সিলেবলের শব্দ

অস্বাভাবিকভাবে, পাঠকসাধারণের, যুক্তব্যঞ্জনগুলি—

অশ্ + শা + ভা + বিক্ + ভা + বে, পা + ঠোক্ + শা + ধা + রো + নের্, জুক্ + তো + ব্যান্ + জোন্ + গু + লি

২৪.৩ অর্ধস্বর সিলেবল গঠন করে না

আগেই বলা হয়েছে, সিলেবল বা দল গঠিত হয় **অন্ততপক্ষে একটি স্বরধ্বনি নিয়ে** বা **স্বরধ্বনি-সমন্বিত ব্যঞ্জনধ্বনি** নিয়ে। কোনো-কোনো ধ্বনিবিজ্ঞানী একটি ব্যতিক্রমের কথা বলেছেন। শ্ একটি ব্যঞ্জনধ্বনি হওয়া সত্ত্বেও এটি একটি সিলেবল। ইংরেজিতে sh এইভাবে দেখানো হয়, আন্তর্জাতিক ধ্বনিলিপিতে (IPA) /ʃ/। একে ব্যতিক্রম বলে ধরে নিয়েই বলব যে, সাধারণভাবে সিলেবল তৈরি করতে হলে অন্তত একটি স্বরধ্বনি চাই-ই।

এই প্রসঙ্গে বলতে হবে যে, অর্ধস্বর দিয়ে সিলেবল হয় না। ই্ / ĭ /, উ্ / ŭ / এগুলি অর্ধস্বর অর্থাৎ পুরো স্বরধ্বনি নয়। দু-একটি শব্দের দৃষ্টান্ত দেখব—যাই, বউ, খাই, গাই। এগুলিকে দেখাব এইভাবে—

যাই — জাই্ / jaĭ /

বউ — বোউ্ / boŭ /

খাই — খাই্ / khaĭ /

গাই — গাই্ / gaĭ /

অন্যদিকে পূর্ণ স্বরধ্বনির দৃষ্টান্ত হল—ইনি, উনি, ইতর।

ইনি — ইনি /ini/

উনি — উনি /uni/

ইতর — ইতর /itɔr/

এবার একটু তুলনা করা যাক—দাই আর দায়ী।

দাই — দাই্ / daĭ /

দায়ী — দাই /dai/

এবারে দেখব কেন অর্ধস্বর দিয়ে সিলেবল হয় না। উপরের দুটি শব্দকে সিলেবলে ভাঙা যাক—

দাই — দাই্ (১ সিলেবল)

দায়ী — দা + ই (২ সিলেবল)

এইভাবেই ‘খাওয়া’, ‘যাওয়া’, ‘হাওয়া’ প্রভৃতি শব্দে মাত্রই দুটি করে সিলেবল।

খাওয়া — খাও্ + আ

যাওয়া — জাও্ + আ

হাওয়া — হাও্ + আ

এখানে লক্ষ করতে হবে যে, খাও্, জাও্, হাও্ এগুলিতে একটি করে সিলেবল। ও্ একটি অর্ধস্বর। তাই ও্ সিলেবল গঠন করছে না।

২৪.৪ সিলেবল গঠনে স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জনধ্বনির ভূমিকা

সিলেবল গঠনে স্বরধ্বনি যে থাকবেই একথা আগেই বলা হয়েছে। এবারে দেখব সিলেবলে স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জনধ্বনি কীভাবে বা কী পরম্পরায় থাকে। ধ্বনিতত্ত্বের আলোচনায় স্বরধ্বনিকে v, ব্যঞ্জনধ্বনিকে c এবং অর্ধস্বরকে sv (semi-vowel) বলা হয়।

১. **এক সিলেবলের** গঠনে স্বরধ্বনি, ব্যঞ্জনধ্বনি ও অর্ধস্বরের বিন্যাস কীভাবে হতে পারে, এখন সেটাই দেখব—

V অর্থাৎ একটিমাত্র স্বরধ্বনি (আ, ও)

VC অর্থাৎ একটি স্বরধ্বনি ও একটি ব্যঞ্জনধ্বনি (উট, ইট, আম)

CV অর্থাৎ একটি ব্যঞ্জন ও একটি স্বরধ্বনি (কু, দা, পা)

CVsv অর্থাৎ একটি ব্যঞ্জন, একটি স্বরধ্বনি ও একটি অর্ধস্বর (যাই, চাই, খাও)

CCVC অর্থাৎ পরপর দুটি ব্যঞ্জন, একটি স্বরধ্বনি আর একটি ব্যঞ্জনধ্বনি (প্রেম —প্ + র্ + এ + ম্)

বিদেশি ভাষার যেসব শব্দ বাংলায় ব্যবহৃত হয় তার কোনো-কোনোটির গঠন আরও জটিল হতে পারে, যেমন CCCVCC অর্থাৎ পরপর তিনটি ব্যঞ্জনধ্বনি, একটি স্বরধ্বনি আর শেষে অর দুটি ব্য-জনধ্বনি—স্প্রিন্ট (sprint)।

স্ + প্ + র্ + ই + ন্ + ট্

২. এবারে **দুই সিলেবলের শব্দের গঠন**

VCV স্বরধ্বনি + ব্যঞ্জনধ্বনি + স্বরধ্বনি (আলু—আ + ল্ + উ)

CVCV ব্যঞ্জনধ্বনি + স্বরধ্বনি + ব্যঞ্জনধ্বনি + স্বরধ্বনি (তালা—ত্ + আ + ল্ + আ)

VCVC স্বরধ্বনি + ব্যঞ্জনধ্বনি + স্বরধ্বনি + ব্যঞ্জনধ্বনি (এবার—এ + ব্ + আ + র্)

CCVCVC দুটি ব্যঞ্জন + স্বরধ্বনি + ব্যঞ্জন + স্বরধ্বনি + ব্যঞ্জন (প্রণাম—প্ + র্ + ও + ন্ + আ + ম্)

CsvCV ব্যঞ্জন + অর্ধস্বর + ব্যঞ্জন + স্বরধ্বনি (বায়না—ব্ + আয়্ + ন্ + আ)

CVCsv ব্যঞ্জন + স্বরধ্বনি + ব্যঞ্জন + অর্ধস্বর (কোথায়—ক্ + ও + থ্ + আয়্)

এছাড়াও আরও নানান রকমের বিন্যাস হতে পারে।

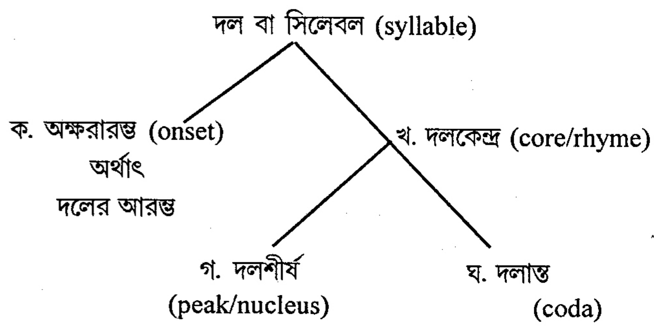
৩. তিন সিলেবলের শব্দের গঠন

VCVCV (আকাশি), CVCVCV (বাদুলে), CCVCVCV (পৃথিবী), CVCCVCV (পার্থিব) ইত্যাদি বহু রকমের বিন্যাস হতে পারে।

বাংলা শব্দে সিলেবলে স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জনধ্বনির বিন্যাস কতরকমের হতে পারে তা দেখানো আমাদের উদ্দেশ্য নয়। কেবল কতকগুলি দৃষ্টান্ত এখানে দেখানো হল। এই তালিকা আদৌ সম্পূর্ণ নয়।

২৪.৫ সিলেবলের সংগঠন

সিলেবলের গঠন বা সংগঠনে কয়েকটা পারিভাষিক শব্দ আমাদের মনে রাখতে হবে। সেগুলি হল ১. অক্ষর বা **দলের আরম্ভ** বা **আদি**, যার ইংরেজি নাম **onset** ; ২. **দলান্ত** বা **অক্ষরান্ত** অর্থাৎ **সিলেবলের অন্ত**, ইংরেজি নাম **coda** ; ৩. **দলকেন্দ্র**, ইংরেজি নাম **rhyme** বা **core**; ৪. **দলশীর্ষ**, যার ইংরেজি নাম **peak** বা **nucleus.** এইবার প্রত্যেকটি পারিভাষিক শব্দকে ব্যাখ্যা করার আগে ছবির আকারে সিলেবল বা দলের গঠনটি দেখে নেব—



ব্যাবহারিক দিক থেকে ক, খ, গ, ঘ এই চারটি অংশের মধ্যে বিশেষভাবে ক, গ ও ঘ-কেই গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হয়। এবার বাংলা ভাষার সিলেবলের উদাহরণ দিয়ে এগুলিকে বোঝানো যেতে পারে। ক. onset বা অক্ষরারম্ভ বা **দলের আদি অংশ** হল প্রকৃত অর্থেই দলের আরম্ভ! দলশীর্ষ বা peak এ যে-স্বরধ্বনি থাকে তার আগে যদি ব্যঞ্জন বা ব্যঞ্জনগুচ্ছ থাকে তবে তাকেই বলা হবে onset অর্থাৎ **দলারম্ভ** বা **অক্ষরারম্ভ**।

আমরা 'কান', 'ত্রাণ' এই দুটি শব্দের সিলেবল-সংগঠন দেখব—

কান — ক্ + আ + ন্

ত্রাণ — ত্ + র্ + আ + ন্

কান-এর onset বা অক্ষরারম্ভ হল ক্, ত্রাণ-এর অক্ষরারম্ভ হল ত্ + র্ এই ব্যঞ্জনগুচ্ছ।

এবারে গ- অর্থাৎ **দলশীর্ষ** বা peak বা nucleus দেখব। সিলেবলে কেন্দ্রীয় অংশই দলশীর্ষ বা peak. একটি স্বরধ্বনিই কেবল দলশীর্ষ হতে পারে। 'কান' ও 'ত্রাণ'-এ আ

হল দলশীর্ষ। অবশ্য কোনো-কোনো ক্ষেত্রে দ্বিস্বরধ্বনিও (diphthong) দলশীর্ষ বা nucleus হতে পারে। দুটি উদাহরণ দেখব 'কুল', 'ভাই'।

কুল — ক্ + উ + ল্
ভাই — ভ্ + আই্

কুল-এ 'উ' হল দলশীর্ষ। আবার ভাই-এ আই্ দ্বিস্বর ধ্বনিটি দলশীর্ষ।

এবারে দলান্ত বা coda-র দৃষ্টান্ত দেখব। Nucleus বা **দলশীর্ষের** পরে যে-**ব্যঞ্জনধ্বনি বা ব্যঞ্জনগুচ্ছ** থাকে, তা-ই coda বা দলান্ত। উদাহরণ—বাণ, চাল।

বাণ — ব্ + আ + ন্
চাল — চ্ + আ + ল্

এই দুটি শব্দে যথাক্রমে ন্ ও ল্ হল coda বা দলান্ত।

সবশেষে একটি কথা বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে। যে তিনটি অংশের কথা বলেছি (অর্থাৎ onset বা আদি, nucleus বা দলশীর্ষ এবং coda বা দলান্ত) তার সবকটি সব শব্দে নাও থাকতে পারে। কয়েকটি সম্ভাবনার কথা বলা যাক।

১. শুধু আদি ও দলশীর্ষ নিয়েই শব্দ হতে পারে। যেমন যা (জ্ + আ), খা (খ্ + আ) ইত্যাদি।

২. আবার আদি-কে বাদ দিয়েও শব্দ হতে পারে। যেমন আখ (আ + খ্)। এখানে দলশীর্ষ ও দলান্ত আছে, কিন্তু আদি বা আরম্ভ (onset) নেই।

৩. তিনটি উপাদান নিয়ে পূর্ণাঙ্গ শব্দও হতে পারে যেমন কান, মান, কুল।

কান — ক্ + আ + ন্
মান — ম্ + আ + ন্
কুল — ক্ + উ + ল্

২৪.৬ শ্রুতিস্বর দিয়ে দলগঠন হয় না

শ্রুতিধ্বনি বা glide দুটি স্বরধ্বনির ভিতরে ফাঁক ভরাট করে। যা + আ এই দুইয়ের মাঝের ফাঁক ভরাট করেছে একটি শ্রুতিস্বর—ও্। তার ফলে শব্দটির রূপ দাঁড়াল যাওয়া। এই ও্ অদলীয় বা অনাক্ষরিক (non-syllabic)। এই শ্রুতিস্বরটি প্রথম সিলেবলে যুক্ত হল বটে, কিন্তু তাতে সিলেবলের সংখ্যাবৃদ্ধি হল না। যাওয়া—জাও্ + আ। দুই দল বা সিলেবল ছিল, তাই-ই থাকল। আরও একটি শব্দ নিয়ে দেখব। আন্দামানের একটি বিলীয়মান উপজাতির নাম—জারোয়া। উচ্চারণ—জা + রো + আ, তিনটি দল বা সিলেবল। এই শব্দের উচ্চারণ যদি হত জার্ + ও্আ, তাহলে পাওয়া যেত দুটি দল বা সিলেবল। প্রকৃত উচ্চারণ— ja + ro + a , jar-wa নয়। অতএব সহজেই দেখানো যায় যে, শ্রুতিস্বর বস্তুতপক্ষে অর্ধস্বরের মতো আসে, এবং তার দল বা সিলেবল গঠনের ক্ষমতা নেই।

২৪.৭ বদ্ধ ও মুক্ত দল

সিলেবল বা দল গঠনে স্বরধ্বনির গুরুত্ব সর্বাধিক। কেননা স্বরধ্বনি ছাড়া দল গঠন সম্ভব নয়। স্বরধ্বনি সিলেবলের যে-কোনো অবস্থানেই থাকতে পারে, শুরুতে, মধ্যে, শেষে। 'আজ' শব্দে একটিই সিলেবল, স্বরধ্বনি রয়েছে শুরুতে। 'মান' শব্দেও একটিই সিলেবল, স্বরধ্বনি রয়েছে মধ্যে। 'কলা' শব্দে দুটি সিলেবল, স্বরধ্বনি আছে শেষে।

সিলেবলে ব্যঞ্জনধ্বনির আছে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা, কোনো দল বা সিলেবল যদি ব্যঞ্জনধ্বনি দিয়ে শুরু হয় তবে তাকে বলা হয় **মুক্তিদায়ী ব্যঞ্জন** (releasing consonant)। 'কলা' শব্দের ক্ মুক্তিদায়ী ব্যঞ্জন। আবার কোনো সিলেবল ব্যঞ্জনধ্বনিতে শেষ হলে তাকে **বদ্ধ ব্যঞ্জন** (arresting consonant) বলা হয়। 'মান' শব্দের ন্ বদ্ধ ব্যঞ্জন। ধ্বনিতত্ত্বে **মুক্ত (open)** ও **বদ্ধ (closed)** এই দু-রকম দল বা সিলেবলের কথা বলা হয়। যে-সিলেবল স্বরধ্বনিতে শেষ হয়, তা-ই মুক্ত দল বা open syllable.

'নীতি', 'মা', 'প্রথা', 'আশু'—এগুলি মুক্ত দলের দৃষ্টান্ত।

নীতি—ন্ + ই + ত্ + ই (দুই সিলেবল—নি.তি)
মা — ম্ + আ (এক সিলেবল — মা)
প্রথা — প্ + র্ + ও + থ্ + আ (দুই সিলেবল— প্রো.থা)
আশু — আ + শ্ + উ (দুই সিলেবল—আ.শু)

প্রত্যেকটি শব্দের শেষে আছে স্বরধ্বনি, যথাক্রমে ই, আ, আ, উ। কাজেই এগুলি মুক্ত দলের দৃষ্টান্ত।

এবারে দেখব বদ্ধ দলের দৃষ্টান্ত। প্রথমেই বলে নিই যে, যে দলের শেষে ব্যঞ্জনধ্বনি থাকে তা বদ্ধ দল।

'পাল', 'দূর', 'নিষেধ'—এগুলি বদ্ধ দলের দৃষ্টান্ত।

পাল — প্ + আ + ল্ (এক সিলেবল—পাল্)
দূর — দ্ + উ + র্ (এক সিলেবল—দুর্)
নিষেধ — ন্ + ই + শ্ + এ + ধ্ (দুই সিলেবল—নি.শেধ্)

প্রত্যেকটির শেষে ব্যঞ্জনধ্বনি আছে, যথাক্রমে ল্, র্, ধ্। প্রত্যেকটিই বদ্ধ দলের দৃষ্টান্ত।

এখানে আরও একটা কথা বলি। কোনো সিলেবলের **শেষে অর্ধস্বর থাকলে সেটিকেও বদ্ধ দল** বলা হবে।

'যাই', 'দেখাও'—এ-দুটিও বদ্ধ দলের দৃষ্টান্ত।

যাই—জ্ + আই্ (এক সিলেবল—জাই্)
দেখাও—দ্ + অ্যা + খ্ + আও্ (দুই সিলেবল—দ্যা.খাও্)

২৪.৮ দ্বিমাত্রিকতা বা দ্বিতীয় স্বরলোপ (biomorism)

সিলেবলের প্রসঙ্গে বাংলা ভাষার উচ্চারণের একটা বৈশিষ্ট্যের কথা এখানে আলোচনা করা একান্তই প্রয়োজন। সেই বৈশিষ্ট্যটিকে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেছিলেন দ্বিমাত্রিকতা, ইংরেজিতে যাকে bimorism বলা যেতে পারে। Mora কথাটির অর্থ মাত্রা। সুনীতিকুমার বলেছেন যে, বাংলা ভাষায় বহুমাত্রিক শব্দের দ্বিমাত্রিক শব্দে পরিণত হবার একটা প্রবণতা লক্ষ করা যায়। নীচের শব্দগুলি উদাহরণ হিসাবে দেখব—

ভাগিনা — ভা + গি + না
গামোছা — গা + মো + ছা
মেজোদা — মে + জো + দা
দেবতা — দে + বো + তা
ভাবনা — ভা + বো + না
দখিনে — দো + খি + নে

প্রত্যেকটিই তিন সিলেবলের শব্দ। অন্তত সেভাবে উচ্চারণ করারই কথা। কিন্তু কথ্য বাংলায় একটা সিলেবল কমে যাবার প্রবণতার জন্য হয়ে দাঁড়াল দ্বিমাত্রিক বা দুই মাত্রার তথা দুই সিলেবলের শব্দ—

ভাগনা — ভাগ্ + না
গামছা — গাম্ + ছা
মেজদা — মেজ্ + দা
দেবতা — দেব্ + তা (এই উচ্চারণ প্রধানত উপভাষায় শোনা যায়)
ভাবনা — ভাব্ + না
দখনে — দোখ্ + নে

প্রত্যেক শব্দ থেকে একটা স্বরধ্বনি তথা দল খসে পড়ল, এবং শব্দগুলি তিন থেকে দুই দলের হয়ে গেল।

সুকুমার সেনও, সুনীতিকুমারকে অনুসরণ করে, এই প্রবণতাকে দ্বিমাত্রিকতা বলেছেন।

কিন্তু সম্প্রতি (১৯৮৫-৮৬ সালে) পবিত্র সরকার বলেছেন যে, বাংলা ভাষার উচ্চারণের এই প্রবণতার নামটি 'দ্বিমাত্রিকতা' হওয়া উচিত নয়। 'মাত্রা' আর দল বা সিলেবল এক নয়। বাংলায় তিন বা চার সিলেবলের শব্দ থেকে একটি স্বরধ্বনি লুপ্ত হবার ফলে সিলেবল-সংখ্যা কমে যায়। তাই পবিত্র সরকারের মতে একে বরং বলা উচিত **দ্বিতীয় স্বরলোপ**। ধ্বনিতত্ত্বে একে **vowel dropping** বলা হয়। কিন্তু এই প্রবণতার কারণ কী? আমরা জানি, বাংলা ভাষায় সমস্ত শব্দের আদ্য দলে অর্থাৎ প্রথম সিলেবলে শ্বাসাঘাত (accent) পড়ে। তারই ফলে দ্বিতীয় সিলেবলের স্বরধ্বনিটি লুপ্ত হয়।

এই প্রবণতার আরও দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে—

পলিতা > পল্‌তে, পাগলি > পাগ্‌লি, সরিষা > সর্‌ষে (সর্ষে), বড়োদি > বড়্‌দি, বড়োদিদি > বড়্‌দিদি, জানালা > জান্‌লা, সজিনা > সজ্‌নে, খুড়োশ্বশুর > খুড়্‌শ্বশুর।

২৪.৯ শ্বাসাঘাত বা প্রস্বর (stress, accent)

আমরা যখন কথা বলি তখন শব্দের কোনো-কোনো জায়গায় বা সিলেবলে একটু ঝোঁক বা জোর দিই। এই **ঝোঁক বা জোরকে stress** বা **accent** বলে। বাংলায় **প্রস্বর** বা **শ্বাসাঘাত** বলা হয়। ইংরেজি শব্দের দৃষ্টান্ত দিয়ে এই শ্বাসাঘাত ভালোই বোঝা যায়। আমরা কয়েকটা ইংরেজি শব্দ নেব—bunting (একরকম পাখি), contribution, notation, kitchen এবার দেখা যাক কোন্ শব্দের কোন্ সিলেবলে accent বা শ্বাসাঘাত পড়ছে।

bunting – bu′n – ting (প্রথম সিলেবলে)
contribution – con-tri- bu′ -tion (তৃতীয় সিলেবলে)
notation – no – ta′ – tion (দ্বিতীয় সিলেবলে)
kitchen – ki′ – tchen (প্রথম সিলেবলে)

শুধু এও নয়। ইংরেজিতে একই শব্দে দুই পদে, দু-রকম শ্বাসাঘাত হতে পারে।

import (n.) – i′m – port
import (v.) – im – po′rt

import যখন বিশেষ্য তখন প্রথম সিলেবলে শ্বাসাঘাত পড়ে, যখন তা ক্রিয়াপদ, তখন দ্বিতীয় সিলেবলে শ্বাসাঘাত পড়ে।

বাংলা ভাষায় সবসময়ই শব্দের প্রথম সিলেবলে শ্বাসাঘাত পড়ে। এদিক থেকে বাংলায় প্রস্বর বা শ্বাসাঘাতের কোনো বৈচিত্র নেই।

পাগল, নিতাই, চাঞ্চল্য, সুস্থির প্রভৃতি শব্দে প্রথম সিলেবলেই প্রস্বর পড়ে। সমস্ত শব্দেই তাই।

কিন্তু **শব্দের প্রস্বর** (word stress) আর **বাক্যের প্রস্বর** (sentence stress) একরকম নয়। বাক্যে ব্যবহৃত শব্দে অর্থ অনুসারে বিশেষ বিশেষ জায়গায় শ্বাসাঘাত পড়ে। প্রত্যেকটি বাক্যকে আমরা কয়েকটি পর্বে ভাগ করতে পারি। সেই পর্বের 'গুরুত্বপূর্ণ' (অর্থের দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ) শব্দের প্রথম সিলেবলে শ্বাসাঘাত পড়াই বাংলা ভাষার নিয়ম। আমরা কয়েকটা বাক্য দেখে নিতে পারি—

ক. আজ আবার বৃষ্টি হবে।
খ. ছেলেরা এখনও বাড়ি ফেরেনি।
ক. আ′জ | আ′বার | বৃ′ষ্টি হবে
খ. ছে′লেরা | এ′খনও | বা′ড়ি ফেরেনি

অবশ্য কোনো বক্তা তাঁর বক্তব্যে বিশেষ কোনো জায়গায় ঝোঁক দিতেই পারেন।

তুমি কি কাল ওদের বাড়ি গিয়েছিলে?

এই বাক্যে অর্থের ঝোঁক অনুসারে বিভিন্ন জায়গায় শ্বাসাঘাত পড়তে পারে।

১. তু́মি কি কাল ওদের বাড়ি গিয়েছিলে? (অর্থাৎ তুমিই কি গিয়েছিলে?)

২. তুমি কি কা́ল ওদের বাড়ি গিয়েছিলে? (অর্থাৎ কালই কি গিয়েছিলে?)

৩. তুমি কি কাল ও́দের বাড়ি গিয়েছিলে? (অর্থাৎ ওদের বাড়ি গিয়েছিলে? নাকি অন্য কারও বাড়ি?)

গ্রন্থপঞ্জি

চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার—বাঙ্গালা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা ১৯৯১

—ভাষাপ্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ, ১৯৯৮

পাল, পলাশ বরন—ধ্বনিমালা বর্ণমালা, ২০০১

শ', রামেশ্বর—সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা, দ্বিতীয় খণ্ড, ১৯৮৮

সরকার, পবিত্র—বাংলা ব্যাকরণ প্রসঙ্গ, ২০০৬

সেন, সুকুমার—ভাষার ইতিবৃত্ত, ১৯৯৪

হাই, মুহম্মদ আবদুল—ধ্বনিবিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব, মুহম্মদ আবদুল হাই রচনাবলী, প্রথমখণ্ড, ১৯৯৪

Laver, John–Principles of Phonetics, 2000

২৫. বাংলা ভাষার বর্ণনামূলক ব্যাকরণ—রূপতত্ত্ব

এই বইয়ের প্রথম পর্বে অষ্টম অধ্যায়ে রূপতত্ত্ব বা morphology-র তত্ত্বের দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। সে-আলোচনায় প্রাসঙ্গিকভাবে বাংলা ভাষার উল্লেখ মাঝে মাঝে থাকলেও আলোচনার ঝোঁকটা ততটা বাংলা ভাষার উপর ছিল না, যতটা ছিল সামগ্রিকভাবে তত্ত্বের উপর। এই অধ্যায়ে আমরা বাংলা ভাষার রূপতত্ত্ব নিয়েই আলোচনা করব। বাংলা ভাষায় শব্দগঠন-পদ্ধতি, প্রত্যয়-বিভক্তি, সমাস, লিঙ্গ, বচন প্রভৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করব। শব্দ নির্মাণের পদ্ধতির সঙ্গে জড়িয়ে থাকে রূপধ্বনিতত্ত্বও অর্থাৎ যাকে morphophonemics বলা হয়। আমাদের আলোচনায় তাও উল্লিখিত হবে।

২৫.১ রূপতত্ত্বের প্রাথমিক ধারণা

সহজ কথায় ভাষায় ব্যবহৃত শব্দের নির্মাণপদ্ধতিকেই রূপতত্ত্ব বলা হয়। শব্দের দুই রূপ—ভাষায় ব্যবহৃত **শব্দ**, যা অভিধানে থাকে ; এবং বাক্যে ব্যবহৃত শব্দ যাকে **পদ** বলা হয়। **রূপতত্ত্ব হল এই দুইয়েরই নির্মাণপদ্ধতির নাম**। আগেই বলেছি, রূপতত্ত্বের ইংরেজি নাম morphology. Morph বা morpheme নিয়েই শব্দ গঠিত হয়। তাই এর নাম morphology. তাহলে জেনে নেব, কাকে বলে morph বা morpheme অর্থাৎ রূপমূল বা রূপিম। রূপমূল বা রূপিম হল এক বা একাধিক ধ্বনির সমবায়ে গঠিত ক্ষুদ্রতম অর্থপূর্ণ একক। এখানে তাহলে রূপিমের বৈশিষ্ট্য বা চরিত্র জানা যাচ্ছে—

১. রূপিম বা রূপমূল এক বা একাধিক ধ্বনির সমবায়ে গঠিত।
২. সেটি ক্ষুদ্রতম অর্থপূর্ণ একক।
৩. তাকে ভাঙলে তা আর অর্থপূর্ণ থাকে না।

এখানে শব্দ বা word এবং রূপিম বা morpheme-এর তফাত দেখে নিতে হবে। 'দুর্দম্যতা' শব্দটি নিয়েই দেখা যাক। এই শব্দটি তিনটি রূপিম নিয়ে গঠিত—দুঃ, দম্য, —তা। এর মধ্যে 'দম্য' একটি শব্দও বটে। প্রতিটি রূপিমই এক বা একাধিক ধ্বনি বা ধ্বনিমূলের (phoneme) সমবায়ে গঠিত। দুঃ-তে আছে দ্, উঃ ; দম্য-তে দ্ + অ + ম্ + ম্ + অ ; তা-তে ত্ + আ। এই রূপিমগুলিকে আর অর্থ বজায় রেখে ভাঙা যায় না।

রূপমূলের সঙ্গে দল বা সিলেবলের সম্পর্ক কী?

১. রূপমূলের অর্থ থাকবেই, কেননা সেটি অর্থপূর্ণ একক। কিন্তু দল বা সিলেবলের অর্থ না থাকতেই পারে। রূপমূলকে দৃশ্যত অর্থাৎ শব্দের চেহারায় ভাঙা হয়, দলকে

শ্রব্যগতভাবে ভাঙা হয়, তার সঙ্গে বানান বা শব্দের চেহারার কোনো সম্পর্ক নেই। 'দুর্বল' শব্দকে রূপিম ও দলে ভেঙে দেখাব—

দুর্বল—দুঃ + বল (রূপিমে বিভাজন)

দুর্বল—দুর্ + বল্ (দল বিভাজন)

২. রূপমূলের সংখ্যা আর দলের সংখ্যা পৃথক হতে পারে।

'দুর্বলতা' শব্দে রূপমূল তিনটি—দুঃ, বল, -তা।

কিন্তু দল চারটি—দুর্ + ব + লো + তা।

এ বিষয়ে অষ্টম অধ্যায় (৮.৯. পরিচ্ছেদ) দ্রষ্টব্য।

এভাবে দেখলে কোনো একটা জায়গায় পাশ্চাত্যের ধারণার সঙ্গে ভারতীয় পদতত্ত্বের ধারণা মিলে যায়। শব্দগঠনের প্রক্রিয়ায় উপসর্গ, বিভক্তি ও প্রত্যয়, সমাস ইত্যাদি পাওয়া যায়। কোনো একটা শব্দ তৈরির পিছনে প্রত্যয় থাকবেই বা বিভক্তি থাকবেই বা সমাস থাকবেই এমন নয়। যেমন **কাক, আমি** এসব শব্দে তথা রূপিমে কোনো প্রত্যয় বা বিভক্তি বা সমাস নেই। আবার **কাকের, আমটি, আমগুলি** এই তিনটি শব্দে বা পদে বিভক্তি আছে; **দুর্বলতা** শব্দে প্রত্যয় আছে। 'রূপতত্ত্ব' একটি আধুনিক পাশ্চাত্য ধারণা। একে 'পদতত্ত্ব' কেউ-কেউ বললেও আমরা মনে করি, 'রূপতত্ত্ব'-ই সঠিক পরিভাষা। কেননা রূপতত্ত্বে শুধু শব্দের গঠন ব্যাখ্যা করা হয় না, পদের গঠনও ব্যাখ্যা করা হয়। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর সুবিপুল গ্রন্থ The Origin and Development of the Bengali Language (1926)-এ Morphology অংশে শব্দ ও পদ দুইয়েরই গঠনপ্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করেছেন। আবার ১৯৩৯ সালে প্রকাশিত তাঁর 'ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ' গ্রন্থেও শব্দগঠন তথা পদগঠন অংশকে তিনি বলেছেন 'রূপতত্ত্ব'।

এখন প্রশ্ন হল, প্রাচীন সংস্কৃত ব্যাকরণেও তো শব্দগঠনের প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করা হয়েছে। তাহলে পাশ্চাত্যের ভাষাবিজ্ঞানে রূপতত্ত্বের ধারণাটি আলাদা করে প্রবর্তন বা প্রয়োগ করা হল কেন?

রূপতত্ত্বের একক হল রূপমূল বা রূপিম। আর প্রত্যেকটি রূপমূল এক বা একাধিক ধ্বনিমূল নিয়ে গঠিত। ভাষার শব্দগঠনে এবং পদগঠনে রূপমূলের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই রূপমূলের ধারণাটিই আধুনিক পাশ্চাত্য ভাষাবিজ্ঞানের অবদান।

শব্দগঠনে উপসর্গ, বিভক্তি, প্রত্যয় প্রভৃতির ভূমিকা আছে। এবং এই উপসর্গ, বিভক্তি, প্রত্যয় প্রত্যেকটিই এক বা একাধিক রূপমূল। বিভিন্ন ধরনের প্রত্যয়, উপসর্গ, পুরুষ, বচন, লিঙ্গ প্রভৃতি ব্যাকরণগত উপাদানকে নতুন শব্দ তৈরির কাজে ব্যবহার করা হয়। একটি বিশেষ্য শব্দের সঙ্গে বহুবচনের বিভক্তি চিহ্ন যোগ করে নতুন শব্দ পাওয়া যায়, আবার স্ত্রীলিঙ্গবাচক রূপমূল ব্যবহার করেও নতুন বা ভিন্ন শব্দ পাওয়া যায়। তাহলে স্ত্রীলিঙ্গবাচক

রূপমূল নতুন শব্দ গঠনের উপকরণ। এইভাবেই গয়লা এবং গয়লানি দুটি আলাদা শব্দ। কাজেই রূপতত্ত্বের প্রধান আলোচ্য বিষয় হল রূপমূলের সাহায্যে শব্দ ও পদের গঠন।

আরও একটা কথা। শব্দ তৈরির এই প্রক্রিয়ায় সবসময়েই ধ্বনিপরিবর্তনও ঘটে যায়। তাই একে রূপধ্বনিতত্ত্ব বা morphonology বা morphophonology বলা হয়।

ভাষাবিজ্ঞানীদের বিশ্লেষণে দেখা গেছে যে, শব্দগঠন ও পদগঠন দুটি ভিন্ন প্রক্রিয়া। উপসর্গ ও প্রত্যয় যোগ করে, সমাসের সাহায্যে এবং নতুন শব্দ জুড়ে শব্দ গঠিত হয় বা নতুন শব্দ গঠিত হয়। 'উন্নয়ন'-এর সঙ্গে অন্ উপসর্গ জুড়ে হল 'অনুন্নয়ন'। আবার -শীল প্রত্যয় জুড়ে হল 'উন্নয়নশীল'। কিন্তু পদের গঠনপ্রক্রিয়া কিছুটা আলাদা। পদগঠনে আমরা সাহায্য নিই বিভক্তির। 'উন্নয়নের' একটি পদ, শব্দ নয়। কেননা -এর বিভক্তি যোগ করে একটি পদ তৈরি হয়েছে। অভিধানে 'উন্নয়ন' পাই, কিন্তু 'উন্নয়নের' পাই না।

২৫.২ মুক্ত ও বদ্ধ রূপমূল

মার্কিন ভাষাবিজ্ঞানী লেনার্ড ব্লুমফিল্ড (Leonard Bloomfield) দু-রকমের রূপমূলের কথা বলেছেন—মুক্ত ও বদ্ধ, ইংরেজিতে যাকে free morph ও bound morph বলা হয়। যে-রূপমূল বাক্যে ব্যবহৃত হতে পারে না, সেগুলি বদ্ধ রূপমূল। 'জল', 'মাটি', 'বই' মুক্ত রূপমূল। অন্য দিকে, বিভক্তি, প্রত্যয়, উপসর্গ বদ্ধ রূপমূল, কেননা '-রা', 'গুলি', 'অপ-', 'উপ-' এগুলি স্বাধীনভাবে বাক্যে ব্যবহৃত হতে পারে না।

'কথাটি' পদটি (এটির সঙ্গে -টি নির্দেশক ব্যবহৃত হয়েছে বলে একে শব্দ না বলে পদ বলা হল) উদাহরণ হিসাবে দেখা যাক। এই পদের 'কথা' অংশটি একটি শব্দ এবং একটি রূপমূল। এবং যেহেতু 'কথা' রূপমূলটি নিজেই বাক্যে ব্যবহৃত হতে পারে, তাই এটিকে বলব মুক্ত রূপমূল। আর '-টি' নির্দেশক স্বাধীনভাবে বাক্যে ব্যবহৃত হতে পারে না বলে একে বলব বদ্ধ রূপমূল।

এখানে মনে রাখতে হবে যে, বদ্ধ রূপমূল স্বাধীনভাবে বাক্যে ব্যবহৃত না হলেও তারও অর্থ আছে, যেহেতু সব রূপমূলই অর্থপূর্ণ একক (unit)।

২৫.৩ শব্দ ও পদ

শব্দ ও পদের পার্থক্যের কথা এখানে একটু স্পষ্ট করে নিতে হবে। আগেই বলা হয়েছে যে, ভাষায় ব্যবহৃত বা ব্যবহারযোগ্য সমস্ত শব্দই 'শব্দ'। সেই শব্দের সঙ্গে নির্দেশক -টা, -টি) বা বিভক্তি (-কে, -দের, -গুলি) যুক্ত হলে সেগুলি আর শব্দ নয়, সেগুলি পদ। শব্দের স্থান অভিধানে, পদের স্থান বাক্যে। কোনো অভিধানে পদের স্থান হয় না। অভিধানে 'কাক' থাকবে, 'কাকের', 'কাকগুলি', 'কাকটি' থাকবে না।

আরও একটা কথা মনে রাখতে হবে। শব্দের সঙ্গে প্রত্যয়, উপসর্গ ইত্যাদি যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ তৈরি হলেও সেগুলি শব্দই হবে। পদ হবে না। 'জল' শব্দ, 'জলীয়' শব্দ,

'জলীয়তা' শব্দ। কিন্তু 'জলের', 'জলকে' পদ। ইংরেজিতে অবশ্য শব্দ ও পদের মধ্যে তফাত করা হয় না। Word বললে শব্দ ও পদ উভয়কেই বোঝাবে।

২৫.৪ বাংলা ভাষায় শব্দগঠন-প্রক্রিয়া : প্রত্যয়

বাংলা ভাষায় শব্দগঠনের বিভিন্নরকম প্রক্রিয়া আছে। এই প্রক্রিয়ার সিংহভাগই সংস্কৃত ভাষা থেকে নেওয়া। তবে বাংলা ভাষার নিজস্ব রীতিতেও শব্দ গঠিত হতে পারে। **যে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় শব্দ গঠিত হয়** সেগুলি হল—ক. **প্রত্যয় যোগ করে** ; খ. **উপসর্গ যোগ করে**; গ. **শব্দদ্বৈতের সাহায্যে** ; ঘ. **সমাসের সাহায্যে** ; ঙ. **প্রযোজকের সাহায্যে** ; চ. **ধ্বনি-পরিবর্তনের দ্বারা**। অন্য দিকে **পদগঠনের প্রক্রিয়া** হল—ক. **কারকবিভক্তি-যোগ** ; খ. **অনুসর্গ যোগ** ; গ. **ক্রিয়াবিভক্তি যোগ**।

প্রত্যয়যোগে শব্দগঠন : কৃৎপ্রত্যয়

বাংলা ভাষায় শব্দগঠনের প্রক্রিয়াগুলির মধ্যে প্রত্যয়ের যোগ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। প্রত্যয় তিনরকম—সংস্কৃত, বাংলা ও বিদেশি। সংস্কৃত ও বাংলা প্রত্যয় আবার দুইরকম—কৃৎ ও তদ্ধিত। ধাতুর সঙ্গে যে-প্রত্যয় যুক্ত হয়, তা-ই কৃৎপ্রত্যয়, এবং নামশব্দের সঙ্গে অর্থাৎ বিশেষ্যজাতীয় শব্দের সঙ্গে যে-প্রত্যয় যুক্ত হয় তা-ই তদ্ধিত প্রত্যয়।

বহু সংস্কৃত কৃৎপ্রত্যয় যোগ করে শব্দ তৈরি হয়। সেসব শব্দ বাংলা ভাষারও শব্দ। সংস্কৃতের অঙ্, অচ্, অণ্, অপ্ কঞ্, খচ্, খল্, খশ্, ঘঞ্ প্রভৃতি কৃৎপ্রত্যয়ের নাম বিদ্যাসাগর মহাশয় বদলে **-অ প্রত্যয়** করেছেন। সেই -অ-প্রত্যয়ান্ত কতকগুলি শব্দের দৃষ্টান্ত হল—চোর (√চুর্ + অ), জয় (√জি + অ), ভয় (√ভী + অ) ইত্যাদি। **-অৎ প্রত্যয়ান্ত** শব্দ হল মহৎ (√মহ্ + অৎ), জ্বলৎ (√জ্বল্ + অৎ)। **অন-প্রত্যয়ান্ত** শব্দ হল সাধন (সাধ্ + অন), শয়ন (√শী + অন), নয়ন (√নী + অন) ইত্যাদি। **অনীয়-প্রত্যয়ান্ত** শব্দ হল করণীয় (√কৃ + অনীয়), পানীয় (√পা + অনীয়), দর্শনীয় (√দৃশ্ + অনীয়)।

এছাড়া বহমান, শয়ান, আসীন, সহিষ্ণু, সৃষ্ট, লব্ধ, দুষ্ট, দগ্ধ, শ্রোতব্য, জ্ঞাতব্য, দাতা, কর্তব্য, উড্ডীন, মগ্ন, ভগ্ন, শীর্ণ, লীন, পূর্ণ, গ্রথিত, নত, গত, শ্রুত, জাত, প্রীত, শান্ত, শমিত প্রভৃতি অসংখ্য তৎসম শব্দ সংস্কৃত কৃৎ প্রত্যয়ের যোগে গঠিত হয়েছে।

বাংলারও নিজস্ব অ-প্রত্যয় আছে, যার যোগে বাংলা শব্দ গঠিত হয়। আসলে অসংস্কৃত ধাতুর সঙ্গে -অ প্রত্যয় যুক্ত হয়ে বিশেষ্যবাচক শব্দ গঠিত হয়। যেমন—খোঁজ (√খুঁজ্ + অ), ডুব (√ডুব্ + অ) ইত্যাদি। **বাংলা -অন প্রত্যয়** যোগ করে তৈরি হয়েছে বাঁচন, ঝাড়ন, ফলন, ঝুলন প্রভৃতি শব্দ। **-অন + আ** (-অনা) যোগ করে পাওয়া গেছে কান্না (কাঁদ্ + না), বাজনা, বাটনা, মাগনা, খেলনা, পাওনা-র মতো শব্দ।

বাংলা **-অন্ত প্রত্যয়** যোগে গঠিত হয়েছে ফুটন্ত, পড়ন্ত, ঝুলন্ত, বাড়ন্ত, ছুটন্ত, ভাসন্ত, ঘুমন্ত প্রভৃতি শব্দ। কখনো-কখনো এসব **শব্দে -ই যোগ করে স্ত্রীলিঙ্গবাচক শব্দ** পাওয়া যায়—দেখুন্তি, নাচুন্তি ইত্যাদি।

-আ প্রত্যয় একটি বাংলা কৃৎ প্রত্যয়। শোয়া, করা, খাওয়া, যাওয়া, শোনা, ধোয়া, ভাবা প্রভৃতি শব্দ -আ প্রত্যয়ের যোগেই পাওয়া গেছে। -আ প্রত্যয়ান্ত শব্দকে বিশেষ্য ও বিশেষণ দু-ভাবেই ব্যবহার করা যায়। **আমার খাওয়া হয়নি** বাক্যে 'খাওয়া' বিশেষ্য। আবার **পোকায়-খাওয়া আম**-এ 'খাওয়া' বিশেষণ।

এছাড়া বাংলা কৃৎপ্রত্যয়ের মধ্যে আরও আছে **-আই, -আন, -আনি প্রত্যয়**। এসব প্রত্যয়ের যোগে পাওয়া যায় চোরাই, সাফাই, চালান, চালানি, ধোলাই, বাছাই, শুনানি, চেঁচানি, উড়ানি, জ্বালানি, ভাঙানি ইত্যাদি শব্দ।

বিশেষত বাংলা কৃৎপ্রত্যয় ও কৃৎপ্রত্যয়ান্ত শব্দ সম্বন্ধে দুটি কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হবে। ১. ধাতুর সঙ্গে কৃৎপ্রত্যয় যুক্ত হয়ে যেসব শব্দ তৈরি হয়েছে সেগুলি বিশেষ্য বা বিশেষণবাচক। আবার সেগুলিকে ক্রিয়াবিশেষ্য হিসাবেও ব্যবহার করা যায়। যেমন চেঁচানো, ঘুমানো, জাগানো। ২. সব ক্ষেত্রে যে কৃৎপ্রত্যয়গুলি ধাতুর সঙ্গেই প্রযুক্ত হয়েছে তা নয়। কোনো-কোনো ক্ষেত্রে নামধাতুর সঙ্গেও কৃৎপ্রত্যয় যুক্ত হয়। সেক্ষেত্রে প্রক্রিয়াটি তদ্ধিত প্রত্যয়যোগের মতো।

প্রত্যয়যোগে শব্দগঠন : তদ্ধিত প্রত্যয়

বাংলা ভাষায় কৃৎপ্রত্যয়ান্ত শব্দের তুলনায় তদ্ধিতান্ত শব্দের সংখ্যা অনেকই বেশি। তার কারণ বাংলায় ধাতুর চেয়ে নামপ্রকৃতির সংখ্যা বেশি। বাংলায় নানান উৎস থেকে তদ্ধিত প্রত্যয়গুলি এসেছে। প্রত্নবাংলা বা প্রাচীন বাংলা থেকে পাওয়া গেছে **আদরার্থক -উ প্রত্যয়**। সুনীতিকুমার তাঁর 'বাঙ্গালা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা' গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে 'কানু' শব্দটি এই **আদরার্থক তদ্ধিত প্রত্যয়ান্ত** শব্দ। সংস্কৃত থেকে এবং কোনো-কোনো ক্ষেত্রে বিদেশি **তদ্ধিত প্রত্যয়ও** এসেছে বাংলায়। বাংলায় **দেশজ তদ্ভব** বা **প্রাকৃতজ তদ্ধিত** প্রত্যয়ের সংখ্যাও কম নয়।

বাংলায় প্রচলিত তৎসম শব্দের অনেকগুলিই **সংস্কৃত তদ্ধিতান্ত** শব্দ। সংস্কৃত তদ্ধিত প্রত্যয়ের মধ্যে ১. -অ (একাদশ, দ্বাদশ, বৈমাত্র, রাঘব, পৌত্র, মানব) ; ২. -অক (শিক্ষক, মূলক) ; ৩. -অঠ (কর্মঠ) ; ৪. -অস্ (অধঃ, পুরঃ) ; ৫. -আয়ন (দ্বৈপায়ন) ; ৬. -আল (রসাল, বাচাল) ; ৭. -ই (দাশরথি, সুগন্ধি) ; ৮. -ইক (কালিক, বৈদিক, ধার্মিক, মৌখিক); ৯. -ইত (সীমিত, বিবাহিত) ; ১০. -ইম (পশ্চিম, আদিম) ; ১১. -ঈ (রজকী, পুত্রী, ব্রাহ্মণী) ; ১২. -এয় (গাঙ্গেয়, কৌন্তেয়) ; ১৩. -ক (শূদ্রক, অপুত্রক) ; ১৪. -তা (শুদ্ধতা, সাধুতা, চঞ্চলতা)—ইত্যাদি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বাংলা তদ্ধিত প্রত্যয়গুলিও নগণ্য নয়। সেগুলির মধ্যে আছে ১. -আ প্রত্যয়—চোরা, বাঘা, জলা, হাতা, রোগা, নোনা ইত্যাদি শব্দ ; ২. -অট বা -ট, প্রত্যয়। এটি স্বরসংগতির ফলে -টা, -টিয়া > -টে হয়ে যায় (দাপট, ঝাপট, ঝাপটা, নেওটা, পাঁশুটে, ভাড়াটে (< ভাড়াটিয়া, ঝগড়াটে, ঘোলাটে) ; ৩. -আই প্রত্যয় (কানাই, বলাই, চোরাই, জগাই, বড়াই) ;

৪. -ই প্রত্যয় (<ঈ) (বাঙালি, পশমি, শয়তানি, বিলাতি) ; ৫. -আম বা -আমি বা -আমো (বাঁদরামি, বাঁদরামো ; ন্যাকামি, ছ্যাবলামি, ঘরামি) ; ৬. -আনো (জুতানো, পেটানো, জমানো) ; ৭. -আর (ভাঁড়ার, দোহার, চামার) ; ৮. -আরি (পূজারি, পিয়ারি, ভিখারি)। এই প্রত্যয়টি প্রসারিত হয়ে -উরি বা -ওরি হয় (ধুনুরি, ডুবুরি) ; ৯. -আলি, -উলি) (বাড়িওয়ালি, বাড়িউলি, রুপালি, চৈতালি, পৌষালি) ; ১০. -ওয়াল, -ওয়ালা, -ওলা (রিকশাওয়ালা, টাঙাওয়ালা, পাহারাওয়ালা, ঘড়িয়াল, কোটাল) ; ১১. -ইয়া, -এ (শহরিয়া > শহুরে, কাঁদুনে, গাঁইয়া, বাদুলে); ১২. -ভর, -ভরা (জীবনভর, রাতভর) ; ১৩. -নি, -আনি, -ইনি, -উনি (কামারনি, স্যাকরানি, গয়লানি, নাতনি, মেথরানি, সাপিনি) ইত্যাদি।

এখানে আমাদের লক্ষ করতে হবে যে, উপরে যেসব বাংলা তদ্ধিত প্রত্যয়ের উল্লেখ করা হয়েছে, তার মধ্যে কতকগুলি একসময় দীর্ঘ-ঈ-কারান্ত বানানে লেখা হত। যেমন গয়লানী, সাপিনী, নাতনী, গোলাপী, ইংরেজী, বাঙালী ইত্যাদি। এবং প্রত্যয়ের নামেও ঈ লেখা হত। কিন্তু আধুনিক বাংলা ভাষার বানাননীতি অনুসারে অতৎসম বা অসংস্কৃত শব্দে দীর্ঘ স্বরের ব্যবহার বর্জিত হয়েছে। তাই পূর্বতন -ঈ বা -ঈকারের বদলে সমস্ত বাংলা প্রত্যয়কে আমরা যথাক্রমে -ই এবং -ইকার দিয়ে লেখাই সমীচীন মনে করি।

বিদেশী তদ্ধিত প্রত্যয়

বাংলা ভাষার তদ্ধিত প্রত্যয়ের তৃতীয় **উৎস বিদেশি ভাষার প্রত্যয়**। দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতক থেকে আরবি-ফারসি-তুর্কি প্রভাব বাংলায় দেখা যেতে থাকে। বাংলায় মূলত ফারসি **তদ্ধিত প্রত্যয়ই প্রধান**। মনে রাখব যে, কোনো-কোনো ফারসি প্রত্যয় অ-ফারসি অর্থাৎ ইংরেজি বা অন্য ভাষার শব্দেও প্রযুক্ত হয়ে থাকে। বাংলায় প্রচলিত ফারসি তদ্ধিত প্রত্যয়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—

১. -আন, -ওয়ান (গাড়োয়ান, কোচওয়ান > কোচোয়ান, দারোয়ান < দরওয়ান, পালোয়ান < পহ্ল্ওয়ান) ;
২. -আনা, -য়ানা, -আনি (সাহেবিয়ানা, বাবুয়ানি, ঘরানা, হিন্দুয়ানি) ;
৩. -খানা (ডাক্তারখানা, বৈঠকখানা, ছাপাখানা, পায়খানা, শুঁড়িখানা, মুদিখানা, তোশাখানা, গোসলখানা)
লক্ষণীয়, এখানে ডাক্তার একটি ইংরেজি ভাষার শব্দের তদ্ভব (ডক্টর > ডাক্তার)। তারই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ফারসি -খানা প্রত্যয়।
৪. -খোর (নেশাখোর, গুলিখোর, চশমখোর, ঘুসখোর, গাঁজাখোর, লাথখোর) ;
৫. -গর, (কারিগর, বাজিগর, সওদাগর, জাদুগর) ; উল্লেখযোগ্য যে, বাজিগর ও জাদুগর-এর বদলে বাংলায় চলে যথাক্রমে বাজিকর ও জাদুকর।
৬. -গিরি (মুটেগিরি, কেরানিগিরি, বাবুগিরি, পান্ডাগিরি, নেতাগিরি, দাদাগিরি) ;
৭. -চা, -চি (মশালচি, তবলচি, ধুনুচি (< ধুনাচি), বাগিচা, বাবুর্চি, কলমচি) ;

৮. -তর, -তরো (এমনতরো, কেমনতরো, গুরুতর) ;
৯. -দার (মশালাদার, মজাদার, বাজনদার (< বাজনাদার), জমিদার, নজরদার, তরফদার, হাবিলদার, মজুমদার, চড়নদার, সমঝদার, জোয়ারদার ; পাওনাদার, মালদার) ;
১০. -দান, -দানি (আতরদান, দোয়াতদানি, কলমদান, পিকদানি) ;
১১. -নবিশ (নকলনবিশ, হিসাবনবিশ)
১২. -বাজ, -বাজি (ধড়িবাজ, চালবাজ, চালবাজি, ধোঁকাবাজ, ফেরেপ্‌বাজ ; ফেরেব্বাজ, গলাবাজি)
১৩. -সই (< সহি) (জুতসই, টেকসই, মাপসই, দশাসই, চলনসই, লাগসই, মানানসই)
১৪. -স্তান (তুল. সং. -স্থান) (পাকিস্তান, তুর্কিস্তান, আফগানিস্তান)।

২৫.৫ উপসর্গযোগে শব্দগঠন

প্রত্যয়ের মতো **উপসর্গ যোগ** করেও বহু শব্দ গঠিত হয়। উপসর্গের ইংরেজি নাম prefix অর্থাৎ যা শব্দের গোড়ায় বসে। ইংরেজিতে প্রত্যয়কে suffix বলা হয়। Prefix ও suffix এই দুটিকে একত্রে affix বলা হয়। উপসর্গও বস্তুতপক্ষে প্রত্যয়ই, **আদ্যপ্রত্যয়**। সংস্কৃত ভাষায় **কুড়িটি উপসর্গ** আছে। সেগুলি বাংলাতেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। প্র— (প্রভাব, প্রকার), পরা—(পরাজয়), অপ—(অপকার, অপসারণ), পরি—(পরিকীর্ণ), সম্—(সম্মান), নিঃ— (নিরন্তর, নীরব), অভি—(অভিযোজন, অভিমান) ইত্যাদি।

আবার সংস্কৃত উপসর্গের বাইরে **বাংলার কয়েকটি নিজস্ব উপসর্গও** আছে। 'নিজস্ব' কথাটাকে একটু শিথিলভাবে গ্রহণ করতে হবে। বাংলা উপসর্গগুলির মধ্যে কতকগুলি সংস্কৃত থেকে পাওয়া, কতকগুলি বিদেশি উৎসের উপসর্গ, কতকগুলি প্রাকৃতের মধ্য দিয়ে বাংলায় এসেছে।

বাংলা উপসর্গের মধ্যে আছে—

১. অ-, অনা-, আ- (অকাজ, অবেলা, অকেজো ; অনামুখো, অনাসৃষ্টি ; আকথা, আকাচা, আকাল) ;
২. কু- (কুকথা, কুকাজ, কুডাক) ;
৩. নি- (নিখাগি, নিখুঁত, নিখোঁজ, নিলাজ) ;
৪. পাতি- (পাতিলেবু, পাতিহাঁস, পাতিকাক) ;
৫. বি- (বিভুঁই, বিনামা) ;
৬. ভর-, ভরা- (ভরসাঁঝ, ভরপেট, ভরাযৌবন, ভরসন্ধ্যে) ;
৭. স- (সজোরে, সপাটে, সলাজ) ;
৮. হা- (হাঘরে, হাভাত)।

বিদেশী উপসর্গও আছে

১. গর- (গরহাজির, গরমিল, গররাজি) ;

২. আম- (আমদরবার, আমজনতা) ;
৩. কার- (কারবার, কারচুপি) ;
৪. খাস- (খাসতালুক ; খাসকামরা, খাসদখল) ;
৫. খুশ-, খোশ- (খুশখবর, খোশমেজাজ, খোশগল্প) ;
৬. না- (নাচার, নামঞ্জুর) ;
৭. নিম- (নিমরাজি, নিমখুন) ;
৮. ফি- (ফিবছর) ;
৯. ব- (বমাল, বকলম) ;
১০. বদ- (বদমেজাজ, বদরাগি)
১১. বে- (বেনাম, বেবন্দোবস্ত, বেখেয়াল, বেচাল, বেপাত্তা) ;
১২. হর- (হরবোলা, হররোজ, হরদম) ;
১৩. ফুল- (ফুলহাতা, ফুলবাবু) ;
১৪. সাব- (সাবজজ, সাবডেপুটি) ;
১৫. হাফ- (হাফপ্যান্ট, হাফ আখড়াই, হাফহাতা) ;
১৬. হেড- (হেডস্যার, হেডমিস্ত্রি, হেডপণ্ডিত)।

২৫.৬ শব্দের দ্বিত্ব করে শব্দগঠন

অনেক বছর আগে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন যে, বাংলা ভাষায় শব্দগঠনের একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ হল শব্দদ্বৈত বা শব্দের দ্বিরুক্তি। ১৩০৭ বঙ্গাব্দে তাঁর 'বাংলা শব্দদ্বৈত' প্রবন্ধটিকে এ-বিষয়ে পথিকৃৎ বলা চলে। তার পর থেকে বাংলা ভাষার এই বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করেছেন সুনীতিকুমার ও মণীন্দ্রকুমার ঘোষ।

শব্দদ্বৈত করে শব্দগঠন হয় নানাভাবে, এবং নানান অর্থে সেসব শব্দ ব্যবহৃত হয়। **শব্দদ্বৈত** সাধারণত **তিনরকমের** হয়—এক. একই শব্দের পুনরুক্তির দ্বারা; দুই. প্রথম শব্দের সমার্থক বা প্রায় সমার্থক শব্দ যুক্ত করে; এবং তিন. ধ্বন্যাত্মক অনুগামী শব্দ বা tag word জুড়ে।

বিশেষ্য বা বিশেষণবাচক শব্দের দ্বিত্ব করে বহুত্ব, পূর্ণতা বা পৌনঃপুনিকতা বোঝাতে শব্দদ্বৈত ব্যবহৃত হয়। যেমন—বছর-বছর, মুঠো-মুঠো, হাঁড়ি-হাঁড়ি, ঝুড়ি-ঝুড়ি। এসব দ্বিরুক্ত শব্দ ব্যবহৃত হয় পৌনঃপুনিকতা বা বারাংবারতা বোঝাতে বা আতিশয্য বোঝাতে।

আবার স্বল্পতা, মৃদুতা, অসম্পূর্ণতা বা সাদৃশ্য বোঝাতে ব্যবহৃত দ্বিরুক্ত শব্দ হল—কাঁদো-কাঁদো, মরোমরো, জ্বরজ্বর (ভাব), হাসি হাসি (মুখ), শীতশীত (ভাব)।

এছাড়া আছে যাকে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন 'অনির্দিষ্ট-প্রভৃতি-বাচক' শব্দদ্বৈত—বইটই, কাপড়চোপড়, জলটল, ফলটল।

উপরের উদাহরণে বিশেষ্য ও বিশেষণের দ্বিত্ব দেখা গেল। **অসমাপিকা ক্রিয়ার দ্বিত্বও করা** হয়—দেখতে দেখতে সন্ধ্যে হয়ে এল, নেচে নেচে চলল।

একই শব্দ পরপর দুবার উক্ত বা উচ্চারিত হলে যে-শব্দদ্বৈত হয়, তাতে ধ্বনিগত পরিবর্তন হয় না, বলাই বাহুল্য। কিন্তু যে-শব্দদ্বৈতে দ্বিতীয় শব্দটি প্রথমটির সমার্থক বা প্রায়-সমার্থক অনুগামী শব্দ, অথচ ঈষৎ পরিবর্তিত, তাতে ধ্বনিপরিবর্তন লক্ষণীয়। লেখালিখি, দেখাদেখি, ওঠাউঠি প্রভৃতি শব্দের ক্ষেত্রে **স্বরের উচ্চতাসাম্য** বা vowel height assimilation বা যাকে কেউ-কেউ স্বরসংগতি বলেন, তাই ঘটছে। দ্বিতীয় সিলেবলের ঊর্ধ্ব স্বরধ্বনির প্রভাবে প্রথম সিলেবলের নিম্ন স্বরধ্বনি ঊর্ধ্ব স্বরধ্বনির কাছে চলে যেতে চায় বা ঊর্ধ্ব স্বরধ্বনিতে পরিণত হয়। এটি হল **রূপধ্বনিতত্ত্ব** বা morphophonology-র অন্তর্গত বিষয়। একটি সহজ দৃষ্টান্ত দেখা যাক। দেখা > দ্যাখা = দ্যাখ্ + আ। কিন্তু দ্যাখ্ + ই = দেখি। 'আ' একটি নিম্ন স্বরধ্বনি। তার জন্য প্রথম সিলেবলের 'দ্যা-' (অ্যা) নিম্নই রইল ('অ্যা' একটি নিম্ন স্বরধ্বনি)। কিন্তু দ্বিতীয় সিলেবলে 'ই' আছে বলে প্রথম সিলেবলের 'দ্যা'- 'দে'-তে পরিণত হল। কেননা 'ই' একটি ঊর্ধ্ব স্বরধ্বনি। 'দ্যা'-হল 'দে'। এ-ও উর্ধ্ব বা ঊর্ধ্বমধ্য স্বরধ্বনি। এইভাবে শব্দগঠনে যে ধ্বনিপরিবর্তন হল তাকেই **রূপধ্বনিগত পরিবর্তন** বা morphophonological change বলা হয়।

২৫.৭ প্রযোজকের সাহায্যে শব্দগঠন

বাংলা ভাষায় শব্দ গঠনের আর একটি প্রক্রিয়া হল **প্রযোজক ক্রিয়ার ব্যবহার**। কর্ + আ এইভাবে পাওয়া গেল *করা* ক্রিয়া। এইভাবেই পেলাম *যাওয়া, খাওয়া, দেওয়া* প্রভৃতি ক্রিয়া। এবার এদের সঙ্গে -নো বা -আনো প্রযোজক যুক্ত হলে পাওয়া যায় *করানো, খাওয়ানো, যাওয়ানো, দেওয়ানো* প্রভৃতি প্রযোজক ক্রিয়া। স্বভাবতই *খাওয়া* আর *খাওয়ানো* দুটি ভিন্ন শব্দ, ভিন্ন তাদের অর্থ। *খাওয়ানো, দেখানো, করানো* প্রভৃতি হল প্রযোজক ক্রিয়ার আভিধানিক রূপ। বাক্যে ব্যবহৃত হতে গেলে এদের সঙ্গে পুরুষ-বিভক্তি, ক্রিয়ার কালরূপ প্রভৃতি যোগ করতে হয়। খাওয়াই, খাওয়াতাম ; দেখালাম, দেখাব, দেখাই ইত্যাদি।

২৫.৮ সমাসের দ্বারা শব্দগঠন

নতুন শব্দ গঠন করায় প্রত্যয়ের পরেই **সমাসের ভূমিকা** গুরুত্বপূর্ণ। দুটি বা তার বেশি শব্দকে জুড়ে অন্য একটি শব্দ গঠন করার প্রক্রিয়াকেই সমাস (compounds) বলা হয়। দুই বা ততোধিক শব্দ জোড়া হয় সন্ধিতেও। তবে সন্ধিতে প্রকৃতপক্ষে শব্দ জোড়া হয় না, জোড়া হয় একটি শব্দের শেষ ধ্বনির সঙ্গে অন্য একটি শব্দের প্রথম ধ্বনিকে। সন্ধিতে কোনো নতুন শব্দ তৈরি হয় না, সমাসে নতুন শব্দ তৈরি হয়।

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বাংলা সমাসগুলিকে তিনটি শ্রেণিতে বিভক্ত করেছেন— **সংযোগমূলক** বা copulative (যেমন দ্বন্দ্ব সমাস) ; **ব্যাখ্যানমূলক** বা **আশ্রয়মূলক** (তৎপুরুষ, কর্মধারয়, দ্বিগু) ; এবং **বর্ণনামূলক** (বহুব্রীহি)। প্রাদি, নিত্য ও অব্যয়ীভাব

সমাসকে তিনি ব্যাখ্যানমূলক বা আশ্রয়মূলক শ্রেণির মধ্যে গণ্য করেছেন। তবে কোনো-কোনো ভাষাতাত্ত্বিক অবশ্য ব্যাখ্যানমুলকের চেয়ে আশ্রয়মূলক নামটিই পছন্দ করেন। এই ধরনের সমাসে একটি শব্দ আর একটি শব্দের অধীন বা 'আশ্রিত' হয়ে যায় বলে আশ্রয়মূলক নামটি তাঁরা পছন্দ করেন। রুশ বিশেষজ্ঞ বিকোভা (E.M. Bykova) ঠিক এই কথাই বলতে চেয়েছেন। তাঁর মতে এগুলি হল 'compounds formed by subordination'.

সংযোগমূলক সমাসে অর্থাৎ **দ্বন্দ্ব সমাসে** দুটি বা তার বেশি ভিন্নার্থক বা ভিন্নজাতীয় শব্দ জোড়া হতে পারে (যেমন বাবা-মা, আকাশপাতাল, হাতাখুন্তি) ; আবার সমার্থক শব্দও জোড়া যেতে পারে (যেমন কাগজপত্র) ; অনুগামী শব্দও জোড়া যেতে পারে (যেমন বাসনকোসন, কাপড়চোপড়)। বাংলা শব্দদ্বৈতের একটা বড়ো অংশই দ্বন্দ্ব সমাসের উদাহরণ। দ্বন্দ্ব সমাসে যে শব্দগুলি জোড়া হচ্ছে তাদের অর্থাৎ সমস্যমান পদগুলির গুরুত্ব যে সমান তা না হতেও পারে। মা-বাবা, ভাইবোন এসব ক্ষেত্রে দুটিরই সমান গুরুত্ব। কিন্তু অনুগামী শব্দের গুরুত্ব অপেক্ষাকৃত কম। দোকানপাট, কাপড়চোপড়, চুরিচামারি প্রভৃতি শব্দে দ্বিতীয় পদটির অর্থ 'অনুরূপ বস্তু'। ওই পদটি প্রথম পদের অর্থকে প্রসারিত করছে।

যাকে **আশ্রয়মূলক সমাস** (subordinative) বলা হচ্ছে, তার মধ্যে আছে নানা ধরনের তৎপুরুষ, কর্মধারয়, দ্বিগু, অব্যয়ীভাব, নিত্য সমাস ও প্রাদি সমাস। এইসব সমাসের সাহায্যে যেসব শব্দ আমরা পাই তার কতকগুলি হল—মনগড়া, বিলেতফেরত, পুথিগত, যথাসাধ্য, বর্ণচোরা, ঢেঁকিছাঁটা, মড়াকান্না, ঘরপালানো, গাছপাকা, ভুঁইফোঁড়, ক্ষণস্থায়ী, কীটদষ্ট, কণ্টকাকীর্ণ, ধানখেত, কাঁচকলা, ঘননীল, গ্রামান্তর, পঞ্চবটী, সপ্তাহ, মহারানি, হররোজ, অনুতাপ প্রভৃতি অজস্র শব্দ।

বর্ণনামূলক সমাস বলতে মূলত বহুব্রীহিকে ধরা হয়। তবে বহুব্রীহি সমাসের বর্ণনামূলক নাম খুব সংগত নয়। এই নামে বহুব্রীহি সমাসের চরিত্র যথাযথভাবে প্রকাশ পায় না। ইংরেজি পরিভাষার descriptive compound বলার কারণেই বাংলায় এর নাম বর্ণনামূলক সমাস। বিকোভা একে বলেছেন Secondary Descriptive Compounds. এই secondary বা গৌণ কথাটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বিকোভা বহুব্রীহি সমাসকে বলেছেন collateral subordination বা সমান্তরাল অধীনতা। বহুব্রীহি সমাসে সমস্যমান পদগুলির অর্থ প্রধান নয়, বরং এই সমাসে '**সমাসবহির্ভূত পদের প্রাধান্য**' দেখা যায়—বলেছেন পবিত্র সরকার। বহুব্রীহি সমাসান্ত শব্দ সাধারণত বিশেষণ পদে ব্যবহৃত হয়—লালপেড়ে, ত্রিশূলপাণি, কমলাক্ষ, বিপত্নীক। অবশ্য বাংলা ভাষায় বিশেষণ পদ প্রায়ই বিশেষ্য হিসাবেও ব্যবহারযোগ্য। আবার ব্যতিহার বহুব্রীহি সমাসে সমাসান্ত শব্দটি বিশেষ্যই বটে—হাতাহাতি, লাঠালাঠি।

২৫.৯ ধ্বনিপরিবর্তনের ফলে নতুন শব্দের সৃষ্টি

রূপতত্ত্বের আলোচনায় রূপধ্বনিতত্ত্বও অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক একটি বিষয়। শব্দগঠন প্রক্রিয়ায় যখন ধ্বনিপরিবর্তন ঘটে তখন সেই প্রক্রিয়াকে **রূপধ্বনিগত পরিবর্তন** বলা হয়। অন্যভাবে বলা যায়, ধ্বনিপরিবর্তন করেও শব্দগঠন করা যায়, করা হয়। ধ্বনিপরিবর্তনের ফলে শব্দগঠনের চারটি প্রক্রিয়ার কথা এখানে বলা প্রয়োজন—ক. ধ্বনিলোপের ফলে শব্দগঠন, খ. অনুকার শব্দের দ্বারা নতুন শব্দ গঠন, এবং গ. ধ্বনি যোগ করে নতুন শব্দ গঠন। ঘ. স্বরের উচ্চতাসাম্যের ফলে শব্দসৃষ্টি।

ক. ধ্বনিলোপের দ্বারা শব্দগঠন

একটি শব্দের আদ্যধ্বনি মধ্যধ্বনি ও অন্ত্যধ্বনির লোপ হলে নতুন শব্দ তৈরি হতে পারে। ধ্বনিলোপের নাম haplology. যখন আদ্যধ্বনি লোপ পায় তখন তাকে aphesis বলা হয়। আরও নির্দিষ্ট করে বলতে গেলে, শব্দের গোড়ার সিলেবল লোপ পাওয়াকেই aphesis বলা হয়। অলাবু থেকে লাউ, অতসী থেকে তিসি, আছিল থেকে ছিল **আদ্যধ্বনিলোপের** দৃষ্টান্ত।

মাঝের ধ্বনির লোপকে syncope বলা হয়। এই প্রবণতার ফলে কাঁচাকলা থেকে কাঁচ্কলা, মিশিকালো থেকে মিশকালো, ঘোড়াসওয়ার থেকে ঘোড়সওয়ার, বড়দাদা থেকে বড়দা, মেজদাদা থেকে মেজদা।

শেষ বা অন্ত্য ধ্বনির লোপকে বলা হয় apocope. এই প্রবণতার জন্য পাওয়া গেছে তা (তাপ থেকে), না (নাও থেকে), ভিত (ভিত্তি থেকে)।

খ. অনুকার শব্দ দিয়ে নতুন শব্দ গঠন

সেইসব শব্দকে অনুকার শব্দ বলব যেগুলি দুটি পদ নিয়ে তৈরি এবং সেই দুটি পদের দ্বিতয়টি প্রথমটির ধ্বনির অনুকার বা অনুকৃতি। দ্বিতীয় অংশটি আপাতদৃষ্টিতে অর্থহীন হলেও অর্থপূর্ণ। কেননা, দ্বিতীয় অংশের জন্যই পুরো শব্দটি নতুন অর্থ নতুন মাত্রা পেয়ে যায়—খেলাটেলা, জলটল, ফলটল, পুতুলটুতুল। খেলা আর খেলাটেলা হুবহু এক নয়। জল আর জলটল সমার্থক নয়। এইভাবে অনুকার শব্দ দিয়ে বাংলা ভাষায় বহু শব্দ তৈরি হয়।

গ. ধ্বনি যোগ করে শব্দ গঠন

ধ্বনিপরিবর্তন সচেতন ব্যাপার নয়। উচ্চারণের সৌকর্য ও সরলতা সম্পাদনই ধ্বনিপরিবর্তনের কারণ এবং সে পরিবর্তন ঘটে যায় স্বাভাবিক ভাবেই। ধ্বনিলোপ যেমন শব্দ তৈরির একটি প্রক্রিয়া, তেমনি **ধ্বনির যোগও** নতুন শব্দ তৈরি করে। ধ্বনিতত্ত্বে এই প্রক্রিয়াকে anaptyxis বা **স্বরাগম** বলা হয়। স্বরাগম হতে পারে শব্দের আদিতে, মধ্যে ও শেষে। স্কুল > ইস্কুল, গ্লাস > গেলাস, শ্রী > ছিরি ইত্যাদি শব্দে স্বরাগমের দৃষ্টান্ত দেখতে পাই।

ঘ. ধ্বনিতত্ত্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকরণ হল vowel height assimilation বা **স্বরের উচ্চতাসাম্য**। এর উদাহরণ আমরা ২৫.৬ পরিচ্ছেদে দেখেছি। আরও স্পষ্ট করে বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে।

প্যাঁচা থেকে পেঁচি, দেশি থেকে দিশি, ঠ্যালা থেকে ঠেলি, বিলেতি থেকে বিলিতি, ইংরেজি থেকে ইংরিজি, পোঁটলা থেকে পুঁটলি, ঝোল থেকে ঝুলি প্রভৃতি উদাহরণে স্বরের উচ্চতাসাম্যের নিয়মে দেখা যাচ্ছে যে, এ > ই, ও > উ, অ্যা > এ এই পরিবর্তন হচ্ছে এবং সেই পরিবর্তনের ফলে তৈরি হচ্ছে নতুন শব্দ। যদি শব্দের দ্বিতীয় দলে বা সিলেবলে ঊর্ধ্ব স্বরধ্বনি থাকে, তবে প্রথম সিলেবলের অনূর্ধ্ব স্বরধ্বনি ঊর্ধ্ব-তে বা ঊর্ধ্ব-মধ্যতে পরিণত হয়। এই নিয়মকেই স্বরের উচ্চতাসাম্য বলে।

২৫.১০ বাংলা ভাষায় পদগঠন প্রক্রিয়া

আগেই বলা হয়েছে যে, বাংলা ভাষায় শব্দগঠন ও পদগঠন দুটি ভিন্ন প্রক্রিয়া। শব্দের স্থান অভিধানে, পদের স্থান বাক্যে। শব্দ কীভাবে গঠিত হয় তা দেখা গেছে উপরে ২৫.৪ থেকে ২৫.৯ পরিচ্ছেদে। এবারে দেখা যাক কীভাবে পদ গঠিত হয়। প্রধানত বিভক্তি যোগ করে **পদ গঠিত** হয়।

বিভক্তি দুই রকমের—কারক-বিভক্তি ও ক্রিয়া-বিভক্তি। কারক-বিভক্তিকে ইংরেজিতে case suffix বলা হয়, ক্রিয়াবিভক্তি conjugational suffix নামে পরিচিত।

কারক-বিভক্তি

বাংলায় পাঁচটি কারক-বিভক্তি হতে পারে—কর্তৃকারক, কর্মকারক, করণ কারক, সম্বন্ধ ও অধিকরণ। কর্তৃকারকের কোনো বিভক্তিচিহ্ন নেই, কাজেই বলা হয়ে থাকে যে কর্তৃকারকে শূন্য বিভক্তি হয়। তবে কর্তৃকারকে অধিকরণের -এ বা -য় বা -তে বিভক্তি ব্যবহৃত হয়। **পাগলে কী না বলে, ছাগলে কী না খায়, বাঘে ধরেছে**। পাগলে, ছাগলে, বাঘে এসব ক্ষেত্রে কর্তৃকারকে -এ বিভক্তি যোগ হয়েছে।

কর্মকারকে -কে বিভক্তিই বেশি ব্যবহৃত হয়। অবশ্য কবিতায় বা উপভাষায় -রে ব্যবহৃত হয়—**ছেলেকে মেরো না, তাকে ডাকো**। আবার -য় বিভক্তিও ব্যবহৃত হয় কোনো-কোনো ক্ষেত্রে—**'যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ুক, আমি তোমায় ছাড়ব না, মা'**।

করণ কারকের বিভক্তি হল কয়েকটি অনুসর্গ 'দ্বারা', 'দিয়ে' বা 'দিয়া', 'কর্তৃক'। **আমাকে দিয়ে এ-কাজ হবে না।**

আমাকে **দিয়ে** এ-কাজ হবে না
আমার **দ্বারা** এ-কাজ হবে না
বাড়ি **থেকে** বেরিয়ো না

অপাদানের কোনো বিভক্তি নেই, অনুসর্গই আছে কেবল। সম্বন্ধ পদের বিভক্তি -র, -এর—পাঁঠার মাংস, বৃষ্টির জল। অধিকরণের বিভক্তি -এ, -তে, -য়। দৃষ্টান্ত—বাড়িতে আছি, বইয়ে পোকা।

ক্রিয়া-বিভক্তি

বাংলা ভাষায় পদগঠনের দ্বিতীয় প্রক্রিয়া হল **ক্রিয়াবিভক্তির যোগ**। ক্রিয়াপদ তৈরি হয় ধাতুর সঙ্গে বিভক্তির যোগে। ক্রিয়াবিভক্তি হতে পারে নানান রকম—১. অসমাপিকা ও সমাপিকা; ২. কাল-বিভক্তি—অর্থাৎ অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ। কাল বিভক্তির প্রকার—অর্থাৎ সাধারণ, ঘটমান, পুরাঘটিত ও নিত্যবৃত্ত ; ৩. পুরুষ-বিভক্তি—অর্থাৎ উত্তম পুরুষ, মধ্যম পুরুষ প্রথম পুরুষ।

এইভাবে **ক্রিয়াবিভক্তির বিভিন্ন উপাদান** বা অংশ জুড়ে শব্দ থেকে পদে রূপান্তর হয়। উদাহরণ দিয়ে বোঝানো যেতে পারে।

'খাওয়া' ক্রিয়ার সঙ্গে ১. অসমাপিকা -ইতে বা -ইয়া যোগ করলে পাওয়া যাবে খাইতে > খেতে ; খাইয়া > খেয়ে ; ২. সমাপিকা -ইল, -ইত যোগ করলে পাওয়া যাবে খাইল > খেল, খাইত > খেত। খাইল ও খেল অতীত কালের সাধারণ রূপ ; খাইত ও খেত নিত্যবৃত্ত অতীত। ৩. পুরুষ-বিভক্তি যোগে পাওয়া যাবে ভবিষ্যতের উত্তম পুরুষে খাইব, খাব (-ইব, -ব) ; মধ্যম পুরুষে খাইবে, খাবে ; প্রথম পুরুষেও খাইবে, খাবে।

এখানে আরও উল্লেখ করতে হবে যে, অসমাপিকা ক্রিয়ার তিনটি রূপ আছে—পূর্ব ক্রিয়া (past active participle), নিমিত্তসূচক অসমাপিকা (infinitive) এবং সাপেক্ষ অসমাপিকা (conditional conjunctive)। 'খেতে', 'বলতে' নিমিত্তসূচক অসমাপিকা, 'গিয়ে' পূর্বক্রিয়া, 'গেলে' সাপেক্ষ অসমাপিকা। সমাপিকা ক্রিয়ার বিভক্তি চার রকম হয়—কাল বিভক্তি (tense suffix), প্রকার বিভক্তি (aspect suffix) পুরুষ বিভক্তি (personal suffix) এবং ভাব বিভক্তি (mood suffix)। এইভাবেই কারকবিভক্তি, অনুসর্গ ও ক্রিয়াবিভক্তি যোগ করে শব্দকে পদে পরিণত করা হয়।

গ্রন্থপঞ্জি

গোস্বামী, কৃষ্ণপদ—বাংলা ভাষাতত্ত্বের ইতিহাস, ২০০১
চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার—ভাষাপ্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ, ১৩৯৪
চাকী, জ্যোতিভূষণ—বাংলা ভাষার ব্যাকরণ, ১৯৯৬
ভট্টাচার্য, সুভাষ— ১. বাঙালির ভাষা, ২০০০
২. ভাষা ও শৈলী, ২০০৬
সরকার, পবিত্র— ১. ভাষাজিজ্ঞাসা, নবম-দশম, ১৯৯১
২. বাংলা ব্যাকরণ প্রসঙ্গ, ২০০৬
মাইতি, প্রকাশ কুমার—আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানের আলোকে বাংলা ভাষা, ২০০৮

২৬. পদপ্রকরণ

বাংলা ভাষায় শব্দ ও পদের পার্থক্য আমরা লক্ষ করেছি। এখন দেখা যাক পদ কতরকমের। পদ পাঁচ রকমের—বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম, ক্রিয়া ও অব্যয়। অনেকে বিশেষ্য ও সর্বনামকে একসঙ্গে নামপদ বলেন। আমরা একে একে এই পদগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেব।

২৬.১ বিশেষ্য

বিশেষ্য ও সর্বনামকে নামপদও বলা হয়। তার কারণ বিশেষ্য নামকে বোঝায়, বস্তুর নাম, ব্যক্তির নাম, দোষগুণের নাম ইত্যাদি। বিশেষ্য কতকগুলি শ্রেণিতে বিভক্ত—ব্যক্তিবাচক বা সংজ্ঞাবাচক, বস্তুবাচক, জাতিবাচক, গুণ বা অবস্থাবাচক, সমষ্টিবাচক, ক্রিয়াবাচক।

যে বিশেষ্য পদে কোনো ব্যক্তি, স্থান, বিষয় ইত্যাদির 'নাম' নির্দিষ্টভাবে বোঝানো হয়, তা-ই **ব্যক্তিবাচক** বা **সংজ্ঞাবাচক বিশেষ্য**। তার উদাহরণ কলকাতা, রবীন্দ্রনাথ, দিল্লি। এই ধরনের বিশেষ্য প্রাণীবাচক ও অপ্রাণীবাচক এই দুই রকমের হতে পারে। উপরের উদাহরণে রবীন্দ্রনাথ প্রাণীবাচক, অন্যগুলি অপ্রাণীবাচক।

বস্তুবাচক বিশেষ্য বলতে বোঝায় বস্তুকে বা বস্তুর নামকে। বস্তুবাচক বিশেষ্যের উদাহরণ চাল, ডাল, ফুল, মাছ, আকাশ ইত্যাদি। বস্তুবাচক বিশেষ্যকে অনেকে ইংরেজি common noun-এর অনুসরণে **সামান্য বিশেষ্য** বলেন।

জাতিবাচক বিশেষ্যের দ্বারা জাতি বা শ্রেণিকে বোঝায়। মানুষ, পাখি, ঘোড়া ইত্যাদি জাতিবাচক বিশেষ্যের দৃষ্টান্ত।

গুণবাচক বিশেষ্যের দ্বারা দোষ, গুণ, প্রকৃতি, ধর্ম বা স্বভাব ইত্যাদি বোঝায়, যেমন গাম্ভীর্য, মায়া, মাধুর্য, দয়া, মমতা, স্নেহ ইত্যাদি।

সমষ্টিবাচক বিশেষ্যের দ্বারা সমষ্টি সূচিত হয়। যেমন—পাল, পুঞ্জ, দল, সংঘ, গোষ্ঠী, ঝাঁক ইত্যাদি।

ক্রিয়াবাচক বিশেষ্যের দ্বারা কাজ বা ক্রিয়া বোঝায়, যেমন যাওয়া, খাওয়া, ভোজন, গমন, দর্শন ইত্যাদি। বিশেষ্য পদের অন্যরকম শ্রেণিবিভাগও হয়ে থাকে। ক. মূর্ত ও অমূর্ত; খ. গণনযোগ্য ও পরিমাপযোগ্য।

মূর্ত বিশেষ্যের (concrete noun) একটা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপ থাকবে, তাকে ধরাছোঁয়া যায়—বই, পাথর, কলম, টেবিল এ সবই মূর্ত বিশেষ্য। অন্য দিকে **অমূর্ত বিশেষ্য** (abstract noun). বলতে এমন বস্তুকে বোঝায় যার কোনো চেহারা বা ইন্দ্রিগ্রাহ্য রূপ নেই। দয়া, তিতিক্ষা, দারিদ্র, চতুরতা অমূর্ত বিশেষ্য।

ইংরেজিতে যা countable ও uncountable, বাংলায় তাকেই বলি **গণনযোগ্য** ও **পরিমাপযোগ্য**। বই, মানুষ, গাছ এসব গণনযোগ্য ; অন্য দিকে দুধ, জল, দয়া, বেদনা প্রভৃতি গোনা যায় না, এগুলি পরিমাপযোগ্য বিশেষ্য।

বিশেষ্য একটিমাত্র শব্দ নিয়ে হতে পারে, যেমন—গাছ, পাথর, দয়া, সৌন্দর্য। আবার একাধিক শব্দ নিয়েও হতে পারে—

তোমার **ছবি আঁকাটা** বেশ হয়েছে।

এখানে 'ছবি আঁকাটা' বিশেষ্য। আরও বেশি শব্দ নিয়েও বিশেষ্য হতে পারে—

কাল সারাটা দিন ঘুরে-বেড়ানো আমার ভালো লাগেনি। এখানে 'কাল সারাটা দিন ঘুরে-বেড়ানো' এই অংশটা বিশেষ্য। এসব ক্ষেত্রে আধুনিক ভাষাতত্ত্বে এগুলোকে নিছক বিশেষ্য না ব'লে বলা হয় 'বিশেষ্যগুচ্ছ' (noun group) বা 'বিশেষ্যখণ্ড' (noun phrase)।

২৬.২ সর্বনাম ও তার শ্রেণিবিভাগ

সর্বনাম যেহেতু বিশেষ্যেরই বদলি, তাই এটিও নামপদ নামেই পরিচিত। সর্বনামের ব্যবহারের কারণগুলি এই—

১. কোনো একটি বিশেষ্যের পৌনঃপুনিক ব্যবহার অনভিপ্রেত হলে তার পরিবর্তে সর্বনাম ব্যবহৃত হয়।

২. কোনো বাক্য বা বাক্যাংশের পরিবর্ত হিসাবে সর্বনাম ব্যবহৃত হয়।

৩. কোনো ব্যক্তি বা বস্তুর পরিচয়ের পরিবর্ত হিসাবে সর্বনাম ব্যবহৃত হয়।

বাংলা ভাষায় সর্বনাম কতকগুলি শ্রেণিতে বিভক্ত।

১. ব্যক্তিবাচক বা পুরুষবাচক (personal pronouns)

আমি, আমরা, তুমি, তারা, সে, তিনি, তুই—এইগুলি **ব্যক্তিবাচক বা পুরুষবাচক সর্বনামের** উদাহরণ। এই শ্রেণির সর্বনামগুলিকে আবার ক. বক্তা পুরুষ (আমি, আমরা), খ. শ্রোতা পুরুষ বা উদ্দিষ্ট পুরুষ (তুমি, তোমরা), ৯. নৈকট্যবাচক বা তুচ্ছার্থক পুরুষ (তুই, তোরা) এবং ঘ. সম্ভ্রমসূচক (তিনি, তাঁরা) এই কটি উপশ্রেণিতে ভাগ করা যায়।

২. নির্দেশক সর্বনাম (demonstrative pronouns)

যে-সর্বনাম কোনো ব্যক্তি বা বস্তুকে নির্দেশ করে, তা-ই **নির্দেশক সর্বনাম**। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় নির্দেশককে বলেছেন **উল্লেখসূচক** বা **নির্ণয়সূচক** সর্বনাম। নির্দেশক সর্বনাম আবার **নিকট-নির্দেশক** বা **প্রত্যক্ষ-নির্দেশক** (proximate বা near demonstrative) এবং **দূর-নির্দেশক** বা পরোক্ষ-নির্দেশক এই দুই রকম হতে পারে। এ, এই, এরা, ইনি, এঁরা, এটি— এগুলি নিকট-নির্দেশক সর্বনাম। অন্য দিকে, ও, ওই, ওরা, ওঁ, ওঁরা, ওটি, ওগুলি—এগুলি পরোক্ষ বা দূর-নির্দেশক সর্বনাম।

৩. সাকল্যবাচক সর্বনাম (inclusive pronouns)

যে সর্বনাম পদে কোনোকিছুর সমষ্টি বোঝায়, তাকে **সাকল্যবাচক সর্বনাম** বলে। উভয়, সব, সকল, সবার, উভয়ের, সবগুলি, সব থেকে, সবার চেয়ে ইত্যাদি সাকল্যবাচক সর্বনামের উদাহরণ।

৪. অনির্দেশক বা অনিশ্চয়তাবাচক সর্বনাম (indefinite pronouns)

যে-সর্বনাম পদে নির্দিষ্টভাবে নিশ্চয় করে কোনো ব্যক্তি বা বস্তুকে বোঝায় না, তা-ই **অনির্দেশক সর্বনাম**। কেউ, কিছু, কোনো, কয়েক প্রভৃতি অনির্দেশক সর্বনাম।

৫. প্রশ্নবাচক সর্বনাম (interrogative pronouns)

প্রশ্ন করতে বা কিছু জিজ্ঞাসা করার জন্য যে-সর্বনাম ব্যবহৃত হয়, তাকে **প্রশ্নসূচক সর্বনাম** বলে। কে, কার, কারা ইত্যাদি প্রশ্নসূচক সর্বনামের উদাহরণ।

৬. সম্বন্ধবাচক বা সংযোগবাচক সর্বনাম (relative pronouns)

যে-সর্বনাম দুই বা ততোধিক ব্যক্তি বা বস্তুর মধ্যে সম্বন্ধ সূচিত করে কিংবা দুটির মধ্যে সংযোগসাধন করে, তাকে **সম্বন্ধবাচক** বা **সংযোগবাচক সর্বনাম** বলে। যা, যে, যার, যাকে, যিনি, যাঁর ইত্যাদি এই ধরনের সর্বনাম।

৭. সাপেক্ষ সর্বনাম (correlatives)

পারস্পরিক সংগতি বোঝাতে একধরনের **সম্বন্ধবাচক সর্বনাম** বা **সাপেক্ষ সর্বনাম** ব্যবহৃত হয়—যে-সে, যত-তত, যতক্ষণ-ততক্ষণ, যেমন-তেমন এগুলিকে সাপেক্ষ পারস্পরিক-**সংগতি-সূচক সর্বনাম** বা correlatives বলা হয়।

৮. আত্মবাচক সর্বনাম (reflexive pronouns)

যে-সর্বনামে আত্মভাব বা নিজস্বভাব বোঝায় তা-ই **আত্মবাচক সর্বনাম**। অনেকসময় উক্তির উদ্দেশ্য বা কর্তৃপদ সম্বন্ধে বিশেষ জোর দেবার জন্য আত্মবাচক সর্বনাম ব্যবহৃত হয়— নিজে, স্বয়ং, নিজেরা, আপনি প্রভৃতি এর দৃষ্টান্ত। এই ধরনের সর্বনামকে কেউ কেউ স্বকর্তৃত্বজ্ঞাপক সর্বনাম বলেন।

৯. অন্যাদিবাচক সর্বনাম

যে-সর্বনামে নিজ ভিন্ন অন্যকে বোঝায় তা-ই অন্যাদিবাচক (অন্য + আদি)। অন্য, অপর প্রভৃতি এর উদাহরণ।

২৬.৩ বিশেষণ

যে-পদে বিশেষ্য সর্বনাম বা অন্য পদের গুণ, দোষ, ধর্ম, অবস্থা সংখ্যা ইত্যাদি প্রকাশিত হয়, তাকেই বিশেষণ পদ বলে।

উন্নত দেশ, **দুরন্ত** বালক (বিশেষ্যের বিশেষণ)
আমার আমি (সর্বনামের বিশেষণ)
খুব গরম (বিশেষণের বিশেষণ)
জোরে ছুটছে (ক্রিয়াবিশেষণ)
লাখ টাকা (সংখ্যাবাচক বিশেষণ)

২৬.৩.১ বিশেষণের শ্রেণিবিভাগ : সাক্ষাৎ বিশেষণ ও বিধেয় বিশেষণ

বাক্যে অবস্থান অনুযায়ী বিশেষণ হতে পারে দুই রকমের—১. সাক্ষাৎ বিশেষণ এবং ২. বিধেয় বিশেষণ।

যে-বিশেষণ বিশেষ্য সর্বনাম ইত্যাদি পদের ঠিক আগে বসে তা-ই **সাক্ষাৎ বিশেষণ**—ভালো ছেলে, রঙিন ঘুড়ি, আমার টাকা।

যে-বিশেষণ বাক্যে বিধেয়-র স্থানে বসে বা বিধেয় হিসাবে ব্যবহৃত হয় তা-ই বিধেয় বিশেষণ—

এই মেয়েটি **ভালো** ; ওই মেয়েটি **কালো** ;
এখানকার বাতাস ভারি **ফুরফুরে**।

২৬.৩.২ সাক্ষাৎ বিশেষণের শ্রেণিবিভাগ

সাক্ষাৎ বিশেষণ কয়েক রকমের হতে পারে—১. নাম বিশেষণ, ২. পদান্তরিত বিশেষণ, ৩. সংখ্যাবাচক বিশেষণ, ৪. বিশেষণের বিশেষণ, ৫. ক্রিয়াবিশেষণ, ৬. অব্যয়জাত বিশেষণ, ৭. সম্বন্ধ বিশেষণ, ৮. বহুপদী বিশেষণ।

১. নাম বিশেষণ

নামপদের অর্থাৎ বিশেষ্য ও সর্বনামের গুণ, দোষ, অবস্থা, ধর্ম প্রভৃতি প্রকাশ করে **নাম বিশেষণ**। কাজেকাজেই শব্দের অর্থ অনুসারে নাম বিশেষণ আবার কয়েক রকমের হতে পারে—**দোষগুণ বাচক** (প্রচণ্ড, বিরাট, উন্নত, ছোটো, গরম) ; **অবস্থাবাচক** (ছুটন্ত, শ্রান্ত, বিষণ্ণ) ; **উৎসবাচক** (বেনারসি শাড়ি, জাপানি চা, মাদ্রাজি লংকা) ; **সংখ্যাবাচক বা পূরণবাচক** (তিন মাস, হাজার টাকা, বাইশে শ্রাবণ) ; **বর্ণবাচক** (লাল মাটি, সবুজ পাথর, নীল খাম) ; **প্রশ্নাত্মক** (কোন, কেমন, কী)

২. পদান্তরিত বিশেষণ

বিশেষ্য, ক্রিয়াপদ, ইত্যাদি পদান্তরিত হয়ে বিশেষণ হিসাবে ব্যবহৃত হলে তাকে পদান্তরিত বিশেষণ বলে।

বিশেষ্য থেকে (জাপানি, পূজ্য, ভারতীয়)
ক্রিয়াপদ থেকে (জ্বলন্ত, ছুটন্ত, ধাবমান)
ধ্বন্যাত্মক শব্দ থেকে (স্যাঁতসেঁতে, ফ্যাকফেকে, প্যাচপেচে)

৩. সংখ্যাবাচক বিশেষণ

বিশুদ্ধ (cardinal) সংখ্যা বা পূরণবাচক (ordinal) সংখ্যা বিশেষণ হিসাবে ব্যবহৃত হলে তাকে **সংখ্যাবাচক বিশেষণ** বলা হয়।

হাজার টাকা, পাঁচ জন, দুই বিঘে, বাইশে ফাল্গুন

৪. বিশেষণের বিশেষণ

যে-পদে নামবিশেষণ ও ক্রিয়াবিশেষণের গুণ, অবস্থা, মাত্রা ইত্যাদি প্রকাশিত হয় তাকে **বিশেষণের বিশেষণ বলে।**

খুব চতুর, **এমন** ভালো, **নিকষ** কালো, **ভীষণ** ভালো এইগুলি বিশেষণের বিশেষণ।

৫. ক্রিয়াবিশেষণ

যে বিশেষণ পদে ক্রিয়ার সময় অবস্থান, দ্রুততা, তীব্রতা, ইত্যাদি বোঝায় তাকে **ক্রিয়াবিশেষণ** বলে।

তাড়াতাড়ি এসো ; **জলদি** চলো ; **ধীরে** হাঁটো ; **চটপট** করো

ক্রিয়াবিশেষণ আবার একাধিক শ্রেণির হতে পারে—কালবাচক, স্থানবাচক বা অবস্থানবাচক, প্রকৃতিবাচক।

১. **কালবাচক ক্রিয়াবিশেষণ—যখন** আসবে, **তখন** ওটা নিয়ে এসো ; **সবসময়** আনন্দে থেকো।

২. **স্থান** বা **অবস্থানবাচক ক্রিয়াবিশেষণ—কোথায়** যাবে? **পথেই** দেখা হবে।

৩. **প্রকৃতিবাচক ক্রিয়াবিশেষণ—**
ধীরে চলো ; **বেশ** গেয়েছে

৬. অব্যয়জাত বিশেষণ

যে-বিশেষণে অব্যয়বাচক শব্দ বিশেষণ হিসাবে ব্যবহৃত হয়, তা-ই অব্যয়জাত বিশেষণ—

হঠাৎ-রাজা, **বিনা** মেঘে বৃষ্টি, **উপরি** পাওনা

৭. সম্বন্ধ বিশেষণ

যে-বিশেষণে সম্বন্ধ পদ বিশেষণের কাজ করে তা-ই সম্বন্ধ বিশেষণ—

আমার বই, **হিরের** আংটি, **দেশের** কথা

৮. বহুপদী বিশেষণ

বাক্যে এমন বিশেষণও ব্যবহৃত হয়ে থাকে যা একাধিক পদসমন্বিত। তাকেই বহুপদময় বা বহুপদী বিশেষণ বলে। নীচের বাক্যগুলি লক্ষ করা যাক—

'**অনেক দিনের মনের** মানুষ'

ঝড়ে-ভেঙে-পড়া ঘর

বারবার-হেরে-যাওয়া দল

লাল জামা নীল প্যান্ট পরা লোকটিকে দেখো।

প্রত্যেকটি বাক্যেই 'মানুষ', 'ঘর', 'দল' এবং 'লোকটি' এই বিশেষ্যবাচক শব্দগুলিকে বিশেষিত করছে **বহুপদময় বিশেষণ**। এও লক্ষ করব যে, এই বহুপদময় বিশেষণগুলির নানান চরিত্র, নানাভাবে গঠিত হয়েছে সেগুলি।

১. বিশেষ্য গুচ্ছের সঙ্গে নিষ্ঠা প্রত্যয়ান্ত (ক্ত বা ক্তবতু প্রত্যয়ান্ত) শব্দ বা শব্দগুচ্ছ নিয়ে তৈরি বহুপদময় বিশেষণ আছে (ঝড়ে-ভেঙে-পড়া, বারবার-হেরে-যাওয়া) ;

২. বিশেষ্য ও বিশেষণের গুচ্ছে তৈরি বহুপদময় বিশেষণও আছে (লাল জামা নীল প্যান্ট পরা)

২৬.৩.৩ বিশেষণের তারতম্য

দুই বা তার বেশি ব্যক্তি বস্তু ইত্যাদির মধ্যে একটির উৎকৃষ্টতা বা অপকৃষ্টতা, আধিক্য বা ন্যূনতা ইত্যাদি বোঝানো হয় **বিশেষণের তারতম্য**-সাধনের দ্বারা। এই তারতম্য দুইভাবে সম্পন্ন হয়—সংস্কৃত নিয়মে এবং বাংলা নিয়মে।

সংস্কৃত নিয়মে -তর প্রত্যয় যুক্ত হয় দুইয়ের মধ্যে অধিকতরতা বোঝাতে—ক্ষুদ্রতর, বৃহত্তর, তিক্ততর। এবং বহুর মধ্যে সবচেয়ে বেশি বোঝাতে -তম প্রত্যয় ব্যবহৃত হয়—বৃহত্তম, ক্ষুদ্রতম।

সংস্কৃতে একটি তৃতীয় পদ্ধতিও আছে তারতম্য প্রকাশের— -ঈয়ান্ ও -ইষ্ঠ প্রত্যয়ের ব্যবহার।

-ঈয়ান্—গরীয়ান্ বর্ষীয়ান্, বরীয়ান্, পাপীয়ান্

-ইষ্ঠ—গরিষ্ঠ, জ্যেষ্ঠ, বর্ষিষ্ঠ

উপরের শব্দগুলির মধ্যে পাপীয়ান্ ও বরীয়ান্ বাংলায় দুর্লভ। অন্যগুলি বাংলা ভাষায়ও ব্যবহৃত হয়।

বাংলা নিয়মে তারতম্য সাধনেরও ব্যবস্থা আছে।

প্রথমত, 'হইতে', 'হতে', 'থেকে', 'চেয়ে', 'চাইতে', 'অপেক্ষা' এইসব অনুসর্গ ব্যবহার করে—

আমার **থেকে** তুমি ভালো

বহুর মধ্যে তারতম্য প্রকাশে 'সবচেয়ে', 'সর্বাপেক্ষা' ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়—

ক্লাসে সতীশই **সবচাইতে** লম্বা।

তোমার কবিতাই **সবচেয়ে** ভালো লাগল।

তবে স্মর্তব্য যে, সংস্কৃতের নিয়মও বাংলায় অনেকসময়েই প্রয়োগ করা হয়ে থাকে—

আমাদের মধ্যে তিনিই প্রবীণতম।

যিনি জ্যেষ্ঠ তাঁকে অবজ্ঞা কোরো না।

প্রশান্ত মহাসাগর পৃথিবীর বৃহত্তম সমুদ্র।

২৬.৪ ক্রিয়াপদ

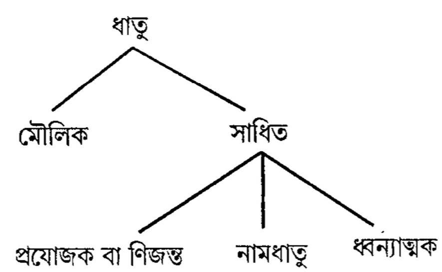
ক্রিয়াপদই বাক্যের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ। ক্রিয়াপদকে কেন্দ্র করেই বাক্যের অন্যান্য উপাদানগুলির অস্তিত্ব। ক্রিয়াপদের উৎস হল ধাতু। ধাতুর সঙ্গে বিভক্তি যোগ হলে ধাতু ক্রিয়াপদে পরিণত হয়। অর্থাৎ বিভক্তিযুক্ত বা বিভক্ত্যন্ত ধাতুই ক্রিয়াপদ। কর্ ধাতুর সঙ্গে -ইতেছি বিভক্তি যোগ করে পাওয়া গেল 'করিতেছি' ক্রিয়াপদটি।

২৬.৪.১ ধাতুর শ্রেণিবিভাগ

ক্রিয়ার মূল অংশই ধাতু। অর্থাৎ বিভক্তিহীন অংশই ধাতু। বাংলায় √কর্, √যা, √দেখ্ এইগুলি ধাতু। ধাতু দুইপ্রকার—**মৌলিক** বা **সিদ্ধ**, এবং **সাধিত**। চিত্রে এইভাবে দেখানো যায়—



সাধিত ধাতু প্রধানত তিনপ্রকার—প্রযোজক বা ণিজন্ত, নামধাতু ও ধ্বন্যাত্মক—



মৌলিক ধাতুর দুটি বৈশিষ্ট্য—১. তা একটিমাত্র সিলেবল দিয়ে গঠিত এবং ২. তাকে ভাঙা বা বিশ্লেষণ করা যায় না। যেমন—যা, খা, দেখ্ ইত্যাদি।

সাধিত ধাতু হল ১. এক বা একাধিক প্রত্যয়যুক্ত এবং ২. একাধিক সিলেবল নিয়ে গঠিত ধাতু। যেমন—করা (কর্ + আ), খাওয়া (খা + আ)।

মৌলিক ধাতুর সঙ্গে **-আ** যোগ করলে সাধিত ধাতু পাওয়া যায়। খা- একটি মৌলিক ধাতু। তার সঙ্গে -আ (অর্থাৎ ও + আ) যোগ করে পাওয়া গেল সাধিত 'খাওয়া' ধাতু। এবার তার সঙ্গে বিভক্তি যোগ করলে পাওয়া যাবে তার ক্রিয়ারূপ।

সাধিত ধাতু অতএব একাধিক সিলেবল নিয়ে এবং একটি বা তার বেশি প্রত্যয় নিয়ে গঠিত। প্রত্যয় যুক্ত হলেও তা ধাতুই থাকছে। সাধিত ধাতু তিন রকম হতে পারে, একথা আগেই বলা হয়েছে—ণিজন্ত, নামধাতু ও ধ্বন্যাত্মক ধাতু।

ণিজন্ত বা **প্রযোজক ধাতু**—ণিজন্ত (ণিচ্ + অন্ত) বা প্রযোজক ধাতুতে কর্তা অপরকে দিয়ে কাজ করায়, স্বয়ং করে না। √দেখ্ + আ = √দেখা, √বস্ + আ = √বসা। ণিজন্ত ধাতু বিভক্তি যুক্ত হলে তার রূপ এইরকম—বসালাম, দেখাব, দেখিয়েছি।

নাম ধাতু—নামপদ বা বিশেষ্য পদের সঙ্গে প্রত্যয় যুক্ত করে নামধাতু পাওয়া যায়। √জুতা, √বেতা (জুতাব, বেতিয়েছে)।

ধ্বন্যাত্মক ধাতু—ধ্বন্যাত্মক শব্দের সঙ্গে -আ প্রত্যয় যুক্ত করে ধ্বন্যাত্মক ধাতু পাওয়া যায়—√ভন্‌ভনা, √টগ্‌বগা, √ঝল্‌মলা।

২৬.৪.২ ক্রিয়ার গঠন

বাংলায় ক্রিয়া দুইরকম ভাবে গঠিত হয়। ১. মৌলিক ধাতু + প্রকার-বিভক্তি + কাল-বিভক্তি + পুরুষ-বিভক্তি। ২. সাধিত ধাতু + প্রত্যয় + প্রকার-বিভক্তি + কাল-বিভক্তি + পুরুষ-বিভক্তি। তবে এ হল একটি ক্রিয়ার 'পূর্ণাঙ্গ' রূপের কথা। অনেক ক্ষেত্রেই কেবল পুরুষ-বিভক্তিই পাওয়া যায়।

আর একটি কথাও এই প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে। ক্রিয়ার গঠনে পুরুষ-বিভক্তি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেননা পুরুষ অনুযায়ী বিভক্তির রূপে পরিবর্তন ঘটে যায়। ক্রিয়ার রূপগুলি দেখলেই সেকথা বোঝা যাবে—খাই, খায়, খাও ; দেখি, দেখে, দেখো। বাক্যে কর্তার সঙ্গেই পুরুষ-বিভক্তির agreement বা সংগতি থাকে। তাই কর্তার বদল হলে পুরুষ-বিভক্তিরও বদল হবে।

২৬.৪.৩ ক্রিয়ার প্রকার

ক. সমাপিকা ও অসমাপিকা

যে ক্রিয়া বাক্যকে পূর্ণ অর্থ দেয় তা-ই **সমাপিকা ক্রিয়া**। সমাপিকা ক্রিয়া বাক্যকে সম্পূর্ণ করে—গেলেন, খাব, চলছে।

যে ক্রিয়া বাক্যের অর্থকে অসম্পূর্ণ রাখে তা-ই **অসমাপিকা ক্রিয়া**—যেতে, খেয়ে, নিতে, নিয়ে, চললে।

খ. সকর্মক ক্রিয়া ও অকর্মক ক্রিয়া

যে ক্রিয়া শুধু কর্তা বা উদ্দেশ্যকে অবলম্বন করে সম্পূর্ণ হয় না, অন্য কিছুকে অবলম্বন করে সম্পূর্ণ হয়, তা-ই **সকর্মক ক্রিয়া**। সকর্মক ক্রিয়ায় কর্মপদ থাকে—

ছোটো খোকা **বই পড়ছে**।
মেয়েটি **গান গাইছে**।

দুটি বাক্যেই কর্মপদ আছে—বই, গান।

কোনো-কোনো ক্রিয়ার কর্ম থাকতে পারে দুটি। সেই ক্রিয়াকে **দ্বিকর্মক ক্রিয়া** বলে। দুটি কর্মের একটি গৌণ, অন্যটি মুখ্য। মুখ্য কর্মই বাক্যে বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

সে **আমাকে বইটি** দিল।

এখানে 'আমাকে' গৌণ কর্ম, 'বইটি' মুখ্য কর্ম। সচরাচর গৌণকর্ম বিভক্তিযুক্ত হয়ে থাকে। মুখ্য কর্ম কখনো বিভক্তিযুক্ত হয়, কখনো বিভক্তিহীন হয়। সচরাচর ণিজন্ত ক্রিয়া সকর্মক হয়ে থাকে।

অন্য দিকে, যে ক্রিয়ার কর্ম থাকে না, তা-ই **অকর্মক ক্রিয়া**।

ছেলেটি হাসছে।

মেয়েটি নাচছে।

'হাসা' বা 'নাচা' ক্রিয়া অকর্মক। কর্ম ছাড়াই এরা সম্পূর্ণ, এরা কর্তৃনিষ্ঠ। অণিজন্ত ক্রিয়া সাধারণত কর্মহীন হয়। কিন্তু বিশেষ বাংলা প্রয়োগে এই অকর্মক ক্রিয়ারও সকর্মক প্রয়োগ হতে পারে—

মেয়েটি খুব নাচ নেচেছে।

এই কর্মকে **সমধাতুজ** বা **সমধাতুক কর্ম** (cognate object) বলে।

আগেই বলা হয়েছে, ণিজন্ত বা প্রযোজক ক্রিয়া সকর্মক হয়—হাসায়, নাচায় এই ক্রিয়াগুলি সকর্মক। যদি প্রশ্ন করি—কাকে হাসায়, কাকে নাচায়, তবে তার উত্তরই কর্ম।

২৬.৪.৪ সরল ক্রিয়া, যৌগিক ক্রিয়া

একটি মাত্র ক্রিয়া-উপাদানে গঠিত ক্রিয়াপদকে **সরল ক্রিয়া** বলে—'গেল', 'করছি' ইত্যাদি সরল ক্রিয়ার দৃষ্টান্ত।

অন্য দিকে, দুটি ক্রিয়া-উপাদানে গঠিত ক্রিয়াপদকে **যৌগিক ক্রিয়া** বলা হয়। যৌগিক ক্রিয়ার প্রথম উপাদানটি -ইয়া (<-এ) বা -ইতে (-ত) প্রত্যয়ান্ত অসমাপিকা ক্রিয়া এবং দ্বিতীয় উপাদানটি পুরুষবিভক্তিযুক্ত সমাপিকা ক্রিয়া।

খাইয়া ফেলিল, খেয়ে ফেলল, দেখতে পেল, উঠে বসল।

২৬.৪.৫ ক্রিয়ার কাল (tense)

ক্রিয়ার সঙ্গে প্রত্যয় ও বিভক্তির যোগে ক্রিয়ার রূপে যে সমস্ত 'প্রসার বা রূপান্তর' ঘটে বা ঘটে গেছে বা ঘটবে বলে যে 'সময়ের বোধ' হয়, তাকেই বলে ক্রিয়ার কাল—এই কথাগুলি সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের।

এ থেকে বোঝা গেল যে, ক্রিয়ার বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎ কাল বোঝাতে নির্দিষ্ট কতকগুলি প্রত্যয় ও বিভক্তি ব্যবহৃত হয়।

রূপ ও অর্থ অনুসারে ক্রিয়ার কাল দুই প্রকার—

১. সরল বা মৌলিক কাল (simple tense)
২. মিশ্র বা যৌগিক কাল (compound tense)

২৬.৪.৫.১ সরল কাল

যে ক্রিয়ারূপে একটিমাত্র ধাতুর সঙ্গেই প্রত্যয় বা বিভক্তি যুক্ত হয়, তাকে **মৌলিক** বা **সরল কাল** বলে। মৌলিক কালে একটি ধাতুর সঙ্গে কালবাচক প্রত্যয় এবং পুরুষবাচক ক্রিয়াবিভক্তি কিংবা কেবলই পুরুষবিভক্তি যুক্ত হয় ; যেমন—দেখ্ + ই = দেখি, দেখ্ + এ = দেখে। বাংলায় মৌলিক কাল চারটি—১. সাধারণ বা নিত্য বা অনির্দিষ্ট বর্তমান (**করে**); ২. সাধারণ বা নিত্য অতীত (**করল**); ৩. নিত্যবৃত্ত অতীত (**করত**); ৪. সাধারণ ভবিষ্যৎ (**করবে**)।

এখানে একটি কথা স্মরণ করতে হবে। উপরের 'করা' ক্রিয়ার যে চারটি রূপ দেখানো হয়েছে তার মধ্যে কেবল 'করে'-র উচ্চারণ ক-রে ; অন্যগুলির উচ্চারণ যথাক্রমে কোর্-লো, কোর্-তো এবং কোর্-বে। তিনটির ক্ষেত্রে ক-য়ের উচ্চারণ কেন 'কো' হল?

এই ক্রিয়ারূপগুলি বিবর্তিত হয়েছে মূল সাধুরূপ থেকে—করে ; করিল ; করিত ; করিবে। করিল, করিত এবং করিবে এই তিনটির ক্ষেত্রে দ্বিতীয় সিলেবলে ই-ধ্বনি থাকায় স্বরসংগতি বা স্বরের উচ্চতাসাম্য নীতি অনুযায়ী প্রথম সিলেবলের অ-ধ্বনি ও-তে পরিণত হয়েছে। কথ্য রূপগুলিতেও সেই কো-বজায় থেকেছে বলেই ওগুলির উচ্চারণ যথাক্রমে—কোরিলো, কোরিতো, কোরিবে।

২৬.৪.৫.২ যৌগিক কাল

এবারে দেখা যাক, কাকে বলে **যৌগিক কাল**। যৌগিক কালে দুটি ক্রিয়া একসঙ্গে এমনভাবে মিশে থাকে যে, মনে হবে ক্রিয়া একটিই। সাধুভাষায় 'করিতেছে' এবং 'করিয়াছে' যৌগিক কালের দৃষ্টান্ত। কীভাবে গঠিত হয়েছে এই দুটি ক্রিয়ারূপ তা দেখলেই বিষয়টা স্পষ্ট হবে।

করিতেছে = √কর্ + (প্রত্যয়) ইতে + √আছ্ + (বিভক্তি) এ

করিয়াছে = √কর্ + ইয়া + √আছ্ + এ

দেখা যাচ্ছে যে, দুই ক্ষেত্রেই দুটি ধাতুর সঙ্গে বিভক্তি যুক্ত হয়ে গঠিত হয়েছে মিশ্র ক্রিয়া এবং তারই ফলে গঠিত হল মিশ্র বা যৌগিক কাল। বাস্তবিকপক্ষে, বাংলায় **সাধুভাষার ক্রিয়ারূপে** যৌগিক কাল পাওয়া যায়। ফলে তা থেকে রূপান্তরিত মান্য চলিত ভাষার করছে, খাচ্ছে, দেখেছে এগুলিও যৌগিক কালের দৃষ্টান্ত।

বাংলা যৌগিক কালের দুটি সংগঠন—১. প্রথম অংশের ধাতুর সঙ্গে -ইতে প্রত্যয় যোগ করে অসমাপিকা ক্রিয়া এবং দ্বিতীয় অংশটি আছ্ ধাতুর সমাপিকা রূপ—

ক. √পড়্ + ইতে = পড়িতে খ. √আছ্ + এ = আছে

= পড়িতে আছে > পড়িতেছে

যৌগিক কালে ক্রিয়ারূপ ঘটমান কালের। ঘটমান বর্তমান, ঘটমান অতীত, ঘটমান ভবিষ্যৎ—যথা পড়িতেছে, পড়িতেছিল ; পড়িতে থাকিবে।

২. প্রথম অংশের ধাতুর সঙ্গে -ইয়া প্রত্যয় যোগ করে অসমাপিকা রূপ এবং দ্বিতীয় অংশটি আছ্ ধাতুর সমাপিকা রূপ—

ক. √পড়্ + ইয়া = পড়িয়া খ. √আছ্ + এ = আছে

= পড়িয়া আছে > পড়িয়াছে

এতে ক্রিয়ারূপটি দাঁড়াছে **পুরাঘটিত কালের**—পুরাঘটিত বর্তমান, পুরাঘটিত অতীত ও পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ—পড়িয়াছে, পড়িয়াছিল, পড়িয়া থাকিবে।

২৬.৪.৫.৩ মৌলিক ও যৌগিক কালে ক্রিয়ারূপ

মৌলিক কালে ক্রিয়ার রূপ চারটি—১. সাধারণ বা নিত্য বা অনির্দিষ্ট বর্তমান ; ২. সাধারণ বা নিত্য অতীত ; ৩. নিত্যবৃত্ত অতীত এবং ৪. সাধারণ ভবিষ্যৎ।

এগুলির রূপ এইরকম—

সাধারণ বর্তমান—করে
সাধারণ বা নিত্য অতীত—করল
নিত্যবৃত্ত অতীত—করত
সাধারণ ভবিষ্যৎ—করবে

প্রত্যেকটিতে একটি মাত্র ধাতুর সঙ্গে ক্রিয়াবিভক্তি যুক্ত হয়েছে।

অন্যদিকে, **যৌগিক কালে** ক্রিয়ার রূপ হতে পারে প্রায় দশ প্রকার।

১. ঘটমান বর্তমান—করছে, দেখছে
২. ঘটমান অতীত—করছিল, দেখছিল
৩. ঘটমান ভবিষ্যৎ—করতে থাকবে, দেখতে থাকবে
৪. পুরাঘটিত বর্তমান—করেছে, দেখেছে
৫. পুরাঘটিত অতীত—করছিল, দেখছিল
৬. সম্ভাব্য অতীত বা পুরাঘটিত সম্ভাব্য—করে থাকবে, দেখে থাকবে
৭. নিত্যবৃত্ত সাধারণ বর্তমান—করে থাকে, দেখে থাকে
৮. ঘটমান পুরানিত্যবৃত্ত অতীত—করতে থাকত, দেখতে থাকত
৯. ঘটমান নিত্যবৃত্ত বর্তমান—করতে থাকে, দেখতে থাকে
১০. পুরাঘটিত নিত্যবৃত্ত বা পুরাসম্ভাব্য নিত্যবৃত্ত অতীত—করে থাকবে, দেখে থাকবে

লক্ষ করব যে, পুরাঘটিত সম্ভাব্য (৬) এবং পুরাঘটিত নিত্যবৃত্ত (১০) এই দুটির রূপ একই। এদের পার্থক্য ক্রিয়ারূপে নয়, অর্থে।

২৬.৫ অব্যয়

দীর্ঘকাল ধ'রে অব্যয় সম্বন্ধে সংস্কৃত ব্যাকরণের ধারণাটিকে বাংলার ক্ষেত্রেও আরোপ করা হয়েছে। সংস্কৃত ব্যাকরণে অব্যয় বলতে বোঝায় এমন শব্দকে বচন-লিঙ্গ-বিভক্তি ভেদে

যার রূপ পরিবর্তিত হয় না। কাজেই সব বিভক্তিতেই অব্যয়ের একই রূপ। সংস্কৃতে অকস্মাৎ, অত্র, অথবা, অধুনা, অন্যত্র, অপিচ, ইতস্তত, ইদানীং, উভয়ত, ঈষৎ, ক্বচিৎ, কিঞ্চিৎ, তাবৎ, যথা, যুগপৎ, সদ্য, সম্প্রতি, সহসা, সুতরাং—এগুলি অব্যয়।

কিন্তু বাংলায় এর অনেকগুলিকেই অব্যয় বলার যুক্তি নেই। ভাষাবিদরা কিছুকাল যাবৎ এগুলিকে আদৌ অব্যয় বলা উচিত কি না সে-প্রশ্ন তুলেছেন। তাঁরা দেখিয়েছেন যে, বাংলা ভাষার চরিত্র ও প্রয়োগ অনুযায়ী তথাকথিত অব্যয়গুলির মধ্যে কয়েকটিকে ক্রিয়াবিশেষণ আর বিশেষণের বিশেষণ বলা যায়। 'ইদানীং', 'সদ্য' নিঃসন্দেহে ক্রিয়াবিশেষণ, 'ঈষৎ' বিশেষণের বিশেষণ (ঈষৎ তপ্ত)। 'সঙ্গে', 'জন্য', এগুলিকে অব্যয় বলা হলেও বস্তুতপক্ষে এরা অনুসর্গ।

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়কে অনুসরণ করে বাংলা অব্যয়গুলিকে আমরা দুটি প্রধান ভাগে বিভক্ত করতে পারি—১. **সংযোগবাচক** বা **সম্বন্ধবাচক** (conjunctions) এবং ২. **আবেগবাচক** বা **মনোভাববাচক** (interjections)।

তবে সুনীতিকুমার একথাও বলেছেন যে, প্রয়োগে একই অব্যয় কখনো সংযোগবাচক এবং কখনো আবেগবাচক হতে পারে।

প্রয়োগ অনুসারে আমরা বাংলা অব্যয়গুলিকে পাঁচটি ভাগে ভাগ করতে পারি—**পদান্বয়ী অব্যয়, সমুচ্চয়ী অব্যয়, অনন্বয়ী অব্যয়, প্রশ্নাত্মক** ও **নিষেধাত্মক অব্যয়**।

পদান্বয়ী অব্যয়

বাক্যে একটি পদের সঙ্গে অপর একটি পদের সম্পর্ক বা অন্বয় ঘটায় বলেই এদের **পদান্বয়ী** বলে। দ্বারা, দিয়ে, কর্তৃক, সঙ্গে, জন্যে ইত্যাদি **পদান্বয়ী অব্যয়**। বস্তুতপক্ষে অনুসর্গগুলিই পদান্বয়ী অব্যয়।

সমুচ্চয়ী অব্যয়

বাক্যে একাধিক পদ বা বাক্যকে ব্যাকরণগতভাবে সংযুক্ত বা সংশ্লিষ্ট করে বলে এর নাম **সমুচ্চয়ী অব্যয়**। যেমন, বরং, নইলে, কিন্তু, আর, ও। **বিয়োজক** বা **বৈকল্পিক অব্যয়ও** সমুচ্চয়ী অব্যয়, যেমন কিংবা, না-হয়।

অনন্বয়ী অব্যয়

সাধারণভাবে বাক্যের সঙ্গে যে অব্যয়পদের সংযোগ বা সম্পর্ক বা অন্বয় থাকে না, তা-ই **অনন্বয়ী অব্যয়**। যেমন—বাহবা, বাঃ, আঃ, মরি মরি ইত্যাদি।

প্রশ্নাত্মক অব্যয়

প্রশ্ন করতে যে-অব্যয় ব্যবহৃত হয় তা-ই **প্রশ্নাত্মক অব্যয়**। যেমন—কি (তুমি আসবে কি?), নাকি (ও যাবে নাকি?)।

সূক্ষ্মবিচারে সমুচ্চয়ী অব্যয়েরও আছে নানান উপবিভাগ, যেমন ১. সংযোজক (ও, আর, এবং) ; ২. বিয়োজক (কিংবা, বা) ; ৩. ব্যতিরেকবাচক (তাহলে, যদি, না হলে, নইলে, নতুবা) ; ৪. প্রতিষেধাত্মক (কিন্তু, পরন্তু) ; ৫. হেতুবাচক (যেহেতু, কারণ, ব'লে) ; ৬. সাপেক্ষ বা শর্তবাচক (তবেই, তাহলে) ; ৭. সংশয়াত্মক (বুঝি, পাছে)।

২৬.৬ অনুকার শব্দ অব্যয় নয়

অনুকার শব্দ এক ধরনের দ্বিপদী শব্দ, অর্থাৎ তার দুটি অংশ। প্রথম অংশে থাকে মূল শব্দটি, দ্বিতীয় অংশটি প্রথম অংশের অনুকার বা অনুকৃতি। প্রথম অংশটি অর্থপূর্ণ, দ্বিতীয় অংশ অর্থহীন। এই দ্বিতীয় অংশ প্রথম অংশের ধ্বনিগত অনুকৃতি—বইটই, জলটল, খাওয়াদাওয়া, ভাজাভুজি এগুলিই প্রকৃত অনুকার শব্দ। এখানে কয়েকটা ব্যাপার আমরা লক্ষ করব। ১. অনুকার শব্দের দ্বিতীয় অংশ অর্থহীন। ২. সেই দ্বিতীয় অংশটি কখনো প্রথম অংশের স্বরধ্বনি বদল করে গঠিত, যেমন চুপচাপ, ধুপধাপ, তুকতাক ; আবার কখনো প্রথম অংশের ব্যঞ্জনধ্বনির বদল করে গঠিত, যেমন জলটল, ফলটল, লুটেপুটে। ৩. দ্বিতীয় অংশটিকে বলা যায় প্রথম অংশের ধ্বনিবিকারজনিত প্রতিধ্বনি। ৪. দ্বিতীয় অংশটি আলাদাভাবে অর্থহীন হলেও ওই অংশের জন্য মূল শব্দের অর্থাৎ প্রথম অংশের অর্থ কিছুটা বদলে যায়। ফল আর ফলটল পুরোপুরি সমার্থক নয়।

অনুকার শব্দকে কখনোই অব্যয় বলা যায় না। এর কোনোটা বিশেষ্য, কোনোটা বিশেষণ, আবার কোনোটা ক্রিয়াবিশেষণ। কিন্তু অব্যয় বলা সংগত নয়।

২৬.৭ নির্দেশক

বাংলা ভাষায় শব্দের শেষে -টা, -টি, -টো, -খানা, -খানি, -গাছ, -গাছা ইত্যাদি শব্দাংশ বসে শব্দটিকে বিশেষিত করে। বহুকাল পর্যন্ত বাংলা ব্যাকরণে এদের প্রত্যয় বলা হয়েছে। প্রচলিত প্রথাগত ব্যাকরণে আজও এদের প্রত্যয় বলে চিহ্নিত করা হয়। রবীন্দ্রনাথ, যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এবং মণীন্দ্রকুমার ঘোষ এদের প্রত্যয় বলতে চাননি। মণীন্দ্রকুমার ঘোষ এদের বলেছেন, 'নির্দেশক সংকেত'। সুনীতিকুমার বলেছেন 'পদাশ্রিত নির্দেশক'। তাঁদের বর্ণনা কিছুটা পৃথক হলেও এগুলি যে নির্দেশক তাতে কোনো ভুল নেই। এগুলির বৈশিষ্ট্য হল এই যে, এগুলি বিশেষ্যকে (কখনো-বা বিশেষণকে) বিশেযিত বা সীমিত বা নির্দিষ্ট করে। -টা ও -টি বাংলা বাক্যের প্রয়োগ অনুসারে কোথাও-কোথাও একই অর্থ বহন করে, কোথাও-বা ঈষৎ ভিন্ন অর্থ সূচিত করে। অনেকসময় ক্ষুদ্রতা বোঝাতে বা আদরার্থে -টি এবং বৃহৎ বোঝাতে বা ঈষৎ অনাদর বোঝাতে -টা ব্যবহৃত হয়, যদিও এই নিয়ম বা নীতি সর্বত্র খাটে না।

একটা কলম ; একটি কলম
একটা নদী ; একটি নদী

এই -টা/-টি দুইয়ের মধ্যে তেমন অর্থগত তফাত আছে বলে মনে হয় না। মণীন্দ্রকুমার

ঘোষ বলেছেন যে, -টা ও -টিয়ের প্রয়োগ কখন হবে তা নির্ভর করে ব্যক্তিগত রুচি ইত্যাদির উপর। শুধু মনে রাখতে হবে যে, -টে ব্যবহৃত হয় কেবল দুটি ক্ষেত্রে—তিনটে, চারটে এবং -টো ব্যবহৃত হয় একটি ক্ষেত্রে—দুটো। এ নিয়ে একইভাবে আলোচনা করেছেন ভাষাতাত্ত্বিক প্রবাল দাশগুপ্ত।

মণীন্দ্রকুমার ঘোষ -খানা, -খানি, -গাছ, -গাছি এগুলির কথাও বলেছেন। এগুলি সাধারণত শব্দের শেষে বসে—

চারখানা খাতা
বইখানি পড়েছি
একগাছা দড়ি

কিন্তু -খানা-র রূপভেদ -খান বসে শব্দের আগে—

খান বিশেক লুচি
খান দশেক বই

-খান শেষে বসতে পারে কেবল উপভাষায়—দশখান টাকা দ্যান।

মণীন্দ্রকুমার ঘোষ -টা/-টি কে বিশেষণবাচক বলেছেন।

বই ; বইটি ; একটি বই

এই তিনের মধ্যে অবশ্য সূক্ষ্ম কিছু পার্থক্য আছে। 'বই'-কে নির্দিষ্ট বা বিশেষিত করছে বলেই বিশেষণবাচক বলা হয়েছে।

এবারে বলা যাক, **কেন নির্দেশককে প্রত্যয় বলা উচিত নয়**। এগুলিকে যাঁরা প্রত্যয় বলেন। তাঁরা দুটি কারণে বলেন—

প্রথমত এগুলি শব্দের শেষে বসে ; দ্বিতীয়ত, এই চিহ্নগুলি শব্দের অর্থ কিছুটা বদলে দেয়।

শব্দের শেষে বসলেই তাকে প্রত্যয় বলা ঠিক নয়। এই চিহ্নগুলি শব্দের দ্যোতনা একটু বদলে দেয় বটে, তবে অর্থ বদলে দেয় না, পদান্তরও ঘটায় না।

২৬.৮ অনুসর্গ (postpositions)

কারকের অর্থপ্রকাশের জন্য যে চিহ্ন ব্যবহৃত হয় তাকে বলা হয় বিভক্তি। কিন্তু দেখা যাবে যে, বাংলায় বিভক্তির চিহ্ন প্রকৃতপক্ষে মাত্র চার-পাঁচটি—কে, -র/-এর, -তে, -য়/-এ। করণ ও অপাদান কারক প্রকাশিত হয় এমন কতকগুলি শব্দ দিয়ে যেগুলি বিভক্তির মতো শব্দের সঙ্গে মিশে যায় না, পৃথক শব্দ হিসাবে শব্দের পরে বসে। এইগুলিকেই বলে **অনুসর্গ**। এদের বিকল্প নাম **পরসর্গ** বা সংস্কৃতমতে, **কর্মপ্রবচনীয়**।

অনুসর্গের বৈশিষ্ট্য চারটি। ১. যে শব্দের সঙ্গে এর সম্পর্ক, অনুসর্গ তার পরে বসে। তাই এর নাম অনু (= পশ্চাৎ) সর্গ, ইংরেজিতে যাকে postposition বলা হয়। ২. অনুসর্গ সংশ্লিষ্ট শব্দের গায়ে মিশে থাকে না, পৃথক শব্দ হিসাবে বসে। ৩. অনুসর্গ ভাষায় পৃথক শব্দ হিসাবেই ব্যবহারযোগ্য। ৪. অনুসর্গগুলি যে-বিশেষ্যের পরে বসে তার কারকত্ব প্রকাশ করে।

বাংলা অনুসর্গগুলি তিনটি উৎস থেকে পাওয়া গেছে। ক. সংস্কৃত থেকে আসা **তৎসম অনুসর্গ**, খ. **তদ্ভব ও দেশি অনুসর্গ**, গ. **বিদেশি ভাষা থেকে আগত অনুসর্গ**।

তৎসম অনুসর্গের মধ্যে আছে—দ্বারা, কর্তৃক, অবধি, অপেক্ষা, বিনা, ব্যতীত, নিকটে, সমীপে, নিমিত্ত, সহিত, প্রতি, ন্যায়, অভিমুখে, পশ্চাতে, মধ্যে, সম্মুখে ইত্যাদি। এর মধ্যে পশ্চাতে, নিমিত্ত, সহিত, সম্মুখে এই অনুসর্গগুলি প্রধানত সাধুভাষাতেই ব্যবহৃত হয়।

আগে, কাছে, ছাড়া, তরে, পানে, পাশে, বই, ভিতর, মাঝে, সাথে, ইত্যাদি অনুসর্গ তদ্ভব বা অর্ধতৎসম। তরে, পানে, সাথে এইকটি মূলত কবিতায়ই ব্যবহৃত হয়।

বিদেশি অনুসর্গের মধ্যে আছে দরুন, বরাবর, বাবদ, বনাম ইত্যাদি। এগুলি আরবি ও ফারসি থেকে এসেছে। এছাড়া আরও কতকগুলি অনুসর্গ বাংলায় ব্যবহৃত হয়, যেগুলি ক্রিয়া থেকে উদ্ভূত। এদের **ক্রিয়াজাত অনুসর্গ** বলা হয়, যেমন—হইতে/হতে, চেয়ে/চাইতে, করে/করিয়া, থাকিয়া/থেকে, দিয়া/দিয়ে, লাগিয়া/লাগি।

আমার থেকে সে বড়ো।

তোমাকে দিয়ে কোন্ কাজ হবে?

২৬.৯ বাংলায় লিঙ্গ

ব্যাকরণে লিঙ্গ তিন রকম—পুংলিঙ্গ, যাতে কোনো পুরুষ প্রাণী বা ব্যক্তিকে বোঝায় ; স্ত্রীলিঙ্গ, যাতে স্ত্রীকে বোঝায়, এবং ক্লীবলিঙ্গ যাতে স্ত্রী-পুরুষ কোনোটিকেই বোঝায় না।

বাংলা লিঙ্গ সংস্কৃতের মতো নয়, হিন্দির মতোও নয়। হিন্দিতে 'গাড়ি' স্ত্রীলিঙ্গ। সংস্কৃতে 'উজ্জ্বলানি নক্ষত্রাণি' বলা হয়। চরিত্র অনুযায়ী লিঙ্গ দুইরকম— **স্বাভাবিক লিঙ্গ** ও **ব্যাকরণগত লিঙ্গ**। ব্যাকরণগত লিঙ্গের ক্ষেত্রে স্ত্রীপুরুষের পার্থক্য দিয়ে লিঙ্গের পার্থক্য হয় না। হিন্দি ও সংস্কৃতের লিঙ্গ ব্যাকরণগত। তাই যে-শব্দে স্ত্রীজাতি বোঝায় না, তাও স্ত্রীলিঙ্গ হতে পারে, যে-শব্দে পুরুষ বোঝায় না, তাও পুংলিঙ্গ হতে পারে। বাংলা ভাষায় লিঙ্গ হল স্বাভাবিক লিঙ্গ। স্ত্রীজাতীয় হলে তবেই স্ত্রীলিঙ্গ, পুরুষজাতীয় হলে তবেই পুংলিঙ্গ। বাংলায় ক্লীবলিঙ্গ নেই।

লিঙ্গ-পরিবর্তন সব শব্দে একই নিয়মে হয় না। তৎসম ও অতৎসম শব্দের লিঙ্গান্তরের রীতি ভিন্ন।

ক. তৎসম শব্দের লিঙ্গান্তরের নিয়মাবলি

১. অকারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দে -আ যোগ করে স্ত্রীলিঙ্গ করা হয়—

কোকিল—কোকিলা

অচল—অচলা

অদ্বিতীয়—অদ্বিতীয়া

চঞ্চল—চঞ্চলা

২. শব্দের শেষে -অক থাকলে, সেগুলিকে -ইকা করে স্ত্রীলিঙ্গ করা হয়—

পাঠক—পাঠিকা
পাচক—পাচিকা
লেখক—লেখিকা
পরিচারক—পরিচারিকা
সাধক—সাধিকা

৩. -আনী যোগে স্ত্রীলিঙ্গ—

ভব—ভবানী
শূদ্র—শূদ্রাণী
রুদ্র—রুদ্রাণী

৪. -ঈ প্রত্যয়যোগে স্ত্রীলিঙ্গ—

গৌর—গৌরী
কুমার—কুমারী
সুন্দর—সুন্দরী
তরুণ—তরুণী
পিশাচ—পিশাচী

৫. -ইনী প্রত্যয়যোগে স্ত্রীলিঙ্গ—

মানী—মানিনী
মায়াবী—মায়াবিনী
মেধাবী—মেধাবিনী
অনুগামী—অনুগামিনী

লক্ষ করতে হবে যে, এই শব্দগুলি মূলে ইন্-ভাগান্ত—মানিন্, মায়বিন্, মেধাবিন্, অনুগামিন্।

৬. -বতী ও -মতী যোগে স্ত্রীলিঙ্গ—

ধনবান—ধনবতী
স্বাস্থ্যবান—স্বাস্থ্যবতী
রূপবান—রূপবতী
কীর্তিমান—কীর্তিমতী
ভক্তিমান—ভক্তিমতী

৭. কতকগুলি শব্দে -আ এবং -আনী দুই যোগেই স্ত্রীলিঙ্গ হয়—

ক্ষত্রিয়—ক্ষত্রিয়া, ক্ষত্রিয়ানী
আচার্য—আচার্যা, আচার্যানী

তবে এসব ক্ষেত্রে সচরাচর অর্থের পার্থক্য ঘটে। যেমন 'আচার্যা' বললে বোঝায় স্ত্রীগুরু বা অধ্যাপিকা। 'আচার্যানী' হল আচার্যের পত্নী।

খ. অতৎসম শব্দের লিঙ্গান্তর-প্রক্রিয়া

১. -ই যোগে স্ত্রীলিঙ্গ—

পাগল—পাগলি
উট—উটি

২. ধ্বনিপরিবর্তন এবং শেষে-ই ধ্বনির যোগে

কাকা—কাকি
মামা—মামি
পিসে—পিসি
মেসো—মাসি
পাঁঠা—পাঁঠি

৩. -নি ও -ইনি যোগে

ভিখারি—ভিখারিনি
পূজারি—পুজারিনি
তাঁতি—তাঁতিনি
বাঘ—বাঘিনি

এইসব শব্দে একসময় -নী লেখা হত। বাংলা শব্দে অর্থাৎ অতৎসম শব্দে -ঈ বা -নী অপ্রয়োজনীয়।

৪. কখনো-কখনো আগে স্ত্রীবাচক শব্দ ব্যবহার করে স্ত্রীলিঙ্গ—

হাতি—মাদি হাতি
নেকড়ে—মাদি নেকড়ে
এঁড়ে বাছুর—বকনা বাছুর।

৫. কখনো কখনো পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ হিসাবে সম্পূর্ণ পৃথক শব্দের ব্যবহার হয়—

বাবা—মা
ভাই—বোন
কর্তা—গিন্নি
ভাশুর—জা
বর—কনে

বাংলায় সর্বনামের স্ত্রীলিঙ্গ রূপ হয় না। বিশেষণের স্ত্রীলিঙ্গ হয়। তবে তার প্রয়োগ সীমিত। চতুরা, প্রথমা, চঞ্চলা, আকুলা, নবীনা, প্রাচীনা প্রভৃতি স্ত্রীবাচক শব্দের ব্যবহার সীমিত ক্ষেত্রেই হয়ে থাকে। 'বিদুষী নারী' বা 'লজ্জাশীলা রমণী' যত সহজে মান্য চলিত ভাষায় ব্যবহার করা যায়, তত সহজে 'চঞ্চলা বালিকা' বা 'তৃষ্ণার্তা ভিখারিনি' ব্যবহার করতে পারি না। অতৎসম বিশেষ্যের পাশে ভারী স্ত্রীবাচক বিশেষণ মানানসই হয় না। বাংলায় তাই অনায়াসে বলা যায়—'সুন্দর মেয়ে'। 'গভীরা রজনী', 'ব্যাকুলা ধরণী', 'মহতী প্রচেষ্টা' ইত্যাদি প্রয়োগ আধুনিক বাংলায় সমীচীন নয়।

২৬.১০ বাংলায় বচন

সংস্কৃতে একবচন, দ্বিবচন ও বহুবচন থাকলেও বাংলায় দ্বিবচন নেই। প্রায় কোনো আধুনিক ভাষাতেই দ্বিবচন নেই। পার্বতীচরণ ভট্টাচার্য কৌতুক করে বলেছেন, দ্বিবচনই যদি থাকে, তাহলে ত্রিবচন, চতুর্বচন, পঞ্চবচনেই বা দোষ কী?

বাংলায় আছে একবচন ও বহুবচন।

বাংলা ভাষায় সাধারণভাবে শব্দে একবচনই বোঝায়। তবে বিশেষভাবে বস্তু বিষয় প্রাণী ইত্যাদির **একবচন** বোঝাবার কয়েকটি নিয়ম আছে।

প্রথমত, বিশেষ্যবাচক শব্দের পরে -টি, -টা, -খানা, -খানি, -গাছ, -গাছা ইত্যাদির যোগ—

ছেলেটি, লোকটা, বইখানি, লাঠিগাছ

দ্বিতীয়ত, বিশেষ্যবাচক শব্দের আগে একটি, একটা, একখানা, একখানি ইত্যাদির ব্যবহার—

একটা ছেলে, একটি মেয়ে, একখানা রুটি

তৃতীয়ত, বিশেষ্যবাচক শব্দের শেষে খানেক শব্দের যোগ—

মাসখানেক, কেজিখানেক

বহুবচন গঠনের নিয়ম

প্রথমত, শব্দের শেষে -রা, -এরা, -গুলি, -গুলো ইত্যাদি প্রত্যয়ের যোগ—

মেয়েরা, বাপেরা, মায়েরা, বাড়িগুলো

এখানে একটা কথা মনে রাখতে হবে। কখন -রা, আর কখন -এরা? যে-সমস্ত শব্দ ব্যঞ্জনান্ত উচ্চারিত হয় সেগুলিতে -এরা যোগ করতে হবে—লেখকেরা, গায়কেরা। যেসব শব্দ যুক্তাক্ষর দিয়ে শেষ হয়, তাদের শেষে ও-ধ্বনি থাকলে -রা বা -এরা যে কোনোটাই যোগ করা যায়—ভক্তরা/ভক্তেরা, শিষ্যরা/শিষ্যেরা।

দ্বিতীয়ত, শব্দের আগে 'বহু', 'অনেক', 'প্রচুর', 'মেলা' ইত্যাদি বহুবচনসূচক শব্দের ব্যবহার—

বহু লোক, অনেক গাছ, প্রচুর ফুল, মেলা বই

তৃতীয়ত, বিশেষ্যবাচক শব্দের শেষে কুল, পুঞ্জ, রাশি, গণ, পাল, সমূহ, রাজি, মণ্ডল বা মণ্ডলী, নিচয় ইত্যাদি শব্দযোগে সমাস করে বহুবচন করা যায়—

নক্ষত্ররাশি, নক্ষত্রপুঞ্জ, বৃক্ষরাজি, নারীকুল

এসব শব্দের অধিকাংশই তৎসমবহুল গদ্যেই বেশি ব্যবহৃত হয়। কথ্যভঙ্গির রচনায় এসবের ব্যবহার কম।

চতুর্থত, বিশেষ্য শব্দের দ্বিত্ব করে বহুবচন—

লাল লাল ফুল, উঁচু, উঁচু বাড়ি।

ষষ্ঠত, কোনো প্রত্যয় যোগ না ক'রে কোনো বহুবচনসূচক সমাস না ক'রে শুধু ভাষার ভঙ্গি দিয়েও বহুবচন সূচিত করা যায়—

মানুষ আর মানুষ, গাছ আর গাছ

সপ্তমত, কখনো-কখনো অনুকার ও অনুগামী শব্দ (tag word) জুড়ে বহুবচন দ্যোতিত করা যায়—

বইটই, কাপড়চোপড়, লোহালক্কড়, জুতোটুতো।

২৬.১১ কারক-বিভক্তি

বাংলা ভাষার কারক প্রকরণ একটি বিতর্কিত বিষয়। উনিশ শতক থেকেই শুরু হয়েছিল সে বিতর্ক। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এবং রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী কারকের সংখ্যা ও প্রকৃতি বা 'কারকত্ব' নিয়ে কতকগুলি সংগত প্রশ্ন তুলেছেন। ১৯৫০ সালে প্রকাশিত বিখ্যাত 'বাগর্থ' নামক গ্রন্থে বিজনবিহারী ভট্টাচার্যও প্রচলিত কারক-বিভক্তি প্রকরণ সম্পর্কে একই প্রশ্ন তুলেছেন। সংস্কৃতের অনুকরণে বাংলা কারকের আলোচনা সংগত নয়। এবং বাংলা ভাষার প্রকৃতি ও প্রয়োগরীতি অনুসারেই কারক প্রকরণের আলোচনা হওয়া উচিত—এটাই এইসব পণ্ডিত ও বিশেষজ্ঞের বক্তব্য। আবার যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি ছয়টি কারকই স্বীকার করেছেন।

বাংলায় বাক্যের পদগুলির প্রত্যেকটিই একটি আর একটির সঙ্গে কোনো-না-কোনো সম্পর্কে আবদ্ধ। আর কারক হল ক্রিয়ার সঙ্গে বাক্যের বিশেষ্যজাতীয় পদগুলির সম্পর্কের ব্যাকরণগত নাম। সেই সম্পর্ক অনুযায়ী সংস্কৃতে আছে ছয়টি কারক—কর্তৃকারক, কর্মকারক, করণকারক, সম্প্রদান কারক, অপাদান কারক ও অধিকরণ কারক এবং দুটি পদ—সম্বন্ধ ও সম্বোধন। বাংলায় সম্প্রদান কারক থাকার কোনো যুক্তি নেই। কেননা স্বত্ব ত্যাগ করে দান করলে সম্প্রদান হবে, নইলে হবে না—এ যুক্তি বাংলায় অচল। আবার সম্বন্ধ একটি পদ, কারক নয় যেহেতু বাক্যের ক্রিয়ার সঙ্গে তার কোনোই সম্পর্ক নেই। এবং সম্বোধনেরও বাংলায় পৃথক কোনো অস্তিত্ব নেই। কাজেই আমরা বাংলায় **কর্তৃকারক, কর্মকারক, করণকারক, নিমিত্ত কারক, অপাদান কারক** এবং **অধিকরণ কারক**—এই ছয়টি কারক আছে বলেই মনে করি।

বাক্যে কারক-সম্পর্ক প্রকাশের জন্য কতকগুলি চিহ্ন থাকে (কর্তৃকারক ছাড়া)। সেই চিহ্নগুলিকে বলা হয় **বিভক্তি**। দেখে নেব প্রতিটি কারকের জন্য বাংলা ভাষায় কোন্ কোন্ বিভক্তি আছে।

১. কর্তৃকারক

বাক্যের ক্রিয়ার চালকের কারকই কর্তৃকারক। বাংলায় এর নাম কর্তৃপদ। বাংলায় কর্তৃকারকের নিজস্ব কোনো বিভক্তিচিহ্ন নেই। বাংলা ভাষায় কর্তা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শূন্যবিভক্তিতে প্রকাশিত—

গোপাল প্রতিদিন মাঠে যায়।

রাম সকালে চা খায়।

কিন্তু দু-একটি ক্ষেত্রে কর্তৃকারকে -'এ', -'তে', -'য়' বিভক্তি হয়—

ছাগলে কী না খায়।
পাগলে কী না বলে।
বাঘে-গোরুতে একই ঘাটে জল খায়।

২. কর্মকারক

বাক্যের কর্মপদের কারকই কর্মকারক। কর্মকারকের বিভক্তিচিহ্ন -'কে', -'রে'—

মা তাঁর **ছেলেকে** পড়াচ্ছেন।
মেয়েটাকে কষ্ট দিয়ো না।
'আমারে ডাক দিল কে ভিতরপানে'।

কখনো-বা '-এ' বা '-য়' বিভক্তিও হয়—

'অন্ধজনে দেহো আলো'....।
আমায় কী করতে হবে বলো।

আবার শূন্যবিভক্তিও হতে পারে—

আমি **বইটা** পড়েছি।
ছেলেটি এখন **ভাত** খাচ্ছে।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, -'রে' বিভক্তি প্রধানত কবিতায় এবং উপভাষায় পাওয়া যায়।

৩. করণ কারক

বাক্যের কর্তা বা কর্তৃপদ যার সাহায্যে ক্রিয়া সম্পাদন করে তার কারকই করণ কারক। করণ কারক বহু ক্ষেত্রে প্রকাশিত হয় অনুসর্গের সাহায্যে—'দ্বারা', 'দিয়ে'/'দিয়া', 'কর্তৃক' ইত্যাদি দিয়ে।

এই কলম **দিয়ে** লেখো।
তার **দ্বারা** এ-কাজ হবে না।

তবে অনেকসময় '-এ', '-তে', '-য়' প্রভৃতি বিভক্তি চিহ্নও ব্যবহৃত হয়—

এই কটি **টাকায়** কাজ হবে না।
এই **কলমে** ভালো লেখা হয়।
ছুরিতে হাত কেটেছে।

৪. নিমিত্ত কারক

যার জন্যে বাক্যে ক্রিয়াসম্পাদন হয় তার কারকই নিমিত্ত কারক। 'নিমিত্ত' অর্থ বোঝাতে যে-কারক, তা-ই নিমিত্ত কারক। এই কারকের বিভক্তিচিহ্ন '-এ', '-এর', '-র' ইত্যাদি। কখনো-কখনো অনুসর্গও ব্যবহৃত হয়—জন্য।

বলির পাঁঠা, **বন্যাত্রাণে** টাকা তোলা, **খেলার** মাঠ, **জ্বরের জন্য** দুর্বল।

৫. অপাদান কারক

বাক্যে ক্রিয়াসম্পাদন যে স্থান বা উৎস থেকে হয়, তার সঙ্গে ক্রিয়ার সম্পর্কের নাম অপাদান কারক। অপাদান কারকে স্খলন, উদ্‌গম ইত্যাদি বোঝায়। অপাদান কারকের

প্রধান বিভক্তিচিহ্ন হল—'হইতে', 'থেকে', 'হতে' ইত্যাদি অর্থাৎ এইসব অনুসর্গ। কখনো-কখনো শূন্যবিভক্তি আবার কখনো-বা '-য়' বা '-এ', '-তে', '-এর' এবং '-র'

'বন **থেকে** বেরোল টিয়ে'।
কলকাতা **থেকে** এসেছে।
'তরী **হতে** তীর'
দুধে ছানা হয়।
টাকায় টাকা হয়।
'সমুদ্রে পেতেছি শয্যা, **শিশিরে** কী ভয়?'

৬. অধিকরণ কারক

ক্রিয়াসংঘটনের আধার বা স্থান, অভিমুখ ও কাল বা সময়কেই অধিকরণ কারক বলে। অধিকরণ কারকে যেসব বিভক্তিচিহ্ন ব্যবহৃত হয় সেগুলি হল—'-তে', '-এ' বা '-য়', '-এতে'। এ ছাড়া শূন্য বিভক্তিও দেখা যায়—

গাছে আছে ফল।
বনে থাকে বাঘ।
মেঝেতে বসে আছে।
বাঁদিকে যাও।
আমি **বাড়ি** থাকব।

অনুসর্গের ব্যবহারও হয়ে থাকে অধিকরণ কারকে—

বাড়ির মধ্যে কে?
কীসের মধ্যে কী?

আগেই বলা হয়েছে, সম্প্রদান ও সম্বন্ধ এই দুটিকে বাংলায় কারক পর্যায়ে ফেলা যায় না। সম্প্রদান প্রকৃতপক্ষে কর্মকারকের সঙ্গে অভিন্ন। সম্বন্ধ একটি পদ, বাক্যে ক্রিয়ার সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক না-থাকায় ওটি কারক নয়।

২৬.১২ বাচ্য

বাংলা বাক্যে কর্তা ও কর্মের প্রতি ক্রিয়ার অনুগামিতা দিয়ে বাচ্য নির্ধারিত হয়। অর্থাৎ দেখা হয় ক্রিয়া কার অনুগামী, কর্তার, না কর্মের। সংস্কৃতের অনুসরণে বাংলায় দীর্ঘকাল যাবৎ চারটি বাচ্যের কথা বলা হয়েছে—কর্তৃবাচ্য (Active Voice), কর্মবাচ্য (Passive Voice), ভাববাচ্য (Neuter Voice), এবং কর্মকর্তৃবাচ্য (Quasi-passive Voice)।

প্রথাগত ব্যাকরণে কোন্‌টি কেমন তা দেখে নেওয়া যাক—

কর্তৃবাচ্য

যে-বাক্যের ক্রিয়া প্রত্যক্ষভাবে কর্তৃপদের দ্বারা বা কর্তার দ্বারাই চালিত হয়, এবং কর্তার পুরুষ অনুসারে ক্রিয়াপদটির রূপ প্রকাশিত হয়, তা-ই কর্তৃবাচ্য। কর্তৃবাচ্যের বৈশিষ্ট্য

হল—১. এতে কর্তা ও উদ্দেশ্য অভিন্ন ; ২. এই বাচ্যে প্রধানত শূন্য বিভক্তি হলেও কখনো-কখনো -এ/-য় বা -তে বিভক্তিও ব্যবহৃত হয় ; ৩. ক্রিয়া কর্তার অনুগামী।

শ্রীলেখা বই **পড়ে**।

তুমি কাল **এসো**।

আমি সেই কথাই **ভাবছি**।

লক্ষণীয় যে, প্রথম পুরুষ (শ্রীলেখা) অনুযায়ী ক্রিয়ারূপ হয়েছে (পড়ে) ; মধ্যম পুরুষ (তুমি) অনুযায়ী ক্রিয়া হয়েছে (এসো) এবং উত্তমপুরুষ (আমি) অনুযায়ী ক্রিয়া হয়েছে (ভাবছি)।

কর্মবাচ্য

কর্মবাচ্যে কর্মপদেরই গুরুত্ব বা প্রাধান্য। কোনো বাক্যে বিধেয় অংশ যদি কর্তার কাজ করে এবং ক্রিয়ার রূপ যদি সেই বিধেয় অংশের উপরই নির্ভর করে, তবে তাকেই কর্মবাচ্য বলা হবে। এখানে "কর্মই মুখ্যরূপে প্রতীয়মান," বলেছেন সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।

তাঁর দ্বারা কাজটি সম্পন্ন হল।

তিনি সকলের দ্বারা প্রশংসিত হয়েছেন।

এই দুটি বাক্যে 'কাজটি' কর্মপদ এবং ক্রিয়া 'সম্পন্ন হল' এবং 'প্রশংসিত হয়েছেন' কর্মেরই অনুগামী। কর্মবাচ্যের বৈশিষ্ট্য হল—(১) এতে প্রাধান্য পায় কর্মপদ ; (২) ক্রিয়া কর্মের অনুগামী ; (৩) কর্ম সচরাচর বিভক্তিহীন হলেও কখনো-কখনো '-কে' বা '-রে' বিভক্তিও যুক্ত হয়।

ভাববাচ্য

যে-বাচ্যে কর্তা বা কর্মের পরিবর্তে 'ভাব' অর্থাৎ ক্রিয়াই প্রাধান্য পায়, তা-ই ভাববাচ্য। ভাববাচ্যে ক্রিয়াটি ক্রিয়াবিশেষ্য হয়ে কর্তার স্থান নেয়।

আপনার কোথায় **থাকা হয়**?

কোথায় **যাওয়া হচ্ছে**?

আজকাল তোমার কী **করা হয়**?

ভাববাচ্য অকর্মক ও সকর্মক উভয়-প্রকার ক্রিয়াতেই হয়ে থাকে। উপরের বাক্যগুলিতে দেখা যাচ্ছে যে—১. মূল কর্তা (আপনার, তোমার) সম্বন্ধপদে পরিণত ; (২) ক্রিয়া অপেক্ষা ক্রিয়াবিশেষ্যই এখানে প্রাধান্য পাচ্ছে।

কর্মকর্তৃবাচ্য

কর্মকর্তৃবাচ্যে কর্মই আপাতভাবে 'নিজের উপর ক্রিয়া করে'। অর্থাৎ কর্মপদ কর্তার মতো ভূমিকা পালন করে। ফলে কর্মকর্তৃবাচ্যে ক্রিয়ার প্রকৃত কর্তা নির্ধারণ করা কঠিন হয়ে পড়ে—

মন্দিরে ঘণ্টা বাজছে।

'ওই বুঝি বাঁশি বাজে'।

বাচ্য সম্বন্ধে আধুনিক ধারণা

বাচ্য সম্বন্ধে পুরোনো ধারণা এখন অনেকটাই বর্জিত হয়ে গেছে। কর্তৃবাচ্য নিয়ে কোনো সংশয় বা বিতর্ক নেই। কিন্তু কর্মবাচ্য ও কর্মকর্তৃবাচ্য নিয়ে বিতর্ক হয়েছে প্রচুর। সুনীতিকুমার তাঁর 'ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ' গ্রন্থে বলেছেন বাংলায় প্রকৃত কর্মবাচ্য ও কর্মকর্তৃবাচ্য নেই। এ-বিষয়ে গভীরতর বিশ্লেষণ করেছেন মণীন্দ্রকুমার ঘোষ তাঁর 'কর্মকর্তৃবাচ্য' ও 'বাংলা বাক্যবিন্যাসে কর্মবাচ্য' নামে দুটি প্রবন্ধে।

যাকে কর্মবাচ্য বলা হয়ে থাকে তাকে সুনীতিকুমার ও মণীন্দ্রকুমার কর্মবাচ্য বলে মেনে নেননি।

অশোককে দেখা যাচ্ছে না।
পাখিটিকে গুলি করা হল।

এই দুটিকে কর্মবাচ্য বলা হত, কেননা এই বাক্যে কর্মপদ প্রাধান্য পেয়েছে। মণীন্দ্রকুমার ঘোষ সংগতভাবেই বলেছেন যে, **কর্মপদ প্রাধান্য পেলেও তা উদ্দেশ্য পদে পরিণত হয়নি**। দ্বিতীয়ত, **কর্মপদ** অর্থের দিক থেকে প্রাধান্য পেলেও বাক্যের **গঠনের দিক থেকে প্রাধান্য পায়নি**। তৃতীয়ত, ক্রিয়ার সঙ্গে কর্মপদের অন্বয়ও ঘটছে না। প্রকৃতপক্ষে **এগুলি ভাববাচ্যের বাক্য**। আমরা বলতে পারি উপরের বাক্যদুটিতে কর্তৃপদ যথাক্রমে (১) অশোককে দেখা এবং (২) পাখিটিকে গুলি করা। এই দুটি বাক্যে 'দেখা' ও 'করা' ক্রিয়াগুলি কর্তৃপদ দখল করছে এবং তারই সঙ্গে অন্বিত হয়েছে 'যাচ্ছে না' ও 'হল' ক্রিয়াদুটি।

আবার নীচের বাক্যগুলি কর্তৃবাচ্যের বাক্য—

আমি ধরা পড়ে গেছি।
চোরটি উধাও হয়েছে।
এই শহরে একটি হাসপাতাল স্থাপিত হয়েছে।

এগুলি কর্তৃবাচ্য, কেননা প্রত্যেকটি বাক্যে কর্তৃপদের সঙ্গেই ক্রিয়ার অন্বয় (আমি—পড়ে গেছি; চোরটি—হয়েছে ; হাসপাতাল—হয়েছে)।

অন্য দিকে, পুরোনো মতে যেগুলিকে ভাববাচ্য বলা হত, সেগুলি প্রকৃতই ভাববাচ্য—

আপনার কোথায় যাওয়া হচ্ছে?
প্রচুর খাওয়া হল।

এসব বাক্যে তথাকথিত কর্তৃপদের সঙ্গে ক্রিয়ার অন্বয় দেখা যাচ্ছে না। বিশেষ্যের রূপে যে-ক্রিয়া রয়েছে তার সঙ্গে অর্থাৎ ক্রিয়াবিশেষ্যের সঙ্গেই ক্রিয়ার অন্বয় এবং বাক্যে এই ক্রিয়াভাবই প্রাধান্য পাচ্ছে। এগুলি তাই ভাববাচ্য।

এবারে বলা যাক তথাকথিত কর্মকর্তৃবাচ্যের কথা। যাকে সংস্কৃতের অনুসরণে কর্মকর্তৃবাচ্য বলা হয়, তা প্রকৃতপক্ষে কর্তৃবাচ্য।

বাঁশি বাজে ; ঘণ্টা বাজে
বৃষ্টি হচ্ছে

সংস্কৃতে 'কর্মকর্তা' বলতে বোঝায় সেই পদকে বা কর্মকে যেখানে কর্ম নিজেই সম্পন্ন

হয় কারক-সাহায্য ছাড়া। এবং যে-বাক্যে কর্মকর্তার প্রাধান্য তা-ই কর্মকর্তৃবাচ্য। উপরের বাক্যগুলিকে কর্ম নিজে নিজে সিদ্ধ হচ্ছে একথা সত্য। কিন্তু মণীন্দ্রকুমার ঘোষ বলেছেন যে, বাচ্যের মূল কথাই হল ক্রিয়ার সঙ্গে সম্বন্ধ বা অন্বয়—ব্যাকরণগত অন্বয়। এই বাক্যগুলিতে ক্রিয়ার সঙ্গে অন্বয় হয়েছে কর্তৃপদের—বাঁশি, ঘণ্টা, বৃষ্টি এই তিনটির। তাই এরা কর্তৃবাচ্যের বাক্য।

২৬.১৩ পুরুষ

ব্যাকরণে 'পুরুষ' বলতে তিন ব্যক্তিকে বোঝায়—(১) বক্তা নিজে, (২) যাকে বলা হচ্ছে সেই ব্যক্তি, এবং (৩) বক্তা ও যাকে বলা হচ্ছে সে ছাড়া অন্য ব্যক্তি। প্রথম জন **উত্তম পুরুষ**, দ্বিতীয় **মধ্যম পুরুষ** এবং তৃতীয় **প্রথম পুরুষ**, ইংরেজিতে যা যথাক্রমে First Person, Second Person ও Third Person.

মনে রাখতে হবে কেবল বিশেষ্য ও সর্বনামেরই পুরুষ হয়। আমরা বিভিন্ন পুরুষের দৃষ্টান্তগুলি দেখে নেব।

উত্তম পুরুষ

একবচন	**বহুবচন**
আমি	আমরা

পুরুষভেদে ক্রিয়াপদের রূপান্তর বা পরিবর্তন হয়। কিন্তু ক্রিয়ার বচনভেদ নেই।

আমি খাই, আমি দেখি
আমরা খাই, আমরা দেখি

মধ্যম পুরুষ

বাংলা ভাষায় মধ্যম পুরুষের তিনটি রূপভেদ আছে—সাধারণ, সম্ভ্রমাত্মক ও তুচ্ছাত্মক।

সাধারণ মধ্যম পুরুষ—

একবচন	**বহুবচন**
তুমি খাও	তোমরা খাও
তুমি যাও	তোমরা যাও

সম্ভ্রমাত্মক মধ্যম পুরুষ

আপনি খান	আপনারা খান
আপনি যান	আপনারা যান

তুচ্ছাত্মক মধ্যম পুরুষ

তুই খাস	তোরা খাস
তুই যাস	তোরা যাস

তুচ্ছাত্মক মধ্যম পুরুষে অনুজ্ঞায় কিছু তফাত হয়—

অনুজ্ঞাবাচক তুচ্ছাত্মক মধ্যম পুরুষ

তুই যা	তোরা যা
তুই খা	তোরা খা

প্রথম পুরুষ

প্রথম পুরুষের দুটি রূপভেদ—সাধারণ ও সম্ভ্রমাত্মক।

সাধারণ প্রথম পুরুষ

সে খায়	তারা খায়

সম্ভ্রমাত্মক

তিনি খান	তাঁরা খান

প্রথম পুরুষের সাধারণ রূপের আরও দৃষ্টান্ত—ও, ওরা ; যে, যারা ; যার, যাদের ; সম্ভ্রমাত্মক রূপ—ওঁ, ওঁরা ; যিনি, যাঁরা ; যাঁর, যাঁদের ; তাঁর, তাঁদের।

পুরুষভেদে ক্রিয়াপদের যে রূপভেদ হয় তা উপরের উদাহরণেই দেখা যাচ্ছে—

আমি, আমরা — খাই
তুমি, তোমরা — খাও
সে, তারা — খায়
তিনি, তাঁরা — খান

গ্রন্থপঞ্জি

ইসলাম, রফিকুল—ভাষাতত্ত্ব (১৯৮৬)
গোস্বামী, কৃষ্ণপদ—বাংলা ভাষাতত্ত্বের ইতিহাস (২০০১)
ঘোষ, অরুণ—বাংলা ভাষাচর্চা (১৯৯৬)
চট্টোপাধ্যায়, হীরেন—ভাষাতত্ত্ব ও বাংলা ভাষার ইতিহাস (১৯৯৩)
চাকী, জ্যোতিভূষণ—বাংলা ভাষার ব্যাকরণ (১৯৯৬)
ভট্টাচার্য, পরেশচন্দ্র—ভাষাবিদ্যা পরিচয় (১৯৯৩)
ভট্টাচার্য, সুভাষ—১. বাঙালির ভাষা (২০০০)
২. ভাষা ও শৈলী (২০০৬)
মাইতি, প্রকাশ কুমার—আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানের আলোকে বাংলা ভাষা (২০০৮)
সরকার, পবিত্র—১. ভাষাজিজ্ঞাসা, নবম-দশম (১৯৯১)
২. বাংলা ব্যাকরণ প্রসঙ্গ (২০০৬)
মুখোপাধ্যায়, অশোক—ব্যাকরণ অভিধান (২০০৫)

২৭. বাংলা ভাষার বাক্যরীতি

২৭.১. বাক্য কী?

বাক্য বলা বা তৈরি করা যত সহজ, বাক্যের সংজ্ঞার্থ দেওয়া তত সহজ নয়। সাধারণভাবে প্রথাগত ব্যাকরণে বলা হয় যে, বাক্য হল এমন কতকগুলো পদের সম্মিলন যাতে একটা সম্পূর্ণ অর্থ বা মনোভাব প্রকাশ পায়। কিন্তু এই ধরনের সংজ্ঞার্থে অস্পষ্টতা থেকেই যায়। সংগঠনগতভাবে একটামাত্র পদ নিয়েও বাক্য তৈরি হতে পারে। কাজে কাজেই 'কতকগুলো পদ' বাক্যে থাকবেই এমন কথা বলা যায় না। দ্বিতীয়ত, একটিমাত্র পদ কি সম্পূর্ণ মনোভাব বা অর্থ প্রকাশ করতে পারে? এর উত্তরও কিন্তু উপরের ওই সংজ্ঞার্থে পাওয়া যাচ্ছে না। সম্পূর্ণ মনোভাব প্রকাশ না করলেও কি বাক্য হয় না? **এখনই যেতে হবে**? **চললে**? এসব কি বাক্য নয়?

এডওয়ার্ড সাপির বলেছেন, বাক্য দিয়ে কোনো-একটি বক্তব্যকে বা ভাবকে প্রকাশ করা হয়—'It (the sentence) is the linguistic expression of a proposition'. সাপিরের এই বক্তব্য গ্রহণ করা গেলেও তাঁর পরের কথাটি এখনকার ভাষাবিজ্ঞানীরা তেমন মানেন না। তিনি বলেছেন, 'It combines a subject of discourse with a statement in regard to this subject.' ইংরেজ ভাষাবিদ সিমিয়ন পটারও একই কথা বলেছেন, তবে একটু অন্যভাবে বলেছেন, 'In all the Indo-European languages the sentence is normally bipartite. Basically it is a two-in-one. It is a binary unit' বাক্যের এই দুই ভাগে বিভাজন বা উদ্দেশ্য ও বিধেয় এই দুই ভাগে বিভাজন বাক্যকে যে বুঝতে তেমন সাহায্য করে না, একথা আমরা পরে দেখব। এখানে কেবল এটুকুই আমরা বলতে চাই যে, আধুনিক ভাষাবিজ্ঞান বাক্যের সংজ্ঞার্থ দিতে গিয়ে বাক্যের সংগঠনের কথাই বলে। বলা হয় যে, বাক্য হল কতকগুলি ব্যাকরণগত উপাদান দিয়ে গঠিত ভাষার বৃহত্তম স্বয়ংসম্পূর্ণ একক। এই সংজ্ঞার্থ অনুসারে একটিমাত্র পদেরও বাক্য হতে অসুবিধে থাকার কথা নয়—

তুমি কি বইটা পড়েছ?
পড়েছি।

প্রথমটি যেমন বাক্য, দ্বিতীয়টিও তেমনই বাক্য। 'পড়েছি' পদটিও যেহেতু সম্পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করছে, সেইজন্য একে আমরা বাক্য বলব।

২৭.২ বাংলা বাক্যের বিশ্লেষণ

বাক্যের বিশ্লেষণ বলতে বুঝি বাক্যের উপাদানগুলিকে চিহ্নিতকরণ। প্রথাগত ব্যাকরণে

বাক্যের দুটি প্রধান উপাদানের কথা বলা হয় বা হত—উদ্দেশ্য ও বিধেয়। বাক্যে যাকে উদ্দেশ করে কিছু বলা হয়, তাকে বলা হয় উদ্দেশ্য, এবং এই উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যা বলা হয় তা-ই বিধেয়। ভাষাবিজ্ঞানী পটার যখন বলেন যে, বাক্য হল একটা দুই অংশে বিভক্ত একক (two-in-one) তখন তিনি এই উদ্দেশ্য আর বিধেয়কে (ইংরেজিতে যা যথাক্রমে subject ও predicate) মাথায় রেখেই ও-কথা বলেন। যখন বলব *আমি গতকালই দিল্লি থেকে ফিরেছি*, তখন আমি পদটি উদ্দেশ্য এবং বাকি অংশ বিধেয়। বলা বাহুল্য, উদ্দেশ্য এইরকম একটি পদের হতে পারে, আবার বহুপদযুক্তও হতে পারে। *তোমার দুই বন্ধু কাল এসেছিল*—এই বাক্যে তোমার *দুই বন্ধু* উদ্দেশ্য। উদ্দেশ্য বাক্যের প্রথমে বসতে পারে, শেষেও বসতে পারে।

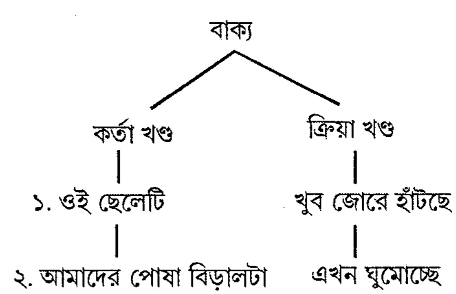
কিন্তু আধুনিক ভাষাবিজ্ঞান দেখিয়েছে যে, বাক্যের এই সাবেক উদ্দেশ্য-বিধেয় বিভাজনে বাক্যের সংগঠন ঠিকমতো বোঝা যায় না। বাক্যের অন্তর্গত পদগুলোর সংস্থান ও বাক্যের বিভিন্ন পদের পারস্পরিক সম্পর্কও ওতে ধরা পড়ে না। এখন তাই উদ্দেশ্য-বিধেয়র বদলে বাক্যকে একটু অন্যভাবে ভাগ করা হয়। তা হল Noun Phrase বা NP, এবং Verb Phrase বা VP. বাংলায় এদের যথাক্রমে কর্তাখণ্ড ও ক্রিয়াখণ্ড বলা যেতে পারে, কিংবা বিশেষ্যগুচ্ছ ও ক্রিয়াগুচ্ছ।

যেকোনো বাক্যকেই কর্তাখণ্ড ও ক্রিয়াখণ্ড এই দুই ভাগে ভাগ করে দেখানো যায়। কর্তাখণ্ডে থাকবে বিশেষ্য, সর্বনাম, বিশেষণ, সর্বনামীয় বিশেষণ, নির্দেশক, বিভক্তি ও প্রত্যয়। এই সবকিছু নিয়েই কর্তাখণ্ড। তার মানে অবশ্য এই নয় যে, যেকোনো বাক্যেই কর্তাখণ্ডের মধ্যে এর সবগুলোই থাকবে। ছোটো সরল বাক্যে এতগুলো উপাদান না থাকতেই পারে। অন্য দিকে ক্রিয়াখণ্ডে কেবল যে ক্রিয়াপদই থাকবে তা নয়। থাকবে ক্রিয়াপদ, স্থানবাচক ও কালবাচক ক্রিয়াবিশেষণ, গৌণকর্ম ও মুখ্যকর্ম। কয়েকটা বাক্য নিয়েই এই দুই ভাগ দেখানো যেতে পারে।

১. ওই ছেলেটি খুব জোরে হাঁটছে।

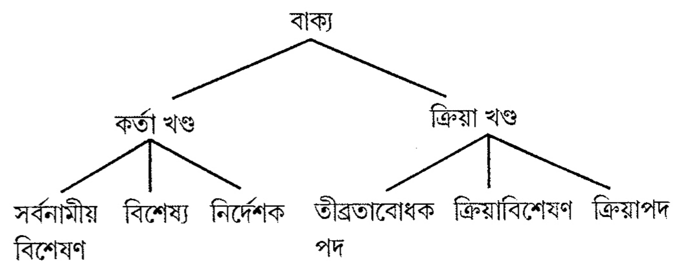
২. আমাদের পোষা বিড়ালটা এখন ঘুমোচ্ছে।

এই বাক্যদুটোকে এভাবে দেখানো যায়—

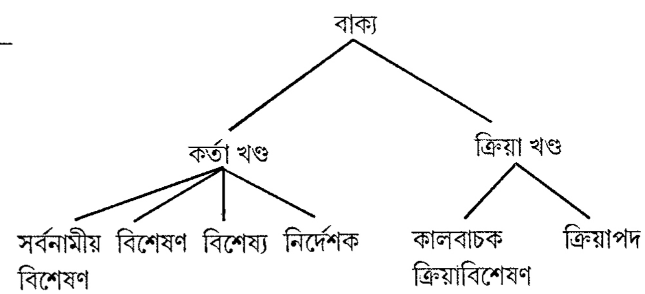


প্রথম বাক্যের কর্তাখণ্ডে আছে একটি সর্বনামীয় বিশেষণ 'ওই', বিশেষ্য 'ছেলে', আর নির্দেশক 'টি'। তাহলে দাঁড়াল—সর্বনামীয় বিশেষণ, বিশেষ্য, নির্দেশক। ক্রিয়াখণ্ডে আছে তীব্রতাবোধক পদ বা intensifier 'খুব', ক্রিয়াবিশেষণ 'জোরে', এবং ক্রিয়াপদ 'হাঁটছে'। দ্বিতীয় বাক্যের কর্তাখণ্ডে আছে সর্বনামীয় বিশেষণ 'আমাদের', বিশেষণ 'পোষা', বিশেষ্য 'বিড়াল', এবং নির্দেশক '-টা'। ক্রিয়াখণ্ডে আছে কালবাচক ক্রিয়াবিশেষণ 'এখন' এবং ক্রিয়াপদ 'ঘুমোচ্ছে'। এই দুটি বাক্যকে যখন কর্তাখণ্ড (বা বিশেষ্যগুচ্ছ) এবং ক্রিয়াখণ্ডে (বা ক্রিয়াগুচ্ছ) ভাগ করছি তখন ওই দুই ভাগে কী কী থাকছে তা দেখানো যায় এইভাবে—

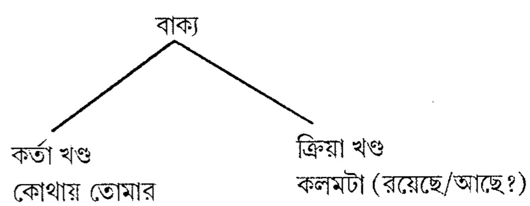
প্রথম বাক্যে—



দ্বিতীয় বাক্যে—



একথা বলাই বাহুল্য যে, বাংলা বাক্যের গঠন এতটা সরল না হতেই পারে। নেওয়া যাক আর একটা বাক্য—কোথায় তোমার কলমটা? কীভাবে ভাগ করব একে?



তার মানে এখানে কর্তাখণ্ডে পাচ্ছি একটা স্থানবাচক সর্বনাম আর সর্বনামীয় বিশেষণ। ক্রিয়াখণ্ডে বিশেষ্য ও নির্দেশক (এবং উহ্য ক্রিয়াপদ)।

বাক্যে পদক্রমও অন্য রকমের হতে পারে। অর্থাৎ ক্রিয়াখণ্ড চলে আসতে পারে আগে, কর্তাখণ্ড চলে যেতে পারে পরে।

আগেকার উদ্দেশ্য-বিধেয় ব্যাপারটার চেয়ে কর্তাখণ্ড (বা বিশেষ্যগুচ্ছ) ও ক্রিয়াখণ্ডের বা ক্রিয়াগুচ্ছ) ভাগ যে বাংলা বাক্যের সংগঠন বুঝতে একটু বেশিই সাহায্য করে, তা আশা করি আমাদের এই আলোচনা থেকে বোঝা যাবে।

২৭.৩ অন্বয়

বাক্যের অন্বয় সম্বন্ধে পুরোনো বা প্রথাগত ধারণা অনেকাংশেই বদলে গেছে। অথচ আজ পর্যন্ত এই অন্বয় সম্পর্কে সর্বমান্য ও সুনির্দিষ্ট কোনো ব্যাখ্যা পাইনি আমরা। তবে অন্বয় সম্বন্ধে ভাষাবিজ্ঞানের সাম্প্রতিক এলাকায় যে ব্যাখ্যা আধারিত রয়েছে তা বুঝে নিতে হলে, কিংবা তা বুঝে নেবার আগে, অন্বয় সম্বন্ধে দীর্ঘকাল যে-ধারণা ব্যাকরণে তৈরি করে দেওয়া হয়েছিল সেকথা বলা দরকার।

এই অধ্যায়ের গোড়ার দিকে বলা হয়েছে যে, বাক্যই ভাষার বৃহত্তম একক (unit)। পাঠকের দিক থেকে একটা প্রশ্ন এখানে আসতে পারে—অনুচ্ছেদ তো বাক্যের চেয়েও বড়ো। কেন তবে আমরা বাক্যকেই ভাষায় বৃহত্তম একক বলছি? এর সহজ উত্তর এই। অনুচ্ছেদের প্রসঙ্গ এখানে অবান্তর। কেননা বাক্যের সঙ্গে বাক্য জুড়ে-জুড়েই তৈরি হয় অনুচ্ছেদ। কাজেই অনুচ্ছেদ হল বাক্যেরই প্রসারিত রূপ।

প্রথাগত ব্যাকরণে অন্বয় বা syntax বলতে মূলত বোঝানো হত পদক্রমকে, যেন পদক্রমই অন্বয়। বাক্য তৈরি হয় কতকগুলো ভাষিক উপাদান নিয়ে। আরও নির্দিষ্টভাবে, শাব্দিক উপাদান বা lexical item নিয়ে। সেই শাব্দিক উপাদানগুলো বাক্যে কীভাবে এবং কোন ক্রমে বসবে তার নিয়ম বিশ্লেষণ ও বর্ণনাকেই অন্বয় বলা হত। মান্য চলিত বাংলায় বাক্যে শব্দগুলির স্বাভাবিক ক্রম হল কর্তা-কর্ম-ক্রিয়া বা SOV (subject-object-verb)। 'ছেলেটি ভাত খাচ্ছে', 'তোমার মা তোমার ভাইকে স্নান করাচ্ছেন' ইত্যাদি বাক্যে এই সূত্রেরই প্রকাশ দেখা যায়। অবশ্য এই পদবিন্যাসকে কেবল প্রাথমিক বলা যায়। কেননা কর্তার সম্প্রসারণ, কর্মের সম্প্রসারণ ইত্যাদির কথাও বলে রাখতে হবে। আবার ক্ষেত্রবিশেষে পদবিন্যাসের বা পদক্রমের এই মূলসূত্রেও হেরফের ঘটে, ঘটানো হয়। উদ্দেশ্য আগে না থেকে পরে চলে যেতে পারে, বিধেয় চলে আসতে পারে তার আগে। একে পদক্রমের বিপর্যাস বলা হয়।

প্রথাগত ব্যাকরণের কর্তা-কর্ম-ক্রিয়া পদক্রমের এই সূত্রটির ত্রুটি সহজেই ধরা যায়। এর প্রধান অসুবিধে এই যে, এতে দুই ধরনের বর্গবিভাগ (classification) মিশিয়ে ফেলা হচ্ছে। কর্তা আর কর্ম এই দুটি হল বাক্যিক উপাদান (element)। অন্য দিকে, ক্রিয়া হল একটি পদনাম বা পদশ্রেণির নাম (word class)। এই কারণেই, আগেই বলা হয়েছে, বিশেষ্যগুচ্ছ (NP) ও ক্রিয়াগুচ্ছ (VP) নামদুটি আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানে ব্যবহার করা হয়।

বাক্যবিশ্লেষণে প্রথাগত ব্যাকরণের অক্ষমতাকে মনে রেখে বাক্যকে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করার সঠিক উপায় বার করতে সচেষ্ট হলেন সংগঠনবাদী ভাষাবিজ্ঞানীরা (structuralist linguists)। তাঁরা বললেন, অন্বয় শুধু পদক্রম নয়। অন্বয় দিয়েই বাক্যকে বা বাক্যের সংগঠনকে বোঝা যায়। তাঁরা দেখালেন যে অন্বয় বলতে তিনটি ব্যাপার বুঝতে হবে—১. পদক্রম, ২. বাক্যের অন্তর্গত পদগুলির সংস্থান, অর্থাৎ রূপগত পরিবর্তন ও পারস্পরিক সম্পর্ক, এবং ৩. বাক্যটিকে বড়ো থেকে ছোটো অংশে ভাগ করা। এই ভাগ করার সময় দেখতে হবে যেন কেবল নিকট-সম্পর্কযুক্ত পদগুলিই এক-একটি গুচ্ছে একসঙ্গে থাকে। এই নিকট-সম্বন্ধযুক্ত পদকে immediate constituents (IC) বা *অব্যবহিত উপাদান* বলেন তাঁরা। আমরা একটি-দুটি বাংলা বাক্য নিয়ে এই অব্যবহিত উপাদান বিষয়টিকে একটু দেখে নিতে পারি।

ধরা যাক এই বাক্যটি—

চন্দন ছুটির দিনে বাড়ি থেকে বেরোয় না

অব্যবহিত উপাদানে ভাঙা যায় স্তরে স্তরে—

১. চন্দন/ছুটির দিনে বাড়ি থেকে বেরোয় না
২. ছুটির দিনে/বাড়ি থেকে বেরোয় না
৩. ছুটির/দিনে
৪. বাড়ি থেকে/বেরোয় না
৫. বাড়ি/থেকে
৬. বেরোয়/না

এইভাবে ভাগ করে আমরা কতগুলো ভাষিক উপাদান পাই যেগুলো তার নিকটবর্তী উপাদান থেকে আলাদা হয়েও ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধযুক্ত। অব্যবহিত উপাদান বিশ্লেষণের সময় অবশ্যই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের কথাটা খেয়াল করতে হবে। চন্দন ছুটির/দিনে বাড়ি/থেকে বেরোয়/না এভাবে ভাগ নিশ্চয় করব না, কেননা তাতে বাংলা বাক্যের ভাব-অর্থ-ছন্দ সবই বিপর্যস্ত হয়ে পড়বে।

এখানে আমরা এও লক্ষ করব যে, অব্যবহিত উপাদান বিশ্লেষণও ত্রুটিহীন নয়। এটা যেন কিছুটা যান্ত্রিক। এই পদ্ধতি বাক্যের স্বরূপ ও সংগঠন বুঝতে কিছুটা সাহায্য করলেও বাক্য-উপাদানগুলোর চরিত্রলক্ষণ (identity) বুঝতে তেমন সাহায্য করে না। বাক্যপ্রকরণকে আরও গভীরভাবে বোঝার জন্য অন্য পদ্ধতির সন্ধান করা হতে লাগল। সবচেয়ে বড়ো কথা অন্বয় দিয়ে কেবল তো বাক্যের সংগঠন বোঝা নয়, বাক্য সৃষ্টির অন্তর্নিহিত সূত্র বা নিয়মও তো জেনে নেওয়া চাই। শুধু এও তো নয়। একই চেহারার একাধিক বাক্যে যে অর্থ বা ভাবের পার্থক্য থাকতে পারে তা-ও তো অব্যবহিত উপাদান থেকে ধরা যায় না।

মার্কিন ভাষাবিজ্ঞানী নোয়াম চমস্কি অন্বয়কে দেখেছেন অন্যভাবে (তাঁর তত্ত্ব অবশ্য

১৯৫৭ সাল থেকে ১৯৬৫-র মধ্যে এবং তার পরে সত্তরের দশক পর্যন্ত অনেকটাই বদলে গেছে)। চমস্কির ব্যাকরণে বাক্যতত্ত্বের উদ্দেশ্যই হল ভাষার সম্ভাব্য সমস্ত বাক্যকে ব্যাখা করা এবং সমস্ত সম্ভাব্য বাক্য তৈরির সূত্র নির্ণয় করা। এই তত্ত্বই *সঞ্জননী-সংবর্তনী ব্যাকরণ* বা Transformational-Generative Grammar (TG) নামে পরিচিত। চমস্কির তত্ত্ব যে সকলেই নির্দ্বিধায় গ্রহণ করেছেন তা নয়। তবে তার গ্রহণীয়তা আপাতত সবচাইতে বেশি।

আমাদের তৈরি-করা বাক্যে অনেকসময় অস্পষ্টতা ও দ্ব্যর্থকতা থাকে। সেই অস্পষ্টতা ও দ্ব্যর্থকতা নিরসনের কাজটাও ব্যাকরণকে করতে হয়।

মুরগি খাওয়ার জন্য প্রস্তুত

এই বাক্যের দুটো অর্থ হতে পারে—১. মুরগি (খাবার) খাওয়ার জন্য প্রস্তুত এবং ২. (আমি/আমরা) মুরগি খাওয়ার জন্য প্রস্তুত। চমস্কির দৃষ্টান্ত হল—Flying planes can be dangerous. এর একটা সম্ভাব্য অর্থ—উড়ন্ত প্লেন বিপজ্জনক হতে পারে। দ্বিতীয় সম্ভাব্য অর্থ—প্লেন ওড়ানো বিপজ্জনক হতে পারে। চমস্কির নব্যব্যাকরণে এসব অস্পষ্টতা বা দ্ব্যর্থকতা নিরসন হতে পারে বাক্যগুলো রূপান্তরিত করে নিলে, কখনো বাক্যকে বদলে নিয়ে, কখনো নতুন উপাদান জুড়ে দিয়ে, কখনো-বা কোনো উপাদান বাদ দিয়ে।

অনেক সময় একই কথা নানাভাবে বলা যায়, আবার একাধিক অর্থও একটি বাক্য দিয়ে প্রকাশ করা যায়। কখনো দেখা যায় দুটি বাক্যের **বাইরের গঠন** (surface structure) আলাদা কিন্তু মূল অর্থ একই, অর্থাৎ **অন্তর্গঠন** (deep structure) একই, যেমন হয় একই বাক্যের বাচ্যবদলে। আবার কখনো-কখনো এর উলটো ব্যাপারও দেখা যাবে। ভাষায় বাক্যের নানান গঠন, নানান অর্থ থাকে, থাকে নানান সুরও। নব্যব্যাকরণ সে সবই ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করে। কীভাবে একটি সূত্রের সাহায্যে অনন্ত-অসংখ্য সম্ভাব্য বাক্য তৈরি হয়ে পারে? একটি বাক্য দেখব—

লোকটি ধীর পায়ে হাঁটছে

এই বাক্যে 'লোকটি'-র জায়গায় রাম, শ্যাম, কমল, নীলু, মেয়েটি প্রভৃতি শতসহস্র নামশব্দ বসানো যায়। আর তার মানেই নতুন নতুন বাক্য। 'ধীর পায়ে'-র বদলে 'জোর পায়ে' বলা যায়, 'জোরে' বলা যায়। 'হাঁটছে'-র বদলে 'দৌড়াচ্ছে' বলা যায়। আবার 'ধীর পায়ে' কথাদুটো বাদ দিলেও নতুন একটা বাক্য তৈরি হবে। এভাবে কিছু যোগ করে বা কিছু বাদ দিয়ে বা বদলে নিয়ে নতুন-নতুন বাক্য 'সঞ্জনন' করা যায়।

চমস্কি প্রথাগত ব্যাকরণের প্রকরণকে বর্জন করেছেন একথা বললে ভুল হবে। বরং তিনি প্রথাগত ব্যাকরণের 'অন্বয়-ধারণা'-র ঘাটতি পূরণ করতেই চেষ্টা করেছেন। এখন আমরা এও দেখতে পাচ্ছি যে, আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানীদের অনেকেই অন্বয়ের বিশ্লেষণে

পদক্রমের কথাটাকে বর্জন করছেন না, বরং তার অর্থকে সম্প্রসারিত করছেন। The Routledge Companion to Semiotics and Linguistics (Paul Cobley সম্পাদিত, London 2001) বইতে বলা হয়েছে—'Syntax is the part of a grammar which deals with the arrangement of words in sentences. An important part of syntax is the order of words'. (p.273)। আমরা বলতে পারি, প্রথাগত ব্যাকরণ অন্বয়ের বাইরের দিকটা দেখায়, চমস্কি তার ভিতরের দিকটা দেখিয়েছেন।

২৭.৪. বাংলা বাক্যের গঠনগত ভাগ

বাংলা বাক্যের গঠনগত ভাগ প্রধানত তিন রকমের—সরল বাক্য, যৌগিক বাক্য, জটিল বাক্য। চতুর্থ একটা ভাগের কথাও বলা যায়—মিশ্র বাক্য যা আসলে দুই শ্রেণির বাক্যের মিলিত রূপ। একে একে এই চাররকম বাক্যের চেহারা ও স্বরূপটা দেখে নেব আমরা।

সরল বাক্য

স্থূলভাবে সরল বাক্য হল সেই বাক্য যাতে একটিমাত্র সমাপিকা ক্রিয়া থাকবে। এই দিক থেকে বিচার করলে সরল বাক্য হবে এইরকম—

ক. *আমি এখন বাজারে যাব।*
খ. *তার গান আমার ভালো লাগে।*
গ. *মায়ের অসুখের খবর শুনে সে দ্রুত বাড়ির দিকে ছুটল।*
ঘ. *রমেশ এই থানার ও.সি.।*

দৃশ্যত ক, খ, গ বাক্যে একটি করেই সমাপিকা ক্রিয়া। আবার ঘ বাক্যে ক্রিয়াটি উহ্য। গ বাক্যে একের মধ্যে দুটি বাক্য লুকিয়ে আছে—সে মায়ের অসুখের খবর শুনল ; সে দ্রুত বাড়ির দিকে ছুটল। তবু যেহেতু সমাপিকা ক্রিয়া একটিই (ছুটল) তাই একে সরল বাক্যই বলা হবে। বাংলা ভাষায় ক্রিয়াপদকে উহ্য রাখার রীতি দীর্ঘপ্রচলিত। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, বাংলা সরল বাক্য দুরকমের হতে পারে—ক্রিয়াপদযুক্ত সরল বাক্য এবং (আপাতদৃষ্টিতে) ক্রিয়াপদহীন সরল বাক্য। এদিক থেকে দেখলে উপরের বাক্যগুলোর প্যাটার্ন ভিন্ন ভিন্ন।

ক, খ ও গ বাক্যে আছে কর্তাখণ্ড ও ক্রিয়াখণ্ড বা বিশেষ্য গুচ্ছ ও ক্রিয়াগুচ্ছ। ঘ বাক্যে আছে বিশেষ্যগুচ্ছ ও বিশেষ্যগুচ্ছ। উপরের গ বাক্যে *মায়ের অসুখের খবর শুনে* এই অংশকে আমরা অসমাপিকা বাক্যখণ্ড বলতে পারি। পবিত্র সরকার সংগতভাবেই প্রশ্ন তুলেছেন এ-ধরনের বাক্যকে আদৌ সরল বাক্য বলা হবে কি না। আমরা এই কারণেই 'একটিমাত্র সমাপিকা ক্রিয়া'-কে সরল বাক্যের শর্ত বলেছি 'স্থূল' বিচারে। গ বাক্যের অসমাপিকা অংশ অর্থের দিক থেকে বাক্যই বটে, গঠনের দিক থেকে না-হলেও। তবু সাবেক ব্যাকরণের নিয়মে গ বাক্য সরলই।

আকারহীন সরল বাক্য (amorphous sentence)

সব ভাষাতেই এমনকিছু অভিব্যক্তি বা উক্তি আছে যেগুলো ব্যাকরণের নিয়মে বাক্য নয়, কেননা বাক্যের পক্ষে আবশ্যিক উপাদান সেগুলোতে থাকে না। অনেকসময় একটিমাত্র শব্দ নিয়েই তৈরি হতে পারে তেমন অভিব্যক্তি বা উক্তি। কিন্তু অর্থের দিক থেকে সেগুলো বাক্যই। একেই য়েসপেরসেন (Otto Jespersen) বলেছেন amorphous sentence. আমরা বলি আকারহীন বাক্য। তার দৃষ্টান্ত দেখব এবার—

ক. *কতদিন ছিলে ওখানে?*
—সাত দিন।
কতদিন?
—সাত দিন।

খ. *ও আচ্ছা।*

গ. *বেয়ারা, দু-কাপ চা।*

যৌগিক বাক্য

দুটি বা তার বেশি সরল বাক্য সংযোজক দিয়ে যদি এমনভাবে জোড়া হয় যে, বাক্যগুলোর স্বাধীন অর্থ ও স্বাধীন গঠন ক্ষুণ্ণ হবে না, অথচ সবটা মিলে একটাই বাক্যের চেহারা নেবে, তাহলে সেই বাক্যকে যৌগিক বাক্য (compound sentence) বলা হবে। এখানে আমরা কয়েকটা কথা মনে রাখব। সংযোজক হতে পারে নানান রকমের, যেমন বিয়োজক বা disjunctive, বৈকল্পিক বা alternative, প্রাতিপক্ষিক বা adversative ইত্যাদি। অর্থাৎ এবং আর, ও, কিন্তু, অথচ, তবু, সুতরাং এ সবই সংযোজক হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে। সংযোজক কীভাবে যৌগিক বাক্য তৈরি করে তা দেখা যাক—

ক. *আমি আজ বড়োই দেরি করে ফেলেছি, কিন্তু আমার উপায় ছিল না।*

খ. *তুমি যথেষ্ট পরিশ্রম করেছ, সুতরাং তুমি সফল হবে।*

গ. *শিগ্‌গিরই একদিন তোমার বাড়ি যাব আর পেট ভরে খেয়ে আসব।*

কখনো-কখনো অবশ্য সংযোজক ছাড়াই যৌগিক বাক্য তৈরি হতে পারে—

ঘ. *তিমির ধীরে ধীরে এগিয়ে এল, তার কাঁধে হাত রাখল।*

ঙ. *এসব দেখে সে অবাক হয়ে গেল, নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারল না।*

চ. *বেলা অনেক হল, এবার ওঠো।*

সংযোজক নেই একথা না বলে বরং বলব সংযোজক উহ্য রয়েছে এসব বাক্যে।

জটিল বাক্য

যে বাক্যে একটি স্বাধীন সরল বাক্য এবং এক বা একাধিক অধীন বা আশ্রিত বাক্য থাকে তা-ই জটিল বাক্য। যে বাক্য বা বাক্যগুলো আশ্রিত বা অপ্রধান, সেটি বা সেগুলো

সচরাচর যে, যেহেতু, যে-সে, যারা-তারা, যদি-তবে এইরকম সংযোজক দিয়ে যুক্ত থাকে। আবার কোথাও-কোথাও সংযোজক না থাকতেও পারে। তিন ধরনের জটিল বাক্য হতে পারে বাংলায়।

এক. বিশেষ্যস্থানীয় আশ্রিত খণ্ডবাক্যযুক্ত (noun clause) জটিল বাক্য ; দুই. সম্বন্ধসূচক সর্বনামযুক্ত বিশেষণস্থানীয় খণ্ডবাক্যযুক্ত (adjective clause) জটিল বাক্য ; এবং তিন. সাপেক্ষ বাক্যযুক্ত ক্রিয়াবিশেষণীয় (adverbial clause) জটিল বাক্য।

এবারে দেখব ওই তিন রকমের জটিল বাক্যের দৃষ্টান্ত।

বিশেষ্যস্থানীয় খণ্ডবাক্যযুক্ত জটিল বাক্য

ক. *আমরা জানি সে আজ আসবে।*

খ. *দেখেই বুঝেছি, এ চিঠি তোমারই লেখা।*

গ. *তুমি কি জানো সে কোথায় থাকে?*

উপরের তিনটি জটিল বাক্যের খণ্ডবাক্যগুলো বিশেষ্যস্থানীয়। তবে বিশেষ্যস্থানীয় খণ্ডবাক্যেরও নানা ধরন হতে পারে। ক ও খ-তে খণ্ডবাক্যদুটো আছে ক্রিয়ার (*জানি, বুঝেছি*) কর্ম হিসেবে। গ একটি প্রশ্নবাক্য। এই জটিল বাক্যেও খণ্ডবাক্যটি *জানো* ক্রিয়ার কর্ম। এ ছাড়া বিশেষ্যের সমপদও (noun in apposition) খণ্ডবাক্য হিসেবে থাকতে পারে। যেমন এই বাক্যে

ঘ. *তিনি এসেছেন এই খবর শুনেই তাঁকে দেখতে ছুটলাম।*

এখানে খণ্ডবাক্যটিকে (*তিনি এসেছেন*) noun in apposition বলা হয়।

বিশেষণস্থানীয় খণ্ডবাক্যযুক্ত জটিল বাক্য

এই ধরনের জটিল বাক্যে খণ্ডবাক্যটি বিশেষণের কাজ করে।

ঙ. *যে ছেলেটি কাল তোমার কাছে এসেছিল সে-ই আজ আমার বাড়ি গিয়েছিল।*

চ. *যার কথা আপনি বলেছিলেন, আমিই সে।*

ছ. *তোমার যা খেতে ইচ্ছে করছে তা-ই খাও।*

দেখা যাচ্ছে যে, এইসব অধীন খণ্ডবাক্য বিশেষণের কাজ করছে, কখনো বিশেষ্যের, কখনো সর্বনামের। আরও কথা, এইসব জটিল বাক্য সদর্থক, নঞর্থক, প্রশ্নবোধক সবরকমই হতে পারে।

সাপেক্ষ খণ্ডবাক্যযুক্ত জটিল বাক্য

জ. *যদি যেতে চাও তবে যাও।*

ঝ. *যদি জানতাম তুমি এত তাড়াতাড়ি ফিরে আসবে তবে আমি তৈরি হয়েই থাকতাম।*

ঞ. *যদি খাটো তবে সফল হবেই।*

ট. *তুমি তো ভালো ফল করবেই, কেননা তুমি যথেষ্ট পরিশ্রম করেছ।*

জ, ঝ, ঞ এই তিনটি বাক্যে জোড়া সংযোজক দেখা যাচ্ছে—যদি-তবে ; ট-তে আছে *কেননা*। এ ছাড়া যা-তা, যাতে-তাতে, কারণ—এসবও সংযোজক হিসেবে কাজ করে। অন্যান্য ধরনের বাক্যের মতো সাপেক্ষ খণ্ডবাক্যযুক্ত জটিল বাক্যেও সংযোজক উহ্য থাকা সম্ভব।

ঠ. *জোরে পা চালাও,* (কেননা) *ট্রেন ধরতে হবে।*

ড. *ও তো ফার্স্ট হবেই,* (কারণ) *ওযে ভালো ছাত্র।*

মিশ্র বাক্য

ব্যাকরণবিদ্‌দের অনেকে মিশ্র বাক্য নামে আর একরকম বাক্যের কথা বলেন। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় জটিল বাক্যকেই মিশ্র বাক্য বলেছেন। আমাদের অবশ্য মনে হয় মিশ্র বাক্য একটা পৃথক ধরন। কোনো বাক্যে একটা সরল, একটা জটিল কিংবা দুটো সরল অর্থাৎ একটা যৌগিক একটা জটিল কিংবা একাধিক জটিল বাক্য মিলেমিশে থাকতে পারে। আমরা তেমন ধরনের বাক্যকেই মিশ্র বাক্য বলতে চাই। এখানে কয়েকটা মিশ্র বাক্য দেখে নেব—

ঢ. *সেদিন তোমার যে চেহারা দেখেছি আর তোমার ভাইটির জামাকাপড়েরও যা দশা দেখেছি তাতে বুঝেছিলাম যে, রীতিমতো ধকল গেছে তোমাদের ওপর দিয়ে।*

ণ. *রাঁধুনি তার হাতাখুন্তি নিয়ে যথাসময়ে এসে গেছে, কিন্তু বাজার থেকে বাবা এখনও আসেননি, আসেনি ভাইও রেশনের দোকান থেকে।*

ত. *আমি ভাবছি যখন বৃষ্টি হবে তখন ধুলোটা কাদায় পরিণত হবে।*

ঢ বাক্যে আছে চারটি বাক্য, যার মধ্যে একটি, শেষের আগেরটি, সরল বাক্য। ওটিই প্রধান বা স্বাধীন বাক্য। প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডবাক্যদুটি যৌগিকের দৃষ্টান্ত ; চতুর্থটি একটি বিশেষ্যস্থানীয় আশ্রিত খণ্ডবাক্য। ণ বাক্যটিতে আছে একটি সরল বাক্য আর একটি যৌগিক বাক্য। ত বাক্যে আছে একটি সরল বাক্য, একটি জটিল বাক্য। এই তিনটিই মিশ্র বাক্যের দৃষ্টান্ত।

২৭.৫ বাক্যের ভঙ্গিগত ভাগ

নানারকম বাক্য বলে আমরা মনের ভাব প্রকাশ করি। নানারকম মানে নানান ভঙ্গি। প্রয়োজন অনুসারে বলবার ভঙ্গি বদলায়। কখনো আমরা প্রশ্ন করি, কখনো বিস্ময় বা উচ্ছ্বাস প্রকাশ করি, আবার কখনো-বা নির্দেশের ভঙ্গিতে কথা বলি। এই নানা ভঙ্গির বাক্যের কতগুলো ভাগ আছে। সেই ভাগগুলোকে আমরা এভাবে দেখাতে পারি—

বাক্য

- নির্দেশক/উক্তিবাচক
- প্রশ্নবোধক
- বিস্ময়বাচক/উচ্ছ্বাসবাচক
- অনুজ্ঞাবাচক

নির্দেশক/উক্তিবাচক বাক্য

আমরা যতরকমের বাক্য বলি তার মধ্যে নিঃসন্দেহে নির্দেশমূলক বা উক্তিবাচক বাক্যই বেশি। কোনো সংবাদ বা তথ্য জানাতেই নির্দেশক বাক্য ব্যবহৃত হয়। নির্দেশক বাক্যের উদাহরণ দেখা যাক—

ক. *আমি তাড়াতাড়ি ফিরে আসব।*

খ. *ট্রেনটা দেরি করে ছেড়েছে।*

গ. *ঘটনাটা ঘটেছে আমার চোখের সামনে।*

উপরের তিনটি বাক্যে বক্তা কিছু-না-কিছু জানাচ্ছে, কোনো তথ্য বা সংবাদ। এই তথ্যজ্ঞাপনই নির্দেশক বাক্যের শর্ত। এখানে বলে রাখা দরকার যে, নির্দেশক বাক্য যেমন সদর্থক হতে পারে (যেমন উপরের ক, খ, গ-তে), তেমনি নঞর্থকও হতে পারে। কোনো তথ্য অস্বীকার করতে, আপত্তি বা প্রতিবাদ জানাতে নঞর্থক নির্দেশক বাক্য ব্যবহার করি আমরা। একটি সদর্থক বাক্যকে দুভাবে নঞর্থকে পরিণত করা যায়—এক. বাক্যে না, নেই, নয় প্রভৃতি নেতিবাচক প্রত্যয় বা ক্রিয়া ব্যবহার করে, যাতে বাক্যের অর্থ উলটে যায়; দুই. নেতিবাচক প্রত্যয় বা ক্রিয়া ব্যবহার করা হবে অথচ অর্থ বজায় থাকবে। উপরের ক ও খ বাক্যকে দু-ভাবে নঞর্থক করে দেখানো যায়—

ক. ১. *আমি তাড়াতাড়ি ফিরে আসব না।*
২. *আমি দেরি করে ফিরব না।*

খ. ১. *ট্রেনটা দেরি করে ছাড়েনি।*
২. *ট্রেনটা সময়মতো (বা ঠিক সময়ে) ছাড়েনি।*

প্রশ্নবাচক বাক্য

যে বাক্যে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয় তা-ই প্রশ্নবাক্য। প্রশ্নবাক্যের কতগুলো শর্ত বা লক্ষণ আছে। প্রশ্নবাক্যের প্রাথমিক শর্ত বা লক্ষণ হল প্রশ্নচিহ্ন। সাধারণভাবে বাক্যের শেষে প্রশ্নচিহ্ন দেখেই বোঝা যায় যে, বাক্যটিতে প্রশ্ন করা হয়েছে। দ্বিতীয়ত, প্রশ্নবাক্যে থাকে প্রশ্নসূচক সর্বনাম বা অব্যয় বা বিশেষণ। কি, কী, কেন, কোথায় কোন, কখন এইসব শব্দ ব্যবহার করে বাক্যকে প্রশ্নাত্মক করে তোলা হয়।

ক. *তুমি কি এখনই চলে যেতে চাও?*

খ. *তুমি সেদিন কী গান গাইলে?*

গ. *কে আবার এত রাতে এল?*

ঘ. *কেন আপনি ওকথা বললেন?*

ঙ. *আমি কীভাবে রাস্তাটা পার হব?*

অনেক সময় প্রশ্নবাচক শব্দ ব্যবহার না করেই প্রশ্নবাক্য তৈরি করা যায়। সেসব বাক্যে প্রশ্নচিহ্ন দেখেই বুঝে নেওয়া যায় যে ওগুলো প্রশ্নবাক্যই।

চ. *তোমাকে যেতেই হবে?*

ছ. *এত অল্পেই খুশি তুমি?*

এইসব বাক্যে প্রশ্নচিহ্ন আছে। কিন্তু প্রশ্নসূচক অব্যয় বা সর্বনাম বা বিশেষণ নেই। প্রশ্নবাক্যের এও এক ধরন।

কখনো-কখনো প্রশ্নচিহ্ন ছাড়াই প্রশ্নবাক্য তৈরি হতে পারে। সেখানে বক্তার সুরটা বুঝে নিতে হয়। একে আমরা ছদ্মপ্রশ্ন (pseudo-interrogative) বলব। প্রশ্নচিহ্ন নেই অথচ প্রশ্নবাক্য—একে অস্বাভাবিক মনে হলেও বাংলা ভাষার পক্ষে মোটেই অস্বাভাবিক নয়।

জ. *তার মনে দয়ামায়ার লেশমাত্র নেই। কেনই বা থাকবে।*

ঝ. *সবই তো তোমরা করে বসে আছ। এখন আমাকে বলে কী লাভ।*

এইসব বাক্যে প্রশ্নচিহ্ন নেই একথা ঠিক। এসব প্রশ্নের মধ্যেই একটা ইতিবাচক বা নেতিবাচক উত্তর নিহিত আছে। প্রশ্নচিহ্ন নেই, কিন্তু সুরটা প্রশ্নাত্মক।

এবারে প্রশ্নবাক্যের ধরন সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার। প্রশ্নবাক্য দু-রকমের হতে পারে। একরকম প্রশ্নবাক্য আছে যাতে প্রশ্নের জবাবে হ্যাঁ কিংবা না উত্তর হয়। একে আমরা হ্যাঁ-না প্রশ্ন (yes-no question) বলতে পারি। য়েসপেরসেন বলেন nexus question.

ঞ. *আপনি কি বাজারে চললেন?*

ট. *কাল তুমিই এসেছিলে?*

এসব প্রশ্নে উত্তর দিতে হয় 'হ্যাঁ' বা 'না' দিয়ে। দ্বিতীয় ধরনের প্রশ্নবাক্যে কোনো খবর বা তথ্য জানতে চাওয়া হয়। অটো য়েসপেরসেন এগুলোকে x-question বলেছেন। আমরা বলি তথ্যপ্রশ্ন বা খবরপ্রশ্ন। পবিত্র সরকার বলেন 'বস্তুপ্রশ্ন'।

ড. *আজ তোমাদের প্ল্যানটা কী?*

ঢ. *সেবার হরিদ্বারে কী ঘটেছিল?*

প্রশ্নবাক্যের প্রসঙ্গে tag question বা লগ্নপ্রশ্নের কথাও বলতে হবে। কথ্য ভাষাতেই লগ্নপ্রশ্ন বেশি ব্যবহৃত হয়। আমরা নীচে তার কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেখব—

ণ. *তুমিই তো কালই ফিরে যাবে, তাই না?*

ত. *কারও কাছ থেকেই সে এতটুকু সাহায্য পায়নি, পেয়েছে কি?*

যেকোনো বাক্যই সদর্থক বা নঞর্থক হতে পারে ; প্রশ্নবাক্যও নেতিবাচক বা নঞর্থক হতে পারে।

থ. *লাইব্রেরি কি রবিবার খোলা থাকে না?*

দ. *তুমি কি আজ মর্নিংওয়ার্কে যাওনি?*

বিস্ময়বাচক/উচ্ছ্বাসবাচক বাক্য

ভঙ্গিগতভাবে তৃতীয় ধরনের বাক্য হল বিস্ময়বাচক বাক্য। সবসময় অবশ্য আমরা বিস্ময়ই প্রকাশ করি না, ক্রোধ, আবেগ এসবও প্রকাশ করি। প্রকাশ করি ঘৃণার মতো মনোভঙ্গিও। সেসবের মধ্যে থাকতে পারে একটা উচ্ছ্বাসের ভাব। এবারে দেখা যাক, তেমনই কয়েকটা বিস্ময়বাচক বা উচ্ছ্বাসবাচক বাক্য।

ক. *সাবধান! সামনেই গর্ত!*

খ. *এইটুকু ছেলের এত দুঃসাহস!*

গ. *তোমার সাফল্যে আমার কী আনন্দই যে হচ্ছে!*

ঘ. *আঃ কী আরাম!*

ঙ. *এও কী সম্ভব!*

উপরের বাক্যগুলোর কোনোটাতে সতর্কীকরণের, কোনোটাতে অবিশ্বাসের, কোনোটাতে ক্রোধ বা স্বস্তির ভাব প্রকাশ পেয়েছে। এখানে উল্লেখ করতে হবে যে, কোনো-কোনো বিস্ময়বোধক বাক্যে, বিশেষত অবিশ্বাস বা সন্দেহ প্রকাশে, একটা প্রচ্ছন্ন প্রশ্নের সুর থাকে, যার নঞর্থক উত্তরও ওই বাক্যের মধ্যেই যেন নিহিত থাকে। উপরের ঙ বাক্য এরকমই একটি বিস্ময়বাক্য। আরও দেখব—

চ. *সে আবার ভদ্রলোক!*

অনুজ্ঞাবাক্য

অনুজ্ঞা শব্দটার আভিধানিক অর্থ আদেশ বা অনুমতি হলেও অনুজ্ঞাবাক্য বলতে শুধু যে আদেশ বা অনুমতিমূলক বাক্য বোঝায় তা নয়। অনুরোধ বা প্রার্থনার ভাবযুক্ত বাক্যও অনুজ্ঞাবাক্যের মধ্যে পড়ে। নীচে কয়েকটা অনুজ্ঞা বাক্যের দৃষ্টান্ত দেখব—

ক. *তুমি এখুনি একবার ওদের বাড়ি যাও।*

খ. *চলে যাও এখন থেকে।*

তোমার হাতটা আমাকে দেখাও তো।

ঘ. *দিকে যেয়ো না।*

ঙ. *এই অঙ্কটা একটু বুঝিয়ে দিন না।*

কয়েকটা ব্যাপার উপরের উদাহরণগুলো থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। এক. অনুজ্ঞা বর্তমান কালে আর ভবিষ্যৎ কালে হয়। দুই. অনুজ্ঞাবাচক বাক্য নেতিবাচক বা নঞর্থকও হতে পারে যেমন ঘ বাক্যে। তিন. অনুজ্ঞা বাক্যে, ইংরেজির মতো কর্তা উক্ত থাকতে পারে, অনুক্তও থাকতে পারে। চার. অনুজ্ঞা সাধারণত মধ্যম পুরুষে হয়—তুমি, তুই, আপনি, তোরা, তোমরা, আপনারা এগুলোই কেবল অনুজ্ঞাবাক্যের কর্তা হিসেবে ব্যবহৃত হতে

পারে। প্রথম পুরুষেও ক্বচিৎ-কখনো অনুজ্ঞা প্রকাশিত হয়, বিশেষত ইচ্ছা বা অভিলাষ প্রকাশে—

চ. *সে আসুক আমার বাড়ি।*

ছ. *কেউ-একজন গিয়ে আমার ছাতাটা নিয়ে আসুক।*

উপরে বলেছি, বাংলায়ও, ইংরেজির মতো, কর্তা অনুক্ত থাকতে পারে অনুজ্ঞা বাক্যে। তার উদাহরণ—

জ. *এখানে এসো।*

ঝ. *বেরোও এখান থেকে।*

গ্রন্থপঞ্জি

আজাদ, হুমায়ুন—বাক্যতত্ত্ব (১৯৮৪)

চক্রবর্তী, উদয়কুমার—বাংলা পদগুচ্ছের সংগঠন (১৯৯২)

চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার—ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ (১৯৮৮)

ভট্টাচার্য, সুভাষ— ১. বাঙালির ভাষা (২০০০)
২. ব্যাকরণের আনন্দপাঠ (২০০৮)

সরকার, পবিত্র— ১. পকেট বাংলা ব্যাকরণ(১৯৯৪)
২. বাংলা ব্যাকরণ প্রসঙ্গ (২০০৬)

সরকার, পবিত্র ও বসু, গণেশ—মাধ্যমিক ভাষা-সন্ধান (২০০৭)

Chomsky, Noam—Syntactic Structures (1957)
—Aspects of Syntax (1965)

Cobley, Paul (ed.)—The Routledge Companion to Semiotics and Linguistics (2001)

Jespersen, Otto—Essentials of English Grammar (1960)

Palmar, Frank—Grammar (1979)

Potter, Simeon—Our Language (1982)

Radford, Andrew & Others—Linguistics : An Introduction (1999)

Sapir, Edward—Language (1949)

২৮. ধ্বনিপরিবর্তন

২৮.১ ধ্বনিপরিবর্তনের কারণ

সাধারণভাবে বলা হয়ে থাকে যে, সচল বা জীবন্ত ভাষার বদল ঘটবেই। এবং সেই বদলের একটি প্রধান দিক হল ধ্বনির পরিবর্তন। পৃথক পৃথক ধ্বনির পরিবর্তন হয় এবং তার ফলে ভাষার উচ্চারণ বদলে যায়। আমরা লক্ষ করি যে, অন্যান্য ভাষার মতো বাংলা ভাষার ধ্বনিরও পরিবর্তন ঘটেছে যুগে যুগে। চর্যাগীতির সময় বাংলা ভাষার ধ্বনি বহুলাংশে বদলে আধুনিক বাংলায় রূপলাভ করেছে। কিন্তু প্রশ্ন হতেই পারে—কেন এই পরিবর্তন? ধ্বনি কেন বদলে যায়?

ধ্বনিপরিবর্তনের কারণগুলি সংক্ষেপে বলা যাক। প্রথমত আছে **ভৌগোলিক কারণ**। নিকটবর্তী কোনো অঞ্চলের ভাষায় বিবৃত ধ্বনির সংখ্যার তারতম্য একটি ভাষার ধ্বনিকে প্রভাবিত করতে পারে। নিকটবর্তী একটি ভাষায় হয়তো মহাপ্রাণ ধ্বনির প্রাধান্য বা স্বল্পতা দেখা যায়। তারই জন্য অপর একটি ভাষার ধ্বনিতেও তার প্রভাব পড়তে পারে। দ্বিতীয়ত, **শারীরিক কারণেও** ধ্বনিপরিবর্তন ঘটে। আমাদের জিভ সবসময় দুরূহ বা দুরুচ্চার্য শব্দকে সহজ করে নিতে চায়। আবার মুখবিবরে একটি নিম্ন ধ্বনি ঊর্ধ্ব ধ্বনির কাছাকাছি চলে আসতে চায় কিংবা ঊর্ধ্ব ধ্বনি নিম্নধ্বনির কাছাকাছি আসতে চায়। তার ফলে ধ্বনি বদলে যায়। এ ছাড়া **লিপিবিভ্রাট, দ্রুত উচ্চারণের প্রবণতা, অজ্ঞতা, সাদৃশ্য** প্রভৃতিকেও ধ্বনিপরিবর্তনের কারণ বলে ধরা যায়।

২৮.২ ধ্বনিপরিবর্তনের ধারা

ধ্বনিপরিবর্তনের কতকগুলি ধারা লক্ষ করেছেন ভাষাতাত্ত্বিকরা। সেগুলি হল—১. ধ্বনিলোপ; ২. ধ্বনির আগম বা ধ্বন্যাগম; ৩. ধ্বনির রূপান্তর।

২৮.২.১ ধ্বনিলোপ

উচ্চারণের সুবিধার জন্য অনেকসময় শব্দের মধ্যবর্তী এক বা একাধিক ধ্বনি বর্জন করা হয়। তার ফলে শব্দের উচ্চারণে সরলতা-সম্পাদন হয়। একেই ধ্বনিলোপ বা haplology বলে। ধ্বনিলোপ প্রকাশিত হয় বর্ণলোপের মাধ্যমে। অনেকসময় শব্দের মধ্যবর্তী বিশেষ একটি ধ্বনিতে শ্বাসাঘাত পড়লে পরবর্তী দুর্বল বা শ্বাসাঘাতহীন ধ্বনি লোপ পেয়ে যায়। ধ্বনিলাপ হতে পারে নানা রকম—

ক. স্বরধ্বনি-লোপ
- আদিস্বর-লোপ
- মধ্যস্বর-লোপ
- অন্ত্যস্বর-লোপ

খ. ব্যঞ্জনধ্বনি-লোপ
- আদিব্যঞ্জন-লোপ
- মধ্যব্যঞ্জন-লোপ
- অন্ত্যব্যঞ্জন-লোপ

গ. সমাক্ষর-লোপ বা সমবর্ণ-লোপ।

ক. স্বরধ্বনিলোপ

আদিস্বর-লোপের বহু দৃষ্টান্ত আছে বাংলায়।

অলাবু > লাউ, অতসী > তিসি, আলোনা > লোনা,
অরিষ্ট > রিঠা, অপিধান > পিধান

মধ্যস্বর-লোপের দৃষ্টান্ত—

জানালা > জান্‌লা, গামোছা > গাম্‌ছা, ভগিনী > ভগ্নী,
সরিষা > সর্ষে, গৃহিণী > গিন্নি, নাতিনী > নাত্‌নি

অন্ত্যস্বর-লোপ—

আজি > আজ, কালি > কাল, গোরূপ (> গোরূব) > গোরু,
জল (জলঅ) > জল্‌, ধান্য > ধান, বন্যা > বান, ভিত্তি > ভিত

খ. ব্যঞ্জনধ্বনি লোপ

শব্দের শুরুতে, মধ্যে ও শেষে যেমন স্বরধ্বনির লোপ হয় তেমনি ব্যঞ্জনধ্বনিও লোপ পেতে পারে। তবে বাংলা ভাষায় আদ্য ব্যঞ্জন কমই লোপ পায়। তবু তারও কিছু দৃষ্টান্ত আছে।

আদ্যব্যঞ্জন-লোপ—

প্রভাত > পোভাত, স্থান > থান, ট্রেন > টেন, শ্রাবণ > শাওন

মধ্যব্যঞ্জন-লোপ—

কার্পাস > কাপাস, শৃগাল > শিয়াল, ফলাহার > ফলার

অন্ত্যব্যঞ্জন-লোপ—

আম্র > আম, মধু > মউ, সখী > সই দধি > দই

গ. সমাক্ষর লোপ

ধ্বনিলোপের আর একটি প্রক্রিয়া হল সমাক্ষর লোপ। শব্দের মধ্যে কাছাকাছি বা

পাশাপাশি একাধিক একই ধ্বনি বা সমধ্বনি থাকলে তার কোনোটি বা কোনো-কোনোটি লোপ পেতে পারে। একেই সমাক্ষর লোপ বলে। সমাক্ষর লোপের উদাহরণ হল—

বড়দাদা > বড়দা, মেজদিদি > মেজদি
পাদোদক > পাদোক, চকখড়ি > চাখড়ি
ছোটোকাকা > ছোটকা, মুখখানি > মুখানি।

ইংরেজরা Krishnanagar-কে Krishnagar এবং Krishnanath-কে Krishnath করে নিয়েছিল। এও সমাক্ষর লোপের দৃষ্টান্ত।

উপরে ধ্বনিলোপের যেসব দৃষ্টান্ত দেখা গেল তার অনেকগুলিতেই দেখা যায় যে, শব্দের গোড়ায় শ্বাসাঘাতের জন্য পরবর্তী সিলেবলের বা শব্দমধ্যের বা শব্দশেষের ব্যঞ্জন লোপ পেয়েছে।

২৮.২.২ ধ্বনির আগম, ধ্বন্যাগম

একটি শব্দের মধ্যে কোনো ধ্বনি প্রবিষ্ট হলে তাকেই ধ্বনির আগম বলে।

ধ্বনির আগমকে চারটি ভাগে বিভক্ত করা যায়—১. স্বরধ্বনির আগম, ২. ব্যঞ্জনধ্বনির আগম ৩. শ্রুতিধ্বনি, ৪. ধ্বনির রূপান্তর।

প্রথমে দেখা যাক **১. স্বরধ্বনির আগম**। স্বরধ্বনির আগম হতে পারে তিন রকমের—ক. আদি স্বরাগম, খ. মধ্য স্বরাগম ও গ. অন্ত্য স্বরাগম।

ক. আদি স্বরাগম

বাংলা ভাষায় শব্দের গোড়ায় সংযুক্ত ব্যঞ্জন থাকলে উচ্চারণের সুবিধার জন্য তার আগে একটি স্বরধ্বনি এসে পড়ার একটা প্রবণতা প্রায়ই দেখা যায়। একেই বলে আদ্য স্বারাগম। ইংরেজি নাম vowel prothesis. এর উদাহরণ—

স্পর্ধা > আস্পর্ধা
স্কুল > ইস্কুল
স্টিমার > ইস্টিমার
স্টেশন > ইস্টেশন, ইস্টিশন

খ. মধ্য স্বরাগম : স্বরভক্তি, বিপ্রকর্ষ (anaptyxis, vowel insertion)

শব্দের মধ্যে যদি সংযুক্ত ব্যঞ্জন থাকে, তবে আমরা কখনো কখনো বিপ্রকর্ষ বা স্বরভক্তির নিয়মে দুটি ব্যঞ্জনকে পৃথক করে দিই। শব্দের মধ্যে এইভাবে স্বরধ্বনির আগমকে মধ্য স্বরাগম বলে। এই মধ্য স্বরাগমকে স্বরভক্তি (স্বরধ্বনির বিভক্তি বা বিভাগ) বা বিপ্রকর্ষ বলা হয়। মধ্য স্বরাগমের উদাহরণ—

শক্তি > শকতি
ভক্তি > ভকতি

ধর্ম > ধরম
জন্ম > জনম
বর্ষণ > বরিষন
দর্শন > দরশন
রত্ন > রতন
হর্ষ > হরষ
কর্ম > করম
মিত্র > মিত্তির
শক্র > শত্তুর
পুত্র > পুত্তুর
মুক্তা > মুকুতা
স্লেট > সেলেট
শ্লোক > শোলোক
গ্রাম > গেরাম
ট্রেন > টেরেন
প্রায় > পেরায়
প্লেট > পেলেট
ব্লাউজ > বেলাউজ

এখানে লক্ষ করার বিষয় এই যে, স্বরভক্তির নিয়মে অ, আ, ই, উ, এ, ও প্রভৃতি নানা ধ্বনির আগম হয়।

গ. অন্ত্য স্বরাগম (vowel catathesis)

আগেই বলা হয়েছে ধ্বনির আগম বা লোপ অনেক ক্ষেত্রেই উচ্চারণের সুবিধা বা সুকরতার কারণে ঘটে। শব্দের শেষে স্বরধ্বনির আগমকে অন্ত্য স্বারগম বলে। তার উদাহরণ—

বেঞ্চ > বেঞ্চি
দিশ > দিশা
ইঞ্চ > ইঞ্চি
সত্য > সত্যি
দৈত্য > দত্যি
দুষ্ট > দুষ্টু

এখানেও দেখা গেল যে, শব্দান্তে আ, ই, উ প্রভৃতি স্বরধ্বনির আগম ঘটেছে।

২. ব্যঞ্জনধ্বনির আগম

শব্দের মধ্যে ব্যঞ্জনধ্বনিরও আগম হতে পারে। ব্যঞ্জনাগমও যথারীতি তিন প্রকার হতে পারে—আদ্য ব্যঞ্জনাগম, মধ্য ব্যঞ্জনাগম, অন্ত্য ব্যঞ্জনাগম।

আদ্য ব্যঞ্জনাগম

শব্দের গোড়ায় ব্যঞ্জনাগমের দৃষ্টান্ত অবশ্য খুব বেশি হয় না বাংলায়। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেখা যাক—

উজু > রুজু
ওঝা > রোঝা, রোজা
ওষ্ঠ > ঠোঁট
উপকথা > রূপকথা

মধ্য ব্যঞ্জনাগম

শব্দের মধ্যেও ব্যঞ্জনের আগম হয়।

ইঁদুর > ইন্দুর
অম্ল > অম্বল
পোড়ামুখী > পোড়ারমুখী

অন্ত্য ব্যঞ্জনাগম

শব্দের শেষে ব্যঞ্জনধ্বনির আগমের উদাহরণ—

নানা > নানান
খোকা > খোকন
জমি > জমিন

৩. শ্রুতিধ্বনি (glide)

পাশাপাশি দুটি ধ্বনির মধ্যে উচ্চারণের সুবিধার জন্য বা দ্রুত উচ্চারণের ফলে কখনো-কখনো অন্য একটি অস্পষ্ট ধ্বনির আগম হয়। সেই ধ্বনিকেই শ্রুতিধ্বনি বা glide বলে। শব্দের বানানে প্রথম দিকে এই শ্রুতিধ্বনিকে দেখানো যায় না বা দেখানো হয় না। পরে সেই রূপান্তর বানানেও এসে যায়। √যা + আ। এর মধ্যে ও্ শ্রুতিধ্বনিটি এসে যাওয়ায় হল ‘যাওয়া’।

শ্রুতিধ্বনি দুই শ্রেণির—য়-শ্রুতি ও ব-শ্রুতি কিংবা বলা যায় অন্তঃস্থ য়-শ্রুতি এবং অন্তঃস্থ ব-শ্রুতি।

য়-শ্রুতি

দুটি স্বরধ্বনি পাশাপাশি থাকলে একটি থেকে অন্যটিতে গড়িয়ে যাওয়ার জন্য তাদের

মধ্যে একটি ধ্বনি এসে যায়। সেই আগত ধ্বনিটি য় হলে তাকে য়-শ্রুতি বলা হবে।

মা-এর > মায়ের
দা-এর > দায়ের (দা = কাটারি)
মা-আমার > মায়ামার
চা-এর > চায়ের
রেডিও > রেডিয়ো

ব-শ্রুতি

দুটি স্বরধ্বনির মধ্যে আগত শ্রুতিধ্বনিটি যদি অন্তঃস্থ-ব হয়, তবে তাকেই বলা হবে অন্তঃস্থ ব-শ্রুতি। অন্তঃস্থ ব-এর প্রভাবে একটা ওয়্ উচ্চারণ এসে যায়।

দে + আ > দেওয়া
যা + আ > যাওয়া
খা + আ > খাওয়া

৪. ধ্বনির রূপান্তর

ধ্বনি-পরিবর্তনের চতুর্থ শ্রেণিটি হল ধ্বনির রূপান্তর। শুধু ধ্বনির আগম বা লোপ দিয়ে সে-পরিবর্তনকে বোঝা যাবে না। কখনো ধ্বনির আগমের ফলে, আবার কখনো ধ্বনিলোপের ফলে কোনো ধ্বনি বদলে যায়। সেই বদলকেই ধ্বনির রূপান্তর বলে। ধ্বনির এই রূপান্তর ঘটে ছয়টি প্রক্রিয়ায়।

ধ্বনির রূপান্তর

সমীভবন | স্বরসংগতি | অভিশ্রুতি | অপিনিহিতি | নাসিক্যীভবন | ধ্বনির বিপর্যয়

১. সমীভবন (assimilation)

দুটি অসম ব্যঞ্জন অর্থাৎ পৃথক উচ্চারণস্থান-জাত ব্যঞ্জন উচ্চারণের সুবিধার জন্য সমস্থানজাত ধ্বনিতে বা সমধ্বনিতে পরিণত হলে তাকে সমীভবন বলা হয়। সমীভবনের ফলে অনেক সময় সংযুক্ত ব্যঞ্জন (consonant conjunct) পরিণত হয় যুগ্মব্যঞ্জনে। নীচে তার উদাহরণ দেখব—

পদ্ম > পদ্দ
ছদ্ম > ছদ্দ

সমীভবন তিন রকমের হতে পারে—**প্রগত সমীভবন** (progressive assimilation), **পরাগত সমীভবন** (regressive assimilation), এবং **অন্যোন্য** বা **পারস্পরিক সমীভবন** (mutual assimilation)।

একটি ধ্বনির প্রভাবে পরবর্তী ধ্বনির পরিবর্তনকে **প্রগত সমীভবন** বলে। ছদ্ম > ছদ্দ, চন্দন > চন্নন, সূত্র > সুত্ত, হল প্রগত সমীভবনের উদাহরণ। বিপরীত প্রক্রিয়াটিই **পরাগত সমীভবন**। অর্থাৎ এতে পরবর্তী অসম ব্যঞ্জনধ্বনির প্রভাবে পূর্ববর্তী ধ্বনির পরিবর্তন ঘটে। তার উদাহরণ হল—

ভক্ত > ভত্ত ; পূর্ণিমা > পুন্নিমে ; দুর্গা > দুগ্গা, ধর্ম > ধম্ম,
কর্ম > কম্ম, মূর্খ > মুক্‌খু

তৃতীয় ধরনের সমীভবন হল **অন্যোন্য** বা **পারস্পরিক সমীভবন**। দুটি আসম ব্যঞ্জন পরস্পরকে প্রভাবিত করে এবং তার ফলে সে-দুটি একজাতীয় ব্যঞ্জনে অর্থাৎ সমব্যঞ্জনে পরিণত হয়। পারস্পরিক সমীভবনের উদাহরণ এইগুলি—

মহোৎসব > মচ্ছব ; কুৎসা > কুচ্ছো, কেচ্ছা
বৎসর > বচ্ছর ; কুৎসিত > কুচ্ছিত

২. স্বরসংগতি বা স্বরের উচ্চতাসাম্য (vowel harmony/vowel height assimilation)

যাকে স্বরসংগতি বলা হয়, তাতে দুটি স্বরধ্বনি পরস্পরের কাছাকাছি আসে বা একজাতীয় ধ্বনিতে পরিণত হয়। মুহম্মদ আবদুল হাই তাই একে সমীভবনের সঙ্গে তুলনা করেছেন। স্বরসংগতি বাংলা ভাষারই একটি ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য। সংস্কৃত হিন্দি প্রভৃতি ভাষায় তা নেই। কীভাবে স্বরসংগতি হয় তা দেখা যাক। তা দেখতে বা বুঝতে হ'লে বাংলা স্বরধ্বনিগুলি সংস্থান দেখা দরকার।

ই   উ
এ   ও
অ্যা অ
আ

বাংলা ভাষার স্বরধ্বনিগুলির উচ্চারণস্থান ও প্রকৃতি উপরের নক্‌শায় বোঝা যাবে। ই, উ ঊর্ধ্ব স্বরধ্বনি, ই সম্মুখ এবং উ পশ্চাৎ। এ, ও ঊর্ধ্বমধ্য স্বরধ্বনি, এ সম্মুখ ও পশ্চাৎ। অ্যা, অ নিম্নমধ্য, অ্যা সম্মুখ, অ পশ্চাৎ। আ কেন্দ্রীয়। উচ্চতার দিক থেকে অসম দুটি স্বরধ্বনি যদি পাশাপাশি উচ্চারণ করতে হয়, তবে দেখা যায় যে, একটি অন্যটির কাছাকাছি চলে আসে অর্থাৎ তাদের উচ্চতা সমান হয়ে যায়। এইজন্য একে **স্বরের উচ্চতাসাম্য** বলা হয়। পবিত্র সরকার **স্বরসংগতির** চেয়ে স্বরের উচ্চতাসাম্য নামটিই উপযুক্ততর বলে মনে করেন। এর বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে বাংলা ভাষায়।

ক. কিতাব > কেতাব, বিলাত .> বিলেত, বিকাল > বিকেল, নিতাই > নেতাই। এসব ক্ষেত্রে ঊর্ধ্বস্বর ই পরিণত হয়েছে ঊর্ধ্বমধ্য এ স্বরে।

খ. কুলা > কুলো, তুলা > তুলো, সুতা > সুতো, জুতা > জুতো। এসব ক্ষেত্রে উ-এর প্রভাবে কেন্দ্রীয় আ পরিণত হয়েছে ও-তে।

গ. নদ > নদী, ঘট > ঘটি, অত > অতি

এসব ক্ষেত্রে নিম্ন স্বরধ্বনি অ পরিণত হচ্ছে উর্ধ্বমধ্য স্বরধ্বনি ও-তে—নোদি, ঘোটি, ওতি। এইভাবে স্বরসংগতি বা স্বরের উচ্চতাসাম্যের আরও বহু দৃষ্টান্ত দেখানো যায়।

৩. অভিশ্রুতি (umlaut)

অভিশ্রুতিকে ধ্বনির রূপান্তর বলা হলেও প্রকৃতপক্ষে তা হল একরকম মিশ্র পরিবর্তন। অপিনিহিতি, ধ্বনিলোপ এবং স্বরসংগতি এই তিনটি প্রক্রিয়ার ফলেই হয় অভিশ্রুতি।

করিয়া > কইরা > ক'রে

দেখিয়া > দেইখা > দেখে

এইভাবে প্রথমে অপিনিহিতির ফলে ই-ধ্বনি আগে চলে এল। পরে মধ্যবর্তী ই-ধ্বনি লোপ পেল এবং স্বরসংগতির ফলে শেষে এ ধ্বনি এল। এই হল অভিশ্রুতির মিশ্রপরিবর্তন।

অভিশ্রুতির ফলে মান্য চলিত বাংলায় পাওয়া গেছে বহু শিষ্ট শব্দ। অভিশ্রুতির ফলে আরও যেসব শব্দ পাওয়া গেছে তার মধ্যে আছে রাত (< রাতি), ধনে (< ধনিয়া), বেনে (< বানিয়া), রেখে (< রাখিয়া), হেসে (< হাসিয়া) ইত্যাদি।

৪. অপিনিহিতি (epenthesis)

দুই বা তিন সিলেবলের শব্দের দ্বিতীয় সিলেবলে ব্যঞ্জনের পরে ই বা উ ধ্বনি থাকলে ব্যঞ্জনের আগেই সেই ই বা উ উচ্চারণ করার যে প্রবণতা, তারই নাম অপিনিহিতি। 'করিয়া' হল 'কইর‍্যা', 'রাখিয়া' হল 'রাইখ্যা'। 'আজি' হল 'আইজ'। এইভাবে আরও পাওয়া গেল—

রাতি > রাইত, বলিয়া > বইল্যা,

খেলিয়া > খেইল্যা, ভাবিয়া > ভাইব্যা

মূলত ঢাকার উপভাষায় অপিনিহিত শব্দের ব্যাপক প্রচলন দেখা যায়।

অনেকসময় ই ধ্বনি না-থাকা সত্ত্বেও তা এসে বসে—

কল্য > কোইল্যা, সভ্য > সইভ্য, নাট্য > নাইট্য, ভাগ্য > ভাইগ্য ইত্যাদি।

৫. নাসিক্যীভবন (nasalization)

নাসিক্য ব্যঞ্জন কখনো-কখনো লোপ পেয়ে যায় এবং পূর্ববর্তী স্বরধ্বনি অনুনাসিক হয়ে যায়। বাংলা নাসিক্য ব্যঞ্জন হল তিনটি—ঙ, ন, ম। এই প্রক্রিয়াটিরই নাম নাসিক্যীভবন। এর উদাহরণ দেখা যাক—

পঞ্চ > পাঁচ, বংশ > বাঁশ, অংশ > আঁশ,

দন্ত > দাঁত, শঙ্খ > শাঁখ, কণ্টক > কাঁটা

ষণ্ড > ষাঁড়, পঙ্ক্তি > পাঁতি, পঞ্জর > পাঁজর

এরই সঙ্গে উল্লেখ করতে হবে আর একটি রূপান্তর প্রক্রিয়ার যার নাম **স্বতোনাসিক্যীভবন** (spontaneous nasalization)। নাসিক্যব্যঞ্জন না-থাকা সত্ত্বেও কোনো-কোনো সময় শব্দে অনুনাসিকতা এসে পড়তে পারে। তাকেই স্বতোনাসিক্যীভবন বলা হয়।

পেচক > প্যাঁচা, পিপীলিকা > পিঁপড়ে, শস্য > শাঁস,

পুস্তিকা > পোথিঅ > পুঁথি, অক্ষি > আঁখি

এসব ক্ষেত্রে অনুনাসিকতা আসবার কথাই ছিল না। একে অকারণ অনুনাসিকতাও বলা যায়।

৬. ধ্বনিবিপর্যয়

পাশাপাশি অবস্থিত দুটি ধ্বনি কখনো-কখনো স্থানবদল করতে পারে। আগেরটি পরে বা পরেরটি আগে চলে যেতে পারে। একেই ধ্বনিবিপর্যয় বলে।

মুকুট > মটুক, রিকশা > রিশকা, পিশাচ > পিচাশ।

আরও পরিবর্তন

এগুলি ছাড়াও ধ্বনিপরিবর্তনের কয়েকটি প্রক্রিয়া আছে। যেমন—

৭. স্বরের দীর্ঘীভবন (lengthening)

শব্দের মধ্যে কোনো ধ্বনি লোপ পেলে কখনো-কখনো পূর্ববর্তী স্বরধ্বনি দীর্ঘ হয়ে যায়।

ধর্ম > ধাম

সপ্ত > সাত

ভক্ত > ভাত

৮. মূর্ধ্যন্যীভবন (cerebralization)

মূর্ধন্য ধ্বনির প্রভাবে দন্ত্যধ্বনি মূর্ধন্য ধ্বনিতে পরিণত হলে তাকে মূর্ধন্যীভবন বলা হয়।

মৃত্তিকা > মাটি,   পততি > পড়া

কখনো-কখনো ঋ, র প্রভৃতির প্রভাবেও মূর্ধন্যীভবন ঘটে।

বৃদ্ধ > বুড়ো, মৃত > মড়া

৯. স্পুনারিজ়ম (Spoonerism) বা ধ্বনির বিপর্যাস

বাক্যের অন্তর্গত ধ্বনির বিপর্যাস ঘটলে তাকে Spoonerism বলা হয়। বিশেষত বাক্যান্তর্গত শব্দের বিপর্যাস ঘটলে তাকেই Spoonrism বলা হয়। রেভারেন্ড স্পুনার নামে জনৈক ইংরেজ যাজক শব্দগুলির ধ্বনি উলটে-পালটে বলতেন। তাঁরই নাম থেকে এই ধ্বনিবিপর্যাসের ওই নাম হয়েছে।

You have hissed my mystery lecture.
(You have missed my history lecture)

বাংলায়—

এক চাপ কা (এক কাপ চা)
কাকার টুমির (টাকার কুমির)
কাক ছড়ালে ভাতের অভাব? (ভাত ছড়ালে কাকের অভাব?)

১০. জোড়কলম (portmanteau)

দুটি শব্দের কিছু অংশ নিয়ে একটি তৃতীয় শব্দ তৈরি হলে তাকে portmanteau word বলে। বাংলায় বলা হয় জোড়কলম শব্দ। রবীন্দ্রনাথের অনুসরণে বিজনবিহারী ভট্টাচার্য বলেন 'স্পর্শদুষ্ট শব্দ'। ইংরেজিতে Oxbridge (Oxford + Cambridge), smog (smoke + fog), tigon (tiger + lion), liger (lion + tiger) প্রভৃতি এর উদাহরণ। বাংলায় সুকুমার রায় হাতিমি (হাতি + তিমি), বকচ্ছপ (বক + কচ্ছপ) প্রভৃতি জোড়কলম শব্দ তৈরি করেছেন। এছাড়া ধোঁয়াশা (ধোঁয়া + কুয়াশা), নিশ্চুপ (নিশ্চল + চুপ), উন্মুখর (উন্মুখ + মুখর) প্রভৃতি জোড়কলমের উদাহরণ।

গ্রন্থপঞ্জি

গোস্বামী, কৃষ্ণপদ—বাংলা ভাষাতত্ত্বের ইতিহাস (২০০১)
চট্টোপাধ্যায়, হীরেন—ভাষাতত্ত্ব ও বাংলা ভাষার ইতিহাস (১৯৯৩)
বসু, দ্বিজেন্দ্রনাথ—বাংলা ভাষার আধুনিক তত্ত্ব ও ইতিকথা (১৯৮০)
ভট্টাচার্য, পরেশচন্দ্র—ভাষাবিদ্যা পরিচয় (২০০০)
ভট্টাচার্য, সুভাষ—বাঙালির ভাষা (২০০০)
সরকার, পবিত্র—১. বাংলা ব্যাকরণ প্রসঙ্গ (২০০৬)
২. ভাষা সরিৎসাগর (১৯৯৪)
সেন, সুকুমার—ভাষার ইতিবৃত্ত (১৯৯৪)

২৯. শব্দার্থতত্ত্ব : শব্দার্থের পরিবর্তন

২৯.১ শব্দার্থতত্ত্ব

ইংরেজিতে যাকে semantics বলা হয়, তা-ই বাংলায় শব্দার্থতত্ত্ব, কারও কারও পরিভাষায় বাগর্থতত্ত্ব। অধ্যাপক বিজনবিহারী ভট্টাচার্য বলেছেন 'বাগর্থবিজ্ঞান'। Semantics হল the science of meaning. বিশিষ্ট বাগর্থবিজ্ঞানী জেফ্রি লিচ (Geoffrey Leech) তাঁর Semantics (1976) গ্রন্থে বলেছেন যে, শব্দার্থতত্ত্ব বা বাগর্থবিজ্ঞান আলোচনার আগে প্রথমেই বুঝে নিতে হবে 'অর্থ' কী? তাঁর মতে এ বিষয়ে শ্রেষ্ঠ বইটি হল অগ্‌ডেন ও রিচার্ডস-এর (C.K. Ogden & I.A. Richards) The Meaning of Meaning (1923)। উক্ত গ্রন্থে লেখকদ্বয় বলেছেন 'অর্থ' (meaning) কথাটিরই ষোলোরকম অর্থ হতে পারে—কোনো একটি শব্দ দিয়ে কিছুর ইঙ্গিত, উদ্দেশ্য, গুরুত্ব, উল্লেখ, লক্ষ্য ইত্যাদি অনেক কিছুই বোঝানো হতে পারে। এই বিষয়টি আমরা **দশম অধ্যায়ে** ব্যাখ্যা করেছি।

২৯.২ শব্দার্থের পরিবর্তন ও তার কারণ

সচল ভাষামাত্রেরই শব্দের অর্থ সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বদলে যায়। এবং সেই পরিবর্তনের কতকগুলি কারণ থাকে। কারণগুলি হল—**ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক** বা **স্থানগত, উপকরণগত, সাদৃশ্যগত, আলংকারিক প্রয়োগঘটিত, শোভনতাজনিত** ইত্যাদি।

একই শব্দ ভিন্ন পরিবেশে ভিন্ন অর্থ ধারণ করে এবং কখনো-কখনো শব্দের গায়ে ভিন্ন অর্থটিও লেগে যায়। 'জহর' শব্দটির অর্থ বাংলায় মণি, হিন্দিতে বিষ। 'অভিমান' শব্দটিরও ভিন্ন অর্থ বাংলা ও হিন্দিতে। তেমনি হিন্দির 'খুন' (রক্ত) আর বাংলার 'খুন' (হত্যা) আলাদা। একেই শব্দার্থ-পরিবর্তনের **ভৌগোলিক** কারণ বলে।

ঐতিহাসিক কারণেও শব্দার্থ বদলে যায়। ঋগ্বেদে 'অসুর' শব্দের অর্থ ছিল প্রাণদ, যে প্রাণদান করে। তাই সেকালে ইন্দ্র বরুণ প্রভৃতি দেবগুণ অসুর বিশেষণে ভূষিত হতেন। পরে সেই অসুর শব্দটির অর্থ দাঁড়াল দেবগণের শত্রু দানবজাতি। **আলংকারিকতা** শব্দার্থ পরিবর্তনের একটা বড়ো কারণ। ভাব পরিস্ফুট করবার জন্য আমরা উপমা বিশেষণ প্রভৃতি ব্যবহার করি। অনেকসময় অলংকার প্রয়োগের ফলে সরাসরি না বলে ইঙ্গিতে অনেককিছু বোঝানো যায়। 'ভবপারাবার' অর্থ সংসারসমুদ্র। এটি একটি আলংকারিক প্রয়োগ। পারাবার শব্দে ব্যাপকতা, দুস্তরতা, সীমাহীনতা প্রভৃতিও বোঝায়। 'মামাবাড়ি' বলদে হাজত বা জেলখানাও বোঝায়, 'গাছপাঁঠা' বললে এঁচড়কে বোঝায়। এসবই আলংকারিকতার ফল।

সৌজন্য বা শিষ্টাচার বা শোভনতাঘটিত কারণেও শব্দার্থ বদলে যায়। সৌজন্য প্রকাশের জন্য বা শিষ্টাচার প্রকাশের জন্য গঙ্গালাভ (মৃত্যু), হরিজন (অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষ), বাড়ন্ত (নিঃশেষ), নমোশূদ্র, জমাদার (মেথর) প্রভৃতি শব্দ তৈরি হয়েছে। এসব ক্ষেত্রে euphemism বা সুভাষণ ঘটেছে।

বক্রোক্তিঘটিত কারণেও অর্থান্তর হয়—কখনো-বা নতুন শব্দের উদ্ভব হয়। দীক্ষাদানকারী বৈষ্ণব সন্ন্যাসীকে যখন 'কানফুঁকো বাবাজি' বলা হয়, কিংবা মুরগিকে 'রামপাখি' বলা হয়, শুয়োরকে 'শুঁড় কাটা হাতি' বলা হয় তখন বক্রোক্তিই করা হয়। বক্রোক্তি করা হয় কখনো নিছকই পরিহাস করতে, কখনো 'অপ্রিয়তা-নিবারণের' জন্য। বিজনবিহারী ভট্টাচার্য বলেছেন, যখন বিদায়কালে কাউকে 'এস' বলি, তখন 'যাও' বলার অপ্রিয়তা ঢাকতেই 'এস' বলি। পাচক ব্রাহ্মণকে 'ঠাকুর' বলার মধ্যেও আছে বক্রোক্তি। এসব ক্ষেত্রে সৌজন্যপ্রকাশই ঘটছে। 'ঘুস' কথাটার রূঢ়তা বা নিকৃষ্টতা ঢাকতে বলা হয় 'সেলামি'।

উপকরণগত কারণেও শব্দের অর্থান্তর হয়। একসময় লেখার কালির রং কেবল কালো হত বলেই তার নাম কালি হয়। পরে নানা রঙের কালি প্রস্তুত হলেও লেখার উপকরণটির ওই নামই থেকে গেল।

ভ্রান্তি বা অজ্ঞতা বা অনবধানতাজনিত কারণেও শব্দার্থের পরিবর্তন হয়ে থাকে। ইংরেজি rivet কে অনতিশিক্ষিত মিস্তিরা বলে 'রিপিট', pliersকে বলে 'প্লাস'। পাষণ্ড, ম্লেচ্ছ, বাউল প্রভৃতির অর্থান্তর উক্ত কারণেই ঘটেছে।

তিল (কালো রঙের শস্য) থেকে গায়ের তিল, বড়ো দা বা কাটারিকে রাম-দা, বড়ো ছাগলকে রামছাগল, বড়ো পথকে রাজপথ নাম দেওয়ার ব্যাপারটা **সাদৃশ্যগত কারণে** ঘটেছে।

২৯.৩ শব্দার্থ পরিবর্তনের ধারা

শব্দার্থ পরিবর্তনের ধারা বা প্রকারগুলি হল—১. অর্থের প্রসার বা সম্প্রসারণ, ২. অর্থের সংকোচন, ৩. অর্থের সংশ্লেষ বা সংক্রম, ৪. অর্থের উৎকর্ষ, ৫. অর্থের অপকর্ষ।

অর্থের প্রসার বা সম্প্রসারণ

প্রতিটি শব্দ উৎপত্তির সময় একটি বিশেষ অর্থ ধারণ বা পরিগ্রহ করে। তখন সেই শব্দটি কোনো ব্যক্তিকে বা বস্তুকে বা ভাব ইত্যাদিকে বোঝায়। পরবর্তী কালে কখনো-কখনো দেখা যায় যে, শব্দটি তার আদি অর্থকে ছাড়িয়ে নতুন অর্থ পরিগ্রহ করেছে। অর্থাৎ সীমিত অর্থ ত্যাগ করে শব্দটি ব্যাপকতর অর্থকে বোঝায়। একেই বলে **অর্থের প্রসার**। নীচে দেখব অর্থের প্রসারের দৃষ্টান্ত—

শব্দ	আদি অর্থ	প্রসারিত অর্থ
দালদা	উদ্ভিজ্জ তেলবিশেষ	যেকোনো বা সবরকম উদ্ভিজতেল
গাঙ	গঙ্গা নদী	যেকোনো নদী
বর্ষ	বর্ষাকাল	সম্পূর্ণ বছর
পরশ্ব/পরশু	আগামীকালের পরদিন	গতকালের আগের দিন ও আগামী কালের পরদিন
বাঁশি	বাঁশের বাঁশি	যেকোনো বাঁশি
তেল	তিলের নির্যাস	তিল সরষে প্রভৃতি শস্যের নির্যাস

অর্থের সংকোচন

কোনো একটি শব্দের মূল অর্থের ব্যাপকতা কমে গিয়ে সীমিত অর্থ প্রকাশ করে কখনো-কখনো। একেই বলে **অর্থের সংকোচন**। অর্থ-সংকোচনের দৃষ্টান্ত এই—

শব্দ	মূল অর্থ	সংকুচিত অর্থ
মুনিস	মানুষ	মজুর
মৃগ	সমস্ত পশু	হরিণ
প্রদীপ	যা বিশেষভাবে আলো দেয় বা আলোকিত করে	তেল-সলতের দীপ
অন্ন	খাদ্য, যেকোনো খাদ্য	ভাত
মন্দির	গৃহ	দেবগৃহ
চাকর	কর্মচারী	ভৃত্য

অর্থের সংশ্লেষ বা সংক্রম

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কোনো শব্দের অর্থ যদি এমনভাবে বদলে যায় যে, মূল বা আদি অর্থের সঙ্গে তার আর কোনো মিল বা সম্পর্কই থাকে না, তবে সেই পরিবর্তনকেই বলে **অর্থের সংশ্লেষ** বা **সংক্রম**।

শব্দ	আদি অর্থ	পরিবর্তিত অর্থ-সংশ্লেষ
সন্দেশ	সংবাদ	মিষ্টান্ন বিশেষ
ঘাম/ঘর্ম	গরম	স্বেদ
ওঝা	পণ্ডিত, জ্ঞানী	রোগ-নিরাময়ের জন্য যে ঝাড়ফুঁক করে
খুন	রক্ত	হত্যা
হঠাৎ (সং)	হঠকারিতাবশত	অকস্মাৎ
পাত্র	পানপাত্র	বর

অর্থের উৎকর্ষ বা উন্নতি

কোনো শব্দের মূল হীন বা নিকৃষ্ট অর্থ যদি বদলে গিয়ে আগের চেয়ে উৎকৃষ্ট বা শুভ অর্থে ব্যবহৃত হয়, তবে তাকেই বলে **অর্থের উৎকর্ষ**।

শব্দ	মূল অর্থ	পরিবর্তিত অর্থ
ভোগ	খাদ্য	দেবভোগ্য খাদ্যসামগ্রী
ধরা	ধারণ, ধারক	পৃথিবী
মন্দির	গৃহ	দেবগৃহ
পুরোহিত	সম্মুখে স্থাপিত	পূজারি
গোধূলি	গোরুর খুরে উৎক্ষিপ্ত ধূলি	সন্ধ্যাকাল

অর্থের অপকর্ষ

শব্দের মূল অর্থ পরিবর্তিত হয়ে যদি নিকৃষ্ট কোনো অর্থ বোঝায়, তবে তাকেই বলা হয় **শব্দার্থের অপকর্ষ** বা **অবনতি**। তার উদাহরণ—

শব্দ	মূল অর্থ	পরিবর্তিত অর্থ
মহাজন	মহদাশয় ব্যক্তি	সুদখোর, কুসীদজীবী
ঝি	কন্যা	বাড়ির কাজের মেয়ে
নাগর	নাগরিক	অবৈধ প্রণয়ী
অর্বাচীন	নবীন	মূর্খ
ধীবর	বুদ্ধিমান ব্যক্তি	জেলে

গ্রন্থপঞ্জি

গোস্বামী, কৃষ্ণপদ—বাংলা ভাষাতত্ত্বের ইতিহাস (২০০১)
চট্টোপাধ্যায়, হীরেন—ভাষাতত্ত্ব ও বাংলা ভাষার ইতিহাস (১৯৯৩)
বসু, দ্বিজেন্দ্রনাথ—বাংলা ভাষার আধুনিক তত্ত্ব ও ইতিকথা (১৯৮০)
ভট্টাচার্য, পরেশচন্দ্র—ভাষাবিদ্যা পরিচয় (২০০০)
ভট্টাচার্য, বিজনবিহারী—বাগর্থ (১৯৭৭)
মাইতি, প্রকাশ কুমার—আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানের আলোকে বাংলা ভাষা (২০০৮)
সেন, সুকুমার—ভাষার ইতিবৃত্ত (১৯৯৪)

৩০. বাংলা উপভাষা

৩০.১ উপভাষা : মিশ্র ভাষা

একটি জাতি বা সমাজবদ্ধ মানুষ যা দিয়ে নিজেদের মধ্যে ভাবের আদানপ্রদান করে, তা-ই ভাষা। এই যদি ভাষা হয় তবে উপভাষা কী? উপভাষা হল ভাষার আঞ্চলিক বিভিন্নতা বা আঞ্চলিক রূপ। স্থানভেদে ভাষার কিছু রূপভেদ দেখা যায়। **সেই রূপভেদেই উপভাষা।** বস্তুতপক্ষে, উপভাষার মধ্যেই একটি জাতির বা ভাষীর ভাষার প্রকৃত কথ্য রূপ ধরা পড়ে।

উপভাষা বলতে অবশ্য কেবল আঞ্চলিক বিভিন্নতাই বোঝায় না। সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির বা বিভিন্ন পেশার মানুষের কথ্য ভাষাতেও কিছু বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে। তাকেও উপভাষা বলতে পারি। এইভাবে মাঝিমাল্লার ভাষা, উকিলের ভাষা, ছুতোরের ভাষাও উপভাষা।

ভাষা অঞ্চল যত বড়ো হবে, উপভাষার সংখ্যাও ততই বড়ো হবে। বিপরীতক্রমে, ভাষা-অঞ্চল যত ছোটো হবে, উপভাষার সংখ্যাও ততই কম হবে। বাংলা উপভাষা সম্পর্কে প্রথম গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা করেছিলেন জর্জ গ্রিয়ারসন তাঁর Linguistic Survey of India নামের গ্রন্থে। প্রায় পঁচিশ বছরের চেষ্টার ফল ১৯টি পর্বে বিভক্ত তাঁর এই গ্রন্থ। এর পঞ্চম খণ্ডের প্রথম পর্বে গ্রিয়ারসন বাংলা উপভাষার বর্ণনা উপস্থিত করেছেন। উপভাষার বিস্তার, লক্ষণ, বৈশিষ্ট্য প্রভৃতি সম্পর্কে তাঁর বিবেচনা পরবর্তীকালের পণ্ডিতরা মেনে নিতে পারেননি। বাংলা উপভাষার বর্গীকরণেও ভুল করেছিলেন তিনি। তবু বিদেশি হয়েও যে বিপুল শ্রমে ও নিষ্ঠায় একাজ তিনি করেছেন তার প্রশংসা করতেই হয়।

এ তো গেল উপভাষার প্রসঙ্গ। এবার মিশ্র ভাষার কথা। **মিশ্র ভাষা** হল এক ধরনের কৃত্রিম ভাষা। যে ভাষার শব্দাবলি একটি ভাষা থেকে গৃহীত এবং ব্যাকরণ অন্য ভাষা থেকে গৃহীত, সেই ভাষাকেই প্রকৃত মিশ্র ভাষা বলা চলে। তবে অন্য দিক থেকে বলতে গেলে যেকোনো কৃত্রিম ভাষাই মিশ্র ভাষা। আমরা একাদশ অধ্যায়ে [দ্র. **ভাষা-পরিকল্পনা**] দেখেছি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রয়োজনে কৃত্রিমভাবে ভাষা তৈরি করা হয়েছে। সেইসব ভাষাকে কেউ বলেছেন constructed language বা 'নির্মিত ভাষা', আবার কেউ বলেছেন কৃত্রিম ভাষা। এসপেরান্তো একটি কৃত্রিম ভাষা, ভোলাপুক একটি কৃত্রিম ভাষা। এগুলির সবই আবার মিশ্র ভাষা। কেননা, একাধিক ভাষার উপাদান নিয়ে এই কৃত্রিম ভাষা তৈরি হয়েছে। পিজিন ইংলিশ একটা কৃত্রিম তথা মিশ্র ভাষা। জিপ্‌সিদের রোমানি ভাষাও মিশ্র ভাষা, যেহেতু ওই ভাষায় ইয়োরোপীয় ও ভারতীয় ভাষার মিশেল আছে।

৩০.২. বাংলা উপভাষার বৈচিত্র্য

গ্রিয়ারসন বাংলায় মোট চল্লিশটি উপভাষাকে চিহ্নিত করেছেন। তিনি western বা পশ্চিমা, eastern বা পূর্বী, south-eastern বা দক্ষিণ-পশ্চিম এবং central বা কেন্দ্রীয় এই চার ভাগে উপভাষাগুলিকে বিন্যস্ত করেছেন। তিনি উপভাষার বর্গীকরণ করেননি। তিনি মান্য কথ্য বা চলিত ভাষাকেই কেন্দ্রীয় বলেছেন। পরবর্তী কালের ভাষাতাত্ত্বিকরাও যে বাংলা উপভাষাগুলিকে সর্বজনগ্রাহ্য কোনো বর্গে বিভক্ত করতে পেরেছেন তা নয়। তবে তুলনামূলক বিচারে সুকুমার সেনের বর্গবিভাগই আপাতত অধিকাংশ আলোচক মেনে নিয়েছেন। সুকুমার সেন পাঁচটি ভাগে বাংলা উপভাষাগুলিকে বিভক্ত করেছেন।

১. রাঢ়ী (মধ্য-পশ্চিমবঙ্গের উপভাষা)
২. ঝাড়খণ্ডি (দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তের উপভাষা)
৩. বরেন্দ্রী (উত্তরবঙ্গের উপভাষা)
৪. বঙ্গালি (পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গের উপভাষা)
৫. কামরূপি (উত্তর-পূর্ব বঙ্গের উপভাষা)

কেউ কেউ ঝাড়খণ্ডিকে পৃথক বর্গ বলে মানেন না। তাঁরা বলেন যে, ঝাড়খণ্ডি রাঢ়ীরই একটি উপবিভাগ। ১৯৮৯ সালে সুকুমার সেনেরই তত্ত্বাবধানে নিখিলেশ পুরকাইত বাংলা উপভাষার যে ভৌগোলিক জরিপ প্রকাশ করেছেন তাতে উত্তর-পশ্চিম, দক্ষিণ-পূর্ব ও দক্ষিণ-পশ্চিম মেদিনীপুরের উপভাষাকে রাঢ়ীরই 'অপরার্ধ' বলেছেন। তাকে ঝাড়খণ্ডি বলেননি এবং ঝাড়খণ্ড নামে কোনো শ্রেণিও দেখাননি। এই তথ্যগুলিকে মনে রেখে বাংলা উপভাষার একটা ছক আমরা আমাদের চোখের সামনে রাখতে পারি। আমরা অবশ্য ঝাড়খণ্ডিও দেখাব।

রাঢ়ী	বরেন্দ্রী	ঝাড়খণ্ডি	কামরূপি	বঙ্গালি
কলকাতা, উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা, নদিয়া, হাওড়া, হুগলি, বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, পূর্ব বাঁকুড়া	মালদা, রাজশাহি, পাবনা, বগুড়া, দক্ষিণ দিনাজপুর	মানভূম, সিংভূম, পশ্চিম মেদিনীপুর, দক্ষিণ ও পশ্চিম বাঁকুড়া, পুরুলিয়া	উত্তর দিনাজপুর, দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, রংপুর, কোচবিহার	ঢাকা, বরিশাল, ময়মনসিংহ, খুলনা যশোর, ফরিদপুর নোয়াখালি, চট্টগ্রাম কুমিল্লা শ্রীহট্ট

এই ছকটিতে যেভাবে ভাগ দেখানো হয়েছে তা যে নিখুঁত তা বলা যাবে না। তবে এটি একটি সাধারণ চিত্র তুলে ধরেছে। প্রতিটি জেলার প্রান্তসীমার ভাষায় পার্শ্ববর্তী জেলার ভাষার প্রভাব দেখা যায়। যেমন পূর্ব খুলনার ভাষায় পশ্চিম বরিশালের ভাষার ছাপ আছে। আর একটা বিষয়ও লক্ষ করব। এখানে আমরা উপভাষার বিভাগ দেখিয়েছি ভৌগোলিক

অঞ্চল ধরে। কাজেই রাষ্ট্রিক বিভাজন এখানে গুরুত্ব পায়নি। তাই বাংলা উপভাষায় বাংলাদেশ রাষ্ট্রের উপভাষাও এখানে দেখানো হয়েছে।

৩০.৩ উপভাষাগুলির মধ্যে মিল ও অমিল

পরিবর্তনশীলতা ভাষার ধর্ম। একটি ভাষার দুই বা তার বেশি ভাষিক গোষ্ঠীর ভৌগোলিক অবস্থান বদলে যায় বলেই আঞ্চলিক বিভিন্নতার সৃষ্টি হয়, অর্থাৎ উপভাষার সৃষ্টি হয়। সেইজন্যই বলা হয় যে, উপভাষা হল 'ভাষা'-র কথ্য রূপভেদ। উপভাষায় উপভাষায় মিল যেমন থাকে, তেমনি পার্থক্যও থাকে।

রাঢ়ীর অন্তর্গত জেলাগুলির উপভাষার সঙ্গে বরেন্দ্রী ও কামরূপির উপভাষার কিছু মিল পাওয়া যায়। তবে অনেক বেশি মিল পাওয়া যায় রাঢ়ীর অন্তর্গত জেলাগুলির ভাষায়; অর্থাৎ বীরভূমের সঙ্গে বর্ধমানের, মুর্শিদাবাদের, আবার হুগলির সঙ্গে হাওড়ার ইত্যাদি। ধ্বনিতত্ত্বের দিক থেকে রাঢ়ের জেলাগুলিতে অভিশ্রুতি ও স্বরসংগতি বিশেষভাবে লক্ষ করা যায়। দ্বিতীয়ত অ-ধ্বনির ও-তে পরিণত হওয়াও রাঢ়ের বৈশিষ্ট্য। বন-বোন্ মন-মোন্, গম-গোম্। তৃতীয় বৈশিষ্ট্য নাসিক্যীভবন। দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের জেলাগুলিতে অনুনাসিকতার প্রবণতা একটু বেশি। রঁইচে (রয়েছে), হাঁসপাতাল, ভোগাইঁছে (ভুগিয়েছে) শোনা যায়। শব্দের মধ্যে মহাপ্রাণতার লোপ বা ক্ষীণতাও ওই অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য। দুদ্ (দুধ), বুজ্ব (বুঝব), কোতা (কোথা), মাতা (মাথা)। বর্ধমান-বীরভূমে ন প্রায়ই ল হয়ে যায়—লিয়ে যাও, লাও গা, ভালো লয় ইত্যাদি।

রাঢ়ীর অভিশ্রুতি-স্বরসংগতি আবার বঙ্গালিতে নেই। বঙ্গালিতে এ ধ্বনির অ্যা-তে রূপান্তর হয়, ও ধ্বনির রূপান্তর হয় উ-তে। এই অঞ্চলে অনুনাসিকতার প্রবণতাও নেই। প্রথম সিলেব্‌লের মহাপ্রাণতা প্রায়ই ক্ষীণ হয়। বাত্ (ভাত), দান্ (ধান)। শ্ ধ্বনি প্রায়ই হ্-তে পরিণত হয়—হালা (শালা), হে গ্যাছে কই (সে কোথায় গেছে)। নোয়াখালি ও চট্টগ্রামের উপভাষায় অনুনাসিকতা প্রবল। বঙ্গালিতে ঘৃষ্ট (affricate) জ্ ধ্বনি দন্ত্য ঘৃষ্টতে (dental affricate) পরিণত হয়। জামা (jama) হয়ে যায় জ়ামা (zama)।

আবার মধ্য বর্ধমানের ভাষার সঙ্গে পশ্চিম বীরভূমের ভাষার পার্থক্য স্পষ্ট। বীরভূমের রইঁচে, ভোগাইঁচে, বর্ধমানে শোনা যাবে না। মধ্য-উত্তর বর্ধমানে রইয়েছে, গেইয়েছে শোনা যায়। তেমনি খুলনা ও বরিশাল দুইই বঙ্গালির অন্তর্ভুক্ত হলেও তাদের মধ্যে তফাত বেশ লক্ষণীয়। বরিশালে করসে (করেছে), খুলনায় কোরিছে, বরিশালে জ়াইতে আছে (যাচ্ছে) খুলনায় জাতিছে।

৩০.৪ আদর্শ কথ্য ভাষাও একটি উপভাষা

বিভিন্ন উপভাষাভাষী লোকেরা পরস্পরের সঙ্গে কথোপকথন কোন্ ভাষায় চালায়? একথা ঠিক যে, কখনো-কখনো নিজের নিজের উপভাষাতেই কথাবার্তা চালায়। আবার দেখা যায় যে, বিভিন্ন উপভাষাভাষী একটি সাধারণ ভাষাতে কথা বলতে শুরু করে, যে-

ভাষাটি কোনো বিশেষ অঞ্চলের নয়, বরং একটি বা দুটি অঞ্চলের উপভাষার উপর ভিত্তি করে গড়ে-ওঠা একটি সর্বজনমান্য ভাষা। সেটিই মান্য কথ্য ভাষা বা মান্য চলিত ভাষা। আমাদের এই মান্য কথ্য ভাষাটি কলকাতা, হাওড়া, হুগলি ও নদিয়ার বৈশিষ্ট্য নিয়ে গড়ে উঠেছে। নিঃসন্দেহে তার মধ্যে কলকাতার ভাষারই প্রাধান্য। ঔপনিবেশিক যুগ থেকেই বাংলা বিভাগ বা প্রেসিডেন্সির গুরুত্ব বাড়ছিল। অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দুই দিক থেকেই প্রেসিডেন্সি বিভাগ তখন ভারতে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। কলকাতার সঙ্গে নানা অঞ্চলের মানুষের ক্রমাগত যোগাযোগ ঘটত। বাংলার বিভিন্ন জেলার মানুষ ব্যাবসার কারণে নিয়মিত আসত কলকাতায়। এই নিরন্তর যোগাযোগের ফলে অন্য উপভাষাগুলিতে যেমন কলকাতার ভাষার প্রভাব পড়ল, তেমনি কলকাতার ভাষাতেও অন্য অঞ্চলের ভাষার প্রভাব পড়ল। কলকাতার ভাষা পরিশীলিত হতে লাগল। আর কলকাতাই যেহেতু তখন রাজনীতি ও অর্থনীতির কেন্দ্র, তাই কলকাতার ভাষাই ধীরে ধীরে হয়ে দাঁড়াল সর্বাঞ্চলবাসী বাঙালির কথোপকথনের ভাষা। এইভাবেই সে ভাষা মান্য কথ্য ভাষা হয়ে দাঁড়াল।

এই মান্য কথ্য ভাষাও একটি উপভাষা। এই কেন্দ্রীয় ভাষাটিও যে একটি উপভাষা সেকথা প্রথম বলেন স্যার জর্জ গ্রিয়ারসন। আমরা দেখেছি (৩০.২) স্যার জর্জ বাংলা উপভাষার আলোচনায় যে পাঁচটি ভাগ করেছেন তারই একটি হল central বা কেন্দ্রীয় উপভাষা। আসলে মান্য কথ্য ভাষাকেই তিনি কেন্দ্রীয় উপভাষা বলেছেন। তাঁর এই সিদ্ধান্ত নির্ভুল এবং পরবর্তীকালের ভাষাতাত্ত্বিকরাও মান্য কথ্য ভাষাকে একটি উপভাষা হিসাবে গণ্য করেন।

৩০.৫ রাঢ়ী উপভাষা

বাংলা উপভাষাগুলির মধ্যে রাঢ়ী উপভাষায় কথা বলে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক মানুষ। অন্য এক দিক থেকেও রাঢ়ী উপভাষা গুরুত্বপূর্ণ। আদর্শ বা মান্য কথ্য বাংলা গড়ে উঠেছে রাঢ়ী উপভাষার উপর ভিত্তি করে। রাঢ়ীর শিষ্ট রূপই রয়েছে মান্য চলিত বা কথ্য ভাষার ভিত্তি হিসাবে।

৩০.৫.১ রাঢ়ীর ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

১. রাঢ়ী উপভাষার প্রধান ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য হল অভিশ্রুতির প্রবণতা।

দেখিয়া > দেইখ্যা > দেখে ; করিয়া > কইর‍্যা > করে

২. স্বরসংগতিও রাঢ়ীর বৈশিষ্ট্য।

শুনা > শোনা ; শিয়াল > শেয়াল ; হিসাব > হিসেব

৩. 'অ' ধ্বনির 'ও' ধ্বনিতে পরিণত হওয়ার প্রবণতাও রাঢ়ীর বৈশিষ্ট্য। বিশেষত ই, উ, ক্ষ এবং য ফলার পূর্ববর্তী 'অ', 'ও' হয়ে যায়।

মন > মোন্ ; সভ্য > শোব্‌ভো ; লক্ষ > লোক্‌খো।

৪. লুপ্ত নাসিক্য ব্যঞ্জনের পূর্ববর্তী স্বরধ্বনির অনুনাসিকতা—

চন্দ্র > চাঁদ ; বংশ > বাঁশ

কোথাও কোথাও স্বতোনাসিক্যীভবনও ঘটে—

পুথি > পুঁথি ; কাচ > কাঁচ

৫. শব্দের আদিতে শ্বাসাঘাত পড়লে শব্দান্তের মহাপ্রাণতার লোপ—

মাছ > মাচ্ ; দুধ > দুদ্ ; বাঘ > বাগ্ ; লাভ > লাব্

৬. শব্দান্তের অঘোষ ধ্বনির ঘোষতা—

কাক্ > কাগ্ ; শাক > শাগ্

৭. ল ধ্বনির ন হওয়া—

লুচি > নুচি ; লোহা > নোহা > নোয়া ; লেবু > নেবু

৮. আবার এর বিপরীত প্রবণতাও দেখা যায়, অর্থাৎ ন > ল

নাতি > লাতি ; নবান্ন > লবান্

৩০.৫.২ রাঢ়ীর রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

১. রাঢ়ীতে কর্তৃকারকের বহুবচনে '-গুলি', '-গুলো' যোগ হয়। কিন্তু অন্যান্য কারকে '-দের' যোগ হয়।

আমগুলো, মেয়েগুলি

আমাদের, তোদের দ্বারা

২. সম্প্রদানে গৌণ কর্মে 'কে' বিভক্তি ব্যবহৃত হয়—

ভিখিরিকে ভিক্ষে দাও

৩. কর্মকারকে গৌণকর্মে 'কে' বিভক্তি বসে, মুখ্য কর্মে কোনো বিভক্তি হয় না—

আমাকে বই দাও।

৪. অধিকরণ কারকে '-এ', '-তে' এবং '-এতে' ব্যবহৃত হয়—

ঘরে বসে আছি।

বাড়িতে কে আছে?

'ঘরেতে ভ্রমর এল'

৫. সকর্মক ক্রিয়ার কর্তৃপদে '-এ' বিভক্তি হয়—

লোকে কত কথাই বলে।

বাঘে গোরু মেরেছে।

৬. করণ কারকে 'দিয়ে', 'দ্বারা', 'সঙ্গে' প্রভৃতি অনুসর্গ ব্যবহৃত হয়। অপাদানে 'হতে', 'থেকে'—

তোমাকে দিয়ে কিচ্ছু হবে না।

আমার সঙ্গে এসো।

কোথা থেকে এলে?

৭. রাঢ়ী উপভাষায় ক্রিয়াপদে বিভক্তির বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়

ক. বর্তমান কালে—

উত্তম পুরুষে '-ই' বিভক্তি—করি, পাড়ি, খেলি, বসি

মধ্যম পুরুষে '-ও' বিভক্তি—পড়ো, খেলো

প্রথম পুরুষে '-এ', '-এন', '-ন' বিভক্তি—করে, খেলে, পড়ে ; করেন, খেলেন।

খ. অতীতকালে ক্রিয়ার বিভক্তি—

উত্তম পুরুষ—'-আম', '-উম' বিভক্তি—করতাম, খেলতুম, খেললাম।

মধ্যমপুরুষ—'-এ', '-ই', '-এন' বিভক্তি—খেলেছিলে, গিয়েছিলি, গিয়েছিলেন।

প্রথম পুরুষ—'-অ', '-এন'—খেলল, খেলেছিল, খেললেন।

৩০.৬ বরেন্দ্রী উপভাষা

বরেন্দ্রী উপভাষা প্রধানত উত্তরবঙ্গের কয়েকটি জেলার ভাষা। মালদহ, পাবনা, রাজশাহি, বগুড়া, দিনাজপুরের একাংশের ভাষাই বরেন্দ্রী বলে পরিচিত। একসময় রাঢ়ীতে আর বঙ্গালীতে পার্থক্যের চেয়ে মিলই ছিল বেশি। ক্রমে বঙ্গালির প্রভাব পড়তে থাকে বরেন্দ্রীর উপর। আবার উত্তরবঙ্গ-সংলগ্ন বিহারের ভাষারও একটা প্রভাব বরেন্দ্রীর উপর পড়েছে।

৩০.৬.১ বরেন্দ্রী উপভাষার ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

১. রাঢ়ীর মতোই বরেন্দ্রীতেও অনুনাসিকতা একটি বৈশিষ্ট্য—

পঁ্যাচা, কাঁচ, ইঁট, চাঁদ

২. শব্দশেষে মহাপ্রাণতার লোপ—

বাঘ > বাগ্, সাধ > সাদ্

৩. বঙ্গালীর প্রভাবে জ (j) ধ্বনি জ়(z) ধ্বনিতে পরিণত—

কাগজ > খাগজ়

বাজ্না > বাজ়্না

৪. শব্দের গোড়ায় 'র' ও 'অ'-এর পরস্পর বদল—

রস > অস   রাম > আম

অঞ্জন > রঞ্জন   রাস্তা > আস্তা

৩০.৬.২ রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

১. বরেন্দ্রীতে বর্তমান কালের মধ্যম পুরুষে '-উ' বিভক্তি এবং অতীত কালে উত্তম পুরুষে 'লাম' বিভক্তি হয়।

২. ভবিষ্যৎ কালের ক্রিয়ায় উত্তম পুরুষে '-ম' বা '-মু' বিভক্তি হয়—রাখিম, যাইমু।

৩. অধিকরণ কারকে '-ত' বিভক্তি ব্যবহৃত হয়—

বাড়িত আছে, ঘরেত আছে

৪. কর্তৃকারকের বহুবচনের '-গুলা' বা '-গুলো'-র বদলে '-গুলি' বা '-গিলা', '-গলা', '-গলান' প্রভৃতি বিভক্তি হয়।

ছাগল গিলা, বইগলান

৫. ষষ্ঠী বিভক্তিতে বহুবচনে '-গোর'

আমাগোর

৩০.৭ ঝাড়খণ্ডি উপভাষা

পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিমাঞ্চলে বিহার-সংলগ্ন মানভূম, সিংভূম, পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিম বাঁকুড়া ও পুরুলিয়ার ভাষা নিয়েই ঝাড়খণ্ডি উপভাষা।

৩০.৭.১ ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

১. ঝাড়খণ্ডিতে 'ও'-ধ্বনি প্রায়ই 'অ'-তে রূপান্তরিত হয়—

লোক > লক

দোকান > দকান

গোটা > গটা

২. অনুনাসিকতা এই উপভাষার অন্যতম বৈশিষ্ট্য—

হাঁসপাতাল, চাঁ, পাঁথর

৩. 'ল' ও 'ন'-এর বিপর্যাস—

নুন > লুন, লুচি > নুচি, নাতি > লাতি, লাঠি > নাটি।

৪. অল্পপ্রাণ ধ্বনি প্রায়ই মহাপ্রাণ ধ্বনিতে পরিণত হয়—

তোমার > তোম্হার

নিতাম > লিথম

তোকে > তখে

৫. স্বরসংগতির প্রবণতা তেমন দেখা যায় না বলে কতকগুলি শব্দের কথ্য রূপ বদল হয়নি—

শিয়াল, বিড়াল, দেশি, মূলা, ধুলা, কুলা

৩০.৭.২ রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

১. নিমিত্তার্থে অনুসর্গের বদলে '-কে' বিভক্তি—

জলকে যাবি লা?

২. নামধাতুর প্রাধান্য—

দিন দগ্ধাইছে, শরীলটা দুখাচ্ছে

৩. 'আছ্' ধাতুর বদলে 'বট্' ধাতুর ব্যবহার—

কে বটে উ লকটা?

ইটা সয়ত্য কথা বটে

৪. ক্রিয়াপদে স্বার্থিক 'ক' প্রত্যয়—

যাবেক, খাবেক, দেখবেক

৫. যৌগিক ক্রিয়ার ব্যাপক ব্যবহার—

খাওয়া করাব

যাওয়া করাব

৬. অপাদান কারকে 'থেকে'-র বদলে '-লে', '-ঠে' প্রভৃতির ব্যবহার—

মায়ের লে মাউসির দরদ বেশি বটে

ঘর ঠে বাহির যাব

৭. ক্রিয়াপদের আগে নঞর্থক 'নাই'-এর ব্যবহার

নাই যাব

নাই খাব

নাই দিব

৩০.৮ কামরূপি উপভাষা

জলপাইগুড়ি, উত্তর দিনাজপুর, দার্জিলিং, কোচবিহার এবং রংপুরের ভাষাই সাধারণভাবে কামরূপি উপভাষা অঞ্চলে পড়ে। তবে উক্ত অঞ্চলের সংলগ্ন বিহারের পূর্ব পূর্ণিয়ায় বাঙালিরা যে-ভাষায় কথা বলে তা কামরূপি বলেই বিশেষজ্ঞদের ধারণা।

৩০.৮.১ ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

১. শব্দের আদ্য 'অ' কখনো-কখনো 'আ' উচ্চারিত হয়—

অসুখ > আসুখ, অতি > আতি, কথা > কাথা

২. কখনো-কখনো 'অ' এবং 'ও' ধ্বনি 'উ' উচ্চারিত হয়—

সমুদ্র > সুমুদ্র ; বোন > বুন ; কোন্ > কুন্

৩. শব্দের মধ্যে ঘোষ মহাপ্রাণ ধ্বনি ঘোষ অল্পপ্রাণ ধ্বনিতে পরিণত হয়—

বুধ > বুদ ; বাঘ > বাগ

৪. বঙ্গালীর মতো 'র' ও 'ড়'-এর বিপর্যাস ঘটে—

শাড়ি > সারি ; বাড়ি > বারি

৫. অপিনিহিতি তেমন নেই কামরূপিতে।

৬. স্বতোনাসিক্যীভবন কামরূপির অন্যতম বৈশিষ্ট্য—

এটা > ইঁটা ; উহা > উঁয়া ; ইহা > ইঁয়া

৭. 'ন' ও 'ল'-এর বিপর্যাস ঘটে কামরূপিতে—

লাঙ্গল > নাঙ্গল, জলঙ্গি > জনঙ্গি, জননী > জলনী

৮. কামরূপিতে শ-ষ-স সবই 'শ' উচ্চারিত হয়।

৯. পদের আদিতে র-কার লুপ্ত হয়—

রাগ > আগ, রাম > আম

১০. 'চ' ও 'ছ' প্রায়ই 'স' উচ্চারিত হয়। কখনো-কখনো 'স' বা 'শ' 'হ'-তে পরিণত।

৩০.৮.২ রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

১. কর্মকারকে '-ক' বিভক্তি প্রায় সর্বজনীন—

হামাক, মোক (আমাকে)।

সপ্তমী বিভক্তিতে '-ত' ব্যবহৃত—

হাড়ীত (হাঁড়িতে)

২. কামরূপিতে '-গুলি' বা 'গুলা' সর্বনামের বহুবচনেও ব্যবহৃত হয়।

৩. ধাতুর বিভক্তির ক্ষেত্রে নিত্য বর্তমানের উত্তম পুরুষে '-ওঁ' / '-ওং', ঘটমান বর্তমানের উত্তমপুরুষে '-চু' / '-চং', সাধারণ অতীতের উত্তম পুরুষে '-নু' এবং সাধারণ ভবিষ্যতের উত্তম পুরুষে '-ইম্' ব্যবহৃত হয়।

৪. সম্বন্ধ পদে '-র' এবং '-ক' দুই-ই যোগ হয়—

মায়ের ঘর, বাপোক ঘর

৫. উত্তম পুরুষের সর্বনামে 'মুই', এবং মধ্যম পুরুষের একবচনে 'তুই' ব্যবহৃত হয়।

৬. সমাপিকা ক্রিয়াকে নঞর্থক করতে ক্রিয়ার আগে নঞর্থক অব্যয় যোগ হয়—

না পড়িম্

না জাওঁ

৭. অপাদান কারকে 'থেকে'-র বদলে 'থাকি' ব্যবহৃত হয়—

ঘর থাকি আলু (ঘর থেকে এল)

বারি থাকি (বাড়ি থেকে)

৩০.৯ বঙ্গালি উপভাষা

বর্তমান বাংলাদেশের অধিকাংশ জেলার ভাষাই বঙ্গালি উপভাষাগুচ্ছের মধ্যে পড়ে।

৩০.৯.১ বঙ্গালির ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

বঙ্গালির উপভাষার মধ্যে বৈচিত্র্য ও বিভিন্নতা আছে। নোয়াখালি, শ্রীহট্ট ও চট্টগ্রামের ভাষা অন্য জেলাগুলির ভাষা থেকে অনেকটাই আলাদা। তবে কতকগুলি সাধারণ বৈশিষ্ট্যের কথা বলা যেতে পারে।

১. বঙ্গালিতে অপিনিহিতির ব্যাপক ব্যবহার হয়, অভিশ্রুতি নেই।

করিয়া > কইরা, মরিয়া > মইরা, আজি > আইজ।

২. নাসিক্য ব্যঞ্জনের লোপ হয় না

চন্দ্র > চান্দ

বন্ধন > বান্ধা

৩. 'এ' ধ্বনি প্রায়ই 'অ্যা' উচ্চারিত হয়—

তেল > ত্যাল, মেঘ > ম্যাঘ, দেশ > দ্যাশ্

কেবল > ক্যাবল, এবং > অ্যাবং

৪. 'স' বা 'শ' ধ্বনির 'হ'-তে রূপান্তর—

সকলে > হগোলে

শালা > হালা

সম্বন্ধি > হুম্মুন্দি

সে > হে (হে কই গ্যাছে)

৫. 'ও' ধ্বনির 'উ' ধ্বনিতে রূপান্তর—

কোদাল > কুদাল

ঝোল > ঝুল (মাছের ঝুল)

ছোটো > ছুডো

৬. 'ট' ও 'ঠ' পরিণত হয় 'ড' ধ্বনিতে।

বেটা > ব্যাডা

কেটা > ক্যাডা

এটা > এডা

৭. শব্দের মধ্যে 'খ' ধ্বনি 'হ'-তে পরিণত হয়।

কখন > কহোন্

এখন > অ্যাহোন্

যখন > জ়হোন্

৮. আদ্য 'হ' 'অ'-তে পরিণত হয়।

হয় > অয় (অয় অয় জ়ানতি পারো না)

৯. অনুনাসিকতা অন্যত্র বিশেষ না থাকলেও নোয়াখালি ও চট্টগ্রামে প্রচুর আছে—

চাঁদ > হাঁদ

আমি > আঁই

তোর > তঁর

১০. বঙ্গালীতে 'চ', 'ছ' ও 'জ' প্রায়ই উষ্ম ধ্বনিতে পরিণত—

চ > স (s), ছ > স (s), জ > জ় (z)

৩০.৯.২ বঙ্গালির রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

১. বিশেষ্যপদের বহুবচনে '-গুলা'-র ব্যবহার ব্যাপক।

ছাওয়ালগুলা, মাইয়াগুলা

কোনো-কোনো জেলায় '-গুল' আর '-গুলাইন'-ও দেখা যায়।

গোরু গুলাইন কম্‌নে গেল?

২. কর্তৃকারকে '-এ' বিভক্তির ব্যবহার—

বাপে দিছে

মায়ে ডাকছে

আপনে এইহানে আহেন

৩. পুরাঘটিত বর্তমানের রূপে প্রায়ই ধ্বনিসংক্ষেপ হয়।

আমি গেসি (গিয়েছি)

আমি করসি (করেছি)

৪. গৌণকর্মে '-রে' বিভক্তির ব্যবহার—

আমারে ডাকো ক্যান্‌?

তরে দিমু না (তোকে দেব না)

আমারে দুগ্‌গা বাত দ্যাও

৫. মধ্যম পুরুষে ভবিষ্যৎ কালে এবং কখনো-কখনো অনুজ্ঞায় '-বা' বিভক্তির ব্যবহার—

তুমি কহন যাবা?

কী খাবা কও।

৬. উত্তম পুরুষে সাধারণ ভবিষ্যতে '-মু' এবং 'উম' বিভক্তির ব্যবহার—

আমি যামু না।

আমি অহন যাউম।

৭. অতীত কালের ক্রিয়ায় নঞর্থক অব্যয় '-নি'-র বদলে '-নাই' ব্যবহৃত হয়।

বান্দরে কলা খায় নাই

আমি বাড়ি যাই নাই

৮. যৌগিক ক্রিয়ার বিচিত্র ব্যবহারও লক্ষণীয়—

কইয়া ফালা (বলে ফেল্)

দ্যাহাইয়া দে (দেখিয়ে দে)

উইঠ্যা বয় (উঠে বোস্)

গ্যাছে গিয়া (চলে গেছে)

আমি অহন যাইবার চাই (আমি এখন যেতে চাই)

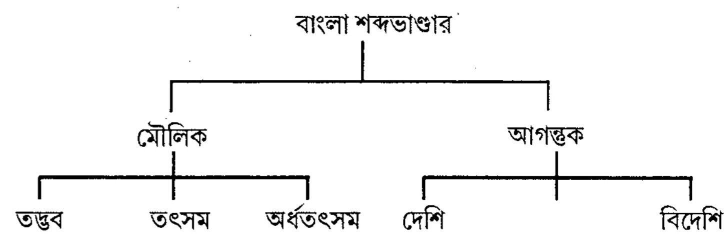
গ্রন্থপঞ্জি

গোস্বামী, কৃষ্ণপদ—বাংলা ভাষাতত্ত্বের ইতিহাস (২০০১)
চট্টোপাধ্যায়, হীরেন—ভাষাতত্ত্ব ও বাংলা ভাষার ইতিহাস (১৯৯৩)
পুরকাইত, নিখিলেশ—বাংলা অসমীয়া ও ওড়িয়া উপভাষার ভৌগোলিক জরিপ (১৯৮৯)
বসু, দ্বিজেন্দ্রনাথ—বাংলা ভাষার আধুনিক তত্ত্ব ও ইতিকথা (১৯৮০)
ভট্টাচার্য, পার্বতীচরণ—বাংলা ভাষা (১৯৮২)
ভট্টাচার্য, সুভাষ—বাঙালির ভাষা (২০০০)
মজুমদার, পরেশচন্দ্র—বাঙলা ভাষা পরিক্রমা, প্রথম খণ্ড (১৩৮৩)
সেন, সুকুমার—ভাষার ইতিবৃত্ত (১৯৯৪)

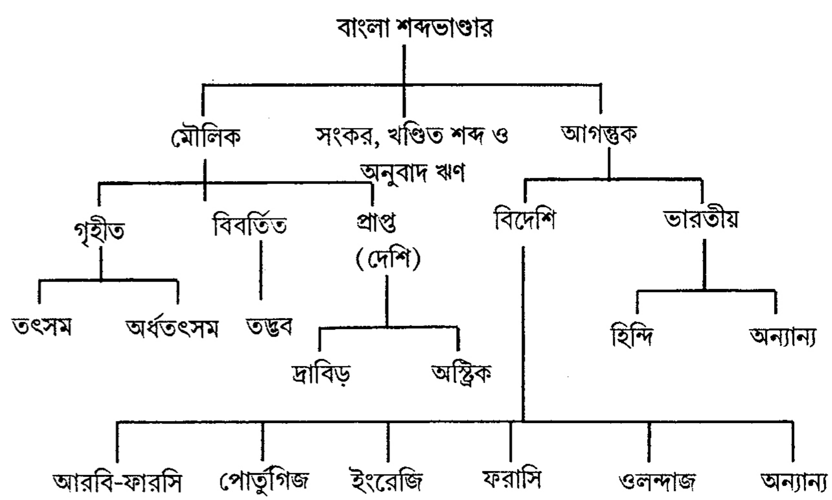
৩১. বাংলা ভাষার শব্দভাণ্ডার

৩১.১ বাংলা ভাষার শব্দভাণ্ডার

বাংলা ভাষার বয়স হাজার বছরের মতো। এই হাজার বছরে বাংলা ভাষা বিভিন্ন উৎস থেকে শব্দ আহরণ করেছে। ভাষাতাত্ত্বিকগণ বাংলা শব্দের উৎস ও শব্দভাণ্ডার নিয়ে আলোচনা করেছেন। সুকুমার সেন বলেছেন বাংলা শব্দের প্রধান দুটি উৎস—**মৌলিক** ও **আগন্তুক**। মৌলিকের মধ্যে আছে তিনটি, ১. তদ্ভব, ২. তৎসম, ৩. অর্ধতৎসম। আগন্তুক শব্দ তাঁর মতে দুই শ্রেণির—১. দেশি, ২. বিদেশি। অর্থাৎ তাঁর মতে বাংলা শব্দভাণ্ডারের রেখাচিত্র হবে এইরকম—



সুকুমার সেনের এই বিভাগ সকলে মেনে নেন না। এই বিভাগে একটা অতিসরলীকরণ দেখা যাচ্ছে। আমরা বাংলা শব্দভাণ্ডারের বিন্যাসকে বরং এইভাবে দেখাতে পারি।



এই ছকটিকে সামনে রেখে আমরা এবার বাংলা শব্দের উৎসগুলিকে দেখে নেব। গৃহীত মৌলিক শব্দ হল **তৎসম, অর্ধতৎসম** ; বিবর্তিত মৌলিক হল **তদ্ভব** এবং প্রাপ্ত মৌলিক বা **দেশি**-র মধ্যে প্রধান হল **অস্ট্রিক**। বিদেশি ভাষা থেকে পাওয়া শব্দও অপ্রচুর নয়। আমরা পেয়েছি **গ্রিক, পোর্তুগিজ, ইংরেজি, ফরাসি, ওলন্দাজ, আরবি-ফারসি, তুর্কি** প্রভৃতি। আগন্তুক **ভারতীয় ভাষাসমূহ** থেকেও এসেছে শব্দ। এছাড়া আছে সংকর শব্দ, খণ্ডিত শব্দ ও অনুবাদ ঋণ।

৩১.২ তৎসম শব্দ

যে সংস্কৃত শব্দ বাংলা ভাষার উন্মেষ পর্বের সময় থেকে আজ পর্যন্ত অবিকৃত অবস্থায় বাংলায় গৃহীত হয়েছে সেগুলিকেই তৎসম শব্দ নাম দেওয়া হয়েছে। এই ব্যাপারটা কেবল আমাদের ভাষাতেই আছে তা নয়। ইয়োরোপীয় ভাষাবিদরা লাতিন থেকে অপরিবর্তিত অবস্থায় গৃহীত শব্দকে mots savants মো সাভাঁ নাম দিয়েছেন। ব্যাপারটা অনেকটা আমাদের তৎসম শব্দেরই মতো। দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু বলেছেন এই 'তৎসম' নামটি ভারতের প্রাকৃত বৈয়াকরণেরা দিয়েছিলেন। এদের সংস্কৃত রূপ প্রাকৃতের ধ্বনি পরিবর্তনের ধারাতেও 'ক্ষুণ্ণ হয়নি।'

আমাদের ভাষার শব্দভাণ্ডারে তৎসম শব্দের সংখ্যা কত, ভাষায় সেই সম্ভারের গুরুত্বই বা কী, তা সুনির্দিষ্টভাবে নির্ণয় করা যায় না। সুনীতিকুমার লক্ষ করেছেন যে, জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের বাঙ্গালা অভিধানে যত শব্দ ধৃত হয়েছে তার মধ্যে শতকরা ৪৪ ভাগ তৎসম শব্দ। সুনীতিকুমার চর্যাগীতি থেকে পরবর্তী কালের সাহিত্যগ্রন্থগুলিতে যত শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে তার হিসাব নিয়ে দেখেছেন সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কীভাবে তৎসম শব্দের ব্যবহার বদলে গেছে। এও লক্ষ করা গেছে যে, অষ্টাদশ শতকের শেষ থেকে সমগ্র উনিশ শতক জুড়ে যত সাহিত্যগ্রন্থ রচিত হয়েছে তাতে তৎসম শব্দের ব্যবহার অন্যান্য শব্দের চাইতে বেশি। কিন্তু আমাদের ভাষায় কত তৎসম শব্দ আছে, কত তৎসম শব্দ সাহিত্যে ব্যবহৃত হয়, তার হিসাব নির্ণয় সহজ কাজ নয়। তবে একথা নিশ্চিতভাবেই বলা যায় যে, সাধুভাষায়, বিশেষত, পণ্ডিতি সাধুভাষায় তৎসম শব্দের যে আধিক্য, চলিত ভাষায় তা নয়। আর সাধারণ মানুষের মুখের ভাষায় অর্থাৎ উপভাষায় তো তৎসম শব্দের ব্যবহার খুবই কম।

তবু একথা অস্বীকার করা সম্ভব নয় যে, তৎসম শব্দ বাংলা ভাষার শব্দভাণ্ডারের একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ। বাংলায় যেসব সংস্কৃত শব্দ এসেছে সেগুলির মধ্যে কিছু কিছু শব্দের প্রাচীনতা লক্ষণীয়। বৈদিক ভাষার শব্দও তাতে আছে। পরবর্তীকালের সংস্কৃত শব্দ তো অজস্র—ঋত ঋত্বিক ঋক্‌থ অক্ষি অবি দম্পতি গ্রহ ইষ্ট মূষিক জ্ঞান নভ উষা তৃণ রুচি শ্লোক বৃদ্ধি কিশলয় জীব ইন্দ্র বরুণ মৃত্যু অন্ত সূর্য নক্ষত্র চন্দ্র উর্বশী প্রান্ত ধ্যান গ্রহণ তারকা পশ্চিম। সংস্কৃত ভাষায় পাওয়া যায় না, এমন বহু শব্দ সংস্কৃতের নিয়মেই গঠন

করে বাংলায় প্রচলিত করা হয়েছে। অতিষ্ঠ, আবাহন খড়্গহস্ত কাণ্ডজ্ঞান অগ্নিমূল্য গণ্ডমূর্খ এসব শব্দ সংস্কৃতের রীতি মেনেই তৈরি হয়েছে। এও একরকম তৎসম শব্দ। গঠন, বিদ্রুপ, প্রভৃতি শব্দ আদৌ সংস্কৃতে নেই, এদের গঠনও সংস্কৃতানুগ নয়। এগুলোকে তৎসম বলা ঠিক নয়।

বাংলায় প্রকৃত তৎসম শব্দ বেশি নয়

যখন তৎসম শব্দের কথা বলি তখন আমরা প্রধানত সেইসব সংস্কৃত শব্দের কথাই মনে রাখি যেগুলির বানান অবিকৃত আছে। আমরা তৎসম শব্দের উচ্চারণের প্রসঙ্গ এড়িয়ে যাই। অনেকদিন আগেই রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন যে, বানানের ছদ্মবেশ ঘুচিয়ে দিলেই তৎসম শব্দ আর তৎসম থাকবে না। অর্থাৎ বানানটাই যা সংস্কৃতের মতো আছে, উচ্চারণ একেবারেই নয়। বলতে গেলে কোনো তৎসম শব্দকেই আমরা বাংলায় সংস্কৃতের মতো উচ্চারণ করি না। আমরা তাকে আমাদের রীতিতে উচ্চারণ করি। সংস্কৃতের অকারান্ত শব্দগুলি বাংলায় হয় ও-কারান্ত, নয়তো ব্যঞ্জনান্ত উচ্চারিত হয়। বাংলার সুপরিচিত স্বরসংগতি বহু শব্দের অ-কে বা নিহিত অ-কে ও-ধ্বনিতে পরিণত করেছে। এই স্বরসংগতি সংস্কৃতে নেই। কাজে কাজেই যেসব শব্দকে আমরা তৎসম বলি, সেগুলো কেবল বানানেই তৎসম, উচ্চারণে নয়।

আবার এমন অনেক শব্দ আছে যেগুলোর বানান সংস্কৃতের মতো, কিন্তু অর্থ বাংলায় এসে বদলে গেছে। তেমন শব্দকে তৎসম বলা সংগত কি না তাও ভাববার বিষয়। তা ছাড়া বহু তৎসম শব্দের বানানকে আমরা কিছুটা বদলে নিয়েছি—সম্রাট, বিরাট, মহান, হনুমান প্রভৃতি শব্দের হস্‌চিহ্ন কোথায় গেল? কোথায় গেল চক্ষু, জ্যোতি, মন প্রভৃতি শব্দের বিসর্গ? এইসব শব্দকে কি তৎসম বলা সংগত?

৩১.৩ অর্ধতৎসম শব্দ

তৎসম শব্দ লোকের মুখে উচ্চারিত হতে হতে বিকৃত হয়ে পড়েছে কখনো-কখনো। এই কিছুটা ভাঙা বিকৃত তৎসম শব্দকেই অর্ধতৎসম শব্দ বলা হয়। অর্ধতৎসম শব্দ মূল তৎসম থেকে উচ্চারণে যেমন আলাদা, বানানেও তাই। ছেরাদ্দ (শ্রাদ্ধ), ছিরি (শ্রী), গুষ্টি (গোষ্ঠী), দস্যি (দস্যু), রোদ্দুর (রৌদ্র), বেম্মো (ব্রহ্ম বা ব্রাহ্ম), তরাস (ত্রাস), ভকতি (ভক্তি), দরশন (দর্শন), গরাস (গ্রাস), কেষ্ট (কৃষ্ণ), পেন্নাম (প্রণাম), পুত্তুর (পুত্র), সুজ্জি (সূর্য), খিদে (ক্ষুধা), বছর/বচ্ছর (বৎসর), বেস্পতি (বৃহস্পতি), মোচ্ছব/মচ্ছব (মহোৎসব), মন্তর (মন্ত্র), বাক্যি (বাক্য), পথ্যি (পথ্য), শুক্কুর (শুক্র), সত্যি (সত্য), গেরাম (গ্রাম), পেরায় (প্রায়), পিত্তি (পিত্ত), কাব্যি (কাব্য), মাগ্‌গি (মহার্ঘ), ভুরু (ভ্রূ), সোমত্ত (সমর্থ), কুচ্ছিত (কুৎসিত)—এগুলো অর্ধতৎসম বা ভগ্নতৎসম শব্দের উদাহরণ। এটা বোঝা কঠিন নয় যে, অর্ধতৎসম শব্দ সচরাচর গদ্যসাহিত্যে ব্যবহৃত হয় না, হলেও তা নাটকের সংলাপেরই উপযুক্ত। কবিতায় এবং সাধারণ মানুষের মুখের ভাষায়ই

অর্ধতৎসম শব্দের ব্যবহার বেশি। অর্ধতৎসম শব্দ সরলীকরণের ফল। আর এই সরলীকরণে মধ্যস্বরাগম বা স্বরভক্তি বা বিপ্রকর্ষ নামের ধ্বনিপরিবর্তন কাজ করে (২৮ অধ্যায় দ্রষ্টব্য)।

৩১.৪ তদ্ভব শব্দ

যেসমস্ত সংস্কৃত শব্দ প্রাকৃতের মধ্য দিয়ে পরিবর্তিত হয়ে বাংলায় এসেছে তাদেরই বলা হয় তদ্ভব শব্দ। কথাটির আক্ষরিক অর্থ তা থেকে (অর্থাৎ সংস্কৃত থেকে) উদ্ভূত। এই শব্দগুলি আমরা পেয়েছি উত্তরাধিকারসূত্রে এবং এগুলিকে বলা যায় খাঁটি বাংলা শব্দ। বাংলা ভাষার শব্দ সম্পদের প্রধান অংশই এগুলি। সুনীতিকুমার বলেছেন, "মুখ্যত এই শব্দগুলিকে লইয়াই আমাদের ভাষা ; এগুলিকে বাদ দিলে কোনও আর্য্য ভাষার স্বকীয় বলিতে কিছুই থাকে না।" অর্ধতৎসম শব্দকে যেমন তৎসম শব্দের বিকৃতি বলে সহজেই চেনা যায়, তদ্ভব শব্দকে তত সহজে সবসময় চেনা যায় না। তদ্ভব শব্দ সংস্কৃত থেকে অনেকটাই সরে গেছে। বরং প্রাকৃতের সঙ্গে তদ্ভব শব্দের ধ্বনিগত সাদৃশ্য অনেক বেশি। সংস্কৃত শব্দ আর্য যুগে যেমন উচ্চারণ করা হত, তা পরে বদলে যায়। নানা জাতির মধ্যে সেই ভাষা প্রচলিত হলে উচ্চারণে বিকৃতি এসে যায়। প্রাকৃত ভাষা সাধারণ মানুষের কথ্য ভাষা। কাজেই তাতে সরলীকরণের একটা ঝোঁক থাকাই স্বাভাবিক। পরবর্তীকালে সেই প্রাকৃতজ শব্দই আরও পরিবর্তিত হয়ে এসে গিয়েছিল আমাদের বাংলা ভাষায়। তাই সবসময় সেগুলোর মূল সংস্কৃত বোঝা সহজ হয় না।

বাংলা ভাষায় অজস্র তদ্ভব শব্দ আছে। তা থাকাই স্বাভাবিক, নইলে আমরা বলতে পারতাম না যে, এগুলি আমাদের ভাষার সম্পদ। সেই অজস্র তদ্ভব শব্দের মধ্যে কয়েকটি এখানে উল্লেখ করছি—গাঁ গোরু আজ মাঝ সাঁঝ ওঝা কাঁঠাল মাছ আমড়া ভাত বাছুর নাতি দেউল আট পিসি পুকুর মামা শাঁখ জামাই উনুন কাঠ কাজ দিঘি খাট উঁচু তেল আরতি তামা ছাতা ফুল ঝি আখড়া মুচি পুথি ডিম ডুমুর।

একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, চলিত ও মুখের ভাষায় তদ্ভব শব্দ অনেক বেশি ব্যবহৃত হয়। কেননা এগুলোর মধ্যে একটা আটপৌরে ভাব আছে, যা আমাদের কথ্য ভাষার সঙ্গে বেশ মানিয়ে যায়।

৩১.৫ দেশি শব্দ

আমাদের ভাষায় প্রাপ্ত মৌলিক শব্দ হল দেশি শব্দ। যেসমস্ত শব্দ অজ্ঞাতমূল, যেসব শব্দের ব্যুৎপত্তি জানা যায় না, সেইসব শব্দকেই একসময় ভাষাতাত্ত্বিকরা দেশি শব্দ বলতেন। তবে এও বলা হত যে, ওইসব অজ্ঞাতমূল শব্দ বিদেশাগত নয়। অর্থাৎ দেশেই সেসব শব্দের সৃষ্টি হয়েছিল। এখন অবশ্য শুধু দেশজ অজ্ঞাতমূল শব্দই নয়, দ্রাবিড় ও অস্ট্রিক ভাষার শব্দকেও দেশি শব্দের পর্যায়ে ফেলা হচ্ছে।

আর্যদের আগমনের আগে থেকেই যেসব শব্দ এদেশের মানুষের মুখের ভাষায় প্রচলিত ছিল সেগুলি, এবং আর্য-পরবর্তী অন্-আর্য ভাষার যাবতীয় দেশজ শব্দই এখন দেশি নামে পরিচিত। এর মধ্যে কিছু শব্দের একসময় সংস্কৃতায়ন ঘটেছিল। তার মানে কিছু শব্দকে ঈষৎ বদল করে সংস্কৃত করে নেওয়া হয়েছিল। অনুমান করা হয় যে, পতঙ্গ (ফড়িং বা ফড়িঙ্গ থেকে), উদুম্বর (ডুমুর থেকে), ঢক্কা (ঢাক থেকে) এইরকমের অন্-আর্য শব্দকে সংস্কৃত করে নেওয়ার উদাহরণ। এইরকম উদাহরণ আরও আছে—মর্কট, জল, আড়ম্বর, ঘোটক, খড়্গ, লিঙ্গ, ডিম্ব, লগুড়, রঙ্গ, গঙ্গা, মাতঙ্গ ইত্যাদি। এগুলো অবশ্যই তৎসম শব্দ, তবে সংস্কৃত ভাষায় এগুলো অন্-আর্য উপাদান বলে মনে করা যেতে পারে। এখন বাংলা ভাষায় যেসমস্ত শব্দকে দেশি বলে মনে করা হয় তার মধ্যে আছে প্রচুর অস্ট্রিক বা কোল শব্দ, যেমন—ঢেঁকি, ঠ্যাঙা, বঁড়শি, কুড়ি, ঝাঁটা, ডাব, ঝোল, আড়া, ঢ্যাঁড়শ, পাড়া, টুকরি, ডেলা, ডিবে, ঢেঁটরা, মুলো, তমলুক, হাওড়া, ডোম, মুড়ি, ঝোল, ধামসা, ঝিঙে, টাঙি, চিংড়ি, গজাল, গেঁড়া, বাদুড়, কাতলা, বাখারি, দামড়া, ডাহা, ভড়ং ঝুল, মালদা, কান্দি, বেলুড়, ঢোঁড়া, লাউ, মুড়ি, উচ্ছে, খুকি, খোকা, খড়, ডিঙ্গা, ঠোঙা (ঠোঙ্গা), খুঁটি, ভাঙা ইত্যাদি অজস্র শব্দ। এবং দ্রাবিড় উৎস থেকে পাওয়া গুঁড়ি, ঠুঁটো, পোকা, কানা, বোঝা, সাঙ্গা, পাড়া, মোটা, আকাল, চুরুট ইত্যাদি। কোনো-কোনো গবেষক মনে করেন যে, এর বাইরেও বহু শব্দই দ্রাবিড় ভাষাগোষ্ঠীর শব্দ থেকে এসেছে। যেমন বঙ্গ, কবাট, কেঁদো, মাকুন্দ, মাঠ, পোড়া মুচি, চিলে, মাউই, নরুন ইত্যাদি। তাঁরা মনে করেন, বাংলায় দ্রাবিড় উপাদান যতটা বলে মনে করা হয়, বস্তুতপক্ষে তা তার চাইতে অনেক বেশি।

৩১.৬ বিদেশি শব্দ

বাংলায় বিদেশি শব্দ আসতে শুরু করেছে প্রাচীন কাল থেকেই। ভারতে পারসিক আক্রমণের সময় পারসিক প্রভাব দেশের অভ্যন্তরে বেশিদূর অগ্রসর হতে পারেনি। তবে কিছু পারসিক শব্দ সংস্কৃতে পরিবর্তিত হয়ে গৃহীত হয়েছিল। পরে গ্রিক আক্রমণের ফলে এবং উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে গ্রিক উপনিবেশ স্থাপিত হওয়ার ফলে কিছু গ্রিক শব্দও এসে যায়। আরবদের সিন্ধু বিজয়ের ফলেও কিছু আরবি শব্দ এদেশে এসেছে। তুর্ক-আফগান শাসনকালে তুর্কি শব্দ ভারতের ভাষাগুলিতে অনুপ্রবেশ করে স্বাভাবিকভাবেই। মোগল যুগে প্রচুর ফারসি শব্দ এবং ফারসির মাধ্যমে আরবি শব্দ ভারতীয় ভাষাগুলিতে এসে যায়। এইভাবে বাংলা ভাষায় গ্রিক, আরবি, ফারসি, তুর্কি প্রভৃতি ভাষার শব্দ এসেছিল। ১৪৯৮ সালে ভাসকো-দা-গামার জলপথে ভারতে আসার ঘটনাটি এদিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এরপর একে একে পোর্তুগিজ, ওলন্দাজ, ইংরেজ, ফরাসি, ডেনীয় বা দিনেমার প্রভৃতি জাতি

ব্যাবসায়িক ও রাজনীতিক কারণে এদেশে আসতে থাকে। ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোমপানির ভারতজোড়া ব্যাবসা আর ১৭৬৫ সালে কোম্পানির শাসন প্রতিষ্ঠা ভারতের সমাজজীবনে তাদের প্রভাবের সুযোগ করে দেয়। বলা বাহুল্য, ইয়োরোপীয় ভাষাগুলি থেকে যত শব্দ বাংলায় এসেছে তার মধ্যে ইংরেজি শব্দ সবচাইতে বেশি। এবারে একে একে বিভিন্ন বিদেশি ভাষার শব্দ কীভাবে বাংলা ভাষার শব্দভাণ্ডারকে পুষ্ট করেছে তা দেখব।

গ্রিক শব্দ

আলোকজান্ডারের আক্রমণের প্রত্যক্ষ ফল তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। তবে ভারতের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে যেসব গ্রিক উপনিবেশ স্থাপিত হয়েছিল তাদের মাধ্যমে কিছু গ্রিক সাংস্কৃতিক উপাদান ভারতীয় জীবনে প্রবেশলাভ করেছিল। জ্যোতিষ ও জ্যোতির্বিদ্যা, মুদ্রাব্যবস্থা, শিল্পকলা প্রভৃতি ক্ষেত্রের কিছু গ্রিক শব্দ এর ফলে ভারতীয় ভাষায় ঢুকে পড়ে। সংস্কৃতের কেন্দ্র (গ্রিক কেন্‌ত্রিন থেকে) যবন, কোণ, হোরা, ক্রমেলক, দাম (দ্রাখ্‌মে থেকে) প্রভৃতি শব্দে গ্রিক প্রভাব আছে।

পোর্তুগিজ শব্দ

আগেই বলেছি ভাসকো-দা-গামার কথা। এই পোর্তুগিজ নাবিক ১৪৯৮ সালের ২০মে তারিখে কালিকটের উত্তরে বর্তমান কেরলের কাপ্পাদ নামে আরব সাগরের তীরস্থ একটি গ্রামে প্রথম উপস্থিত হন। সেই প্রথম, তবে শেষ নয়। একাধিকবার তাঁর ভারতে আসা, পোর্তুগিজ উপনিবেশ প্রতিষ্ঠা, এদেশে সাম্রাজ্য স্থাপনের চেষ্টা, প্রভৃতির মধ্য দিয়ে ভারতের ভাষা ও সংস্কৃতিতে পোর্তুগিজ প্রভাবের চিহ্ন পড়তে শুরু করে, তবে সুদূর পুবের বাংলার সঙ্গে পোর্তুগিজদের সংযোগ আরও পরবর্তী সময়ের ঘটনা। যতদূর জানা যায়, বাংলায় পোর্তুগিজদের আসাযাওয়ার সূত্রপাত ষোড়শ শতকের গোড়ার দিকে ১৫১৭ সালে। পোর্তুগিজরা এদেশের মানুষকে যেমন পদানত করার স্বপ্ন দেখেছিল, তেমনি এদেশের মানুষের সঙ্গে মেশবার চেষ্টাও কখনো-কখনো করেছে। আর তারই ফলে তাদের ব্যবহৃত কিছু শব্দ এসে গেছে আমাদের ভাষায়, অবশ্যই পরিবর্তিত চেহারায় ও পরিবর্তিত উচ্চারণে, বলতে গেলে রূপান্তরিত হয়ে।

খুঁজে দেখা গেছে বাংলায় একশোর মতো পোর্তুগিজ শব্দ এসেছে। এর মধ্যে আছে পাঁউ যার মানে রুটি। এ থেকে পেয়েছি পাঁউরুটি, আলমারি এসেছে আরমারিয়ো থেকে, আনারস এসেছে আনানস থেকে। নোনা পাওয়া গেছে পোর্তুগিজ আনোনা থেকে। পাওয়া গেছে আরও অনেক শব্দ—আলকাতরা, বেহালা, গরাদ, আলপিন, গির্জা, সাবান, নিলাম, চাবি, আয়া, কাফরি, পাদরি, ইস্পাত, কাজু, পিস্তল, ফিতা, বোম্বেটে, মেজ, বয়াম, মাস্তুল, বোমা, আতা, এনতার, তিজেল, পিরিচ, ওলন্দাজ, ফরাসি, বোম্বাই, সাগু প্রভৃতি।

ইংরেজি শব্দ

আমাদের ভাষায় পোর্তুগিজ ওলন্দাজ ফরাসি প্রভৃতি ভাষার শব্দ যত এসেছে, মোট ইংরেজি শব্দের সংখ্যা তার চাইতে অনেক বেশি। এটা অস্বাভাবিক নয়। কেননা দুশো বছরের ব্রিটিশ শাসন আমাদের সাংস্কৃতিক ও সামাজিক জীবনে গভীর ও স্পষ্ট প্রভাব ফেলেছে। শাসনসংক্রান্ত বহু শব্দ আমরা ইংরেজি থেকে নিয়েছি, নিয়েছি প্রাত্যহিক জীবনে ব্যবহৃত অনেক জিনিসের নাম। অনেক নতুন জিনিস ও তার ব্যবহার আমরা শিখেছি ইংরেজদের কাছ থেকে, সেই সংক্রান্ত শব্দও যে আসবে তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই। বাংলায় আগন্তুক সমস্ত ইংরেজি শব্দের তালিকা তৈরি করা সম্ভব নয়, তার প্রয়োজনও নেই। এখানে কেবল নানা ধরনের ইংরেজি শব্দের একটা অসম্পূর্ণ তালিকা দিচ্ছি। নানা ধরনের কথাটার ব্যাখা দরকার। ১. এমন শব্দ আছে যেগুলো প্রায় অবিকৃত উচ্চারণে বাংলায় চলে। ২. আবার এমন শব্দও আছে যেগুলোর উচ্চারণ কিছুটা বদলেছে। ৩. এমন শব্দও কম নয় যেগুলো এতটাই বদলেছে যে তাদের উৎসের সঙ্গে এখন প্রচুর দূরত্ব। প্রথম শ্রেণির শব্দের মধ্যে আছে—অফিস, পাউন্ড্, পেট্রল, নোটিস, ল্যাম্প, ট্রেন, চাইম, চেয়ার, কেয়ার, শেয়ার, প্লেন, পেন, পেপার, ফুল (full), ট্যাকসি, ট্যাক্স, চপ, ফ্লপ, কাট, শার্ট, থিয়েটার, রোড, স্ট্রিট, অর্ডার, ড্রাম, থিয়োরি, বার্লি, সনেট, রোমান্স, প্ল্যান, ক্লাস, ম্যাপ, লজিক, ট্র্যাজেডি, কমেডি, টয়লেট, গ্যালারি, অ্যাসিড, অ্যালার্ম, অ্যাশট্রে, অ্যাটর্নি, ফিল্‌ম্, লংজাম্প, হাইজাম্প, নেট, ম্যানেজার, নোট, পাউডার, ড্রেন, মাস্টার, ফাইন, ফ্যাশন, বল (ball), কল (call), পেনসিল, আর্ট, সোয়েটার, কম্ফর্টার, কার্পেট, ফাইবার, টিকিট, টেলিফোন, টেলিগ্রাম, স্ট্রাইক, কফ (cough), কর্ক ইত্যাদি।

দ্বিতীয় শ্রেণির মধ্যে আছে—পুলিশ, আপিল, ইঞ্জিন, কোম্পানি, ডজন, নম্বর, পকেট, ক্লাসিক, সুভেনির, অ্যামেচার, কলম (column), হ্যান্ডেল, লাগেজ ইত্যাদি।

তৃতীয় শ্রেণির মধ্যে আছে বহু শব্দ—ইঞ্চি, টেবিল, প্লাস (pliers), গেলাশ, ইশকুল, ইস্টিমার, কেতলি, ডাক্তার, ল্যামফো (lamp), বুরুশ, লিস্টি, ফিস্টি, জাঁদরেল, সান্ত্রি, ক্যানেস্তারা, টালি, পলেস্তারা (plaster), বান্ডিল, আস্তাবল ইত্যাদি।

ফরাসি শব্দ

ফরাসি ভাষার শব্দ বাংলায় কমই এসেছে। এবং যেসব শব্দ এসেছে তার মধ্যে কতকগুলোর উচ্চারণ বদলে গেছে, ফলে শব্দটাও নতুন রূপ পেয়েছে। ফরাসি ভাষার প্ল্যানচেট (মূল উচ্চারণ প্লাঁশেৎ) কুপন (মূল উচ্চারণ কুপোঁ), ম্যাটিনি (মূল উচ্চারণ মাতিনে) প্রভৃতি শব্দের উচ্চারণ বদলে নেওয়ায় শব্দটাই বদলে গেছে। আবার কতগুলো ক্ষেত্রে মূলের উচ্চারণের কাছাকাছি থাকায় পরিবর্তনটা তেমন বড়ো নয়—আঁতাঁত (entente), বুর্জোয়া (bourgeois), কাফে (café), কার্তুজ (cartouche), মাদাম (madame), ব্যালে (ballet), রেস্তোরাঁ (restaurant)। একথাও উল্লেখ করতে হবে

যে, আরও কিছু ফরাসি শব্দ বাংলায় চালু হয়েছে—যেমন গ্যারেজ (মূল ফরাসি গরাজ়), ক্রুচেট (মূল ফরাসি ক্রুশে), এলিট (মূল ফরাসি এলিৎ) প্রভৃতি। তবে এগুলো ইংরেজির মাধ্যমে বাংলায় এসেছে বলেই এদের উচ্চারণ ইংরেজি রীতির মতো।

ওলন্দাজ শব্দ

আধুনিক কালে পোর্তুগিজরাই প্রথম ইয়োরোপীয় জাতি যারা ভারতে আসে। তাদের পর আসে ওলন্দাজ বা ডাচ জাতি। এরাই ভারত থেকে পোর্তুগিজদের হঠিয়ে দেয়। ১৬০৪ সাল থেকে ভারতে ডাচদের প্রাধান্য অনুভূত হতে থাকে। একে একে কালিকট, সুরাত, মসলিপত্তম, কোচিন প্রভৃতি স্থান থেকে তারা পোর্তুগিজদের উৎখাত করে দেয়। বাংলার চুচুড়া ও কাশিমবাজারেও তাদের আধিপত্য স্থাপিত হয়। তবে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দাপটে ডাচরাও পিছু হঠতে থাকে। ভারতে ডাচ উপনিবেশ উঠে যেতে থাকে। ডাচরা এরপর নজর দেয় ইন্দোনেশিয়ার দিকে। কিন্তু যতদিন তারা দক্ষিণ-পশ্চিম ও দক্ষিণ-পূর্ব ভারতে ছিল, এবং যতদিন বাংলায় ছিল ততদিনে তাদের প্রভাবের কিছু চিহ্ন তারা রেখে যেতে পেরেছে। সংখ্যায় খুব কম হলেও বাংলায় কয়েকটি ওলন্দাজ শব্দ প্রচলিত হয়ে গেছে। এগুলো হল, রুইতন হরতন ইশকাপন তুরুপ ইস্ক্রুপ ইত্যাদি। লক্ষ করবার যে, এগুলোর অধিকাংশই তাস খেলার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। আরও লক্ষ করবার যে, তাসের চারটি রঙের মধ্যে এই তিনটি ওলন্দাজ ভাষা থেকে এসেছে, অথচ চতুর্থটি অর্থাৎ চিড়িতন এল অন্য উৎস থেকে।

আরবি-ফারসি শব্দ

বাংলা ভাষার শব্দভাণ্ডারে আরবি-ফারসি এবং তৎসহ তুর্কি ভাষার শব্দের সম্ভারের কথা যখন বলি, তখন আমরা ভুলে যাই যে, সুদূর প্রাচীনকালেও কিছু প্রাচীন পারসিক শব্দ ভারতে প্রচলিত হয়েছিল। পুথি, মুচি, কাহন, মিহির (মিহ্‌র্ বা মেহের থেকে) স্যাকরা (সিক্কা থেকে) এই ধরনের অল্পকিছু শব্দ সেইসূত্রে এসেছে। তবে বাংলায় প্রচলিত প্রায় তিন হাজার আরবি-ফারসি শব্দের প্রায় সবই এসেছে দ্বাদশ শতকের পরে ভারতে মুসলিম অধিকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে। আমাদের দেশের প্রথম প্রকৃত মুসলমান শাসকগোষ্ঠী ছিল তুর্ক-আফগানরা। সেই সূত্রে তুর্কি শব্দও কিছু পাওয়া গেছে। ষোড়শ শতকে যে-মোগলরা ভারতে শাসক হয়ে বসে তারাও গোড়ার দিকে তুর্কি ভাষায় কথা বলত। বাবরের আত্মজীবনী তুর্কি ভাষাতেই লেখা, পরে তা ফারসিতে অনূদিত হয়েছিল। কিন্তু এ সত্ত্বেও তুর্কি শব্দের তুলনায় আমাদের ভাষায় ফারসির প্রচুরতা কেন এ প্রশ্ন উঠতেই পারে।

পারস্যের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে ও আফগানিস্তানে তুর্কিরা বিপুলভাবে উপনিবিষ্ট হলেও তারা খুব অল্প সময়ের মধ্যে নিজেরাই পারসিক সংস্কৃতির দ্বারা প্রভাবিত হয়, এতটাই যে, বলা যেতে পারে তাদের 'পারস্যায়ন' ঘটেছিল। কথাটা বলেছেন সুনীতিকুমার। কাজেই

তাদের মাধ্যমে তুর্কি ভাষার যতটা প্রভাব ভারতে বিস্তারলাভ করতে পারত ততটা করেনি, বরং তারা নিজেরাই কিছু পরিমাণ ফারসির বাহক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। দ্বিতীয়ত, ষোড়শ শতকে যখন ভারতে মোগল শাসন কায়েম হল, তখন থেকে, প্রথম কয়েক দশক বাদে, ধীরে ধীরে ফারসির প্রভাব জোরালো ও গভীর হতে থাকে। মোগল শাসকরা তুর্কির বদলে ফারসিকেই তাঁদের ভাষা হিসেবে গ্রহণ করেন। বাংলায় যে মুসলমান শাসকরা শাসন করছিলেন তাঁরা ছিলেন ফারসি ভাষা ও সংস্কৃতির বাহক। তাঁদের শাসনকালে দরবারের রীতিনীতি, রাজস্বনীতি, শাসনপদ্ধতি, আইনকানুন ইত্যাদি সংক্রান্ত প্রচুর ফারসি-আরবি শব্দ বাংলা ভাষায় প্রবেশ করে। লক্ষ করবার যে, যে-সমস্ত আরবি শব্দ বাংলায় এল তার প্রায় সবই এল ফারসির মারফত, অর্থাৎ ফারসির হাত ঘুরে। তার ফলে আরবি শব্দগুলির ধ্বনিগত পরিবর্তনও কিছুটা ঘটে গেল।

আরবিই বলি আর ফারসিই বলি, শব্দগুলি হুবহু বাংলায় চালু হয়নি, চালু হয়েছে কিছুটা পরিবর্তিত হয়ে। আরবিমূল শব্দের মধ্যে আছে—অকু অছি আক্কেল আতর আমল আমির আসল উজু উজির ওমরা আহাম্মক আসবাব হুজুর হুশ জাফরান বিলাত বহর কাবাব কাজি বাহার ফকির কলাই খলিফা হারামজাদা ফরাজি আকছার আলবাত এজলাস এজাহার এলাকা এলেম কোরান কোরবানি ফিকির কায়েম কাফের কেতা কসুর কাগজ কদম কয়েদ কিমা কলপ কেল্লা কৈফিয়ত খালাস গলদ খসড়া খাজনা খেতাব জবাই তালিকা তাগাদা জাহির জহরত খোলসা জিম্মা তল্লাশ তুফান তামাম তালাক তোয়াক্কা তোফা তাজুব তালেবর নিকা নবাব তরিবত তফাত তছনছ নাবালক নকশা দৌলত দলিল তম্বি তালুক নমুনা ফাজিল মোল্লা মক্তব মাদ্রাসা তালিম নাজেহাল ফতে ফারাক নায়েব মেরাপ মক্কেল হাওলাত হদ্দ হাকিম সাহেব মেয়াদ মৌলবি সই হাজত হাল মোকদ্দমা হিম্মত মেরামত মানে হরকত হাউই মফস্‌সল, মুনাফা সেলাম হালুয়া সাবেক মোতায়েন হেফাজত হক শখ ইত্যাদি। বলা বাহুল্য, কোনো-কোনো শব্দ মূল আরবি থেকে অনেকটাই সরে এসেছে। যেমন মেরামত এসেছে মরম্মৎ থেকে, ফইজত এসেছে ফদীহৎ থেকে, মুহুরি এসেছে মুহর্‌রিব্‌ থেকে, কাগজ এসেছে কায়গদ থেকে এবং ওজর এসেছে উদ্‌র্‌ থেকে। আবার কোনো-কোনো শব্দ মূলের বেশ কাছাকাছি। যেমন কদর (মূল কদ্‌র্‌), আমল (মূল অমল্‌), সাহেব (মূল সাহিব্‌), হাকিম (মূল হকীম)।

ফারসি শব্দের সংখ্যা আরও অনেক বেশি। কয়েকটির উল্লেখ করি—অন্দর আওয়াজ আতশ আদমশুমার আন্দাজ আবাদ আমদানি আমেজ আশমান আস্তে কারবার কোতোয়াল কামাই কোমর খরিদ খাকি খুব খরগোশ খুশি খোদ খোদা খোজা খুশবু খানসামা খামোখা গোমস্তা গোলাপ চশমা চোস্ত চাপরাশি চালাক চাকর চাদর চৌবাচ্চা চুকলি চরকা চেহারা জখম জঙ্গি জমি জমাদার জমিদার জিনিস জাদুকর জানোয়ার টাকা তরমুজ তাজা তন্দুর দরগা দরবার দরদ দম দরুন দলিল দস্তাবেজ দরজি দামামা দানা দালান দারোগা দরাজ দায়ের দরখাস্ত দুশমন দিল দিলদার দেওয়ান দস্তক দরবেশ দস্তানা দস্তুর দোকান দোয়াব দস্তা দপ্তর

দাগ দুরস্ত নরম নমুনা নাচার নাস্তানাবুদ নগদ নালিশ নিশান নজরানা পরোয়া পাইকার পেঁয়াজ পেয়াদা পোলাও পরদা পরগনা পয়মাল পছন্দ পরকলা পোক্ত পায়খানা পোস্ত পেয়ালা পায়জামা পেশা পুল ফরমাশ ফরমান ফরিয়াদ বন্দর বরফ বাপতা বাগিচা বাদাম বারকোশ বেলেয়ারি বন্দোবস্ত বাজার বাজিকর বুলবুল বকশিস বাগান বিমা ভিস্তি ময়দা মলম মস্তান মালাই মজুর মহরত মালিশ মাহিনা মিহি মিহিদানা মোরগ মুরগি রওনা রপ্তানি রাস্তা রাহা রুমাল রেহাই রেশম রেকাব শিশি শরিক শানাই শের সরকার সরদার সওয়ার সাজা সিকদার সাদা হরকরা হামানদিস্তা হাজার হেস্তনেস্ত। এই প্রসঙ্গে আরও বলা দরকার যে, ফারসি থেকে শুধু যে গোটা শব্দ এসেছে তা নয়, এসেছে বে- গর- প্রভৃতি উপসর্গও। তার নজির আছে কতকগুলি শব্দে—বেআইন, গররাজি, ফিবছর।

এইসব আরবি-ফারসি শব্দ সবই যে একসময়ে এসেছে তা নয়। নানা সময়ে ধীরে ধীরে আমাদের ভাষায় এগুলো এসেছে। এর মধ্যে যুদ্ধবিষয়ক শব্দ আছে, আছে প্রশাসন বিষয়ক, ইসলাম ধর্ম বিষয়ক, রাজস্ব বিষয়ক, শিক্ষা সংগীত সাহিত্য প্রভৃতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শব্দ।

তুর্কি শব্দ

বাংলায়, আগেই বলেছি, তুর্কি শব্দের সংখ্যা বেশি নয়। সুনীতিকুমার বাংলায় চল্লিশটির মতো তুর্কি শব্দ লক্ষ করেছেন। তার মধ্যে আছে—আলখাল্লা উজবুক উর্দু কলকা কাঁচি কাবু কুলি কোঁতকা কোরমা খান/খাঁ খাতুন চকমকি চিক তবক তকমা তুজুক তুরুক/তুর্ক তোড়া বাবুর্চি বোঁচকা মুচলেকা লাস সওগাত। -চি একটি তুর্কি প্রত্যয়। বেশকিছু আরবি-ফারসি-হিন্দি শব্দের সঙ্গে এই -চি যুক্ত হয়—তবলচি মশালচি খাজাঞ্চি ইত্যাদি। তুর্কি শব্দকে অবশ্য ভাষাতাত্ত্বিকরা সচরাচর ফারসি শব্দের মধ্যেই গণ্য করেন।

অন্যান্য বিদেশি শব্দ

বিদেশি ভাষার শব্দ বলতে যেগুলো গুরুত্বপূর্ণ আমরা এতক্ষণ কেবল সেগুলোর কথাই বলেছি। অন্য কোনো-কোনো বিদেশি ভাষা থেকেও দু-চারটি করে শব্দ আমাদের ভাষায় এসেছে। যেমন মালয়ি ভাষার কাকাতুয়া, অস্ট্রেলিয়ার ক্যাঙারু ও বুমেরাং, জাপানি ভাষার রিকশা হারাকিরি জুজুৎসু কিমোনো, স্পেনীয় ভাষার চকোলেট কুইনাইন, তিব্বতি ভাষার লামা, চৈনিক ভাষার চিনি চা ও লিচু, ইতালীয় ভাষার ম্যাজেন্তা ফাশিস্ত, রুশ ভাষার ভদকা স্পুটনিক, বর্মি ভাষার লুঙ্গি ও প্যাগোডা, জার্মান ভাষা থেকে এসেছে নাৎসি কুইসলিং ব্লিৎসক্রিগ কিন্ডারগার্টেন। তবে এইসব শব্দের অনেকগুলিই আমাদের কাছে যেহেতু ইংরেজির মারফত এসেছে তাই ইংরেজি উচ্চারণের প্রভাব রয়েছে শব্দগুলির বাংলায় গৃহীত রূপে। এমনকী জাপানি কারাতে শব্দটিও বানানের প্রভাবে আমাদের কাছে ক্যারাটে হয়ে আছে, ঠিক যেমন তোকিয়ো হয়ে আছে টোকিয়ো।

বিদেশি শব্দ গ্রহণের নানান রীতির কথা আগেই বলেছি। কতকগুলো বিদেশি শব্দ আমরা গ্রহণ করেছি তাদের রূপ অনেকটাই বদলে নিয়ে—যেমন বিস্কুট খ্রিস্টান গ্যারেজ

জিনিস আনারস কাগজ ওজর প্রভৃতি। এগুলোকে এক ধরনের তদ্ভব শব্দ বলা যেতে পারে। দ্বিতীয় এক ধরনের শব্দ আছে যেগুলোর মূল রূপ সামান্য বদলে গেছে—কদর আমল তালাক কোম্পানি কফি ইঞ্জিন ইত্যাদি। আবার তৃতীয় এক ধরনের শব্দ আছে যেগুলো আমরা 'প্রায়' হুবহু মূলের উচ্চারণ অনুসরণ করে গ্রহণ করেছি। এই 'প্রায়' কথাটি লক্ষণীয়। একটি বিদেশি ভাষার শব্দ অন্য এক ভাষায় হুবহু অনুসরণ করে লেখা একরকম অসম্ভব। এক্ষেত্রে আমরা বলতে চাই মূলের খুবই কাছাকাছি থেকেছি। তার উদাহরণ—বাস (bus) রেস্তোরাঁ কাফে আঁতাঁত বুর্জোয়া কংক্রিট কমা সেমিকোলন ল্যাম্প পাউডার মোটর সোয়েটার পুলওভার থিয়েটার পেনসিল পাউন্ড পেট্রল কেক টিন ফুট ট্রেন চপ ফিল্‌ম্‌ ইত্যাদি।

আর একটি কথা। গত ছয় শতক ধরে ভারতে বিদেশি বণিকদের ব্যাবসার সুবাদে এবং এদেশে মুসলমান ও ইংরেজ শাসনের সুবাদে পোর্তুগিজ শব্দ ওলন্দাজ শব্দ ইংরেজি শব্দ আরবি ফারসি শব্দ বাংলায় এসেছে। এসেছে মালয়ি বর্মি চৈনিক ও জাপানি শব্দ। এ তো গেল একটা দিক। অন্য দিকে ইয়োরোপীয়রা আমাদের শব্দ এবং অন্য জাতির শব্দ বিকৃতভাবে উচ্চারণ করার ফলে অনেক ক্ষেত্রে তৈরি হয়েছে একই শব্দের ভিন্নরূপ। এই ব্যাপারটার একটা অসামান্য আলোচনা ও এইসব শব্দের পূর্ণাঙ্গ তালিকা আছে *হবসন-জবসন* বইয়ে। বাংলা শব্দভাণ্ডারের আলোচনার সময় এই প্রসঙ্গটিরও উল্লেখ করা প্রয়োজন। এইভাবেই অসম হয়েছে আসাম, খড়্গপুর এই কারণেই অধিকাংশ বাঙালির উচ্চারণে আজও খড়্গপুর। সংস্কৃতের বণিকশালা বা ভাণ্ডশালা ইয়োরোপীয়দের মুখে বদলাতে বদলাতে হয়ে গেল bankshall.

কতকগুলো শব্দের একাধিক উৎসের কথা জানা যায়। আমাদের কাছে শব্দটি কোন উৎস থেকে এসেছে তা নির্ণয় করা অনেকসময় কঠিন হয়ে পড়ে। কামিজ পোর্তুগিজ camisa থেকে এসেছে, না কি আরবি কামীজ থেকে? চাটনি হিন্দি চট্‌নী থেকে এসেছে কি? কেরানি কি পোর্তুগিজ escrevente থেকে, না কি হিন্দি করানি থেকে? দেওয়াল হিন্দি থেকে এসেছে, না কি ফারসি দীওয়ার থেকে? গাঁজা হিন্দি থেকে, না কি মালয়ি গান্‌সা থেকে? কাজু (বাদাম) শব্দটি সম্ভবত লাতিন আমেরিকার প্রাচীন তুপি ভাষার অকাজু থেকে পোর্তুগিজদের মাধ্যমে এসেছে। যদিও এর মালয়ি উৎসকেও উড়িয়ে দেওয়া যায় না। শব্দটির মালয়ি রূপ গাজু।

অনেক আরবি-ফারসি-তুরকি এমনকী পোর্তুগিজ শব্দ আমাদের কাছে হিন্দির মারফত এসেছে। কুলি চাদর চারপাই ছিলিম তো আছেই। আছে পোর্তুগিজ camara থেকে পাওয়া কামরা শব্দটি। এটি হিন্দিতে কামরা ছিলই। আমরা তা নিয়ে নিয়েছি। বাংলা ঘাট শব্দের মূল উৎস যে সংস্কৃত ঘট, তাতে ভুল নেই। কিন্তু বাংলায় ঘাট কীভাবে পাওয়া গেল? বিবর্তনের সূত্রে? না, শব্দটি হিন্দি ঘাট থেকে এসেছে। আমরা বলে থাকি গুদাম এসেছে পোর্তুগিজ

গুদাউ (gudao) থেকে। কিন্তু যখন স্মরণ করি, সিংহলিতে গুদাম আছে, মালয়িতে গদঙ্গ আছে একই অর্থে, তখন থমকে যেতে হয়। সবগুলোর একই উৎস হওয়াও অসম্ভব নয়।

৩১.৭ অন্যান্য ভারতীয় ভাষার শব্দ : প্রতিবেশী ভাষার শব্দ

শুধু বিদেশি ভাষার শব্দই যে আমরা নিয়েছি তা নয়, আমরা নিয়েছি অন্যান্য ভারতীয় ভাষার কিছু শব্দও। আমরা হিন্দি ও উর্দু ভাষার শব্দ নিয়েছি, অল্পসংখ্যক হলেও তামিল তেলুগু গুজরাতি ও মরাঠি ভাষার শব্দও নিয়েছি। ভাষাতাত্ত্বিকরা যাকে হিন্দুস্তানি বলেন সেই হিন্দি-উর্দু থেকে এবং হিন্দি থেকে পেয়েছি—আলাল গাধা গুমটি চুলা চিতা ছুকরি ছোকরা জওয়ান গাঁজা ঝান্ডা ঝিল কিসান ডাকাত বন্ধু বাংলো/বাংলা বাজরা বস্তি বাহাদুর নোকর ব্যস দেওয়ালি ডাক (post) ধরনা গোলা (মরাই) দৌড় ডাবর ধুতি ধোপা ধোবি মজদুর মোকাবিলা লাগাতার হাওয়া হাওয়াই প্যাঁড়া গুমটি। গুজরাতি ভাষা থেকে এসেছে তকলি হরতাল গরবা (নাচ) খদ্দর। তামিল থেকে প্যান্ডেল। মরাঠি থেকে পেশোয়া বরগি চামচা।

৩১.৮ সংকর শব্দ, খণ্ডিত শব্দ, অনুবাদ ঋণ

সংকর শব্দ

এক ভাষার শব্দের সঙ্গে অন্য এক ভাষার শব্দ মিলে তৈরি হলে তাকেই বলি সংকর বা মিশ্র শব্দ (hybrid words)। শুধু সম্পূর্ণ শব্দই নয়, এক ভাষার উপসর্গ, প্রত্যয় প্রভৃতিও অন্য এক ভাষার শব্দের আগে-পরে বসে নতুন মিশ্র শব্দ তৈরি হতে পারে। ইংরেজি শব্দের সঙ্গে বাংলা প্রত্যয় (মাস্টারি, খ্রিস্টানি), ইংরেজি শব্দের সঙ্গে ফারসি প্রত্যয় (ডেপুটিগিরি, ডাক্তারখানা) তো আছেই। এ ছাড়াও নানান ধরনের সংকর বা মিশ্র শব্দ বাংলায় চালু হয়েছে। কতকগুলো উদাহরণ নিই—খেয়ালি হিসাবি কাগুজে ফকিরি মেয়াদি কেতাবি (আরবি + বাং প্রত্যয়) ; বেহেড (ফা. উপসর্গ + ইংরেজি); সবুট (বাং + ইং); বেআদব বেআবরু বেওয়ারিশ (ফা. উপসর্গ + আরবি); ফৌজদারি চৌকিদারি (ফা. + বাং প্রত্যয়); বেহিসাবি (ফা. উপসর্গ + আরবি + বাং প্রত্যয়); অকুস্থল (আরবি + তৎসম); হাতসাফাই (বাং + ফা); মাস্টারমশাই (ইং + বাং); পণ্ডিতি জ্বরো জলো কীর্তনিয়া আকাশি রক্তিম চীনা চীনে নীলচে (তৎসম + বাং. প্রত্যয়); ভোটকেন্দ্র হেডপণ্ডিত (ইং + তৎসম)। বেসুর আইনসিদ্ধ (ফা/আরবি + তৎসম)। এ ছাড়া বেটাইম কাগজপেনসিল দরজা-জানালা জেলখানা (বিদেশি + বিদেশি)। এইরকম নানাভাবে মিশ্র শব্দ তৈরি হয় এবং বাংলায় এইরকম বহু মিশ্র বা সংকর শব্দ আছে। আরও কিছু সংকর শব্দের দৃষ্টান্ত—হাফহাতা হাফগেরস্ত হাফআখড়াই ফুলহাতা হেডমিস্ত্রি দখলীকৃত কলেজীয় মার্কিনি তিব্বতীয় বেজম্মা।

খণ্ডিত শব্দ

খণ্ডিত শব্দ (clipped words) অবশ্য বিদেশি ভাষায়ই বেশি। একটি শব্দের গোড়ার অংশ বা মাঝের অংশ বা শেষের অংশ ছেঁটে তৈরি হয় একটি অপেক্ষাকৃত ছোটো শব্দ। ইংরেজিতে এর প্রচুর দৃষ্টান্ত আছে। যেমন omnibus থেকে bus, aeroplane থেকে plane, helicopter থেকে copter, minibus থেকে mini, photograph থেকে photo, refrigerator থেকে fridge, hippopotamus থেকে hippo ইত্যাদি। এর মধ্যে কয়েকটা বাংলায়ও এসে গেছে। যেমন এসেছে বাস প্লেন মিনি ফোটো ফ্রিজ হিপো ফোন মাইক (মাইক্রোফোন থেকে)।

শিয়ালদহ দক্ষিণ সেকশনের রেলযাত্রীরা লক্ষ্মীকান্তপুর লোকাল ডায়মণ্ডহারবার লোকাল ও বারুইপুর লোকালকে যথাক্রমে বলেন লক্ষ্মী ডায়মন্ড ও বারুই। মজার ব্যাপার বটে। তবে এই খণ্ডিত নামগুলো এখনও তেমন ব্যাপকভাবে প্রচলিত হয়নি।

অনুবাদ ঋণ

এক ভাষার শব্দ বা শব্দগুচ্ছ (phrase) বা এমনকী সম্পূর্ণ বাক্য অনেকসময় আরেক ভাষায় অনুবাদের মাধ্যমে গৃহীত হয়। বাংলায়ও এইভাবে এসেছে অনেক শব্দ ও শব্দবন্ধ। অনুবাদ কখনো প্রায় আক্ষরিক, যেমন—সুবর্ণসুযোগ (golden opportunity) সুবর্ণ যুগ (golden age), কালা কানুন (black act), কাগুজে বাঘ (paper tiger), বলগা হরিণ (rein deer), দূরদর্শন (television), সবুজ সংকেত (green signal), সিংহভাগ (lion's share), কালোবাজার (black market), ঝরনা কলম (fountain pen), কুম্ভীরাশ্রু (crocodile tears), শ্বেতপত্র (white paper), নীল রক্ত (blue blood), পাদপ্রদীপ (footlight), উড়ালপুল (flyover), শীর্ষ সম্মেলন (summit conference), উত্তমাশা অন্তরীপ (Cape of Good Hope), নলকূপ (tubewell), খেলোয়াড়সুলভ আচরণ (sportsman spirit), বাতিঘর (lighthouse), কাঁদানে গ্যাস (teargas), হিমঘর (cold storage), মাটির সন্তান (son of the soil), ভাগ্যের বিড়ম্বনা (irony of fate)। আবার কখনো-কখনো অনুবাদ অর্থানুযায়ী, ততটা আক্ষরিক নয়। যেমন—বিনা মেঘে বজ্রপাত (bolt from the blue), ভৌতবিজ্ঞান (physical science), যানজট (road jam) ইত্যাদি। অনেক সময় সম্পূর্ণ বাক্যও অনুবাদ করে ব্যবহার করা হয়। যেমন, চায়ের পেয়ালায় তুফান তোলা (raise a storm in tea cup), মূর্খের স্বর্গে বাস করা (live in a fool's paradise), রুপোর চামচ মুখে নিয়ে জন্মানো (to be born with a silver spoon in one's mouth) ইত্যাদি লক্ষণীয়। যেকোনো সচল ভাষা অন্য ভাষা থেকে শব্দ নেয়, অনুবাদের দ্বারস্থও হয়। এটা অস্বাভাবিক কোনো ব্যাপার নয়। কিন্তু কখনো-কখনো অনুবাদ নিতান্তই যান্ত্রিক হয়ে যায়। আমাদের ভাষার রীতি ও মেজাজের সঙ্গে অনেক সময়ই মেলে না। এইরকম কিছু অনুবাদের নমুনা দেখাই—আইন নিজের

হাতে নেওয়া, কোনো পাথর ওলটাতে বাকি না রাখা (to leave no stone unturned), নগ্ন সত্য (naked truth), অর্ধবাৎসরিক (half-yearly—ষাণ্মাসিক কী দোষ করেছে?), উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি (high-power committee—অধিক ক্ষমতাসম্পন্ন বলাই তো সংগত), এইসব অনুবাদ বাংলা ভাষার পক্ষে ঠিক মানানসই নয়। তবে ক্রমাগত ব্যবহৃত হতে থাকলে সবই সয়ে যায়। এসব ক্ষেত্রেও তেমন হওয়া অসম্ভব নয়।

গ্রন্থপঞ্জি

চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার—বাঙ্গালা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা (১৯৯১)

দাশ, সত্যনারায়ণ—বাংলায় দ্রাবিড় শব্দ (১৯৯৩)

বসু, দ্বিজেন্দ্রনাথ—বাংলা ভাষার আধুনিক তত্ত্ব ও ইতিকথা (১৯৮০)

ভট্টাচার্য, পরেশচন্দ্র—ভাষাবিদ্যা পরিচয় (১৯৯৩)

ভট্টাচার্য, সুভাষ—বাঙালির ভাষা (২০০০)

মাইতি, প্রকাশ কুমার—আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানের আলোকে বাংলা ভাষা (২০০৮)

সরকার, পবিত্র—ভাষাজিজ্ঞাসা (নবম-দশম) (১৯৯১)

সেন, সুকুমার—ভাষার ইতিবৃত্ত (১৯৯৪)

৩২. সাধুভাষা ও চলিত ভাষা

৩২.১ লেখ্য ও সাহিত্যিক গদ্য

১৯৫৯ সালে প্রকাশিত একটি নিবন্ধে ভাষাবিজ্ঞানী চার্লস ফার্গুসন diglossia বা দ্বিভাষারীতির কথা বলেছিলেন। নানান সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ভাষাগত কারণে প্রায়ই একই ভাষায় দুটি ভিন্ন রীতি গড়ে উঠতে পারে। একেই diglossia বা দ্বিভাষারীতি বলে। লেখার ভাষা ও মুখের ভাষায় নানান পার্থক্য থাকে। বাংলায় সেই মুখের ভাষার উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে মান্য চলিত ভাষা। সেই সময় থেকেই বাংলা লেখ্য বা সাহিত্যিক ভাষায় দুটি রীতি পাশাপাশি চলেছে—সাধুভাষা ও চলিত ভাষা। বাংলার ক্ষেত্রে এই হল diglossia বা দ্বিভাষারীতির ব্যাখ্যা।

বাংলায় সাধুভাষা অষ্টাদশ শতক থেকে গড়ে উঠতে শুরু করে। তবে তার বিকাশ উনিশ শতকে। উনিশ শতকের গোড়ায় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজকে কেন্দ্র করে সংস্কৃত পণ্ডিতদের নির্দেশনায় সাধুভাষার একটা বিশেষ রূপ-পরিগ্রহ হয়। সেই ভাষায় সংস্কৃত বা তৎসম শব্দের আধিক্য লক্ষণীয়। তার শৈলীও কিছুটা কৃত্রিম। সে-যুগের গদ্য-শৈলীর প্রধান রূপকারদের মধ্যে রামরাম বসু, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার প্রমুখের মতো বাঙালি কয়েকজন যেমন ছিলেন, তেমনি অন্যরা ছিলেন সাহেব—জনাথান ডানকান, হেনরি পিটস ফর্স্টার, উইলিয়াম কেরি প্রভৃতিরা। এই সময় বাংলা গদ্যের আর এক কেন্দ্র ছিল শ্রীরামপুর মিশন। এঁদের হাতে যে সাধুভাষা রূপলাভ করল তাতে গদ্য ছিল কৃত্রিম, সকলপ্রকার বিষয়ের অনুপযোগী। এঁদের পরে যিনি বাংলা গদ্যকে অনেকটাই গড়েপিটে নেন তিনি রামমোহন রায়। রামমোহন সমাজ ও ধর্ম বিষয়ে যেসব নিবন্ধ রচনা করেন, তারই প্রয়োজনে ভাষাকে অনেকটা সাবলীল করে তোলেন। তবে উনিশ শতকে বাংলা সাধুভাষাকে যিনি যথার্থই শ্রীমণ্ডিত করেন তিনি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। বাংলা গদ্যে ক্রিয়াপদকে উহ্য রেখে বাক্যে দৃঢ়তা প্রথম তিনিই এনেছিলেন। প্রকৃত সাহিত্যিক গদ্যের জনক নিঃসন্দেহে বিদ্যাসাগর।

বাংলা সাধুভাষার অন্যান্য রূপকাররা হলেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অক্ষয়কুমার দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ও হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। এঁদের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ বাংলা লেখ্য ভাষাকে যতখানি পুষ্ট করেছিলেন ততখানি আর কেউই করেননি।

এর পরই চলিত ভাষার দিকে নজর যায়। প্রথম যাঁরা সে-চেষ্টা করেন তাঁরা হলেন প্যারীচাঁদ মিত্র এবং কালীপ্রসন্ন সিংহ। সেদিক থেকে 'আলালের ঘরের দুলাল' ও 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা' রীতিমতো একটা বিদ্রোহ ঘটিয়ে ফেলে। বিংশ শতকের গোড়ার দিকে চলিত ভাষার জন্য একটা প্রায় আন্দোলন গড়ে ওঠে, যার রূপকার প্রমথ চৌধুরি।

রবীন্দ্রনাথের উৎসাহ তো ছিলই। তারপর থেকে বাঙালির লেখ্য তথা সাহিত্যিক ভাষার দুটি রূপই সমানে চলতে থাকল, যদিও চলিত ভাষার জোরটা ক্রমশই বাড়ছিল।

৩২.২ সাধুভাষা ও চলিত ভাষার পার্থক্য

বিশেষ্য, বিশেষণ প্রভৃতিতে সাধু ভাষা ও চলিত ভাষায় পার্থক্য খুব নগণ্য। সর্বনাম কোথাও সদৃশ, কোথাও আলাদা। তুমি, তোমরা, আমি, আমরা, আপনি, আপনারা, আপনাদের, আমাদের—এসব সর্বনাম সাধু ও চলিতে নির্বিশেষে ব্যবহৃত হয়। তবে একসময় সাধুতে আমাদিগের ব্যবহৃত হত। এখন তা হয় না। আমরা দেখব সাধু-চলিতের প্রধান পার্থক্য ক্রিয়াপদে, অনুসর্গে, কোনো-কোনো ক্ষেত্রে সর্বনামে, ধ্বনিতে, কোনো-কোনো ক্ষেত্রে ভাবগাম্ভীর্যে।

৩২.২.১ শব্দভাণ্ডারগত পার্থক্য

একসময় মনে করা হত যে, সাধুভাষা ও চলিত ভাষায় শব্দগত পার্থক্য আছে। ১৯৬০ সালে প্রকাশিত একটি নিবন্ধে ('Literary and Colloquial Bengali in Modern Bengali Prose') মার্কিন লেখক এডওয়ার্ড ডিমক দেখাবার চেষ্টা করেছিলেন যে, সাধুভাষায় আর চলিত ভাষায় ভিন্ন ধরনের শব্দ ব্যবহৃত হয়। তিনি আর এক মার্কিন গবেষক গর্ডন ফেয়ারব্যাংকস-এর হিসেব অনুসরণ করেছেন। ডিমক বলতে চেয়েছেন যে, 'হংস' কেবল সাধুভাষায় ব্যবহৃত হয়, চলিতে কেবলই 'হাঁস'। সাধুতে 'দান করা' আর চলিতে 'দেওয়া'। এ যে কতবড়ো ভুল তা শিক্ষিত বাঙালির অজানা নয়। হয়তো একশো-দেড়শো বছর আগে সাধুতে তৎসম শব্দ বেশি ব্যবহার করা হত। কিন্তু এখন তাও বলা যায় না। বহুকাল হল সাধু আর চলিতের মধ্যে একটা সংলগ্নতা লক্ষ করা যাচ্ছে। উভয়ে উভয়ের বৈশিষ্ট্য আত্মসাৎ করছে। চলিতে তৎসম যথেষ্টই ব্যবহৃত হয় দরকার মতো, সাধুতেও আটপৌরে শব্দ ব্যবহৃত হয়।

৩২.২.২ রূপতত্ত্বগত ও পদবিন্যাসগত পার্থক্য

সাধুভাষা ও চলিত ভাষার প্রধান পার্থক্য রূপতত্ত্বগত ও পদবিন্যাসগত। তার মধ্যে আছে ক্রিয়াপদের পার্থক্য, সর্বনামের পার্থক্য, অনুসর্গের পার্থক্য, অব্যয়ের পার্থক্য, শব্দের কথ্য ও সাধু রূপের পার্থক্য, পদবিন্যাসগত পার্থক্য, ভাবগাম্ভীর্যের পার্থক্য।

ক্রিয়াপদের পার্থক্য

সাধুভাষায় ক্রিয়াপদের প্রাচীন ও পূর্ণ রূপ ব্যবহৃত হয় এবং চলিত ভাষায় সেইসব ক্রিয়াপদেরই বিবর্তিত ও অভিশ্রুতি-ঘটিত রূপ ব্যবহৃত হয়। সাধুভাষায় ক্রিয়াপদের ইব, ইবে, ইল, ইলাম, ইয়া, ইতেছি, ইছে, ইতেছে এইসব পূর্ণ বিভক্তি ব্যবহৃত হয়, অন্য দিকে চলিত ভাষায় ই- অংশের লোপ হয়—ব (খেলব), বে (যাবে), ল (গেল), লাম (খেলাম), -ছি (খাচ্ছি ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়। লক্ষ করার বিষয়, -ইতেছ পরিণত হয়েছে -চ্ছ বিভক্তিতে এবং অসমাপিকা ইয়া পরিণত হয়েছে -য়ে তে (খেয়ে) এবং কোথাও কোথাও -এ তে (বসে, এসে)।

তবে যেসব বাংলা বাক্যে ক্রিয়াপদ উহ্য থাকে, সেখানে সর্বনাম বা ক্রিয়াঘটিত অনুসর্গ না থাকলে বোঝাই যাবে না বাক্যটি বা বাক্যগুলি চলিতের, না সাধুর।

তোমার নাম কী?
আমার সেখানে যাওয়া উচিত।
আপনার যুক্তিই যথার্থ।

এই বাক্যগুলি সাধু বা চলিত যেকোনো রীতিরই হতে পারে। আবার কখনো-কখনো ক্রিয়াপদের কোনো-কোনো রূপ দেখেও বোঝা যাবে না সেটি চলিতের না সাধুর—

তুমি যাও
তুমি খাও
সে খায়

এ কেবল নিত্য বর্তমান ও বর্তমান অনুজ্ঞায়। অন্যান্য রূপের ক্ষেত্রে একথা বলা যাবে না।

গিয়াছে/ গেছে, গিয়েছে
খাইবে/খাবে
খাইলাম/ খেলাম

সর্বনামের পার্থক্য

সাধু ও চলিত ভাষায় আর একটি পার্থক্য সর্বনামের রূপের ব্যবহারে। কতকগুলি পার্থক্য দেখা যাক—

সাধু	চলিত
ইহা	এ
ইহাকে	একে
ইহার	এর
তাহা	তা
তাহাকে	তাকে
তাহার	তার
যাহা	যা
যাহাকে	যাকে
উহা	ও
উহাকে	ওকে
উহার	ওর
এইটা	এটা
যাঁহার	যাঁর
ইনি	এঁ
উঁহার	ওঁর
উঁহাকে	ওঁকে

আমি, আমরা, তুমি, তোমরা, আমাকে, তোমাকে—এগুলি সাধু-চলিতে অভিন্ন।

অনুসর্গের পার্থক্য

অনুসর্গের ব্যবহার সাধু ও চলিতে অনেকটাই আলাদা। দ্বারা, দিয়া, কর্তৃক, আপেক্ষা, চাইতে, ন্যায়, হইতে—এগুলি সাধুতেই কেবল ব্যবহৃত হয়—আমার দ্বারা, তাহার অপেক্ষা, তাহার চাইতে। অন্য দিকে, চলিতে দিয়ে, চেয়ে, থেকে ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়। 'অপেক্ষা' 'দ্বারা' চলিতেও কেউ-কেউ ব্যবহার করেন। চলিতে আরও ব্যবহৃত হয় সামনে, মতো, সঙ্গে, কাছে, আগে, ছাড়া, পাশে, মধ্যে ইত্যাদি।

অব্যয়পদের পার্থক্য

কতকগুলি সংস্কৃত অব্যয় প্রধানত সাধু ভাষাতেই ব্যবহৃত হয়। যেমন কদাপি, অত্র, অপিচ, কুত্রাপি, ইত্যাদি। অবশ্য চলিতে এগুলি যে ব্যবহৃত হয়ই না, তা নয়। তবে এগুলি সাধুভাষার মেজাজের সঙ্গেই বেশি মানানসই।

শব্দের কথ্য ও সাধু রূপের পার্থক্য

জুতো, সুতো, হিসেব, সন্ধ্যে, পেতল, কুয়ো, তেতো, মিথ্যে, সত্যি, যজ্ঞি, মুচ্ছো (মূর্ছা), ফিতে, ভিক্ষে—এই শব্দগুলি বা শব্দের এই কথ্য রূপগুলি চলিতেই ব্যবহৃত হয়। সাধুতে পাই জুতা, সুতা, হিসাব, সন্ধ্যা, কুয়া, পিতল, তিক্ত, মিথ্যা, সত্য, যজ্ঞ, মূর্ছা।

পদবিন্যাসগত পার্থক্য

সাধু ভাষার বাক্যে পদক্রম সুনির্দিষ্ট। সাধু ভাষার বাক্যে সমাপিকা ক্রিয়া সচরাচর বাক্যের শেষে আসে।

সে তাহার ছাতাটি লইয়া দ্রুত প্রস্থান করিল।
সূর্যাস্তের পূর্বেই তাহারা গ্রাম ছাড়িয়া গেল।

পদক্রমের ছয়টি ক্রমিক পদ-উপাদান এইরকম—

১. বিশেষণসহ কর্তৃপদ, ২. কালবাচক ক্রিয়াবিশেষণ, ৩. স্থানবাচক ক্রিয়াবিশেষণ, ৪. গৌণ কর্ম ৫. মুখ্য কর্ম ৬. ক্রিয়াপদ।

এবার একটি বাক্য নিয়ে এই ক্রম দেখা যাক—

তাহার মাতুল (১) গতকাল (২) নদীর ধারে (৩)
আমাকে (৪) এই কথা (৫) বলেন (৬)

৩২.৩ সাধু-চলিতের পারস্পরিক সংলগ্নতা

উনিশ শতকের গোড়ার দিক থেকে পরবর্তী দেড়শো বছরে সাধুভাষার দীর্ঘ পথ-পরিক্রমায় অনেক পরিবর্তন ঘটে গেছে। লক্ষ করলে দেখা যাবে যে, সর্বনাম আর ক্রিয়াপদের আদি ও পূর্ণরূপই সাধুর প্রধান বৈশিষ্ট্য থেকে গেছে। এ-দুটি ব্যাকরণগত

প্রকরণ চলিত ভাষায় কখনো ব্যবহৃত হয়নি। সাধুভাষার অন্য যে সব বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হয়, সেগুলো যেমন কঠোরভাবে সবসময় পালিত হয়নি, তেমনি সাধুভাষার তথাকথিত কিছু বৈশিষ্ট্য বারবার চলিত গদ্যে দেখা গেছে। ব্যতিক্রমের মধ্যে কেবল ক্রিয়াপদ ও সর্বনাম। সাধুরীতির ভারী তৎসম শব্দ চলিতে যথেষ্ট ব্যবহৃত হয়, সংস্কৃতের অব্যয় পদগুলি—যেমন অকস্মাৎ, ক্বচিৎ, কদাচিৎ—চলিতে ব্যবহৃত হয়েই থাকে। অন্য দিকে, সাধু ভাষায় তদ্ভব শব্দ, কথ্য রীতির শব্দ প্রভৃতির ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায়।

চলিত ভাষার ভিত্তি বাঙালির মুখের ভাষা। সেই কারণে চলিত ভাষা স্বাভাবিক, অকৃত্রিম, বেগবান, স্বচ্ছন্দ। বিদ্যাসাগর মহাশয়ই প্রথম সাধু ভাষাতেও সেই স্বাচ্ছন্দ্য ও বেগ আনলেন। তাঁর এবং অন্যান্যদের চেষ্টায় সাধুভাষা বঙ্কিম-নিন্দিত 'আভাঙ্গা সংস্কৃতের গণ্ডি' থেকে ক্রমশ বেরিয়ে আসে। ফলে সাধুভাষা ক্রমশ নমনীয় ও সরল হয়ে মেজাজে চলিতের কাছাকাছি চলে আসছিল। বিংশ শতকে এসে দেখা গেল, সাধু ভাষা ও চলিত ভাষায় পার্থক্য কেবল ক্রিয়াপদ আর সর্বনামে। সাধু ভাষার কোনো-কোনো নিদর্শন যদি জটিল ও ভারী হয়, তবে বলা যায় যে চলিত ভাষায়ও ভারী ও জটিল বাক্যের নিদর্শন আছে। এক দিকে, সাধু ভাষা চলিতের কিছু বৈশিষ্ট্য আত্মসাৎ করেছে, অন্য দিকে চলিতেও দরকারমতো গাম্ভীর্য সঞ্চারিত হয়েছে।

গ্রন্থপঞ্জি

চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার—ভাষাপ্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ (১৯৮৮)
চট্টোপাধ্যায়, হীরেন—ভাষাতত্ত্ব ও বাংলা ভাষার ইতিহাস (১৯৯৩)
ভট্টাচার্য, পরেশচন্দ্র—ভাষাবিদ্যা পরিচয় (১৯৯৩)
ভট্টাচার্য, সুভাষ—বাঙালির ভাষা (২০০০)
মাইতি, প্রকাশ কুমার—আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানের আলোকে বাংলা ভাষা (২০০৮)
সরকার, পবিত্র—ভাষা জিজ্ঞাসা, নবম-দশম (১৯৯১)

৩৩. বাংলা উচ্চারণতত্ত্ব ও বাংলা উচ্চারণের রূপরেখা

৩৩.১ বাংলা ভাষার উচ্চারণতত্ত্ব

প্রত্যেক ভাষার উচ্চারণের কতকগুলি সাধারণ প্রবণতা থাকে। সেই প্রবণতাগুলি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা না থাকলে সেই ভাষার উচ্চারণের চরিত্র বা বৈশিষ্ট্য সম্পর্কেও সুস্পষ্ট ও অভ্রান্ত ধারণা সম্ভব নয়। বাংলা উচ্চারণ অভিধানে কয়েক হাজার শব্দের উচ্চারণ বিবৃত হয়। অভিধান থেকে একটি শব্দের উচ্চারণ জেনে নেওয়া যায়। কিন্তু তাতে বাংলা উচ্চারণের সাধারণ বৈশিষ্ট্য বা চরিত্র সম্পর্কে কিংবা প্রবণতা সম্পর্কে ধারণা হয় না। অথচ বাঙালিই হোন আর অবাঙালিই হোন, বাংলা উচ্চারণের প্রধান লক্ষণগুলিকে চিনে নেওয়া একান্তই কর্তব্য। আমাদের বর্ণমালা এবং মুখের ভাষায় উচ্চারিত ধ্বনির মধ্যে সম্পূর্ণ মিল বা ঐক্য নেই। আমাদের স্বরবর্ণ এগারোটি অথচ আদর্শ কথ্য ভাষায় স্বরধ্বনি আছে সাতটি। আমাদের মুখের ভাষায় অন্তত আঠারোটি যৌগিক স্বরধ্বনি বা diphthong আছে, অথচ বর্ণমালায় আছে মাত্র দুটি—ঐ, ঔ। আমাদের উচ্চারণে প্রচুর অর্ধস্বরের ব্যবহার আছে, অথচ বর্ণমালায় তার কোনো অস্তিত্ব নেই। আমাদের ব্যঞ্জনবর্ণ আছে পঁয়ত্রিশটি, কিন্তু মুখের ভাষা ব্যঞ্জনধ্বনি আছে ত্রিশটি। এ ছাড়া স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জনধ্বনির পরিবর্তন তো আছেই। এখানে বাংলা উচ্চারণের সাধারণ বৈশিষ্ট্য ও লক্ষণগুলি সংক্ষেপে বর্ণনা করা যাক।

বাংলা স্বরবর্ণ ও স্বরধ্বনি

১. বাংলা বর্ণমালায় এগারোটি স্বরবর্ণ আছে। প্রত্যেকটি বর্ণেরই উদ্ভাবন হয়েছিল এক-একটি ধ্বনির প্রতিনিধিত্ব করার জন্য। কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে আ, ই, উ এবং ও এই চারটি বর্ণ মোটামুটিভাবে যথাক্রমে a, i, u এবং o ধ্বনির যথার্থ প্রতিনিধি। এগুলির দ্বিতায় কোনো উচ্চারণ নেই। কিন্তু অ ঋ এ ঈ এবং ঊ-র উচ্চারণ সম্পর্কে বিশেষ আলোচনা প্রয়োজন। অ কখনো অ উচ্চারিত হয়, কখনো ও উচ্চারিত হয়। ঋ ব্যঞ্জনধ্বনির মতো উচ্চারিত হয়, ঈ এবং ঊ নামে দীর্ঘ-ঈ ও দীর্ঘ-ঊ হলেও হ্রস্ব-ই এবং হ্রস্ব-উ-র মতো উচ্চারিত হয়।

অ একটি নিম্নমধ্য অর্ধ-বিবৃত পশ্চাৎ ধ্বনি। এই জন্য তার পরে ই বা উ ধ্বনি থাকলে অর্থাৎ ঊর্ধ্ব ধ্বনি থাকলে অ ঊর্ধ্বধনিতে রূপান্তরিত হয়—অর্থাৎ ও ধ্বনিতে পরিণত হয়। এইজন্যই পট = পট্, কিন্তু পটি = পোটি, মশা = মশা কিন্তু মসী = মোশি। একইভাবে পশু, কলু বঁটি, নদী প্রভৃতি অজস্র শব্দের বানানে অ

(অর্থাৎ প, ক, বঁ, ন) থাকলেও উচ্চারণে ও হয়। অবশ্য একটি -দুটি ব্যতিক্রমও আছে। শব্দের গোড়ায় অ যদি নঞর্থক উপসর্গ হয় তবে পরে ই বা উ ধ্বনি থাকলেও গোড়ার অ ও হয় না। যেমন অকুণ্ঠ, অটুট, অপুত্রক, অপূর্ব। দ্বিতীয়ত, আতিশয্যবাচক বা সহ অর্থে স-যুক্ত শব্দের স-য়ের নিহিত অ ধ্বনি ও হয় না, স শো হয় না। যেমন সচিত্র, সতীর্থ, সঠিক, সজীব। তৃতীয়ত, সৎ বা সদ্-যোগে গঠিত শব্দের নিহিত অ-ধ্বনি ও-ধ্বনিতে পরিণত হয় না। যেমন সদুত্তর, সদুপদেশ। নিহিত (inherent) অ ধ্বনির পরে ক্ষ (ক্‌খ) থাকলে অ ধ্বনি ও ধ্বনিতে পরিণত হয়। কক্ষ, পক্ষ, অক্ষ, দক্ষ প্রভৃতি শব্দে অ-য়ের পরে ঈ বা উ নেই বটে। তবু অ ও-ধ্বনিতে পরিণত হল ক্ষ অর্থাৎ ক্‌খ ধ্বনিগুচ্ছের প্রভাবে। শব্দের গোড়ায় র-ফলা-যুক্ত ব্যঞ্জন থাকলে সেই র-ফলা-যুক্ত ব্যঞ্জনের নিহিত অ-ধ্বনি ও ধ্বনিতে পরিণত হয়—গ্রহ, গ্রহণ, ক্রম, শ্রম, প্রথা, দ্রষ্টা, প্রথম। অবশ্য পরে য় থাকলে ও ধ্বনি হবে না—ক্রয়, ত্রয়।

২. আদর্শ কথ্য বাংলায় শব্দের শেষের নিহিত অ ধ্বনির লোপের একটা স্বাভাবিক ও সাধারণ প্রবণতা আছে। দাম, দমন, ফল, কমল, কলম, শ্রাবণ, শ্যাম, রাম প্রভৃতি শব্দের শেষের ব্যঞ্জনের সঙ্গে একটি করে নিহিত অ ধ্বনি ছিল। কিন্তু সেই অ ধ্বনিটি আমাদের উচ্চারণে লোপ পায়। আমরা এইরকম বহু শব্দকেই ব্যঞ্জনান্ত অর্থাৎ হলন্ত উচ্চারণ করি। এই প্রবণতার কথা সকলেই জানেন। কিন্তু এই নিয়মেরও কতগুলি ব্যতিক্রম আছে। সেগুলিরও উল্লেখ প্রয়োজন। প্রথমত, শেষ সিলেবলের আগে অনুস্বার থাকলে, সহজ করে বলতে গেলে, শেষ নিহিত অ-যুক্ত ব্যঞ্জনের আগে অনুস্বার থাকলে শেষ অ-ধ্বনি লোপ পায় না—কংস হংস বংশ ত্রিংশ। দ্বিতীয়ত, ত বা ইত প্রত্যয়ান্ত শব্দের শেষ ত-য় স্বরধ্বনি লোপ পায় না। নিবারিত, নত, পুলকিত, গত, আগত, ব্যাখ্যাত, মথিত। তৃতীয়ত, শেষে হ বা য় (অনীয় বা ঈয়/এয়) থাকলে স্বরধ্বনি লোপ পায় না—পেয়, মদীয়, পানীয়, নমনীয় ; দেহ, বহ, সহ, দাহ, কেহ কলহ। এই ধরনের নিয়ম ও প্রবণতা আরও আছে। এখানে মাত্র কয়েকটিরই উল্লেখ করা হল।

৩. বাংলায় শব্দের গোড়ায় ঋ থাকলে তা রি উচ্চারিত হয়। র + ই এইভাবে ধরলে এই রি মোটেই স্বরধ্বনি নয়। আবার শব্দের মধ্যে স্বরধ্বনির পরে ঋ-কার থাকলে আদর্শ কথ্য বাংলায় ব্যঞ্জনের একটা দ্বিত্বের প্রবণতা লক্ষ করা যায়। আকৃষ্ট = আক্-ক্রিষটো, আদৃত = আদ্-দ্রিতো। কোনো বাঙালিই কথোপকথনে অর্থাৎ সাধারণ আলাপে এগুলিকে আ-ক্রিষ্‌টো বা আ-দ্রিতো উচ্চারণ করেন না। তবে একথাও ঠিক যে, পরিশীলিত উচ্চারণে অর্থাৎ ফরমাল, চেষ্টিত, ও সচেতন উচ্চারণে ওই দ্বিত্ব এড়ানোর চেষ্টা হয়। আমরা স্বাভাবিকভাবে উপকৃত শব্দটিকে উপোক্‌ক্রিতো বললেও আবৃত্তিতে বা নাটকের সংলাপে কেউ কেউ উপোক্রিতো বলার পক্ষপাতী।

৪. বাংলা স্বরবর্ণ ও স্বরধ্বনির বিরোধের আর একটি বড়ো ক্ষেত্র হল এ। বহু শব্দ বানানে এ বা এ-কার হলেও উচ্চারণে অ্যা হয়। খেলা, চেলা, ভেড়া, একা, এগারো, বেড়া, এত, যেন, যেমন, লেজা, হেলাফেলা। কিছু বিদেশি, দেশি ও নবাগত শব্দ অবশ্য আজকাল অ্যা দিয়েই লেখা হচ্ছে। যেমন ন্যাতা, ন্যাকড়া, অ্যাসিড, জ্যাঠা, ক্যাবলা। কিন্তু এখনও অজস্র শব্দ আমাদের ভাষায় আছে যেগুলি বানানে এ বা এ-কার অথচ উচ্চারণে অ্যা। এক্ষেত্রে সমস্যার আংশিক সমাধান হতে পারে যদি এ এবং অ্যা উচ্চারণের ক্ষেত্রগুলিকে চিহ্নিত করা যায়। সাধারণত শব্দের মধ্যের ও শেষের এ-কার অ্যা উচ্চারিত হয় না। দ্বিতীয়ত, যুক্তব্যঞ্জনের এ-কার সর্বত্রই এ উচ্চারিত হয়—শ্রেয়, প্রেম, ক্রেতা, দ্বেষ। বিশেষ্য বা বিশেষণের য় বা হ-এর পূর্ববর্তী এ-কার এ উচ্চারিত হয়—দেহ, গেহ, কেহ ; দেয়, পেয়, গেয়। চতুর্থত, শব্দের দ্বিতীয় সিলেবলে ই বা উ ধ্বনি থাকলে প্রথম সিলেবলের এ বা এ-কার এ উচ্চারিত হয় ফেন = ফ্যান্, কিন্তু ফেনিল = ফেনিল্, পেঁচানো = প্যাঁচানো, কিন্তু পেঁচিয়ে = পেঁচিয়ে।

৫. আদর্শ কথ্য বাংলায় আঠারোটি যৌগিক স্বরধ্বনি বা diphthong আছে। ডিফথঙের বৈশিষ্ট্য এই যে তাতে একটি পূর্ণ স্বরধ্বনি এবং একটি অর্ধস্বরধ্বনি থাকে। আয়, যাই, খাই, চায়, শুই প্রভৃতি শব্দে এই ডিফথং আছে। আয় = আয়্, যাই = যাই্, খাই = খাই্, চায় = চায়্, শুই = শুই্। লক্ষ করার বিষয় যে, এই দ্বিতীয় স্বরধ্বনিটি পূর্ণ নয়। তাই এগুলিকে ঠিক ঠিক দেখাতে গেলে একটি হ্স্-চিহ্ন চাই। ধ্বনিলিপিতে দেখানো হয় এইভাবে—aĕ, jaĭ, khaĭ, caĕ, ʃuĭ. অনুরূপভাবে দাও = দাও্ /daŏ/ ।

৬. স্বরধ্বনি প্রসঙ্গে শেষ বক্তব্য এই যে, যদিও আমরা জানি যে, বাংলায় কোনো বিশেষ স্বরধ্বনির দীর্ঘ উচ্চারণ নেই, যেমন ঈ বা ঊ এর, তথাপি মনে রাখতে হবে যে এক সিলেবলের শব্দে স্বরধ্বনি সব সময়ই দীর্ঘ উচ্চারিত হয়। আম এবং আমি শব্দে আ একই মাত্রার নয়। আম শব্দের আ দীর্ঘ, তেমনই কুল শব্দের উ দীর্ঘ, এমনকী গঁদ শব্দের অঁ দীর্ঘ। এই দীর্ঘতা /:/ চিহ্ন দিয়ে বোঝানো হয়। আম = /a:m/, কুল /ku:l/, গঁদ = /gɔ̃:d/। এইভাবে দেখলে বাংলায় যেকোনো স্বরধ্বনিই দীর্ঘ উচ্চারিত হতে পারে, যদি সেই স্বরধ্বনি এক সিলেবলের শব্দের স্বরধ্বনি হয়।

বাংলা ব্যঞ্জনবর্ণ ও ব্যঞ্জনধ্বনি

১. আগেই বলা হয়েছে, বাংলা বর্ণমালায় পঁয়ত্রিশটি ব্যঞ্জনবর্ণ থাকলেও ব্যঞ্জনধ্বনি আছে ত্রিশটি। ঞ-র কোনো নিজস্ব সুনির্দিষ্ট উচ্চারণ বাংলায় নেই. কখনো তার উচ্চারণ য়ঁ (মিঞা), কখনো তার উচ্চারণ ইয়ঁ (নঞর্থক), কখনো বা ন (বাঞ্ছা)। য বাংলায় জ উচ্চারিত হয়, মূর্ধন্য-ণ দন্তমূলীয় ন-য়ের মতো উচ্চারিত হয়। কয়েকটি

সীমিত ক্ষেত্র ছাড়া মূর্ধন্য-ষ সাধারণভাবে শ উচ্চারিত হয়। য় বাংলায় একটি অর্ধস্বর বা **semi-vowel** হিসাবে বিবেচিত। বাকি ব্যঞ্জনবর্ণগুলির উচ্চারণ নিয়ে কোনো সংশয় বা অনিশ্চয়তা নেই, তাদের উচ্চারণে বিভিন্নতাও নেই। দন্ত্য-ন সম্পর্কে একটি প্রাসঙ্গিক মন্তব্য প্রয়োজন। এটিকে দন্ত্য-ন বলাই যদিও দীর্ঘকালের রীতি, বাংলায় দন্ত্য-ন প্রকৃতপক্ষে দন্ত্য (dental) ধ্বনি নয়, এটি একটি দন্তমূলীয় (alveolar) ধ্বনি। এছাড়া দন্ত্য-স নামে দন্ত্য হলেও এর দুটি ধ্বনি আছে। একটি তালব্য শ-য়ের মতো—সময়, সব, সমান। অন্যটি দন্তমূলীয় ধ্বনি, যা পাওয়া যায় ত-বর্গের সঙ্গে যুক্ত হলে—কাস্তে, ন্যস্ত, বিস্তার, দিস্তা, স্বাস্থ্য। এছাড়া অন্য ব্যঞ্জনবর্ণগুলির উচ্চারণ মোটামুটি সুনির্দিষ্ট।

২. বাংলা ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণের কিছু সমস্যা আছে যুক্তব্যঞ্জনের ক্ষেত্রে। তাই ব্যঞ্জনের উচ্চারণ প্রসঙ্গে যুক্তব্যঞ্জন সম্পর্কে দু-একটি কথা বলে নেওয়া দরকার।

ক. বাংলায় ক্ষ প্রকৃতপক্ষে একটি যুক্তব্যঞ্জন—ক্ + ষ্। সংস্কৃতে এর ঠিক ওই রকম উচ্চারণই দস্তুর। কিন্তু বাংলায় ক্ষ-র দু-রকম উচ্চারণ পাই এবং সেই দুটি উচ্চারণই সংস্কৃত উচ্চারণের চেয়ে অনেক আলাদা। ক্ষ শব্দের গোড়ায় খ উচ্চারিত হয়—ক্ষয়, ক্ষমা, ক্ষরণ। শব্দের মধ্যে ক্খ উচ্চারিত হয়—অক্ষর, কক্ষ, বীক্ষণ।

খ. জ্ঞ অর্থাৎ জ্ + ঞ্ শব্দের গোড়ায় গ্ঁ উচ্চারিত হয়—জ্ঞান, জ্ঞাপন। শব্দের মধ্যে গ্ঁগঁ উচ্চারিত হয়—বিজ্ঞান, সজ্ঞান।

গ. ব-ফলার একাধিক উচ্চারণ পাওয়া যায়। শব্দের গোড়ায় ব-ফলার কোনো উচ্চারণ নেই—শ্বাস, শ্বাপদ, দ্বাপর, দ্বিজ, দ্বার। শব্দের মধ্যে ব-ফলা ব্যঞ্জনের দ্বিত্বঘটায়—বিদ্বান (বিদ্দান্), স্বত্ব (শৎতো)। ব-ফলাযুক্ত হ্-এর উচ্চারণ বিশেষভাবে লক্ষণীয়। আহ্বান (আও্ভান্), বিহ্বল (বিউ্ভল্)। উদ্ উপসর্গ-যুক্ত শব্দে ব-ফলা ব উচ্চারিত হয়—উদ্বাস্তু, উদ্বুদ্ধ, উদ্বোধন।

ঘ. ম-ফলার তিনটি উচ্চারণ পাওয়া যায়। শব্দের গোড়ায় ম্ উচ্চারিত হয় না, তার পরিবর্তে একটা অনুনাসিকতা আসে—স্মিত (শিঁতো), স্মারক (শাঁরোক্)। শব্দের মধ্যে বা শেষে ম-ফলা থাকলে অনুনাসিকতা তো আসেই, উপরন্তু পরের ব্যঞ্জনটির দ্বিত্ব হয়—বিস্ময় (বিশ্শঁয়্), রশ্মি (রোশ্শিঁ)। তৃতীয়ত, কোনো কোনো ক্ষেত্রে ম-উচ্চারিত হয়, আর তা হয় বলেই দ্বিত্ব বা অনুনাসিকতা কোনোটিই আসে না—কাশ্মীর, তন্ময়, মৃন্ময়, বাল্মীকি, জ্যোতিষ্মান, চক্ষুষ্মান প্রভৃতি।

ঙ. য-ফলার পাঁচরকম উচ্চারণ আদর্শ কথ্য বাংলায় লক্ষ করা যায়। (এক) পরে ব্যঞ্জনধ্বনি কিংবা অ, আ, ও ধ্বনি থাকলে শব্দের আদ্য য-ফলা অ্যা উচ্চারিত হয়—ব্যবহার, ব্যক্ত, ব্যস্ত ; (দুই) পরে ই ধ্বনি থাকলে য-ফলা এ উচ্চারিত

হয়—ব্যথিত, ব্যতিক্রম ; (তিন) শব্দের শেষে বা মধ্যে ব্যঞ্জনে য-ফলা থাকলে ব্যঞ্জনটির দ্বিত্ব হয়—সদ্য, পদ্য, কল্য গদ্য ; (চার) শব্দের গোড়ায় য-ফলার সঙ্গে উ-কার, ঊকার বা ও-কার থাকলে য-ফলার উচ্চারণ হয় না—দ্যুতি, ন্যুব্জ, ব্যূহ, দ্যোতনা ; (পাঁচ) শব্দের শেষে আ-কার-যুক্ত য-ফলা দ্বিত্ব + আ উচ্চারিত হয়। হত্যা = হোৎতা (হোৎত্যা নয়), বিদ্যা = বিদ্‌দা (বিদ্‌দ্যা নয়)।

চ. রেফ এবং র-ফলার বৈশিষ্ট্য এই যে, শব্দের মধ্যে বা শেষে এরা ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব ঘটায়। গর্ব, দর্প, সর্ব প্রভৃতি শব্দের উচ্চারণ ঠিক গর্‌বো, দর্‌পো, শর্‌বো নয়। লিখতে হয় গরব্‌বো দরপ্‌পো শরব্‌বো। তবে প্রথম ব্যঞ্জনটি খণ্ডিত। অর্থাৎ দ্বিত্ব আংশিক। IPA-তে দেখাতে হলে হওয়া উচিত এইরকম—gɔr(b)bo, dɔr(p)po, ʃɔr(b)bo সম্প্রতি বাংলা উচ্চারণে বানানের প্রভাব লক্ষ করা যাচ্ছে। ফলে শিক্ষিত বাঙালি রেফযুক্ত ব্যঞ্জন একটু সর্তকতার সঙ্গে উচ্চারণ করছেন।

শব্দের মধ্যে ও শেষে র-ফলা সব সময়ই ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব ঘটায়। ছাত্র = ছাৎত্রো, বিশ্রাম = বিস্‌স্রাম্।

ছ. হ-য়ের সঙ্গে মূর্ধন্য-ণ, দন্ত্য-ন ও ম-ফলা যুক্ত হলে, উচ্চারণে হ পরে চলে যায়। অপরাহ্ণ = [oporannho]. ব্রাহ্মণ [brammhon].হ-য় ব-ফলার উচ্চারণে হ ধ্বনি খণ্ডিত ও ধ্বনিতে পরিণত হয়। এবং ব-ধ্বনি ভ-ধ্বনিতে পরিণত হয়। আহ্বান = আও্‌ভান aŏ bɦan, হ-য় য-ফলার উচ্চারণ জ্ঝ। সহ্য, বাহ্য, দাহ্য প্রভৃতির উচ্চারণ যথাক্রমে শোজ্‌ঝো, বাজ্‌ঝো, দাজ্‌ঝো।

৩. অনুনাসিকতা ও বিসর্গ

বাংলা ভাষায় অনুনাসিকতার একটি বিশেষ চরিত্র আছে। স্বরধ্বনির অনুনাসিকতা স্পষ্টই উচ্চারিত হয়। চাঁদ কোঁচা, বাঁশি প্রভৃতি শব্দের অনুনাসিকতা খুবই স্পষ্ট। কিন্তু যুক্ত-ব্যঞ্জনে নাসিক্য ব্যঞ্জনের জন্য, বিশেষত ঞ-র জন্য বা ম-ফলার জন্য যেখানে অনুনাসিকতা আসে, সেখানে অনুনাসিকতা কোথাও স্পষ্ট, কোথাও ক্ষীণ, আবার কোথাও বা সম্পূর্ণ অশ্রুত। স্মারক, বিস্ময় প্রভৃতি শব্দে অনুনাসিকতা বেশ স্পষ্ট। স্মরণীয়, স্মরণ, পদ্ম, বিজ্ঞান প্রভৃতি শব্দে অনুনাসিকতা ক্ষীণ ; আবার লক্ষ্মী, সূক্ষ্ম প্রভৃতি শব্দে অনুনাসিকতা একেবারেই অশ্রুত।

বাংলায় বিসর্গের উচ্চারণ সম্পর্কে একটি কথাই স্মরণীয়। বিসর্গের উচ্চারণ নেই। কেবল তার প্রভাবে পরবর্তী ব্যঞ্জনটির দ্বিত্ব হয়। দুঃখ = দুক্‌খো, অধঃপাত = অধোপ্‌পাৎ।

৪. শেষ ব্যঞ্জনের মহাপ্রাণতা

শব্দের শেষের মহাপ্রাণ ধ্বনি যদি ব্যঞ্জনান্ত উচ্চারিত হয়, তবে সেই মহাপ্রাণ ধ্বনির মহাপ্রাণতা লোপ পায় অথবা ক্ষীণ হয়ে যায়। কাঁধ, সাধ, বাঁধ, প্রভৃতি শব্দের ধ ধ্

উচ্চারিত হয় না, এদের প্রকৃত উচ্চারণ অনেকটা দ্ ও ধ্ এর মাঝামাঝি। ধ্বনিচিহ্নে দেখানো যেতে পারে এইভাবে— kæ̃d(ɦ), ʃad(ɦ), bãd(ɦ)। আবার, লক্ষ করার বিষয় যে, শেষ মহাপ্রাণিত ধ্বনিটি যদি স্বরান্ত উচ্চারিত হয় তবে মহাপ্রাণতা লোপ পায় না। সাধা শব্দের উচ্চারণ শাধা [ʃadɦa]। এমনকী শব্দের মধ্যে একটি মহাপ্রাণিত ব্যঞ্জন ও পরবর্তী ব্যঞ্জনের মধ্যে কোনো স্বরধ্বনি না থাকলে মহাপ্রাণিত ব্যঞ্জনটির মহাপ্রাণতা লোপ পায় কিংবা ক্ষীণ হয়ে যায়। আছড়ানো, গাছপালা, সাঁঝবেলা প্রভৃতি শব্দে ছ ও ঝ এর মহাপ্রাণতা খুবই ক্ষীণ হয়ে যায়। আছড়ানো, গাছপালা, সাঁঝবেলা প্রভৃতি শব্দে ছ ও ঝ এর মহাপ্রাণতা খুবই ক্ষীণ, প্রায় অশ্রুত।

৫. পাশাপাশি ব্যঞ্জনের পরিবর্তন

সবশেষে ব্যঞ্জনধ্বনির বহির্বর্তী সন্ধির উল্লেখ করতে হয়। বাক্যে একটি শব্দের শেষ ব্যঞ্জনধ্বনির সঙ্গে পরের শব্দের প্রথম ব্যঞ্জনধ্বনির সন্ধি কথ্য ভাষার একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। এই সন্ধি প্রধানত দু-রকমের, সমস্থানজাত বা homorganic এবং ভিন্নস্থানজাত বা heterorganic। এক গ্রাস (অ্যাগ্‌গ্রাশ্), দিক গাল (দিগ্‌গাল্), হাত ধরা (হাদ্‌ধরা), পিঠ ঢাকা (পিড়ঢাকা), মেঘ করেছে (মেক্ কোরেছে) প্রভৃতি সমস্থানজাত সন্ধির দৃষ্টান্ত। আবার পাক দেওয়া (পাগ্ দেওআ), পাঁচ ভাই (পাঁজ্ ভাই্), এক ঢোক (অ্যাগ্ ঢোক) প্রভৃতি ভিন্নস্থানজাত সন্ধির উদাহরণ। মান্য কথ্য বাংলার এইসব প্রবণতা উপেক্ষা কিংবা অস্বীকার করা যায় না। তবে লক্ষণীয় যে, পরিশীলিত বা ফরমাল উচ্চারণে এই ধরণের ধ্বনিগত পরিবর্তন সতর্কভাবে এড়িয়ে চলবারই চেষ্টা দেখা যায়।

৩৩.২ মান্য বাংলা উচ্চারণের রূপরেখা

কতকগুলি দৃষ্টান্তশব্দ নিয়ে বাংলা উচ্চারণের প্রবণতাগুলি দেখানো হবে। পনেরো-ষোলোটি নিয়ম বুঝে নিলেই বাংলা উচ্চারণের হদিশ মিলবে।

১. আমল, কমল, সরল, গরল, নরম। উচ্চারণ যথাক্রমে (আ-মোল্, ক-মোল্, শ-রোল্, গ-রোল্, ন-রোম্। দ্বিতীয় সিলেবলে ও-ধ্বনি এল প্রথম সিলেবলের বিবৃত বা অর্ধবিবৃত স্বরধ্বনির প্রভাবে। একই ভাবে বারণ (বা-রোন্), মরণ (ম-রোন্) হবে। এগুলোকে আ-মল্ ক-মল্ শ-রল্ গ-রল্ ন-রম্ বা-রন্ ম-রন্ উচ্চারণ করা উচিত নয়।

২. সবল, অমল, অবল। উচ্চারণ শ-বল্, অ-মল্ অ-বল্।
এগুলো উপরের নিয়মে পড়ে না। এইসব শব্দে সহার্থক উপসর্গ স- এবং নঞর্থক উপসর্গ অ-রয়েছে। এসব ক্ষেত্রে দ্বিতীয় সিলেবলে ও ধ্বনি আসবে না।

৩. মদিরা, মন্দির, কলিকাল, ঘটি। উচ্চারণ যথাক্রমে মো-দি-রা, মোন্-দির, কো-লি-কাল্, ঘো-টি।
এখানে পরের সিলেবলে ই ধ্বনি থাকায় প্রথম সিলেবলের অ-ধ্বনি ও হয়ে

গেল। পরে উ-ধ্বনি থাকলেও তাই। এইভাবেই সমুদ্র, কলুষিত শব্দে শো-মুদ্-দ্রো আর কো-লু-শি-তো উচ্চারণ হবে।

৪. অটুট, অবিনীত, অচির, সচিত্র। অ-টুট্, অ-বি-নি-তো, অ-চি-রো, স-চিৎ-ত্রো। এখানে উপরের দ্বিতীয় সূত্রের মতো নঞর্থক বা সহার্থক উপসর্গ থাকায় ও উচ্চারণ এল না।

৫. গণ্য, ভব্য, নব্য, সভ্য কল্য। গোন্-নো, ভোব্-বো, নোব্-বো, শোব্-ভো, কোল্-লো। এখানে দুটো কথা মনে রাখতে হবে। প্রথমত, পরে য-ফলা থাকায় আগের অ ওকারান্ত হল। দ্বিতীয়ত, য-ফলা থাকা সত্ত্বেও উচ্চারণ য-ফলা না হয়ে ব্যঞ্জনটির ডবল উচ্চারণ হল।

৬. ভঙ্গ, বন্ধ, পোক্ত, মস্ত। ভং-গো, বন্-ধো, পোক্-তো, মস্-তো, শেষে যুক্তব্যঞ্জন থাকলে তার উচ্চারণ ও-কারান্ত হচ্ছে।

৭. গ্রস্ত, গ্রহ, প্রথা, দ্রব। গ্রোস্-তো, গ্রো-হো, প্রো-থা, দ্রো-বো। র-ফলায় নিহিত (inherent) অ ধ্বনি থাকলে উচ্চারণ ও-কারান্ত হবে। গ্রস্-তো বা গ্র-হো উচ্চারণ একেবারেই ভুল।

৮. বিশ্রাম, প্রশ্ন, অশ্লীল। বিস্-স্রাম, প্রোস্-নো, অস্লিল্। বাংলা ধ্বনিতত্ত্বের নিয়মে তালব্য-শ এর সঙ্গে র-ফলা বা ল-ফলা যুক্ত হলে উচ্চারণে দন্ত্য-স আসে। সম্প্রতি প্রোশ্নো, অশ্লিল্, উচ্চারণের ঝোঁক দেখা গেলেও তা একান্তই অনুচিত।

৯. সহ্য, বাহ্য, গ্রাহ্য, আহ্বান, বিহ্বল। শোজ্-ঝো, বাজ্-ঝো, গ্রাজ্-ঝো, আও্ভান্, বিউ্ভল্। মান্য চলিত বাংলার (standard colloquial) এই উচ্চারণ বিশেষভাবে লক্ষ করতে হবে। আও্ভান্-কে আহোবান্ বা আহোভান্ বলা এবং বিউ্ভল্-কে বিহোভল্ বলা মারাত্মক ভুল।

১০. পদ্ম, বিস্ময়, স্মরণ। মান্য উচ্চারণে ম্-ধ্বনি বা অনুনাসিকতা আসে না। স্বাভাবিক উচ্চারণ পদ্-দো, বিশ্-শয়্, শ-রোন্। তবে বেতার-দূরদর্শনের ঘোষক ও আবৃত্তিকারগণ পদ্-দোঁ, বিশ্-শঁয়্ এবং শঁ-রোন্ বলেন। এই উচ্চারণ বানান-প্রভাবিত (spelling pronunciation) এবং ফরমাল। Standard colloquial বা মান্য কথ্য উচ্চারণে অপ্রয়োজনীয়।

১১. একাশি, একাত্তর, একান্ন, লেজ। মান্য উচ্চারণ অ্যা-কা-শি, অ্যা-কাৎ-তোর্, অ্যা-কান্-নো, ল্যাজ্। সম্প্রতি বানানের প্রভাবে এ-কা-শি, এ-কাৎ-তোর্, এ-কান্-নো এবং লেজ্ শোনা যাচ্ছে। এও ফরমাল এবং ঘোষক আবৃত্তিকার ও গায়কদের মুখেই বেশি শোনা যায়। এগুলো ভুল। এ-উচ্চারণ বানান-প্রভাবিত। বহু লোকের মুখে শোনা গেলেও এসব উচ্চারণ বর্জনীয়।

১২. কৃত্য, ভৃত্য, সত্য। কৃৎ-তো, ভ্রিৎ-তো, শোৎ-তো। য-ফলা-ওয়ালা ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব হয়ে যাওয়াই এসব শব্দের বৈশিষ্ট্য।

১৩. অতঃপর, বহিঃপ্রকাশ। অ-তোপ্-পর্, বো-হিপ্-প্রো-কাশ্। বিসর্গের পরের ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব হবে। বিসর্গ উচ্চারিত হবে না।

১৪. গীত, গীতবিতান, জল, জলকষ্ট, রূপ, রূপবাণী। লক্ষ করতে হবে যে, গিৎ কিন্তু গি-তো-বি-তান্ ; জল্ কিন্তু জ-লো-কশ্-টো ; রূপ্ কিন্তু রু-পো-বা-নি। সমাসবদ্ধ হলে পূর্বপদের ব্যঞ্জানান্ত শব্দের স্বরান্ত উচ্চারণ হয়। কিন্তু দুটি শব্দের সংযোগ যদি বাংলা মতে হয় কিংবা দ্বিতীয় শব্দটি যদি অসংস্কৃত শব্দ হয়, তবে প্রথম শব্দটির স্বরান্ত উচ্চারণ হবে না—মনখারাপ (মোন্-খা-রাপ্), পথচলতি (পথ্-চোল্-তি) শতকরা (শৎ-ক-রা), জলচল (জল্-চল্)।

১৫. ভেজাল, বেচারা। ভ্যা-জাল্, ব্যা-চা-রা। এটাই স্বাভাবিক মান্য উচ্চারণ। কিন্তু পরিশীলিত ও ফরমাল উচ্চারণে ভে-জাল্, বে-চা-রা শোনা যায়। আবৃত্তি বা গানে এটা চলতেও পারে, কিন্তু শিষ্ট কথোপকথনে ভ্যা-জাল্ ও ব্যা-চা-রা।

১৬. কবিতা পাঠে বা আবৃত্তিতে ও গানে এসব নিয়মের ব্যতিক্রম হতেই পারে। বাংলায় শব্দের প্রান্তিক বর্ণ সচরাচর ব্যঞ্জনান্ত বা হসন্ত উচ্চারিত হয়—ফল, ম্লান, মন, ফুল, জল, পথ, সব। কবিতায় বা গানে ক্ষেত্রবিশেষে ফ-লো, ম্লা-নো, মো-নো, ফু-লো হতেই পারে।

১৭. পথ, মন, জল, ফুল, কুল, স্নান নবীন, ব্যবহার। এইরকম বহু শব্দের শেষ বর্ণ ব্যঞ্জনান্ত উচ্চারিত হয়। পথ্, মোন্, জল্, ফুল্, কুল্, স্নান্, নো-বিন্, ব্যা-বো-হার্। কিন্তু অনেক শব্দের শেষ বর্ণ স্বরান্ত উচ্চারিত হয়। যেমন যত, কত, শত গ্রহ, নত, পূত, গ্রথিত, শক্ত, যক্ষ, লক্ষ, মস্ত।
লক্ষ করব যে, ত-প্রত্যয়ান্ত শব্দের ত উচ্চারণ হয়। ৎ নয়। দ্বিতীয়ত শেষে যুক্তবর্ণ থাকলে স্বরান্ত উচ্চারণ (শক্ত = শক্-তো) হয়। তৃতীয়ত, শেষে হ থাকলে অকারান্ত উচ্চারণ হয়, গ্রহ (গ্রোহো)।

১৮. ব্যস্ত, ব্যবহার, ব্যসন (বিলাসব্যসন) যথাক্রমে ব্যাস্-তো, ব্যা-বো-হার, ব্যা-শোন্। কিন্তু ব্যতীত, ব্যথিত, ব্যতিক্রম এর উচ্চারণ বে-তি-তো, বে-থি-তো, বে-তিক্-ক্রোম্। ব্যাতিতো নয়, ব্যাথিতো নয়, ব্যাতিক্ক্রোম্ নয়।

৩৪. বাংলা শব্দের নিরুক্তি ও ব্যুৎপত্তি

৩৪.১ শব্দের নিরুক্তি

বাংলা ভাষার শব্দভাণ্ডারের আলোচনায় (৩১ অধ্যায় দ্রষ্টব্য) আমরা দেখেছি কতরকম উৎস থেকে শব্দ এসেছে বাংলা ভাষায়। যেকোনো সচল ভাষাই বহু উৎস থেকে শব্দ আহরণ করে এবং মূল শব্দকে প্রায়ই বদলে নেয়। শব্দের বদল ঘটে চেহারায় অর্থাৎ বানানে, অর্থে এবং ধ্বনিতে। বাংলা ভাষা সংস্কৃত থেকে বহু শব্দ পেয়েছে। যেসব শব্দ বানানে অবিকৃত থেকেছে সেগুলিকে বলা হয় তৎসম। তৎসম শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্ণীত হয়েই রয়েছে। তৎসম শব্দ প্রাকৃতের মধ্য দিয়ে বিবর্তিত হয়ে তদ্ভব রূপ লাভ করে। বাংলায় সেই তদ্ভব শব্দের সংখ্যা বিপুল। শুধু সংস্কৃত থেকেই নয়, বিদেশি শব্দও পরিবর্তিত হয়ে 'তদ্ভব রূপ' ধারণ করে। বাংলায় তেমন শব্দের সংখ্যা কম নয়। এখানে অসংস্কৃত অর্থাৎ অতৎসম শব্দের নিরুক্তি ও ব্যুৎপত্তি দেখানো হবে। সেইসঙ্গে এমন কিছু তৎসম শব্দও বিবেচিত হবে যেগুলির অর্থ বাংলায় এসে বদলে গেছে, অর্থাৎ যেগুলি বানানে তৎসম হলেও অর্থের দিক থেকে তদ্ভব।

৩৪.২ শব্দের উৎস ও ভাষাতাত্ত্বিক টীকা : নিরুক্তি ও ব্যুৎপত্তির ব্যাখ্যা

অন্ন—সংস্কৃতাগত তৎসম শব্দ, মূল অর্থ খাদ্য। কিন্তু বাংলায় অর্থসংকোচনের ফলে 'ভাত' অর্থে ব্যবহৃত।

অপরূপ—সং অপূর্ব > প্রাকৃ. অপুরুব (স্বরভক্তি) > অপরূপ। লোকনিরুক্তি।

অমিয়—সং অমৃত (ন + মৃত) > প্রাকৃ. অমিঅ > বাংলায় য়-শ্রুতির ফলে অমিয়।

আ

আইচ—সং. আদিত্য > প্রাকৃ. আইচ্চ (প্রাকৃতে শব্দান্তর্গত দ্ লুপ্ত, পরিণত চ-তে) > বাং. আইচ (সমব্যঞ্জন লোপ)।

আইবুড়ো—সং. অব্যূঢ় > প্রাকৃ. আইবুঢ়—আদ্য দলে প্রস্বরের ফলে অ > আ এবং অপিনিহিতির কারণে 'ই'-র আগম > আইবুঢ় > আইবুড়ো (অল্পপ্রাণীভূত)।

আঁকশি—সং. আকর্ষণী > প্রাকৃ. আকশ্শঙ্গী সমীভবন এবং নাসিক্যব্যঞ্জন লোপ > আকশ্শী (স্বরধ্বনিলোপ) > আঁকশি (স্বতোনাসিক্যীভবন)।

আঁখি—সং. অক্ষি > প্রাকৃ. অক্‌খি > বাং. আঁখি (আদ্য দলে প্রস্বরের ফলে অ > আ এবং স্বতোনাসিক্যীভবন।

আঁটি—সং. অস্থি > প্রাকৃ. অট্‌ঠিঅ > অপভ্রংশ অঠ্ঠিঅ (স্বতোমূর্ধন্যীভবন) > আঁঠি (যুগ্ম

ব্যঞ্জনের একটি লুপ্ত এবং ক্ষতিপূরণ স্বরূপ পূর্বস্বরের দীর্ঘতা—compensatory lengthening এবং স্বতোনাসিক্যীভবন)।

আঁতুর, আঁতুড়—সং. অন্তঃকুটির > প্রাকৃ. অন্তউড়ি > বাং. নাসিক্য ব্যঞ্জন লোপ এবং আদ্য দলে অনুনাসিকতা = আঁতুর, আঁতুড়।

আঁশ—সং. অংশু > প্রাকৃ. আঁশু (অ > আ) > আঁশ (পদান্তের উ লোপ)

আঁষ—সং. আমিষ > প্রা. বাং. আঁবিষ > বাং. আঁইষ > আঁষ (পদমধ্যবর্তী ই লোপ)

আংটি—সং. অঙ্গুষ্ঠিকা > প্রাকৃ. অঙ্গুট্‌ঠিআ > বাং. আঙটি, আংটি (অল্পপ্রাণীভবন)।

আখড়া—সং. অক্ষবাট > প্রাকৃ. অক্‌খআড (সমীভবনের ফলে ক্ষ > ক্‌খ, বা > আ, ঘোষীভবনের ফলে ট্ > ড্) > বাং. আখড়া (ক্ খ এর ক-লোপ, পূরকদীর্ঘীভবনে আদ্য স্বর অ > আ এবং পদান্তের ড হল ডা > ড়া।

আজ—সং. অদ্য > প্রাকৃ. অজ্জ (দ্য > জ্জ > জ্জ) বাং আজ (যুগ্মব্যঞ্জনের একটির লোপ এবং পূরকদীর্ঘীভবনে (অ > আ)

আট—সং. অষ্ট > প্রাকৃ. অট্‌ঠ > বাং. আট (যুগ্ম-ব্যঞ্জনের একটির লোপ এবং পূরকদীর্ঘীভবনে অ > আ)

আঠারো—সং. অষ্টাদশ > প্রাকৃ. অট্‌ঠারস > অপভ্রংশ অট্‌ঠারহ যুগ্মব্যঞ্জনের একটির লোপে অঠরহ > বাং. আঠারো (আদ্য দলে হ্রস্বস্বরের দীর্ঘীভবন এবং অন্ত্য হ > ও)

আড়াই—সং. অর্ধতৃতীয় > প্রাকৃ. অড্‌ঢইঅ > পালি অড্‌ঢতিয় > বাং. আড়াই (যুগ্মব্যঞ্জনের একটির লোপ, পূর্বস্বরের দীর্ঘীভবন, সমীভবন)।

আদিখ্যেতা—সং. আধিক্য > আধিক্যতা (ভ্রামাত্মক -তা যোগ) > আদিখ্যেতা (মহাপ্রাণ ধ > অল্পপ্রাণ দ এবং ক > খ) > স্বরসংগতির ফলে আদিখ্যেতা

আনারস—পোর্তুগিজ আনানস্ > লোকনিরুক্তির ফলে আনারস (নস্ > রস)

আপন, আপনি —সং. আত্মন্ > আত্মা > প্রাকৃ. আৎপা > অপ. আপ্পা > আপন (ষষ্ঠী বিভক্তির -নাম্ এর ন) > আপনি ('তিনি'-র সাদৃশ্যে 'ই'-র আগম)।

আবছা—সং অভ্রচ্ছায়া > প্রাকৃ. অব্‌ভচ্ছায়া (ভ্‌ব > ভ্র-সমীভবন) > আবছা (চ্ছ > ছ + আ সমব্যঞ্জনের একটির লোপ, অন্ত্য য় লোপ এবং পূরক দীর্ঘীভবনে ছ > ছা)

আমড়া—সং. আম্রাতক > প্রাকৃ. অম্বাডঅ (ম্র > ম্ব, আ > অ, ত > ড মূর্ধন্যীভবন, স্বরমধ্যবর্তী ক লুপ্ত) > আমড়া (আদ্য অ > আ, অন্ত্য ডঅ > ডা > ড়া)

আমি—সং. অস্মাভিঃ > প্রাকৃ. অম্‌হাহি > প্রা. বাং. আহ্মি > আমি।

আরশি—সং. আদর্শিকা > প্রাকৃ. আঅরসিয়া > বাং. আরশি (আ লোপ, অন্ত্য য়া লোপ)

আলতা—সং. অলক্তক > প্রাকৃ. অলত্তঅ (ক্ত > ত্ত সমীভবনে, স্বরমধ্যস্থ একক অল্পপ্রাণ ক্ লোপ) > আলতা (যুগ্মব্যঞ্জনের একটির লোপ এবং পূরক দীর্ঘীভবনে অ > আ এবং পদান্তের অঅ > আ)

আলমারি—পোর্তুগিজ আর্মারিও (armario) > আলমারি (বিষমীভবন, বা লোকনিরুক্তি)
আশি—সং. অশীতি > প্রাকৃ. অসীই (স্বরমধ্যবর্তী একক অল্পপ্রাণ তি > ই, ত্ লোপের ফলে)> অসি (পদান্তের উদ্বৃত্ত স্বর 'ই' লুপ্ত) > আশি (পূর্ব স্বরের দীর্ঘীভবনে)

ই

ইট, ইঁট—সং. ইষ্টক > প্রাকৃ. ইট্‌ঠঅ (পদান্তিক ব্যঞ্জন স্বরধ্বনিতে পরিবর্তিত ক > অ) > ইটঅ (যুগ্মব্যঞ্জনের একটির লোপ) > বাং. ইট (পদান্তিক উদ্বৃত্ত অ লোপ), ইঁট (স্বতোনাসিক্যীভবন)।

ইঁদারা—সং. ইন্দ্রাগার > প্রাকৃ. ইন্দাআর (ত্রিব্যঞ্জনের একটি লুপ্ত এবং অল্পপ্রাণ 'গ' লুপ্ত) > ইঁদাআর (নাসিক্য ব্যঞ্জনের বদলে পূর্বস্বরের অনুনাসিকতা) > ইঁদারা (ধ্বনিবিপর্যয়)।

ইস্কাপন—কৃতঋণ শব্দ। ওল. স্কোপেন (schopen) > ইস্কোপেন (আদিস্বরাগম) > ইস্কাপন (ধ্বনিবিপর্যয়)

ইস্কুল—কৃতঋণ শব্দ। ইং. school > স্কুল, কখনো কখনো কথ্য ভাষায় ইস্কুল (আদি স্বরাগম)

উ

উই—সং. উপদীকা > প্রাকৃ উবঈআ (প > ব, দ্ লোপ, ক্ লোপ) > উই (স্বরমধ্যবর্তী ব লোপ, ঈ > ই, পদান্তিক আ লোপ)

উজবুক—তুর্কি উজবেগ > উজবুক (স্বরসংগতি) (একসময় উজবেকিস্তানে সৈনিকদের দেহ সুগঠিত হলেও বুদ্ধিতে তারা ছিল হীন। তা থেকেই বাংলায় 'বোকা' বা 'গবেট' অর্থে প্রযুক্ত)।

উনিশ—সং. ঊনবিংশতি > প্রাকৃ. ঊনবীস (স্বরের দীর্ঘীভবনে বি > বী, অনুস্বার লোপ, শ > স পদান্তিক ত লোপ) > উনিশ (আদ্যস্বরের হ্রস্বতা ঊ > উ, ব্ লোপ, স > শ)।

উনুন—সং. উষ্ণাপন > প্রাকৃ. উন্‌হাবণ (ষ্ণ > ন্‌হ্, প > ব, ধ্বনিবিপর্যয়ে ন এসেছে আগে) > অপ. উনহাঅন (ব্ লোপ) > উনান (হ্ লোপ, অ লোপ) > উনুন (স্বরসংগতি)।

উপোস— সং. উপবাস > প্রাকৃ. উপআস (ব্ লোপ) > উপাস > উপোস (স্বরসংগতি)।

উবু—সং. ঊর্ধ্ব > প্রাকৃ. উব্‌ভ (র্ধ্ব > ব্‌ভ সমীভবন), আদ্যস্বরের হ্রস্বতা ঊ > উ) > প্রা. বাং. উভ (মধ্যবর্তী ব্ লোপ) > উব (অল্পপ্রাণীভবনে ভ > ব) > উবু (স্বরসংগতি)।

এ

এগারো—সং. একাদশ > প্রাকৃ. এগ্‌গারহ (ঘোষীভবন) > প্রা. বাং. এগারহ (যুগ্মব্যঞ্জনের একটি লোপ) > এগার (পদান্তিক 'হ' লোপ)।

এয়ো—সং. অবিধবা > প্রাকৃ. অইহআ (ব্ লোপ, ধ > হ, পদান্তিক ব্ লোপ) > আইহ (আদিস্বরের দীর্ঘীভবন, পদান্তিক স্বরলোপ) > আইও (হ্ ধ্বনির লোপ, পদান্তিক অ > ও) > এয়ো (স্বরসংগতি)

এলো—সং. আকুলায়িত > প্রাকৃ. আউলাইঅ (ক্ লোপ, ত্ লোপ, য়ি > ই) > আউল (আ, ই, অ লোপ) > এলো স্বরসংগতি আ > এ, উল > লো)।

ও

ওঝা—সং. উপাধ্যায় > প্রাকৃ. উপাজ্ঝাঅ (ধ্য > জ্ঝ, য় > অ) > অপ. উঅজ্ঝঅ (প্ লোপ, আ > অ, ঝা > ঝ) > বাং. ওঝা (উঅ > ও, জ্ লোপ, পদান্তিক অ > আ)। আঞ্চলিক ভাষায় কখনো-কখনো—রোজা।

ওয়ারিশ—কৃতঋণ শব্দ আরবি বারিস > ওয়ারিস (য়-শ্রুতি) > ওয়ারিশ(পদান্তিক স > শ)

ক

কই (কোথায়)—সং. কস্মিন্ > প্রাকৃ. কহিং (স্ম > হ্, ন্ > ং) > বাং. কই (হ্ লোপ, পদান্তিক অনুস্বার লোপ)।

কনুই—সং. কফোণিকা > প্রাকৃ. কহোণিআ (ফ > হ, পদান্তিক ক্ লোপ) > অপ. কণই (হ্ লোপ, ণি > ণ, ই ধ্বনির বিপর্যয়) > কনুই (স্বরসংগতি)।

কনে—সং. কন্যা > কইন্যা (অপিনিহিতি) > কইন্যে (স্বরসংগতি) > কনে।

করাত—সং. করপত্র > প্রাকৃ. করপাত (ত্র > ত, যুক্তব্যঞ্জনের একক ব্যঞ্জনে পরিণতি, একক ব্যঞ্জনের পূরক দীর্ঘীভবন প > পা) > অপ. করআত (প্ লোপ) > করাত।

কলম—কৃতঋণ শব্দ আরবি কল্‌ম্ > কলম (মধ্য স্বরাগম)

কলা—সং. কদলক > প্রাকৃ. কঅলঅ (মধ্যবর্তী দ্ লোপ, পদান্তিক ক > অ) > কলা (পদান্তিক স্বরের বৃদ্ধি)

কহতব্য—সংকর শব্দ। বাং. কহ্ ধাতু + সং. তব্য প্রত্যয়।

কাঁকড়া—সং. কর্কট > প্রাকৃ. কক্কড (র্ক > ক্ক, পদান্তিক ট-এর ঘোষীভবনে ট > ড) > কাকড়া (ক্ক > ক, আদিস্বরের দীর্ঘীভবন, পদান্তিক ড > ড়, স্বরের বৃদ্ধি) > কাঁকড়া (স্বতো নাসিক্যীভবন।

কাছারি—সং. কৃত্যগৃহ > প্রাকৃ. কচ্ছহরিঅ (কৃ > ক, ত্য > চ্ছ, গৃহ > রিহ > রিঅ ধ্বনিবিপর্যয়) > কাছারি।

কানু—সং. কৃষ্ণ > প্রাকৃ. কণ্হ (ষ্ণ > হ্ণ > ণ্হ, আদ্য ঋকার লোপ) > প্রা.বাং. কাহ্ন (ক > কা, ণ > ন) > মধ্য বাং. কান (হ্ লোপ) > আ. বাং. কানু (পদান্তিক অ > উ)। কখনো-কখনো কান + আই = কানাই।

কাঁটা—সং. কণ্টক > প্রাকৃ. কণ্টঅ (ক্ লোপ) > বাং. কাঁটা (নাসিক্য ব্যঞ্জন ণ লোপ পেয়ে অনুনাসিকতায় পরিণত, আদ্য স্বরের দীর্ঘীভবনে, ক > কা, পদান্তিক স্বরের দীর্ঘীভবনে অ > আ।

কামার—সং. কর্মকার > প্রাকৃ. কম্মআর (র্ম > ম্ম, মধ্যবর্তী ব্যঞ্জন ক্ লোপ) > কামার (যুগ্মব্যঞ্জনের একটি লোপ এবং পরিপূরক দীর্ঘীভবনে আদ্য ক > কা।

কাহন—সং. কার্ষাপণ > প্রাকৃ. কাহাবন (র্ষ > হ, র্ লোপ, প > ব) > কাহন (ব্‌লোপ, আ-ধ্বনির লোপ)

কাহিনি—সং. কথনিকা > প্রাকৃ. কহণিআ (থ > হ, ন > ণ মূর্ধন্যীভবন, পদান্তিক ক্ লোপ) > অপ. কহানি (হ > হা, ণ > ন, পদান্তিক আ লোপ) > বাং. কাহিনি (আদ্য ক > কা, হা > হি)

কুঁজো—সং. কুব্জ > প্রাকৃ. কুজ্জ (সমীভবনে ব্জ > জ্জ) > কুঁজ (পদমধ্যবর্তী যুক্তব্যঞ্জনের একটি জ্ লোপ, স্বতোনাসিক্যীভবন) > কুঁজো (স্বরসংগতি)।

কুঁড়ে—সং. কুটির > প্রাকৃ কুডিআ (ট > ড ; র্ লোপ এবং অ > আ) > প্রা. বাং. কুড়িআ (ড > ড়) > কুঁড়িয়া (স্বতোনাসিক্যীভবন) > কুঁড়ে (স্বরসংগতি)।

কুমোর—সং. কুম্ভকার > প্রাকৃ. কুম্ভআর (ক্ লোপ) > কুমার (ভ্ লোপ) > কুমোর (স্বরসংগতি)

কুলুপ—কৃতঋণ শব্দ। আরবি কুফ্‌ল্ > কুল্‌প্ (ধ্বনিবিপর্যয়) > কুলুপ (স্বরসংগতি, ফ> প।

কেওড়া—সং. কেতকট > প্রাকৃ. কেদগত > অপ. কেঅঅড (প্রাকৃতে এসে মধ্যবর্তী ত > দ ঘোষীভবন এবং মূর্ধন্য ধ্বনি ট > ত দন্ত্য ধ্বনিতে পরিণত ; অপভ্রংশে দ্ গ্ লুপ্ত, পদান্তে ত > ড মূর্ধন্যীভবন) > বাং. কেওড়া।

কেঁচো—সং. কিঞ্চুলিকা > প্রাকৃ. কিঞ্চহি (মধ্যবর্তী 'উ' ধ্বনির লোপ, 'ল' লোপ, পদান্তিক 'ক' লোপ এবং 'হ' ধ্বনির আগম > কেঁচো (ঞ্চ -এর ঞ লুপ্ত এবং আদ্য ধ্বনির অনুনাসিকতা, কিঁ > কেঁ স্বরসংগতির ফল)।

কেয়া—সং. কেতক > প্রাকৃ. কেদগ (অঘোষ ত > ঘোষ দ, পদান্তে অঘোষ ক > ঘোষ গ) > অপ. কেঅঅ (দুই ব্যঞ্জন দ্, গ্ লুপ্ত) > কেয়া (স্বরসংগতি এবং য়-শ্রুতি)

কোটাল—সং. কোষ্টপাল > প্রাকৃ. কোট্টপাল, কোট্টআল > কোটআল (ষ্ট > ট্ট এবং প্ লোপ) > কোটাল।

খ

খই—সং. খদিকা > প্রাকৃ. খইআ (দ্ লোপ) > বাং. খই (অন্ত্য স্বর লোপ)।

খন্তা—সং. খনিত্র > প্রাকৃ. খনিত্থ (মূধ্যন্য-ণ > ন এবং ত্র > ত্থ) > খন্তা (ই ধ্বনি লুপ্ত, যুক্তব্যঞ্জনে ত্থ বা থ > তা)।

খাঁড়া—সং. খণ্ড > প্রাকৃ. খড্ড (ণ্ ধ্বনির লোপ এবং সমীভবনে ড্ড) > খাঁড়া (আদ্যস্বরের দীর্ঘীভবন ও পূরক নাসিক্যীভবন, পদান্তে ড > ড় এবং পদান্তিক স্বরের দীর্ঘীভবন। তদ্ভব শব্দ।

খাজা—সং. খাদ্য > প্রাকৃ. খজ্জ (সমীভবনে দ্য > জ্জ এবং আদ্য স্বরের হ্রস্বীভবন খা > খ) > খাজা (সমীভবনে একটি ব্যঞ্জন লুপ্ত, পদান্তে স্বরের দীর্ঘীভবন)।

খামার—সং. স্কম্ভাগার > প্রাকৃ. খম্ভাআর (আদি যুক্তব্যঞ্জন সরলীভূত স্ক > খ, শ্বাসাঘাতের

জন্য অল্পপ্রাণ ক > মহাপ্রাণ খ ; মধ্যব্যঞ্জন গ্ > অ) > খামার (আদ্য স্বরের দীর্ঘীভবন, মধ্যবর্তী যুক্ত ব্যঞ্জনের সরলতা স্তু > ম্)

খাল—তামিল কাল্ > সং. খল্ল > প্রাকৃ. খল্ল (সমীভূত) > খাল (পদান্তিক যুক্তব্যঞ্জনের একক ব্যঞ্জনে পরিণতি এবং আদ্যস্বরের পরিপূরক দীর্ঘীভবন।

খুদ—সং. ক্ষুদ্র > প্রাকৃ. খুদ্দ (ক্ষ > খ ; দ্র > দ্দ সমীভূত) > খুদ (পদান্তে যুক্তব্যঞ্জন একক ব্যঞ্জনে পরিণত)।

খুড়া—সং. ক্ষুদ্রতাত > প্রাকৃ. খুড্ডআঅ (ক্ষ > খ ; দন্ত্য ধ্বনির মূর্ধন্যীভবনে দ > ড এবং যুক্তব্যঞ্জন দ্র > ড্ড—সমীভবন) > অপ. খুড়আ (ড্ > ড়), পদান্তিক অ লুপ্ত) > খুড়া।

খেয়া—সং. ক্ষেপ > প্রাকৃ. খেঅ (ক্ষে > খ ; প্ লোপ) > খেয়া (পদান্তিক অ > য়া, য়-শ্রুতি এবং দীর্ঘীভবন)।

গ

গয়লা—সং. গোপালক > প্রাকৃ. গোআলঅ (প্ লোপ, পদান্তিক ক্ লোপ) > গোয়ালা (য়-শ্রুতি, পদান্তিক স্বরের দীর্ঘীভবন) > গয়লা (গো > গ)

গা—সং গাত্র > পালি গত্ত (গা > গ, ত্র > ত্ত) > অপ. গাত (অন্ত্য ত্ত > ত, পূর্ব স্বরের দীর্ঘীভবন) > প্রা. বাং. গাঅ > গা

গাঁ—সং গ্রাম > প্রাকৃ. গাম (আদ্য র্ লোপ) > গাঁ ('ম' লোপ এবং পূর্বস্বরের নাসিক্যীভবন)

গাঁট, গাঁইট—সং. গ্রন্থি > প্রাকৃ. গণ্ঠি, গাণ্ঠি (মূর্ধন্যীভবন) > গাঁট, গাঁইট (ণ লুপ্ত পূরক অনুনাসিকতা এবং আদ্য স্বরের দীর্ঘীভবন)

গাঙ, গাং—সং. গঙ্গা > প্রাকৃ. গঙ্ঙা (ঙ্গ > ঙ্ঙ) > গাঙ (সমীভূত দুটি ব্যঞ্জনের একটির লোপ, পূর্ববর্তী স্বরের দীর্ঘীভবন)। 'গঙ্গা' নদীবিশেষের নাম। কিন্তু 'গাঙ' বলতে যেকোনো নদীই বোঝায়।

গাজন—সং. গর্জন > প্রাকৃ. গজ্জণ (র্ লুপ্ত, সমীভবনে জ্জ এবং মূর্ধন্যীভবন) > গাজন (যুক্ত ব্যঞ্জনের একটির লোপ এবং পূর্বস্বরের দীর্ঘীভবন)।

গাধা—সং. গর্দভ > প্রাকৃ. গদ্দহ (র্দ সমীভবনে দ্দ, পদান্তিক মহাপ্রাণ ভ > হ) > অপ. গাদহ (দ্দ > দ, পূর্ব স্বরের দীর্ঘীভবন) > গাধা (দহ > ধ, পদান্তিক স্বরের দীর্ঘীভবন)।

গামছা—গা + মোছা। গা-মো-ছা এই তিনটি অক্ষর বা দল উচ্চারণের সুবিধার্থে হল গাম্‌ছা (দ্বিমাত্রিকতা বা দ্বিতীয় স্বরলোপ)।

গারদ—আগন্তুক শব্দ, ইং guard থেকে। গার্ড > গারদ (মধ্য স্বরাগম, পদান্তিক ড > দ)।

গাল—সং. গণ্ড > প্রাকৃ. গল্ল > গাল (যুক্তব্যঞ্জনের একটির লোপ, পূর্বস্বরের পূরক দীর্ঘীভবন)।

গিন্নি—সং. গৃহিণী > প্রাকৃ. গির্‌হিনী > অপ. গিরনী (গৃ > গির্) > গিন্নি (সমীভবনে ন্ন)।

গুঁই—সং. গোমিক > প্রাকৃ. গোমিঅ > অপ. গোঁইঅ > গুঁই (নাসিক্য ব্যঞ্জন ম্ এর পরিবর্তে স্বরের অনুনাসিকতা ; পদান্তিক ক্ লুপ্ত, স্বরসংগতিতে গোঁ > গুঁ)।

গুয়া—সং. গুবাক < প্রাকৃ. গুআঅ (মধ্যবর্তী ব্যঞ্জন ব্ ও পদান্তিক ব্যঞ্জন ক্ লুপ্ত) > গুয়া (পদান্তিক স্বর লুপ্ত, য়-শ্রুতিতে আ > য়া)।

গোসাঁই—সং. গোস্বামী > প্রাকৃ. গোস্সামী, গোস্সামি (সমীভবনে স্ব > স্স) > গোসাঁই (মধ্যবর্তী যুক্তব্যঞ্জনের একক ব্যঞ্জনে পরিণতি) স্স > স (পদান্তিক নাসিক্য ব্যঞ্জন পরিবর্তিত স্বরের অনুনাসিকতায়)।

গোরু—সং. গোরূপ > প্রাকৃ. গোরূঅ (পদান্তিক ব্যঞ্জন প্ লুপ্ত) > গোরু (পদান্তের উদ্বৃত্ত স্বরধ্বনির লোপ)।

গোয়াল—সং. গোশালিকা > প্রাকৃ. গোহালিআ (শ্ > হ্, পদান্তিক ব্যঞ্জন ক্ লুপ্ত) > গোহালি (উদ্বৃত্ত স্বর লুপ্ত) > গোয়াল (য-শ্রুতি হা > য়া) > গোয়াল (পদান্তিক স্বর লুপ্ত)

ঘ

ঘড়া—সং. গ্রথক > প্রাকৃ. ঘটঅ (গ্র > ঘ, পদান্তিক ক্ লুপ্ত) > ঘড়া (ট > ড়, উদ্বৃত্ত স্বর লুপ্ত)

ঘড়ি—সং. ঘটিকা > ঘড়ি (ট্ > ড়, পদান্তিক কা লুপ্ত) অর্থসংক্রম ঘটেছে।

ঘর—সংগৃহ > প্রাকৃ. গর্হ/গর্হ (?) > ঘর (অন্ত্য হ্ লুপ্ত, আদ্য অল্পপ্রাণ গ মহাপ্রাণতা লাভ করে ঘ হয়েছে)।

ঘরণি—সং. গৃহিণী > ঘরিনি (ঋ > অর) > ঘরনি (মধ্যবর্তী স্বরধ্বনির লোপ)।

ঘা—সং. ঘাত > প্রাকৃ.ঘাঅ (পদান্তিক ত্ লুপ্ত) > ঘা (পদান্তিক উদ্বৃত্ত স্বর লুপ্ত)।

ঘাম—সং. ঘর্ম > প্রাকৃ ঘম্ম (র্ম > ম্ম) > ঘাম (পদান্তের যুক্তব্যঞ্জন একক ব্যঞ্জনে পরিণত এবং আদ্য স্বরের দীর্ঘীভবন ঘ > ঘা)।

ঘি—সং. ঘৃত > প্রাকৃ. ঘিঅ (ঘৃ > ঘিঅ পদান্তিক ত্ লুপ্ত) > ঘি (পদান্তিক 'অ' লুপ্ত)।

ঘুঁটে—সং. গোবিষ্ঠা > প্রাকৃ. গোইট্‌ঠা (বিঁ > ই, ষ্ঠ > ট্‌ঠ) > (আদ্য অল্পপ্রাণ গ্ মহাপ্রাণ ঘ্-তে পরিণত, স্বতোনাসিক্যীভবন, স্বরসংগতি)।

ঘোড়া—সং. ঘোটক > প্রাকৃ. ঘোডঅ (ট > ড, ক্ লুপ্ত) > ঘোড়া (ড > ড়, পদান্তে স্বরের দীর্ঘীভবন অ > আ)।

ঘোল—সং. ঘূর্ণ > প্রাকৃ. ঘুল্ল (র্ণ > ন্ন > ল্ল) > ঘোল (সমীভবন ঘু > ঘো, ল্ল > ল)।

চ

চল্লিশ—সং. চত্তারিংশ > প্রাকৃ. চত্তারীস (ত্ব > ত্ত, অনুস্বার লোপ, শ > স) > অর্ধমাগধী চয়লীশ > অপ. চালীশ > বাং. **চল্লিশ** (য় লুপ্ত, আদ্য চয়া > চা > চ, একক ব্যঞ্জন ল > যুক্তব্যঞ্জন ল্ল)।

চশমা—কৃতঋণ শব্দ। আরবি চশ্‌মহ্ > চশমা (পদান্তের হ্ লুপ্ত, আ ধ্বনির আগম)।

চাঁদ—সং. চন্দ্র > প্রাকৃ. চন্দ (র্ লুপ্ত ন্দ্র > ন্দ) চাঁদ (নাসিক্য ব্যঞ্জনের লোপ, পূর্ববর্তী স্বরের অনুনাসিকতা ও দীর্ঘীভবন)।

চাক, চাকা—সং. চক্র > প্রাকৃ. চক্ক (সমীভবন) > চাক (ক্ক > ক, আদ্য স্বরের দীর্ঘীভবন চ > চা) চাকা (অন্ত্যস্বরাগম)

চার—সং. চত্বারি > প্রাকৃ. চত্তারি (ত্ব > ত্ত সমীভবন) > অপ. চারি (মধ্যবর্তী যুক্তব্যঞ্জনের লোপ এবং আদ্য স্বরের দীর্ঘীভবন)—চ > চা) > চার (অন্ত্য ই লুপ্ত)।

চালুনি—সং. চালুনিকা > প্রাকৃ. চালণিআ, (পদান্তের ক্ লুপ্ত , উ লুপ্ত) > চালনি > চালুনি (পদান্তিক আ লুপ্ত, স্বরসংগতিতে ল > লু)।

চিড়ে, চিঁড়ে—সং. চিপিটক > প্রাকৃ. চিইড়অ (পি > ই, ট > ড় , ক > অ) > চিড়া (উদ্বৃত্ত অ লুপ্ত, ড় > ড়া) > চিড়ে (স্বরসংগতি)। স্বতোনাসিক্যীভবন—চিড়ে > চিঁড়ে।

চিৎপটাং—সং. চিত্রপটাঙ্গ > অর্ধতৎসম চিৎপটাং (ত্র > ৎ, ঙ্গ > ং)।

চৌকি—সং. চতুষ্কী > প্রা. চতুহ্‌কী (ষ্ > হ্) > চউকি (পদমধ্যস্থ ব্যঞ্জন ত্ লুপ্ত, হ্ লুপ্ত) > চৌকি (চউ > চৌ)।

চৌকো—সং. চতুষ্ক > প্রাকৃ. চতুহ্‌ক (ষ্ > হ্) > চউক > চৌক > চৌকা (অন্ত্যস্বরাগম) > চৌকো (স্বরসংগতি)।

চৌঠা—সং. চতুর্থ > প্রাকৃ. চউট্‌ঠ (ত্ লুপ্ত ; র্থ > ট্‌ঠ) > চউঠা (মধ্যবর্তী ট্ লুপ্ত, অন্ত্যস্বরাগম ঠ > ঠা) > চৌঠা।

চৌদ্দ—সং. চতুর্দশ > প্রাকৃ চউদ্দহ (মধ্যবর্তী ত্ লুপ্ত ; র্দ > দ্দ, সমীভবন, শ > হ) চউদ্দ > চৌদ্দ (পদান্তিক হ লুপ্ত)।

ছ

ছত্রিশ—সং. ষট্‌ত্রিংশ (ৎ) > প্রাকৃ. ছত্তীশ (ষট্ > ছ, ত্র > ত্ত সমীভবন) > ছত্রিশ (ত্ত > ত্র)।

ছয়—সং. ষট্ > প্রাকৃ. ছঅ > অপ. ছহ > বাং. ছয় (হ্-লোপ, য়-শ্রুতি)।

ছা—সং. শাবক > প্রাকৃ. ছাঅ, ছাঅঅ (ব্ লোপ, ক্ লোপ) > ছা (পদান্তিক উদ্বৃত্ত অ, অ লুপ্ত)।

ছাউনি—সং. ছাদনিকা > প্রাকৃ. ছাঅনিআ (দ্ লুপ্ত, ক্ লুপ্ত) > অপ. ছাঅনি (পদান্তের আ লুপ্ত) > ছাউনি (স্বরসংগতি)।

ছাতিম—সং. সপ্তপর্ণ > সত্তপন্ন (প্ত > ত্ত সমীভবন, র্ণ > ন্ন) > অপ. ছত্তঅন্ন (স > ছ, প্ লোপ) > ছাতিম (ত্ত > ত, আদ্য স্বরের দীর্ঘীভবন—ছ > ছা, ন্ন > ন > ম)।

ছাতু—সং. শক্তু > প্রা. ছত্তু (শ > ছ, ক্ত > ত্ত) > ছাতু (ত্তু > তু, আদ্য স্বরের দীর্ঘীভবন ছ > ছা)।

ছানা—সং. ছন্ন > প্রাকৃ. ছন্ন > ছানা (ন্ন > ন, আদ্যস্বরের দীর্ঘীভবন—ছ > ছা, অন্ত্য স্বরের দীর্ঘীভবন)।

ছুতার—সং. সূত্রধর > প্রাকৃ. সুত্তহর (ত্র > ত্ত সমীভবন, ধ > হ) > অপ. ছুত্তঅর (স্ > ছ্, হ > অ) > ছুতার (ত্ত > ত, অ > আ)। স্বরসংগতিতে—ছুতোর।

ছুরি—সং. ক্ষুরিকা > প্রাকৃ. খুরিআ > অপ. ছুরিআ (ক্ষ > খ > ছ, ক্ লোপ) > ছুরি (পদান্তিক 'আ' লুপ্ত)।

ছেনি—সং. ছেদনিকা > প্রাকৃ. ছেঅনিআ (দ্ লোপ, ক্ লোপ) > অপ. ছেঅনিঅ > ছেনি ('অ' লোপ, পদান্তিক 'অ' লোপ)।

জ

জহর—সং. জতুগৃহ > প্রাকৃ-জউহর (ত্ লোপ, গৃহ > হর) > জহর (পদমধ্যবর্তী 'উ' লোপ)। বাংলায় অর্থসংক্রম ঘটেছে। মূল অর্থ ছিল জতু বা গালানির্মিত ঘর।

জাউ—সং. যবাগূ > প্রাকৃ. জআউ (ব্ লুপ্ত, গ্ লুপ্ত) > জাউ (আদ্য স্বরের দীর্ঘীভবন)

জাঁতা—সং. যন্ত্র > প্রাকৃ. জংত, জন্ত (ন্ত্র > ন্ত) > জাঁতা (নাসিক্য ব্যঞ্জন লুপ্ত এবং পূর্ববর্তী স্বরের অনুনাসিকতা ও দীর্ঘীভবন, অন্ত্যস্বরের দীর্ঘীভবন)।

জাঁদরেল—ইং. general > জাঁদরেল (ন্ লোপ ও স্বরের নাসিক্যীভবন, স্বরসংগতি, দ্ ধ্বনির আগম)।

জুঁই—সং যূথিকা > প্রাকৃ. জুহিআ (য্ > জ্, থ্ > হ, ক্ লোপ) > জুঁই (স্বতোনাসিক্যীভবন, হি > ই, অন্ত্য 'অ' লুপ্ত)।

জুয়া—সং. দ্যূতক > জুঅ (দ্ > জ্ তালব্যীভবন, য-ফলা লোপ, ত্ লোপ, ক্ লোপ) > জুআ (অঅ > আ) > জুয়া (য়-শ্রুতি)।

জেঠা—সং. জ্যেষ্ঠতাত > প্রাকৃ. জেট্‌ঠতাত (ষ্ঠ > ট্ঠ, য-ফলার লোপ) > অপ. জেট্‌ঠআঅ (ত্, ত লোপ) জেঠা (ট্ঠ > ঠ্, শেষ 'অ' লুপ্ত)।

ঝ

ঝড়—সং.ঝটিকা > প্রাকৃ. ঝডিআ (ট > ড, ক্ লুপ্ত) > ঝড় (ড > ড়, পদমধ্যবর্তী 'ই' লুপ্ত, পদান্তিক 'আ' লুপ্ত)।

ঝাঁঝ—সং. ঝঞ্ঝা > প্রাকৃ. ঝঞ্‌ঝা > ঝাঁঝ (নাসিক্য ব্যঞ্জন ঞ লুপ্ত এবং পূর্ববর্তী স্বরধ্বনির অনুনাসিকতা এবং পরিপূরক দীর্ঘীভবন ঝঁ > ঝাঁ, পদান্তিক 'আ' লুপ্ত)।

ঝামা—সং. ক্ষাম > প্রাকৃ. ঝাম (তালব্যীভবনে) > ঝামা (পদান্তে আ যুক্ত)।

ঝি—সং. দুহিতা > প্রাকৃ. ধীতা (দ্হ > ধ) > অপ. ঝিআ (ধ > ঝ, ত্ লুপ্ত) > ঝি (পদান্তিক 'আ' লুপ্ত)

ঝিঙে—অস্ট্রিক ভাষার শব্দ ঝিঙ্গা > ঝিঙা > ঝিঙে (স্বরসংগতি)

ঝুনো—সং. জূর্ণ > প্রাকৃ. জুণ্না (র্ণ > ণ্ন, সমীভবন এবং অন্ত্যস্বরাগম) > ঝুনা (জ > ঝ যুক্তব্যঞ্জনের একটির লোপ এবং মহাপ্রাণীভবন) > ঝুনো (স্বরসংগতি)।

ঝোপ—সং. ক্ষুম্প > প্রাকৃ. ঝুম্প (ক্ষ > ঝ) ঝোপ (যুক্তব্যঞ্জনের একটির লোপ, এবং স্বরসংগতির ফলে ঝু > ঝো)।

ট

টাকা—সং. টঙ্ক > প্রাকৃ. টক্ক (নাসিক্য ব্যঞ্জনের লোপ) > টাকা (যুগ্মব্যঞ্জনের একটির লোপ, আদ্য স্বরের পূরক দীর্ঘীভবন, পদান্তিক স্বরের দীর্ঘীভবন)।

টেরা, ট্যারা—সং. তির্যক্ > প্রাকৃ. তিরিঅ (র্য > রি, পদান্তিক ক্ লুপ্ত) > টেরা (ত > ট, পদান্তিক স্বরের দীর্ঘীভবন অ > আ) > ট্যারা (স্বরসংগতি)।

ঠ

ঠাঁই—সং. স্থানিক > প্রাকৃ. ঠানিঅ (স্থ > ঠ, পদান্তিক ব্যঞ্জন ক্ লুপ্ত) > ঠাঁই (নাসিক্য ব্যঞ্জন ন্ লুপ্ত, আদ্যস্বরে অনুনাসিকতা)।

ঠাকুর—সং. ঠক্কুর (তুলনীয়, তুর্কি. তিগির) > প্রাকৃ. অবিকৃত ঠক্কুর > ঠাকুর (যুগ্মব্যঞ্জনের একটি লুপ্ত, আদ্যস্বরের পূরক দীর্ঘীভবন)।

ঠিক—সং. স্থিতক > প্রাকৃ. ঠিঅক্ক (স্থ > ঠ), পদমধ্যস্থ ত্ লুপ্ত, পদান্তিক ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব) > ঠিক (মধ্যস্বরলোপ এবং পদান্তিক যুক্তব্যঞ্জন একক ব্যঞ্জনে পরিণত)।

ঠোঁট—সং তুণ্ড > প্রাকৃ. টুণ্ড (ত > ট) > ঠোঁট (ট > ঠ মহাপ্রাণীভবন, ণ্ড > ট, নাসিক্য ব্যঞ্জনের লোপ এবং পূর্ববর্তী স্বরের অনুনাসিকতা।

ড

ডাইনি—সং. ডাকিনী > প্রাকৃ. ডাইনী (পদমধ্যবর্তী ক্ লুপ্ত) > ডাইন, ডান (পাদান্তিক স্বর লুপ্ত)।

ডাঁশ—সং. দংশ > প্রাকৃ. ডংশ (দ > ড মূর্ধন্যীভবন) > ডাঁশ (নাসিক্য ব্যঞ্জনের লোপ, আদ্য স্বরের পূরক দীর্ঘীভবন ও অনুনাসিকতা)।

ডান্ডা—সং. দণ্ড > প্রাকৃ. ডংড (দ > ড মূর্ধন্যীভবন, ণ্ > ং) > ডাণ্ডা (আদ্যস্বরের দীর্ঘীভবন, অন্ত্যস্বরের দীর্ঘীভবন, অনুস্বার > ণ্) > ডান্ডা

ডান১—সং. দক্ষিণ > প্রাকৃ. ডাহিন (দ > ড মূর্ধ্যনীভবন, ক্ষ > হ) > ডান (পদমধ্যবর্তী হ লুপ্ত)।

ডান২—**ডাইনি** দ্র।

ডুমুর—সং. উদুম্বর > প্রাকৃ. ডুম্বর (আদ্য. 'উ' লুপ্ত, দ্ > ড্) > ডুমুর (যুক্তব্যঞ্জনের ম্ব-এর ব্ লুপ্ত, মধ্যস্বরাগম)।

ঢ

ঢাক—সং. ঢক্ক > প্রাকৃ. ঢক্ক > বাং. ঢাক (ক্ক > ক, পূর্ববর্তী স্বরের দীর্ঘীভবন)।

ঢিলা—সং. শৃথিল > শিথিল > প্রাকৃ. ঢিল্ল (শ্ লুপ্ত, থ্ > ঢ্, পদান্তিক ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব) > ঢিলা (পদান্তিক যুক্ত ব্যঞ্জনের একক ব্যঞ্জনের পরিণতি, অন্ত্যস্বরের দীর্ঘীভবন) > ঢিলে (স্বরসংগতি)।

ত

তকমা—কৃতঋণ শব্দ। আরবি তগ্‌মা > তকমা (অঘোষীভবন)।

তা—সং. তাপ > প্রাকৃ. তাব > তা (প্ > ব্ ঘোষীভবন, পদান্তিক ব লুপ্ত)।

তাঁত—সং. তন্তু > প্রাকৃ. তন্ত (পদাতিক উ লোপ) > তাঁত (নাসিক্য ব্যঞ্জনের লোপ এবং পূর্ববর্তী স্বরের অনুনাসিকতা ও দীর্ঘীভবন)।

তামা—সং. তাম্র > প্রাকৃ. > তম্ব (আদি স্বরধ্বনি হ্রস্বতাপ্রাপ্ত, ম্র > স্ব) > তামা (আদ্য স্বর দীর্ঘীভূত, র লুপ্ত, পদান্তিক স্বর দীর্ঘীভূত)।

তিসি—সং. অতসী > তিসি (আদি স্বরলোপ, স্বরসংগতি)।

তুমি—সং. যুষ্মাভিঃ > প্রাকৃ. তুম্হহি (য় > ত্, মধ্যস্বরলোপ, ষ্ম > ম্হ্, ড্ > হ্) > তুহ্মি > তুমি (অল্পপ্রাণীভবন)।

তুরুপ—কৃতঋণ শব্দ। ওলন্দাজ ত্রুপ (troef) > তুরুপ (মধ্যস্বরাগম)।

তুলট—সং. তূলপট্ট > প্রাকৃ. তুলঅট্ট (প্ > অ) > তুলট (উদ্বৃত্ত অ লুপ্ত ট্ট > ট)।

তুলি—সং. তুলিকা > প্রাকৃ. তুলিআ > তুলি (ক্ লুপ্ত, পদান্তিক আ লুপ্ত)।

তেরো—সং. ত্রয়োদশ > প্রাকৃ. তেরহ (ত্র > ত, দ-এর রকারীভবন, শ্ > হ্) > তেরঅ (অন্ত্য হ লুপ্ত) > তেরো।

তেরচা, তেরছা—সং. তির্যক > প্রাকৃ. তেরিচ্ছ (স্বরভক্তি—ই ধ্বনির আগম, য লুপ্ত ; ক > চ্ছ) > তেরছা (রি > র ; চ্ছ > ছ, অন্ত্যস্বর দীর্ঘীভূত)।

তৈল—সং. তৈল > প্রাকৃ. তেল্ল (তৈ > তে ; ল > ল্ল) > তেল (যুক্ত সমব্যঞ্জনের একক ব্যঞ্জনে পরিণতি)।

তেষট্টি—সং. ত্রিষষ্টি > প্রাকৃ. তিসট্ঠি (র-ফলার লোপ, মূর্ধন্য ধ্বনি দন্ত্যধ্বনিতে পরিণত, ষ্ট > ট্ঠ) তেষট্টি (তি > তে স্বরসংগতি ; মূর্ধন্যীভবন ; ট্ঠ > ট্ট)

থ

থই—(জলের তল)—সং. স্থাঘ > প্রাকৃ. থাহ (স্থ > থ ; ঘ > হ— মহাপ্রাণ ঘ পরিণত মহাপ্রাণ হ-তে) > প্রা. বাং. থাই (অন্ত্য স্বরের দীর্ঘীভবন) > থই (আ > অ)।

থর—সং. স্তর > প্রাকৃ. থর > বাং থর (স্ত > থ)।

থাম—সং. স্তম্ভ > প্রাকৃ. থম্ভ > থম্ম > থাম (স্ত > থ ; ম্ভ > ম্ম সমীভবন > ম (যুগ্ম সমব্যঞ্জনের একক ব্যঞ্জনে পরিণতি)।

থুপ—সং স্তূপ > প্রাকৃ. থুপ (স্ত > থ মহাপ্রাণীভবন) > থুপ।

দ

দই—সং. দধি > প্রাকৃ. দহি (মহাপ্রাণ ধ > হ্) > দই (হ্ লোপ)।

দঁক—সং. উদক > দক (আদিস্বর লোপ) > দঁক (স্বতোনাসিক্যীভবন)।

দখিন—সং. দক্ষিণ > প্রাকৃ. দক্খিন (ক্ষ > ক্খ) > দখিন (মধ্যবর্তী ক্ লোপ)।

দড়—সং. দৃঢ় > প্রাকৃ. দঢ় (ঋকার লোপ) > দড় (ঢ় > ড. অল্পপ্রাণীভবন)।

দম্বল—সং. দধি + অম্ল > দধ্যম্ল > দহিঅম্বল (ধ > হ ; ম্ল > ম্বল) > দম্বল (হি-লোপ, মধ্যস্বরলোপ)।

দাই—সং ধাত্রী > প্রাকৃ. ধাঈ > ধাই (ত্র লোপ) > দাই (অল্পপ্রাণীভবন)।

দাঁত—সং. দন্ত > প্রাকৃ. দংত (নাসিক্য ব্যঞ্জন ন্ > ং) > দাঁত (পূর্বস্বরের অনুনাসিকতা ও দীর্ঘীভবন)।

দাম—আগন্তুক শব্দ। গ্রিক দ্রাখ্‌মে (মুদ্রাবিশেষ) > সং দ্রম্য (দ্র > দ ; আকার লোপ, ম > ম্য > প্রাকৃ. দ্রম্ম (ম্য > ম্ম সমীভবন) > দাম (দ্র > দ, আদ্যস্বরের দীর্ঘীভবন ; ম্ম > একক ব্যঞ্জন ম)।

দিঘি—সং. দীর্ঘিকা > প্রাকৃ. দিগ্‌ঘিআ (র্ঘ > গ্ঘ, অন্ত্য ক্ লোপ) > দিঘি (মধ্যবর্তী গ্ লোপ, পদান্তিক আ লোপ)।

দুই—সং. দ্বি > দ্বে > প্রাকৃ. দুবি > দুবে (ব্ এর বিপর্যাস) > দুই (পদ মধ্যস্থ ব্ লোপ)

দেউটি—সং. দীপবর্তিকা > প্রাকৃ. দিঅবট্টিআ (প্ লোপ ; র্ত > ট্ট মূর্ধন্যীভবন ; পদান্তিক ক্ লোপ) > অপ. দিঅবট্টিঅ (পদান্তিক আ > অ) > দেউটি (সমীভবনে দি > দে ; অব > উ ; ট্ট > ট ; পদান্তিক অ লুপ্ত)।

দেউল—সং. দেবকুল > প্রাকৃ. দেঅউল (ব্ লুপ্ত) > দেউল (মধ্যস্বর লোপ)।

দেড়—সং. দ্বি-অর্ধ > প্রাকৃ. দিঅড্‌ঢ (দ্ব > দ ; র্ধ > ড্ঢ মূর্ধন্যীভবন) > দেড় (সমীভবনে দি > দে ; ড্ঢ > ড়)।

দেয়াসি—সং. দেবদাসী > প্রাকৃ. দেঅআসী (ব্, দ্ লোপ) > দেয়াসি (য়-শ্রুতি)।

দেশলাই—সং. দীপশলাকা > প্রাকৃ. দিঅসলাআ (প্, ক্ লোপ) > দিয়াসলাআ (য়-শ্রুতি); স্বরের দীর্ঘীভবন) > দিয়াশলাই (দন্তমূলীয় স্ > তালব্য শ্ তালব্যীভবন ; অন্ত্য আ > ই) > দেশলাই (স্বরসংগতিতে দি > দে ; মধ্যবর্তী য় লোপ)।

ধ

ধটি—সং. ধটিকা > প্রাকৃ. ধটিআ (ক্ লোপ) > ধটি (অন্ত্য আ লোপ)।

ধড়া—সং. ধটিকা > প্রাকৃ. ধডিআ (ট > ড, ক্ লোপ) > ধড়িআ > ধড়া (মধ্যবর্তী 'ইকার' লুপ্ত এবং অন্ত্য আ-য়ের স্থান বিপর্যয়)।

ধনে—সং. ধন্যাক > প্রাকৃ. ধন্নাঅ (ন্য > ন্ন ; ক্ লোপ) > ধনিঅ (মধ্যস্বরাগম যুগ্ম সমব্যঞ্জনের একক ব্যঞ্জনে পরিণতি) > ধনিয়া (য়-শ্রুতি) > ধনে (স্বরসংগতি)।

ধাই— **দাই** দ্র।

ধাঁধা—সং. ধন্দ > প্রাকৃ. ধন্‌দ (ন্ধ > ন্দ) > ধাঁধা (ন্ লোপ ; পূর্বস্বরের অনুনাসিকতা ও দীর্ঘীভবন ; পদান্তিক স্বরের দীর্ঘীভবন)

ধোঁয়া—সং. ধূম্র > প্রাকৃ. ধুম্ম (ধূ > ধু ; ম্র > ম্ম) > ধূমা (যুগ্ম সমব্যঞ্জনের একক ব্যঞ্জনে পরিণতি ; পদান্তিক স্বরের দীর্ঘীভবন) > ধোঁয়া (ম্ লোপ, পূর্বস্বরের অনুনাসিকতা য়-শ্রুতি)।

ন

নই (নদী)—সং. নদী > প্রাকৃ. নঈ (দ্ লুপ্ত) > নই ('কালিনী নইকূলে')।

নকল—কৃতঋণ শব্দ। আরবি নক্‌ল্ > নকল (যুগ্ম সমব্যঞ্জনের একক ব্যঞ্জনে পরিণতি; মধ্য স্বরাগম)।

নট—সং. নৃত্যক > প্রাকৃ. নট্টঅ (নৃ > ন, ত্য > ট্ট মূর্ধন্যীভবন ; পদান্তিক ক্ লোপ) > নট (যুগ্ম সমব্যঞ্জনের একক ব্যঞ্জনের পরিণতি ; পদান্তিক অ লোপ)।

নধর—সং. নবধর > প্রাকৃ. নঅধর (ব্ লোপ) > নধর (মধ্যস্বর লোপ)।

ননদ—সং. ননন্দা > প্রাকৃ. ণণংদা (ন > ণ মূর্ধন্যীভবন ; ন্ > ং) > ননদ (পদমধ্যবর্তী অনুস্বার লোপ)।

নয়—সং নবতি > নব > প্রাকৃ. ণঅ > নয় (য়-শ্রুতি)।

নরুণ—সং নখহরণিকা > নহহরনিঅ (খ > হ, ক্ লোপ), (পদান্তের দীর্ঘস্বর হ্রস্বস্বরে পরিণত) > নহরণী (হ লুপ্ত ; নি > নী ; পদান্তিক অ লুপ্ত) > নরুন (হ্ লুপ্ত, র > রু স্বরসংগতি ; অন্ত্যস্বরের লোপ)।

নাইয়া—সং. নাবিক > প্রাকৃ. নাইঅ (ব্ লোপ, ক্ লোপ) > নাইয়া (য়-শ্রুতি)।

নাগর—সং. অর্থ নগরবাসী। শব্দটির অর্থাবনতি ঘটেছে। পরিবর্তিত অর্থ অবৈধ প্রেমিক।

নাগা—সং. নগ্নক > প্রাকৃ. ণগগঅ (ন > ণ, গ্ন > গ্‌গ ; ক্ লোপ) > নাগা (যুগ্ম সমব্যঞ্জনের একক ব্যঞ্জনে পরিণতি ; আদ্যস্বরের দীর্ঘীভবন ; পদান্তিক অ > আ)।

নাতি—সং নপ্তৃক > প্রাকৃ. নত্তিঅ (প্তৃ > ত্ত, ক্ লোপ > অপ. নাতিঅ (ত্ত > ত) > নাতি (অন্ত্যস্বরলোপ)।

নাপিত—সং. স্নাপিত > প্রাকৃ. ণহাপিত (স্ন < ণহা) > নাপিত (হ্ লোপ)

নালতা (পাটগাছ)—সং. নল + বাং. তিতা > নলিতা (ত্ লোপ) > নালতা (আদ্যস্বরের দীর্ঘীভবন) > নালতে (স্বরসংগতি)।

নিম—সং. নিম্ব > প্রাকৃ. নিংব (ম্ > ং) > নিম (ং > ম)

নিশ্চুপ—জোড়কলম (portmanteau) শব্দ। নিশ্চল + চুপ (নিশ্ (চল) + চুপ)।

নেউল—সং. নকুল > প্রাকৃ. ণউল (ন > ণ ; ক্ লোপ) > নেউল (স্বরসংগতি)।

নেওটা—সং. স্নেহবৃত্ত > প্রকৃ নেহবট্ট (স্ন > ন ; বৃ > ব ; ত্ত > ট্ট) > অপ. নেহঅট্ট (ব্ লোপ) > নেঅঅট্ট > নেওটা (সমাক্ষর লোপ ; স্বরসংগতি ; অন্ত্যস্বরের দীর্ঘীভবন)।

নেমন্তন্ন—সং. নিমন্ত্রণ > নিমন্তন্ন > নেমন্তন্ন (ত্র > ন্ত ; স্বরসংগতি); অর্ধতৎসম।

প

পইঠা (সিঁড়ি, ধাপ)—সং. প্রতিষ্ঠা > প্রাকৃ. পইট্‌ঠা (প্র > প ; ত্ লুপ্ত ; ষ্ লুপ্ত) > পইঠা (পদমধ্যবর্তী ট্ লুপ্ত)।

পঁচাত্তর—সং. পঞ্চসপ্ততি > প্রাকৃ. পংচহত্তরি (ঞ্ > ং ; স > হ, প্ত > ত্ত, ত্ > র্) > পঁচাত্তর (পংচ > পঁচা) (অনুনাসিকতা, হ লোপ, অন্ত্য ইকার লোপ)।

পড়শি—সং. প্রতিবেশী > প্রাকৃ. পড়িএসি (প্র > প ; ত্ > ড় ; ব্ লোপ) > পড়শি (মধ্য স্বরলোপ ; এ লোপ)।

পরশু—সং. পরশ্বঃ > পরশুঅ > পরশু (অর্থান্তর, পরশ্বঃ অর্থ ছিল আগামী কালের পর দিন। বাংলায় গতকালের আগের দিনও বোঝায়।)

পলা— সং. প্রবাল > প্রাকৃ. পআল (প্র > প ; ব্ লোপ) > পলা (মধ্যস্বরলোপ, অন্ত্যস্বরের দীর্ঘীভবন)।

পাউরুটি—পোর্তু. পাউ (pao) + হি. রোটি > পাউরুটি

পাকা—সং. পক্ব > প্রাকৃ. পক্ক (ক্ব > ক্ক, সমীভবন) > পাকা (ক্ক > ক একক ব্যঞ্জন, আদ্যস্বর ও অন্ত্যস্বরের দীর্ঘীভবন)।

পাঁচ—সং পঞ্চ > প্রাকৃ. পংচ > পাঁচ (ঞ্চ > ং ; পং > পাঁ)।

পাখা—সং. পক্ষ > প্রাকৃ. পক্খ > পাখা (ক্ষ > ক্খ ; অন্তস্বরের পূরক দীর্ঘীভবন)।

পাট—সং. পট্ট > প্রাকৃ. পট্‌ট > পাট (ট্ট > ট ;) আদ্যস্বরের পূরক দীর্ঘীভবন)।

পাত—সং. পত্র > প্রাকৃ. পত্ত (ত্র > ত্ত) > পাত (ত্ত > ত একক ব্যঞ্জন ; আদ্যস্বরের দীর্ঘীভবন)।

পাথর—সং. প্রস্তর > প্রাকৃ. পত্থর (প্র > প ; স্ত > ত্থ) > পাথর (ত্থ > থ ; প > পা দীর্ঘীভবন)।

পালকি—সং. পর্যঙ্কিকা > প্রাকৃ. পল্লংকিআ (র্য > ল্ল লকারীভবন > পদান্তিক ক্ লোপ) > পালকি (ল্ল > ল একক ব্যঞ্জন ; নাসিক্য ব্যঞ্জন লোপ ; আদ্যস্বরের দীর্ঘীভবন ; পদান্তিক আ লোপ)।

পালা—সং. পর্যায় > প্রাকৃ. পল্লঅ (র্য > ল্ল সমীভবন ; য় > অ, মধ্যস্বর লোপ) > অপ. পাল্লা (আদ্যস্বর ও অন্ত্যস্বরের দীর্ঘীভবন) > পালা (ল্ল > ল একক ব্যঞ্জন)।

পিঁড়ি—সং. পীঠিকা > প্রাকৃ. পিঠিআ (ক্ লোপ) > অপ. পিঢিঅ (ঠ > ঢ ; আ > অ) > পিঢ়ি (ঢ় > ড়, অন্ত্য অ লোপ) > পিঁড়ি (স্বতোনাসিক্যীভবন, অল্পপ্রাণীভবন)।

পিলে—সং. প্লীহা > প্রাকৃ. পিলিহা (মধ্য স্বরাগম) > পিলা (পদমধ্যবর্তী ই লোপ, হ্ লোপ) > পিলে (স্বরসংগতি)

পিসি—সং. পিতৃস্বসৃকা > প্রা. পিউস্‌সসিআ (ত্ লোপ ; ঋ > উ ; স্ব > স্‌স সমীভবন; সৃ > সি ; ক্ লোপ) > অপ. পিউসিঅ (পদমধ্যবর্তী স্‌স লোপ, অন্ত্যস্বরের হ্রস্বীভবন) > পিসি (উ লোপ, পদান্তিক অ লোপ)।

পুঁটি—সং. প্রোষ্ঠী > প্রাকৃ. পুট্‌ঠী (প্রো > পু ; ষ্ঠ > ট্ঠ) > অপ. পুংঠী (নাসিক্য ব্যঞ্জনের আগম) > পুঁটি (অনুস্বার লোপ, পূর্ব স্বরের অনুনাসিকতা ; ঠ > ট (অল্পপ্রাণীভবন)।

পুঁথি—সং. পুস্তিকা > প্রাকৃ. পুত্থিআ (স্ত > ত্থ , সমীভবন, ক্ লোপ) > পুথি (ত্থ > থ) > পুঁথি (স্বতোনাসিক্যীভবন)।

পুকুর—সং পুষ্কর > প্রাকৃ. পুক্খর (ষ্ক > ক্খ) > পুখর (ক্ লোপ) > পুকুর (খ > ক, অল্পপ্রাণীভবন, স্বরসংগতি)।

পুতুল—সং. পুত্তলিকা > প্রাকৃ. পুত্তলিআ (ক্ লোপ) > পুত্তল (পদমধ্যবর্তী ই লোপ, পদান্তিক ক্ লোপ) > পুতুল (যুগ্মব্যঞ্জন ত্ত একক ব্যঞ্জনে পরিণত—ত ; স্বরসংগতি ত > তু)।

পৈঠা—**পইঠা** দ্র।

পুত—সং. পুত্র > প্রাকৃ. পুত্ত (ত্র > ত্ত) > অপ. পুত (ত্ত > ত) > পুঅ > পো (ত্ লোপ; উ + অ > ও)।

পোয়াতি—সং. পুত্রবতী > প্রাকৃ. পুঅঅতী (ত্র্ লোপ, ব্ লোপ) > পুয়াতি (অঅ > আ > য়া য়-শ্রুতি) > পোয়াতি (সমীভবন)।

প্যাঁচা—সং. পেচক > প্রাকৃ. পেচঅ (ক্ লোপ) > পেচা (পদান্তে চঅ > চা) > প্যাঁচা (স্বরসংগতি, স্বতোনাসিক্যীভবন)।

ফ

ফকির—কৃতঋণ শব্দ। আ. ফক্কীর > ফকির (ক্ক > ক, ঈ > ই)।

ফড়িং—সং. পতঙ্গ > প্রাকৃ. পটিঙ্গ (ত > ট ; মূর্ধন্যীভবন, মধ্যস্বরাগম) > ফড়িঙ্গ (প > ফ মহাপ্রাণীভবন; ট > ড়) > ফড়িং (ঙ্গ-এর গ্ লোপ = ফড়িঙ > ফড়িং)।

ফলা—সং. ফলক > প্রাকৃ. ফলঅ (ক্ লোপ) > ফলা (পদান্তে লঅ > লা)।

ফলার—সং. ফলাহার > ফলার (পদমধ্যবর্তী হ লোপ)। আদি অর্থ ছিল ফল আহার। পরিবর্তিত অর্থ কলা দই চিঁড়ে ইত্যাদি আহার। অর্থপ্রসার।

ফাঁকি—সং ফক্কিকা > প্রাকৃ. ফক্কিআ (পদান্তিক ক্ লোপ) > ফাকি (ক্ক > ক ; পদান্তিক আ লোপ ; আদ্যস্বরের দীর্ঘীভবন) > ফাঁকি (স্বতোনাসিক্যীভবন)।

ফাগ—সং. ফল্গু > প্রাকৃ. ফগ্গু (ল্গ > গ্গ সমীভবন) > অপ. ফগ্গু > প্রা. বাং. ফাগু (যুক্তব্যঞ্জনের একক ব্যঞ্জনে পরিণতি, আদ্যস্বরের দীর্ঘীভবন) > ফাগ (পদান্তিক স্বরধ্বনির লোপ)।

ফিকির—আরবি ফিক্র্ > ফিকির (মধ্য স্বরাগম)।

ফিঙে—সং. ফিঙ্গক > প্রাকৃ. ফিংগঅ (ঙ্গ > ংগ ; ক্ লোপ) > ফিঙ্গা (অ > আ) > ফিঙা (গ্ লোপ) > ফিঙে (সমীভবন)।

ফেউ—সং. ফেরু (শিয়াল) > প্রা. বাং. ফেউর (ধ্বনিবিপর্যয়) > ফেউ (পদান্তিক র লুপ্ত)।

ফোড়ন—সং স্ফোটন > প্রাকৃ. ফোড়ণ (স্ফ > ফ ; ট > ড ; ন > ণ মূর্ধন্যীভবন) > ফোড়ন (ড > ড়, ণ > ন)।

ব

বইঠা—সং. বহিত্র > প্রাকৃ. বহিট্ঠ (ত্র > ট্ঠ) > বইঠা (হি > ই অল্পপ্রাণীভবন ; ট্ লুপ্ত; ঠ > ঠা)।

বউ—সং. বধূ > প্রাকৃ. বহূ (ধূ > হূ) > বউ (হূ > উ স্বরের হ্রস্বীভবন)।

বউড়ি (পুত্রবধূ) —সং. বধূটী > প্রাকৃ বহুড়ী (ধ > হ ; ট > ড়) > বউড়ি (হু > উ ; ড়ী > ড়ি স্বরের হ্রস্বীভবন)।

বড়দা—বাং. বড়োদাদা > বড়্দা (মধ্যস্বর লোপ ; সমাক্ষর লোপ)।

বাই—সং. বাতিক > প্রাকৃ. বাইঅ (ত্ লোপ ; ক্ লোপ) > বাই (পদান্তিক অ লোপ)।

বাইশ—সং. দ্বাবিংশ > প্রাকৃ. বাবীস (দ্ব > ব ; অনুস্বার লোপ ; পূর্ববর্তী স্বরের দীর্ঘীভবন; শ > স দন্ত্যীভবন) > বাইশ (ব্ লোপ ; ঈ-কার > ই ; স > শ তালব্যীভবন)।

বাউল—সং. বাতুল > প্রাকৃ. বাউল > বাউল (ত্ লোপ)

বাঘ—সং. ব্যাঘ্র > বাগ্ঘ (ব্যা > বা ; ঘ্র > গ্ঘ) > বাঘ (মধ্যবর্তী গ্ লোপ)।

বাছা—সং. বৎস > প্রাকৃ. বচ্ছ (ৎস > চ্ছ) > বচ্ছা (অন্ত্যস্বরের দীর্ঘীভবন) > বাচ্ছা (আদ্যস্বরের দীর্ঘীভবন) > বাছা (চ্ছ > ছ)।

বাট (পথ)—সং. বর্ত্ম > প্রাকৃ. বট্ট (র্ লোপ, ত্ম > ট্ট, সমীভবন, মূর্ধন্যীভবন) > বাট (ট্ট > ট একক ব্যঞ্জনে পরিণত, পূর্ববর্তী স্বরধ্বনির দীর্ঘীভবন)।

বাপ—সং. বপ্র > প্রাকৃ. বপ্প (প্র > প্প) > বাপ (প্প > প, যুক্তব্যঞ্জন একক ব্যঞ্জনে পরিণত; আদ্যস্বরের দীর্ঘীভবন)।

বালা—সং. বলয় > প্রাকৃ. বলঅ (য় > অ) > বালা (পদান্তের অ লোপ এবং আদ্যস্বরের পূরক দীর্ঘীভবন)।

বাসর—সং. বাসগৃহ > প্রাকৃ. বাসহর (গৃহ > ঘর > হর) > বাসর (হ লোপ)।

বিছা, বিছে—সং. বৃশ্চিক > প্রাকৃ. বিচ্ছিঅ > বিচ্ছঅ (বৃ > বি, শ্চ > চ্ছ, সমীভবন ; ক্ লোপ ; ইকার লোপ) > বিছা (চ্ছ > ছ, অন্ত্যস্বরের দীর্ঘীভবন) > বিছে (স্বরসংগতি)।

বিথার (বিস্তার)—সং. বিস্তার > প্রাকৃ. বিত্থার (স্ত > ত্থ) > বিথার (যুগ্ম সমব্যঞ্জনের একক ব্যঞ্জনে পরিণতি)।

বিয়ে—সং. বিবাহ > প্রাকৃ. বিআহ (পদমধ্যবর্তী ব্ লোপ) > বিয়া (য়-শ্রুতি ; পদান্তিক হ লোপ) > বিয়ে (স্বরসংগতি)।

বিশ—সং. বিংশ (তি) > প্রাকৃ. বীস (নাসিক্য ব্যঞ্জন লোপ ; পূর্ববর্তী স্বরধ্বনির দীর্ঘীভবন; শ > স) > বিশ (আদ্যস্বরের হ্রস্বীভবন ; স > শ তালব্যীভবন)।

বুড়ো—সং. বৃদ্ধ > প্রাকৃ. বুড্ঢ (ঋকার > উ ; দ্ধ > ড্ঢ) > বুড়ো (ড্ঢ > ড়)

বেয়াই—সং. বৈবাহিক > প্রাকৃ. বেবাহিঅ (ঐ > এ ; পদান্তিক ক্ লোপ) > বেহাই (বা > হা ; হ্ লোপ ; পদান্তিক অ লোপ) > বেয়াই (য়-শ্রুতি)।

বৈঠা—**বইঠা** দ্র।

বোন—সং ভগিনী > প্রাকৃ. বঘিনী > বহিনী (ভ > ব, অল্পপ্রাণীভবন ; গ্ < ঘ মহাপ্রাণীভবন; ঘ > হ) > বহিন (অন্ত্যস্বর লোপ) > বইন (হি > ই) > বোন (ব > বো)।

ভ

ভাই—সং. ভ্রাতৃক > প্রাকৃ. ভাইঅ (ভ্র > ভ, ত্ লোপ ; ঋ > ই ; ক্ লোপ) ভাই (পদান্তিক অ লোপ)।

ভাঁজ—সং. ভন্‌জ > প্রাকৃ. ভংজ (ন্ > ং) > ভাঁজ (নাসিক্য ব্যঞ্জন লোপ, পূর্বস্বরের দীর্ঘীভবন ও অনুনাসিকতা)।

ভাঁড় (পাত্র)—সং. ভাণ্ড > প্রাকৃ. ভংড (মূর্ধন্য ণ > ং, আদ্য আ > অ) > ভাঁড় (ভং > ভাঁ (অনুনাসিকতা ও আদ্য স্বরের দীর্ঘীভবন) ; ড > ড়।

ভাজ (ভাইবউ)—সং. ভ্রাতৃজায়া > প্রাকৃ. ভাউজ্জাঅ (র-ফলা লোপ ; ত্ লোপ ; ঋ-কার > উ ; জ > জ্জ ; য় লোপ, অন্ত্যস্বরের হ্রস্বীভবন) > অপ. ভাউজাঅ (জ্জ > জ) > ভাউজ (জা > জ ; অন্ত্য অ লোপ) > ভাজ (মধ্যস্বরলোপ)।

ভাত—সং. ভক্ত > প্রাকৃ. ভত্ত (ক্ত > ত্ত, সমীভবন) > ভাত (ত্ত > ত, আদ্যস্বরের দীর্ঘীভবন)।

ভাপ (বাষ্প)—সং. বাষ্প > প্রাকৃ. বপ্‌ফ > ভপ্প (আদ্যস্বরের হ্রস্বীভবন ; ব্ > ভ্ মহাপ্রাণীভবন; ষ্প > প্প > ভাপ (যুগ্মব্যঞ্জনের একক ব্যঞ্জনে পরিণতি)।

ভালো—সং. ভদ্রক > প্রাকৃ. ভল্লঅ (দ্র > ল্ল ; ক্ লোপ) > ভালো (ল্ল > ল যুগ্মব্যঞ্জনের একক ব্যঞ্জনে পরিণতি ; আদ্যস্বরের দীর্ঘীভবন)।

ভিমরুল—সং. ভৃঙ্গরোল > প্রাকৃ. ভিঙ্গরুল (ভৃ > ভি ; ও > উ) > ভিমরুল (ঙ্গ > ম)।

ভুঁইয়া—সং. ভূমিক > প্রাকৃ. ভূমিঅ (ক্ লোপ) > ভুঁইয়া (ঊ > উ স্বরের হ্রস্বীভবন ; নাসিক্য ব্যঞ্জন লোপ, আদ্যস্বরের অনুনাসিকতা ; অন্ত্য অ > য়া য়-শ্রুতি)।

ভোম্‌রা—সং. ভ্রমর > প্রাকৃ. ভমর (র-ফলা লোপ) > ভোম্‌রা (অ > ও ; মধ্যস্বরলোপ; পদান্তিক স্বরের দীর্ঘীভবন)।

ম

মই—সং. মদী > প্রাকৃ. মঈ (দ্ লোপ) > মই (অন্ত্যস্বরের হ্রস্বীভবন)।

মউ—সং. মধু > প্রাকৃ. মহু (ধ্ লোপ) > মউ (হ্ লোপ)।

মড়ক—সং. মরক > মড়ক (স্বতোমূর্ধ্যনীভবন)।

মড়া—সং, মৃত > প্রাকৃ. মট (মৃ > ম ; ত > ট মূর্ধন্যীভবন) > মড়া (ট > ড়, অন্ত্যস্বরের দীর্ঘীভবন)।

মা—সং. মাতৃ > মাতা > প্রাকৃ. মাআ (ত্ লোপ) > মা (অন্ত্যস্বর লোপ)।

মাছ—সং. মৎস্য > প্রাকৃ. মচ্ছ (ৎস > চ্ছ সমীভবন) > মাছ (যুক্তব্যঞ্জনের একটি লোপ; পূর্ববর্তী স্বরের দীর্ঘীভবন)।

মাটি— সং. মৃত্তিকা > মট্টিআ (ঋকার লোপ, ত্ত > ট্ট মূর্ধ্যন্যীভবন ; ক্ লোপ) > মট্টিঅ > মাটি (যুক্তব্যঞ্জনের একক ব্যঞ্জনে পরিণতি, অন্ত্যস্বরলোপ।

মাথা—সং. মস্তক > প্রাকৃ মত্থঅ (স্ত > ত্থ সমীভবন, ক্ লোপ) > মাথা (ত্থ > থ, পূর্ববর্তী স্বরের দীর্ঘীভবন ; অন্ত্যস্বরের দীর্ঘীভবন)।

মাসি—সং. মাতৃস্বসৃকা > প্রাকৃ. মাউস্সসিঅ (ত্ লোপ ; ঋ > উ, স্ব > স সমীভবন ; সৃ > সি ; ক্ লোপ ; অন্ত্যস্বরের হ্রস্বীভবন) > অপ. মাউসিঅ (স্স লোপ) > মাসি (মধ্যস্বর লোপ; অন্ত্যস্বর লোপ)।

মিনতি—আরবি মিন্নৎ + সং বিজ্ঞপ্তি > মিন্নত্তি > মিনতি জোড়কলম শব্দ।

মুটে—বাং মোটিয়া > মুটিয়া (স্বরসংগতি) > মুটে (স্বরসংগতি)

মেজো—সং. মধ্য > প্রাকৃ. মজ্ঝ (ধ্য > জ্ঝ) > মাঝ (জ্ঝ > ঝ, পূর্বস্বরের দীর্ঘীভবন) + উয়া > মাঝুয়া > মাউঝা (অপিনিহিতি) > মেঝো (অভিশ্রুতি) > মেজো (অল্পপ্রাণীভবন)।

মোড়ল—সং. মণ্ডল > প্রাকৃ.. মংডল (ণ্ড > ংড) > মোড়ল (অ > ও ; ড > ড়)।

য

যক—সং যক্ষ > প্রাকৃ. জক্খ (ক্ষ > ক্খ) > যক (জ > য ; অন্ত্য মহাপ্রাণ খ লোপ)।

র

রসুন—সং. লশুন > রশুন (ল > র রকারীভবন)।

রা—সং. রাব > প্রাকৃ. রাঅ (ব্ লোপ) > রা (অন্ত্যস্বরলোপ)

রাই—সং. রাধিকা > প্রাকৃ. রাহিআ (ধ্ > হ্ ; ক্ লোপ) > অপ. রাইঅ (হ্ লোপ ; অন্ত্য আ স্বরের হ্রস্বীভবন) > রাই (অন্ত্য স্বরলোপ)।

রাখাল—সং রক্ষপাল > প্রাকৃ. রক্খআল (ক্ষ > ক্খ ; প্ লোপ) > রাখাল (সমীভবন; ক্খ > খ)।

রানি*—সং. রাজ্ঞিকা > প্রাকৃ. রাণ্ণিআ (জ্ঞ > ণ্ণ, ক্ লোপ) > রানী (ণ্ণ > ন্ন যুগ্মব্যঞ্জনের একক ব্যঞ্জনে পরিণতি ; দন্ত্যীভবন > রানি (পদান্তে স্বরের হ্রস্বীভবন)।

[* 'রাণী' বানান অযৌক্তিক। 'রানি' বানানই সংগত]

রিঠা, রিঠে—সং. অরিষ্ট > প্রাকৃ. অরিট্‌ঠ > রিট্‌ঠ (ষ্ট > ট্ঠ সমীভবন ; আদিস্বরলোপ) > রিঠা (যুক্ত ব্যঞ্জনের একটি লোপ ট্ঠ > ঠা ; অন্ত্যস্বরের দীর্ঘীভবন) > রিঠে (স্বরসংগতি)।

রুই—সং. রোহিত > প্রাকৃ. রোহিঅ (ত্ লোপ) > অপ. রোইঅ (হ্ লোপ) > রুই (ও > উ স্বরসংগতি)।

ল

লাউ—সং. অলাবু > প্রাকৃ. লাবু (আদি স্বরলোপ) > অপ. লাউ (ব্ লোপ) > বাং. লাউ।

লাখ—সং. লক্ষ > প্রাকৃ. লক্খ (ক্ষ > ক্খ সমীভবন) > লাখ (ক্ লোপ ; আদ্য স্বরের দীর্ঘীভবন)।

লাট—ইং. লর্ড (lord) > লাট (র্ লোপ ; আদিস্বরের দীর্ঘীভবন ; ড > ট অঘোষীভবন)।

লাঠি—সং. যষ্টি > প্রাকৃ. লট্‌ঠি (য > ল; ষ্ট > ট্‌ঠ সমীভবন) > লাঠি (যুগ্মব্যঞ্জনের একক ব্যঞ্জনে পরিণতি ; আদ্যস্বরের দীর্ঘীভবন)।

লুট—সং. লুণ্ঠন > প্রাকৃ. লুঠ (ণ্‌ লোপ, পদান্তে ন লোপ) > লুট্‌ (পদান্তে ঠ > ট অল্পপ্রাণীভবন)।

শ

শ, শো—সং. শতম্‌ > প্রাকৃ. সঅ (শ > স দন্ত্যীভবন ; ত্‌ লোপ, অন্ত্য ম্‌ লোপ) > মধ্য বাং. শয় > আ-বাং শ, শো (য় লোপ)

শাওন—সং. শ্রাবণ > প্রাকৃ. সাওণ (শ > স ; র-ফলা লোপ ; ব্‌ লোপ) > শাওন (স > শ তালব্যীভবন ; অন্ত্য ণ > ন দন্ত্যীভবন)।

শাঁখ—সং. শঙ্খ > প্রাকৃ. সংখ (শ > স দন্ত্যীভবন ; ঙ > ং) > শাঁখ (ং লোপ ; স > শ তালব্যীভবন পূর্বস্বরের অনুনাসিকতা ও দীর্ঘীভবন)।

শাঁখা—সং. শঙ্খক > প্রাকৃ. সংখঅ (শ > স দন্ত্যীভবন ; ঙ > ং; ক্‌ লোপ) শাঁখা (স > শ তালব্যীভবন ; অনুস্বার লোপ ; আদ্যস্বরের অনুনাসিকতা ও দীর্ঘীভবন)।

শাড়ি—সং. শাটিকা > প্রা. সাডিআ (শ > স দন্ত্যীভবন ; ট > ড ঘোষীভবন ; ক্‌ লোপ) > সাড়ি (ড > ড় ; অন্ত্য স্বরলোপ) > শাড়ি (স > শ তালব্যীভবন)।

শামুক—সং. শম্বুক > প্রাকৃ. সম্মুক (শ > স দন্ত্যীভবন ; ম্ব > ম্ম সমীভবন) > শামুক (ম্ম > ম ; স > শ তালব্যীভবন ; আদ্যস্বরের দীর্ঘীভবন)।

শালা—সং. শ্যালক > প্রাকৃ. সালঅ (শ > স, যুক্তব্যঞ্জন সরলীভূত ; অন্ত্য ক্‌ লোপ) > শালা (স > শ তালব্যীভবন ; অন্ত্যস্বরলোপ ; আদ্যস্বরের দীর্ঘীভবন)।

শাশুড়ি—সং. শ্বশ্রূ > প্রাকৃ. সস্‌সু (শ্ব > স ; শ্রূ > স্‌সু যুক্ত ব্যঞ্জন সরলীভূত) > সাসু (সস্‌ > সা) > শাস (পদান্তের উ লোপ, স > শ তালব্যীভবন) > শাশ + উড়ি প্রত্যয় = শাশুড়ি।

শিউলি—সং. শেফালিকা > প্রাকৃ. সেহালিআ (শ > স দন্ত্যীভবন ; ফ্‌ লোপ ; ক্‌ লোপ) > সেহালি (অন্ত্য) আ লোপ) > শিয়ালি (য়-শ্রুতি) > শিউলি (স্বরসংগতি)।

শিখ—সং. শিষ্য > প্রাকৃ. সিক্‌খ (শ > স দন্ত্যীভবন ; ষ্য > ক্‌খ সমীভবন) > শিখ (স > শ তালব্যীভবন ; ক্‌ লোপ)।

শিমুল—সং. শিম্বল > প্রাকৃ. সিম্মল (শ > স দন্ত্যীভবন ; ম্ব > ম্ম সমীভবন) > শিমল (স > শ তালব্যীভবন) > শিমুল (স্বরসংগতি)।

শুঁটি—সং. শুণ্ঠি > প্রাকৃ. সুংঠি (শ > স দন্ত্যীভবন ; নাসিক্য ব্যঞ্জন ণ > ং) > শুঁঠি (স > শ তালব্যীভবন ; অনুস্বার লোপ, পূর্বস্বরের অনুনাসিকতা) > শুঁটি (ঠ > ট অল্পপ্রাণীভবন)

ষ

ষাঁড়—সং. ষণ্ড > প্রাকৃ. সংড (ষ > স দন্ত্যীভবন ; ণ > ং) > ষাঁড় (স > ষ মূর্ধন্যীভবন; ং লোপ, আদ্যস্বরের অনুনাসিকতা ও দীর্ঘীভবন)।

ষাট (৬০)—সং. ষষ্টি > প্রাকৃ. সট্‌ঠি (ষ > স দন্ত্যীভবন ; ষ্ট > ট্‌ঠ সমীভবন) > ষাট (স > ষ মূর্ধন্যীভবন ; ঠ্‌ লোপ ; আদ্যস্বরের দীর্ঘীভবন)।

স

সই—সং সখী > প্রাকৃ. সহি (খ > হ) ; অন্ত্যস্বরের হ্রস্বীভবন) > সই (হ্‌ লোপ)।

সতিন—সং সপত্নী > প্রাকৃ. সপতিনী (মধ্যস্বরাগম ; ত্ন > তিনী যুক্তব্যঞ্জনের সরলীকরণ) > সতিনী (প্‌ লোপ) > সতিন (অন্ত্য স্বরলোপ)।

সব—সং. সর্ব > প্রাকৃ. সব্ব (র্ব > ব্ব সমীভবন) > সব (যুক্তব্যঞ্জনের একক ব্যঞ্জনে পরিণতি)।

সম্বরা—সং. সম্ভরক > প্রাকৃ. সম্বরঅ (ম্ভ > ম্ব অল্পপ্রাণীভবন ; ক্‌ লোপ) > সম্বরা (অন্ত্য স্বরের দীর্ঘীভবন)।

সাঁই—সং. স্বামী > প্রাকৃ. সামি (স্ব > স ; মী > মি) > সাঁই (ম্‌ লোপ, পূর্ববর্তী স্বরের অনুনাসিকতা)।

সাঁওতাল—সং. সামন্তপাল > প্রাকৃ. সাঁঅন্তআল (ম্‌ লোপ, প্‌ লোপ) > সাঁওতাল (অ > ও; ন্ত > ত ন্‌ লোপ)।

সাঁঝ—সং. সন্ধ্যা > সঞ্‌ঝা (ন্‌ > ঞ্‌ ; ধ্য > ঝ) > সাঁঝ (ন্‌ লোপ ; আদ্যস্বরের দীর্ঘীভবন ও অনুনাসিকতা ; অন্ত্যস্বরলোপ)।

সাঁড়াশি—সং. সন্দংশিকা > প্রাকৃ. সণ্ডংসিআ (ন্‌ > ণ্‌ মূর্ধন্যীভবন ; দ > ড মূর্ধন্যীভবন; অপ. সন্ডংসিঅ শ > স দন্ত্যীভবন ; ক্‌ লোপ) (অন্ত্যস্বরের হ্রস্বীভবন) > সাঁড়াশি (ণ লোপ; ড > ড়া ; আদ্যস্বরের অনুনাসিকতা ও দীর্ঘীভবন ; স > শ তালব্যীভবন ; অন্ত্যস্বরলোপ)।

সাজি (-মাটি)—সং. সর্জিকা > প্রাকৃ সজ্জিআ (র্জ > জ্জ সমীভবন ; ক্‌ লোপ) > সজ্জি (অন্ত্যস্বরলোপ) > সাজি (জ্জ > জ একক ব্যঞ্জন, পূর্বস্বরের পূরক দীর্ঘীভবন)।

সাতাশ—সং. সপ্তবিংশ > প্রাকৃ. সত্তঈস (প্ত > ত্ত সমীভবন ; ব্‌ লোপ) ; ং লোপ ; শ > স দন্ত্যীভবন) > সাতাইশ (ত্ত > ত ; পূর্বস্বরের দীর্ঘীভবন, ঈ > ই) > সাতাশ (ই লোপ); স > শ তালব্যীভবন)।

সুতো—সং. সূত্র > প্রাকৃ. সুত্ত (ত্র > ত্ত সমীভবন) > সুতা (ত্ত > ত ; অন্ত্যস্বরের দীর্ঘীভবন) > সুতো (স্বরসংগতি)।

সুয়ো (-রানি)—সং. সুভগা > প্রাকৃ. সুহঅ (ভ > হ ; গ্‌ লোপ) > সুহা (হঅ > হা) > সুয়া (হ্‌ লোপ ; য়-শ্রুতি) > সুয়ো (স্বরসংগতি)।

সুড়ঙ্গ— গ্রিক. সুরিংকস > সং. সুরঙ্গ > প্রাকৃ. সুরঙ্গ > সুড়ঙ্গ (র > ড়)।

সেজ (শয্যা)—সং. শয্যা > প্রাকৃ. সেজ্জা (শ > স দন্ত্যীভবন ; য্য > জ্জ সমীভবন ; অন্ত্যস্বরের দীর্ঘীভবন) > অপ. সেজ্জ (অন্ত্যস্বর লোপ) > সেজ (জ্জ > জ একক ব্যঞ্জনে পরিণতি)।

সোঁটা (লাঠি)—হি. সোংটা (< প্রাকৃ. সুংড < সং শুণ্ড) > সোঁটা (ং লোপ, পূর্বস্বরের অনুনাসিকতা)।

সোহাগ—সং. সৌভাগ্য > প্রাকৃ. সোভগ্গ (ঔ > ও ; গ্য > গ্‌গ সমীভবন) > অপ. সোহগ্‌গ (ভ্ > হ) > সোহাগ (হ > হা ; অন্ত্য গ লোপ)।

হ

হরতাল—গুজরাতি হড়্‌তাল > হড়তাল (ড > ড়) > হরতাল (ড় > র রকারীভবন)।

হাঁচি—সং. হঞ্চি > প্রাকৃ. হংচি (ঞ্চ > ংচ) > হাঁচি (ং লোপ ; পূর্বস্বরের দীর্ঘীভবন ও অনুনাসিকতা)।

হাঁড়ি—সং হণ্ডিকা > প্রাকৃ. হন্ডিআ (ক্ লোপ) > হাঁড়ি (ণ লোপ ; পূর্বস্বরের অনুনাসিকতা ও দীর্ঘীভবন ; অন্ত্য আ লোপ)।

হাত—সং. হস্ত > প্রাকৃ. হত্থ (স্ত > ত্থ সমীভবন) > হাত (ত্থ > ত একক ব্যঞ্জনে পরিণতি; অল্পপ্রাণীভবন ; পূর্বস্বরের দীর্ঘীভবন)।

হাতি—সং. হস্তী > প্রাকৃ. হত্থী (স্ত > ত্থ) > হাতি (ত্থ > ত) যুক্তব্যঞ্জনের একক ব্যঞ্জনে পরিণতি ; অল্পপ্রাণীভবন ; পূর্বস্বরের দীর্ঘীভবন)।

হিয়া—সং. হৃদয় > প্রাকৃ. হিঅঅ (হৃ > হি ঋকার লোপ ; দ্ লোপ ; য় > অ) > হিয়া (অঅ > আ য়-শ্রুতি)।

হেঁচকা—সাঁও. হেঁচ + কা > হেঁচকা

হেডপণ্ডিত—সংকর শব্দ। ইং হেড (head) + সং পণ্ডিত।

গ্রন্থপঞ্জি

ভাষাতত্ত্ব ও ভাষাবিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ

অ্যাবারক্রম্বি, ডেভিড—সাধারণ ধ্বনিতত্ত্বের উপাদান (খোন্দকার আশরফ হোসেন অনূদিত, ১৯৮৯)

আজাদ, হুমায়ুন—বাক্যতত্ত্ব (১৯৮৪)

আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ—আধুনিক ভাষাতত্ত্ব (১৯৯৭)

ইসলাম, রফিকুল—ভাষাতত্ত্ব (১৯৯২)

চক্রবর্তী, উদয়নারায়ণ—বাংলা পদগুচ্ছের সংগঠন (১৯৯২)

চক্রবর্তী, বিপ্লব—শৈলী চিন্তাচর্চা (২০০৩)

চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার—বাঙ্গালা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা (১৩৯৮)

দাশ, শিশিরকুমার—ভাষাবিজ্ঞান (১৯৯২)

দাশগুপ্ত, প্রবাল—কথার ক্রিয়াকর্ম (১৯৮৭)

নাথ, মৃণাল—ভাষা ও সমাজ (১৯৯৯)

বিশ্বাস, সুকুমার—ভাষাবিজ্ঞান পরিচয় (১৯৬৮)

ভট্টাচার্য, পরেশচন্দ্র—ভাষাবিদ্যা পরিচয় (১৯৯৩)

ভট্টাচার্য, সুভাষ—ভাষা ও শৈলী (২০০৬)

—ভাষার অভিমুখ (২০১০)

মজুমদার, অভিজিৎ—শৈলীবিজ্ঞান ও আধুনিক সাহিত্যতত্ত্ব (২০০৭)

মুসা, মনসুর—ভাষাচিন্তা : প্রসঙ্গ ও পরিধি (১৯৯১)

রায়, অপূর্বকুমার—শৈলীবিজ্ঞান (২০০৬)

রায়, মোহিতকুমার—ভাষাবিজ্ঞানের গোড়ার কথা (১৯৮৮)

শ', রামেশ্বর—সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা (১৯৮৮)

সিরাজ, কাজী—আধুনিক ভাষাবিজ্ঞান (১৯৯৭)

সেন, মুরারিমোহন—ভাষার ইতিহাস (১৯৭৭)

সেন সুকুমার—ভাষার ইতিবৃত্ত (১৯৯৪)

হক, দানীউল—ভাষাবিজ্ঞানের সূক্ষ্মতর প্রসঙ্গ (১৯৯৪)

হাই, মুহম্মদ আবদুল—ধ্বনিবিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব (২০০৪)

Bach, E—An Introduction to Transformational Grammar (1964)

Barber, C.L.—The Story of Language (1975)

Bloomfield, Leonard—Language (1933)

Crystal, David—Linguistics (1980)

Crystal, D & Davy, D—Investigating English Style (1969)

Fischer, S.R.—A History of Language (1999)

Gleason, H.A.—An Introduction to Descriptive Linguistics (1961)

Gray, Louis H.—The Foundations of Language (1958)

Hockett, Charles F—A Course in Modern Linguistics (1958)

Laver, John—Principles of Phonetics (2000)

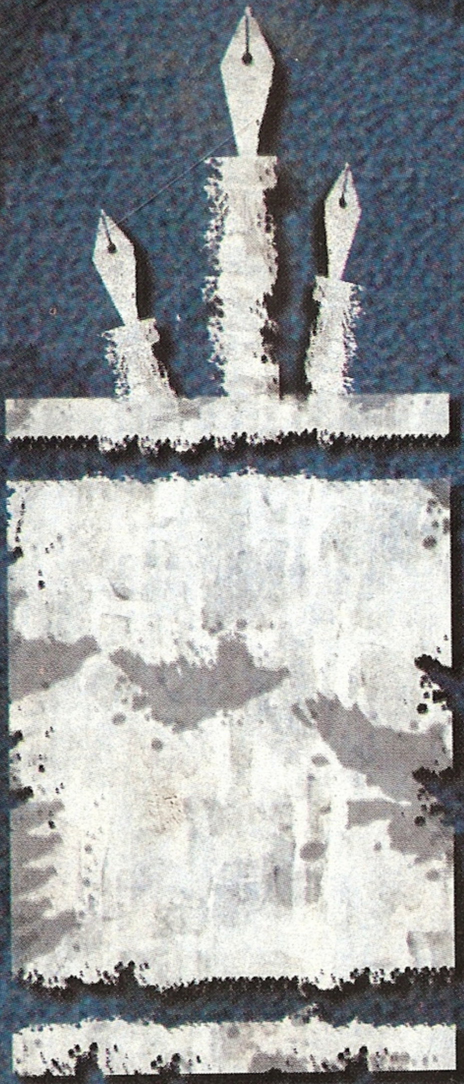
Leech, Geoffrey—Semantics (1976)
Potter, Simeon—Our Language (1962)
—Language in the Modern World (1961)
Palmer, Frank—Grammar (1979)
Robins, R.H.—A Short History of Linguistics (1997)
Sapir, Edward—Language (1949)
Trask, R.L.—Linguistics : The Basics (2003)
Trager, G.L.—Language and Linguistics (1972)
Taraporewala, I.G.S.—Elements of the Science of Language (1978)
Trudgill, P—Sociolinguistics (1974)

বাংলা ভাষা ও ব্যাকরণ বিষয়ক গ্রন্থ

আজাদ, হুমায়ুন—বাঙলা ভাষা (১৯৮৪)
গোস্বামী, কৃষ্ণপদ—বাঙলা ভাষাতত্ত্বের ইতিহাস (২০০১)
চক্রবর্তী, চিন্তাহরণ—ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি (১৩৬৭)
চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার—ভাষাপ্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ (১৯৮৮)
চট্টোপাধ্যায়, হীরেন—ভাষাতত্ত্ব ও বাংলা ভাষার ইতিহাস (১৯৯৩)
চাকী, জ্যোতিভূষণ—বাংলা ভাষার ব্যাকরণ (১৯৯৬)
দাশ, নির্মল—বাংলা ভাষার ব্যাকরণ ও তার ক্রমবিকাশ (২০০০)
বসু, দ্বিজেন্দ্রনাথ—বাংলা ভাষার আধুনিক তত্ত্ব ও ইতিকথা (১৯৮০)
ভট্টাচার্য, পার্বতীচরণ—বাংলা ভাষা (১৯৮২)
ভট্টাচার্য, বিজনবিহারী—বাগর্থ (১৯৭৭)
ভট্টাচার্য,সুভাষ—বাঙালির ভাষা (২০০০)
—বাংলাভাষা চর্চা (১৯৯২)
মজুমদার, পরেশচন্দ্র—বাঙলা ভাষা পরিক্রমা (১৩৮৩) প্রথম, দ্বিতীয়
মাইতি, প্রকাশ কুমার—আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানের আলোকে বাংলা ভাষা (২০০৮)
শহীদুল্লাহ্, মুহম্মদ—বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত (১৯৯৮)
সরকার পবিত্র—ভাষা-জিজ্ঞাসা (১৯৮৮)
—বাংলা ব্যাকরণ প্রসঙ্গ (২০০৬)
—ভাষা দেশ কাল (১৯৮৫)
—গদ্যরীতি পদ্যরীতি (১৯৮৫)
—পকেট বাংলা ব্যাকরণ (১৯৯৪)
Bykova, E.M.—The Bengali Language (191)
Chatterji, Suniti Kumar—The Origin and Development of the Bengali Language (1985)
Dimock, Edward C. et al—Introduction to Bengali (1976)
Kostić, D. & Das, Rhea—A Short Outline of Bengali Phonetics (1977)
Mojumdar Atindra—Bengali Language : Historical Grammar (1972)

নির্ঘণ্ট

(পাশের সংখ্যা অনুচ্ছেদ বা পরিচ্ছেদ নির্দেশ করছে, পৃষ্ঠাসংখ্যাকে নয়)



বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ